স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প

স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প

নবনীতা দেবসেন
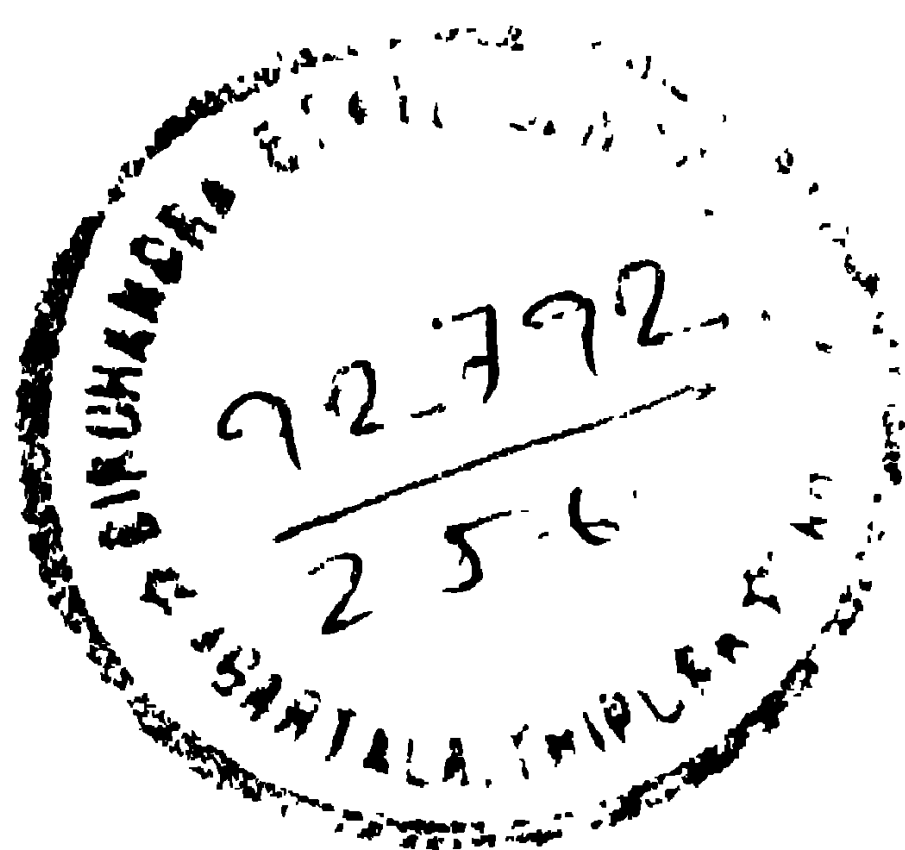
মডেল পাবলিশিং হাউস

Swanirbachita Shrestha Galpa
by
Nabanita Debsen
[A collection of Selected Stories]

প্রচ্ছদ □ পূর্ণেন্দু পত্রী
অলঙ্করণ □ শান্তনু দে

■ *মডেল পাবলিশিং হাউস*-এর পক্ষে ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭৩ থেকে *জয়দেব ঘোষ* কর্তৃক প্রকাশিত, *মডেল কম্পিউটার সেন্টার*
৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭৩ কর্তৃক অক্ষর বিন্যাস

মুদ্রণে ঃ
ইউনিক ইণ্ডিয়া প্রিন্টোগ্রাফিক্স
৩০জি, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

মূল্য ৬০ টাকা
ISBN 81-7616-036-9

ভূমিকা

'স্বনির্বাচিত' আর 'শ্রেষ্ঠ' এই দুটি বিশেষ নাম পাশাপাশি বসাতে বড়ই অস্বস্তি হয়, কেননা, শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করতে পারেন একা পাঠক। ঐ ব্যাপারটিতে লেখকের মতামত মোটেই গ্রাহ্য নয়।

এই সংকলনটি সযত্নে নির্বাচিত, এমন দাবি করব না; র‍্যান্‌ডম সিলেকশন বলাই ঠিক। কেবল একটিই খেয়াল রেখেছি, গল্পগুলো যেন বিভিন্ন ধরনের হয়। পড়তে ভালো লাগলেই আমার কাজ শেষ।

পৌষ সংক্রান্তি
কলকাতা ২৯

নবনীতা দেবসেন

প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ

মঁসিও হুলোর হলিডে
গল্পগুজব
ভালোবাসা কারে কয়
নাট্যারম্ভ
বসন্ মামা ও অন্যান্য গল্প
খগেনবাবুর পৃথিবী

প্রকাশিত উপন্যাস

আমি, অনুপম
স্বভূমি
প্রবাসে দৈবের বশে
অন্য দ্বীপ
শীত সাহসিক হেমন্তলোক
বামাবোধিনী
একটি দুপুর
দেশান্তর
ঠিকানা

সূচিপত্র

শ্রীমতী রত্নমালা রায়
কল্যাণীয়াসু

মিরাক্ল

ফিরতে ফিরতে দশটা বেজে গেল। সক্কলের আগে দুটো ফোন করতে হবে। ফেরবামাত্র। একটা খোকনের বাড়িতে, ওর দাদুঠাকুমাকে জানিয়ে দিতে হবে যে খোকন আজ বাড়ি ফিব[illegible] না। বাপি, খোকন দু'জনেই হাসপাতালে রাত কাটাবে; বাচ্চুকে হসপিটালে রিমুভ করতে হয়েছে। বাচ্চুর অবস্থা ভাল নয়, লোক চিনছে না, দারুণ রাইগর হচ্ছে। ডাক্তারবাবু বাড়িতে রাখতে ভরসা পেলেন না। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে মেজ জামাইবাবুর থ্রু দিয়ে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এলুম এইমাত্র। বাচ্চু বাপিদের সঙ্গে পড়ে, হোস্টেলে থাকে। জ্বর বাড়তে বাপি ওকে এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু এখানে রাখলে চলবে না। ডাক্তারবাবু ভয় পাচ্ছেন। জেনারেল ওয়ার্ডে রেখেও শান্তি নেই। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করানোর চেষ্টা করছেন। খোকনের দাদুকে ফোনটা করে দিয়েই ভক্তিব্রত মেসোমশাইকে ফোন করতে হবে। অতবড় ডাক্তার মেসো নিশ্চয়ই কিছু না কিছু করতে পারবেন। হা[illegible] অবস্থা নাকি অস্বাভাবিক, প্রেসার অবিশ্বাস্য নিচে নেমে গেছে। বাপির বন্ধু, বয়স কত হবে আর? এই উনিশ-কুড়িই হবে। অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাবার সময় পালস ছিল না। বাচ্চুর আবার কলকাতায় কেউ নেই। লোকাল গার্জেন এক জামাইবাবু, তিনি নামেই লোকাল; থাকেন বিরাটিতে। আর মাসের মধ্যে পাঁচ দিনই কাটান ট্যুরে। দিদিটি গিন্নিবান্নি গাঁইয়া মানুষ। খবর শুনে কেবল কেঁদেই ভাসাচ্ছেন!— জামাইবাবু এখন ট্যুরে। সবটা দায়িত্বই বন্ধুদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। তারাও তো ছেলেমানুষ। দেখি, ভক্তি মেসোকেই ধরতে হবে। রাত দশটার পরেই সেটা সুবিধে। আমিও তো খুব একটা এক্সপার্ট কেউকেটা নই, ঢাকুরে-মেয়ে বলে খানিকটা হালু-চালু, এই পর্যন্ত। [illegible] এই সময়টায় পাঁচদিনের জন্যে দুর্গাপুরে পাঠিয়েছে ওঁকে,— কী যে করি! খোকনের বাবা-মাও আপাতত দিল্লিতে, বাড়িতে কেবল বুড়োবুড়ি—দাদুঠাকুমা। খোকনের বাড়িতে ফোন করতে চেষ্টা শুরু করি— ওঁরা নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন। খবরটা না দিলেই নয় যে নাতি আজ রাত্রে ফিরবে না।

ডায়ালের চেষ্টা করতেই বুঝলাম লাইনে জট। তোলবামাত্রই এক ভদ্রলোক

বললেন— 'ফোরয়েট সিক্সয়েট জিরো টু ত্রি?' আমি বললুম— 'না। রং নাম্বার। ছেড়ে দিন।' নামিয়ে রেখে আবার তুলে ডায়াল করি। আবার— 'ফোরয়েট সিক্সয়েট স্যরি, ফোরসিক্সয়েট সিকস জিরো টু ত্রি?'

মনে অসহ্য উদ্বেগ তায় এই ইনডিসাইসিভ অ্যাপ্রোচ টু লাইফ অ্যাণ্ড ফোন নাম্বার্স— ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে যায় আমার। বললুম— 'আগে মনস্থির করুন তো দেখি? ঠিক নম্বরটা বেছে নিন। আসলে কোনটা চান?' বলেই খেয়াল হলো, ভদ্রলোক সাতটা ফিগার বলছেন। ফোন নম্বরে সাতটা সংখ্যা তো হতেই পারে না। স্বগতোক্তি করে ফেলি,— সাতটা ফিগার বলছে পাগল নাকি?' গুরুগম্ভীর আরেকটা তৃতীয় গলা এবার ফোনের মধ্যে গুমগুম করে ওঠে— 'ছেড়ে দিন দিদিমণি, পাগল নয়, ও ম্যাড্রাসী মাতালের কাণ্ড।'

—আজ্ঞে কী বললেন?

—বলচি— ওসব ম্যাড্রাসী মাতাল। ওদের কিচু জ্ঞানগম্যি আচে? বিশমিনিট ধরে এই চালাচ্চে। একেকটা নম্বর। আপনি তো এইমাত্তর লাইনে এয়েচেন।

আসামের সাম্প্রতিক কীর্তিকলাপের কল্যাণে আমি এখন দারুণ সর্বভারতীয়। উদার জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ প্রাণী। প্রচণ্ড ভীতি জন্মেছে, বুকের মধ্যে টের পেয়েছি প্রাদেশিকতা মহাপাপ। কোমর বেঁধে লেগে পড়ি— এই মদ্রদ্বেষীকে শায়েস্তা করা দরকার।

—'কেন, বাঙালী মাতালদের বুঝি জ্ঞানগম্যি থাকে? তারা মাদ্রাজী মাতালদের চেয়ে উন্নত শ্রেণীর জীব?'

—আঃ হা কী মুশকিল! সব মাতালই যাচ্ছেতাই, সব মাতালই পাবলিক ন্যুইসেন্স। কি বাঙালী কি ম্যাড্রাসী। তবে ম্যাড্রাসী মাতাল আরো খারাপ। গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করেন তিনি। আমিও খেপে যাই—

—'কেন কেন? শুনি?'

—কেননা ইদিগে তারা মাছ মাংস খাবে না, অথচ উদিগে মদ খাবে— ধাতে সইবে কেন? নিরিমিষ্যি সাত্ত্বিক আহারের সঙ্গে ওসব রাজসিক পানীয় চলে না, বুইলেন? কতায় বলে 'মদ্যমাংস'। মদ্য সইতে হলে মাংস চাই, প্রোটিন চাই— গায়ে বল চাই!

এই রে, সাত্ত্বিক-রাজসিক কী সব লজিক্যাল ইনকনসিস্টেন্সি দেখাচ্ছে! কিন্তু মূল বিষয় যখন প্রাদেশিকতার গন্ধযুক্ত, তখন যুক্তি মানেই দুর্যুক্তি। অ্যাবসার্ড অথবা সাউণ্ড— কোনওপ্রকার যুক্তিতেই প্রাদেশিকতাকে সাপোর্ট করা যায় না। অতএব ইতিহাস থেকে উদাহরণ খুঁজতে থাকি, কোথায় ভেজিটেরিয়ানরা বলশালী ছিল?— ডাইনোসর?— বৌদ্ধরাজরা?— হিটলার!

— কেন মশাই, হিটলার তো নিরামিষ্যি খেত, সে কি শক্তিমান ছিল না?

— না। সে ছেলো অত্যেচারী। বলবান হওয়া আলাদা জিনিস। তাছাড়া সে ব্যাটা মদও খেত না। তাছাড়া সে ম্যাড্রাসীও ছেলো না, ছেলো কি?

—মাদ্রাজী এত অপছন্দ কেন আপনার?

— কে বলচে? ম্যাড্রাসী ভাড়াটের মতন ভাড়াটে হয় না। ম্যাড্রাসী বসের মতন বস হয় না। তাছাড়া, ইলেকশন থেকেও তো বুইতে পাচ্চেন, ম্যাড্রাসের হাতেই ইনডিয়ার ফিউচার, ওরা সব টক দই খেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ক্লিয়ার ব্রেনে করেক্ট পলিটিক্যাল পয়েন্টগুলো দেকতে পায়। বুয়েচেন? সাধে কি আমাদের ম্যাড্রাসী প্রেডিডেন্ট, ম্যাড্রাসী বিদেশমন্ত্রী, ম্যাড্রাসী অর্থমন্ত্রী?

—কিন্তু ওঁরা সবাই তো ম্যাড্রাসী নন, দুজন অন্ধ্রের লোক।

—ওই একই হলো। দ্রাবিড় কালচার। বিন্ধ্যের ওপার। ম্যাড্রাসী মানে কি ম্যাড্রাসের লোক? ম্যাড্রাসী মানে সাউথ ইনডিয়ান। ইডলি-ধোসাকে কী বলবেন? ম্যাড্রাসী খাবার। সেটা কি কেবল ম্যাড্রাসেই খায়? না হোল সাউথ ইণ্ডিয়া?

—হ্যাল্লো, সিকসয়েট ফোরয়েট—স্যরি, —ত্রিয়েট ফোরয়েট সিকস জিরো টু?—দ্বিধা-জড়িত প্রশ্ন আসে। অমনি ধমক!

—'আঃ। এগেন ডিস্টার্বিং? পুট ডাউন রিসিভার। গো টু বেড। স্লীপ! গিভিং অল রং নাম্বার্স আনডারস্ট্যাণ্ড? নো সেভেন ফিগার নাম্বার ইন ক্যালকাটা। প্লিজ ডিসকানেক্ট। যত্তোসব ইয়ে—হুঁঃ।'

—য়োক্কে য়োক্কে, স্যরি টু ডিস্টার্ব ইউ স্যার, গুড য়িভিনিং টুয়্যায়ল—' সবিনয়ে ফোন নামানোর শব্দ হয়।— আমিও সগৌরবে ঘোষণা করি—

—দেখলেন কত ভদ্র? দ্রাবিড় কালচার বাংলার চেয়ে ঢের উন্নত কালচার।

—ওই এক মিনিট! এক্ষুনি আবার তুলবে। মাতালের আবার কালচার। হুঁঃ।

হঠাৎ আমার খেয়াল হয় ফোনটা তো করা হচ্ছে না খোকনের দাদুকে? একি কাণ্ড; আমিও কী মাতাল? ব্যাকুল হয়ে বলে উঠি—

—আপনিও এবারে ফোনটা প্লীজ একটু নামিয়ে রাখুন, আমাকে খুব জরুরী একটা কল করতে হবে। রাত হয়ে যাচ্ছে।

—আমারও খুব জরুরী। আপনিই নাবিয়ে রাখুন। আমি লাইনে এইচি আপনার ঢের আগে।

—প্লীজ! আমি দু'মিনিটে সেরে নেব।

—মেয়েছেলের ফোন দু'মিনিটে সারা হবে? হাসালেন।

—এটা সেরকম ফোন নয়। একটি ছেলেকে এইমাত্র হাসপাতালে ভর্তি করে এসেছি। সেই সম্পর্কে খবর দিতে হবে— সত্যি সত্যি ভীষণ আর্জেন্ট— বিশ্বাস করুন—আমার গলা আটকে যায়।

—ঠিক আচে ঠিক আচে বুজিচি বুজিচি— খটাশ করে ফোন ছাড়ার শব্দ হয়। আঃ বেশ ভদ্রলোক তো? এই তো ডায়ালটোন! সযত্নে খোকনদের নম্বরটি ঘোরাই।

—হ্যাল্লো! —সেই গুম গুম আওয়াজ।

—আঃ! আপনি কেন ধরলেন?

—ধরলুম কেন? আমার ফোন রিং করচে বলে—।

—ওঃ—ছাড়ুন, ছাড়ুন, আপনি না ছাড়লে—

—ছাড়চি। ছাড়চি। আমি কী ইচ্ছে করে বাগড়া দিইচি নাকি? ভালো ঝঞ্ঝাটেই পড়িচি বাপু। নিন মশাই করুন আপনার ফোন!

ঝনাৎ করে রিসিভার নামনোর শব্দ হয়। আবার ডায়ালটোন। খোকনের নম্বর ঘোরাই। দু'বার রিং করতেই—

—হ্যাল্লো।

—ফোর টু টুটু থ্রি টু?

—এখনো পাননি বুঝি?

—অ্যাঁ? আবার আপনি? ধুত্তোর ছাই—

—এ লাইনদুটো জড়িয়ে গ্যাচে মনে হচ্চে— ওটা আপনি আজ আর পাবেন না বোদায়।

—পাই না-পাই আপনাকে ভাবতে হবে না! আপনি আগে নামিয়ে রাখুন তো?— বিনাবাক্যে ওদিকে শব্দ হয়— কট্টাস। ডায়ালটোন। ডায়াল করি—

—হ্যাল্লো—একটা সুদূর শব্দ আসে এবার।

—হ্যালো, খোকনের দাদু বলছেন? দাদু নমস্কার। আমি বাপির বউদি। আমাকে চিনতে পারছেন তো?

—নমস্কার। তা আর পাচ্চিনি? খুব পাচ্চি চিনতে। রাগ করবেন না যেন বউদিদি, আমি— ইনঅ্যাডভারট্যান্টলি—

—অ্যাঁ? আবার আপনি? এখনো লাইনে আছেন?

—মোটেই নেই। ফোন বেজেচে, রিসিভ করিচি। আর বলতে হবে না, ছেড়ে দিচ্চি।

—শুনুন, শুনুন, এবারে বাজলেও রিসিভ করবেন না।

—তা কখনো হয়? আমি রিসেপশনিস্ট। ফোন-ধরা-ফোন করাই আমার কাজ।

—এই রাত সোয়া দশটার সময়ে কোন আপিসে রিসেপশনিস্ট বসে থাকে জানতে ইচ্ছে করে?

—কোনো আপিসেই নয়। আপিসগুলো বেলা পাঁচটার পরে মহাশ্মশান।

—তাহলে?

—আমি তো হোটেলে চাগরি করি। আটাশ বছর ধরে এই হোটেলে চাগরি কচ্চি। নাইট ডিউটি। মানে টেন-টু সিক্স ফুলশয্যে। অথবা কণ্টকশয্যে। যাই বলুন।

—অ! তা দয়া করে খানিকক্ষণ অন্তত ফোন ধরবেন না। আমি খবরটা দিয়ে নিই? খুব আর্জেন্ট।

—না ধরলিই বা কী? বাজচে তো এখেনে। খোকনের দাদুর বাড়িতে তো যাচ্চেই না। বুয়েছেন? জট পাকিয়ে গ্যাচে লাইনে। কী খবরটা কী?

—আর বলবেন না একটি ছেলেকে হাসপাতালে—

—ভর্তি করে এয়েচেন। তা তো শুনলুম। কেসটা কী? মিনিবাস?

—না না। ভীষণ জ্বর বিকার— এনকেফালাইটিসের আশঙ্কা—

—সেই খবরটা খোকনের দাদুকে দিতে হবে? যে আপনারা খোকনকে হাসপাতালে ভর্তি করে এয়েচেন?—

—না না, খোকনকে নয়। বালাই ষাট। বাচ্চুকে। কিন্তু খোকন আজ রাত্তিরে ফিরবে না, ওরা সব বন্ধুরা মিলে হাসপাতালে রাত জাগবে— সে খবরটা বুড়োবুড়ি দাদু-ঠাকুমারা তো উদ্বেগেই—

—অ! বাচ্চুকে! কিন্তু আজগে ফেনে তো পাবেন না! বাড়িতে খবর দিয়ে আসার মতন কেউ নেই?

—কোথায় আর? উনি দুর্গাপুরে গেছেন অফিসের কাজে, দেওর তো নিজেও হাসপাতালে রাত জাগছে। আছি কেবল ননদ আর আমি।

—আই সী।

একমুহূর্ত গম্ভীর নৈঃশব্দ্য। তারপর—

—খোকনের বাড়িটা কোতায়?

—যোধপুর পার্কে। অনেক দূর।

—আপনি ঠিকানাটা দিন দিকিনি। খবরটা যদি পৌঁচে দেয়া যায়, দেকি চেষ্টা করে।

—আপনি দেবেন? আপনি এখন কোথায়?

—শ্যালদায়। এ হোটেলটা শ্যালদা ইস্টিশনের কাচে।

—পাগল নাকি? কোথায় শেয়ালদা কোথায় যোধপুর পার্ক! এত রাত্তিরে।—

—রাত বেশি হয়নি তো, স' দশটা মোটে। ট্রামবাস চলচে। দেকি কোনো ছোঁড়া-ফোঁড়াকে পয়সা দিয়ে যদি পাঠাতে পারি— দিন ঠিকানাটা দিন—

—না না ওসব পাগলামি ছাড়ুন। আমি বরং দেখি সামনের বাড়ি থেকে যদি ফোন করা যায়! আমাকে তো আরো গোটা দুই মেসেজ দিতে হবে কি না?

—কি? রিলাই কত্তে পাচ্চেন না। না?

—না না, তা কেন? আপনার কাইনড অফারের জন্য অনেক ধন্যবাদ। সত্যি বলছি। দেখি, যদি— না পেরে উঠি তখন হয়তো....

সামনের বাড়ির কাকাবাবু-কাকীমা খুব ভালো লোক। প্রায় শুয়ে পড়েছিলেন, ভাগ্যিস আর দেরি করিনি। যাক একবারেই লাইন মিলে গেল। খোকনের দাদু-ঠাকুমা সত্যিই খুব ভাবনায় পড়েছিলেন। একটা ডিউটি চুকলো। নেক্সট ভক্তিব্রত মেসোমশাই। তাকেও পাওয়া গেল এক ডাকেই। সব শুনে বললেন— 'দাঁড়া, দেখি যদি দাশগুপ্তকে পাই, নইলে মণ্ডলকে ধরতে হবে। আমি একটু পরেই ফোন করে তোকে জানিয়ে দেব কদ্দুর কি পারা গেল।' ফোন ছেড়ে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরলুম। ফিরেই মনে পড়ল— 'ফোন করে জানিয়ে দেব' মানে? ফোন তো নষ্ট। ফোন তো জটপাকান। শেয়ালদার সেই হোটেলের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা। ওদিকে সামনের বাড়ির আলো নিবে গেছে।

আবার গিয়ে বুড়োমানুষদের তুলে বিরক্ত করা যায় না। কাকীমা অসুস্থ মানুষ। এখন কী করি?

এদিকে আমাদের ফোনে তো সমানেই নানাবিধ অশরীরী শব্দ— দেয়ালাকরা শিশুর আধোফোটা হাসিকান্নার মত— আধো আধো ক্রিরিরিং...রি...রি....রিং হচ্ছে তো হচ্ছেই। হঠাৎ লক্ষ্য করলুম তিনবার করে বাজছে। আশ্চর্য তো, বাজা উচিত ছ'বার করে। ছোট ননদ রিংকুটা সদ্য কলেজে ঢুকেছে, অঙ্কের পোকা, চটপটে বুদ্ধি খেলে মাথায়, বললে— 'ও বৌদি, নির্ঘাৎ সেই ভদ্রলোক ওয়ান নাইন নাইন ঘোরাচ্ছেন এবার। —দেখই না ফোনটা তুলে।'

ফোন তুলতেই – হ্যালো, ট্রাংক বুকিং?

—আজ্ঞে না।

—তবে? ওয়ান নাইন নাইন?

—আজ্ঞে তাও না। আমাকে চিনলেন না? আমি সেই যে বাপির বউদি।

—ওঃ হো, আর আমি সেই শ্যালদার—

—আজ্ঞে বুঝেছি।

—আপনি কি পারলেন যোধপুর পার্কে খবরটা দিতে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা হয়ে গেছে। সামনের বাড়ি থেকে। থ্যাংকইউ।

—যাক বাঁচা গেল। এবার ছেড়ে দিন।

—আপনি এত রাত্তিরে কোথায় ট্রাংক বুকিং করছেন?

—আর বলেন কেন? হোটেলের চাগরি। বুক কচ্চি একটা ডিল্লির কল।

—ও বাবা। দিল্লি? তাহলে আর ভদ্রতাটা রেসিপ্রোকেট করা গেল না! স্যরি।

—তার মানে?

—মানে, আপনি তো যোধপুর পার্কে গিয়ে আমার মেসেজটা দিয়ে আসতে চেয়েছিলেন? আমি কিন্তু তার রিটার্ন দিতে গিয়ে আপনার মেসেজটা দিল্লি পৌঁছে দিতে পারছি না! এই আর কি!

গম্ভীর গলায় সীরিয়াস উত্তর হয় — না না, তা কী করে হবে। সে তো সম্ভবই নয়। তারচে, আপনি বরঞ্চ ফোনটা ছেড়ে দিন। তাহলেই হবে। এখন রিং শুনলেও ধরবেন না কিছুক্ষণ।

—তা কেমন করে হবে? আমি যে একটা ডাক্তারের কল এক্সপেক্ট করছি। ছটা টুংটাং বাজলেই আমি ধরব। তিনটে বাজছে শুনলে বরং আর ধরব না। আপনি চেষ্টা করুন —বলে আমি রেখে দি।

—টুং-টাং-টিং, ক্রিং-ক্রাং ক্রিং চলতেই থাকে। যেন আধোঘুমে-আধোজাগরণে নিশি-যাপন করছে টেলিফোন। আমরাও ঘুমোতে পারি না। রিংকু আর আমি খাটে শুয়ে জেগে থাকি, ওই বকমবাজ ডিলিসিয়াস ফোনের পাশে। কী জানি, যদি ফোনটা এসে যায়? হঠাৎ রিংকুর মস্তিষ্কে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল।

—বৌদি, এক কাজ করলে হয় না?

ভক্তি মেসো যতবারই ফোনের চেষ্টা করবেন, প্রত্যেকবার তো শেয়ালদার ওই ভদ্রলোককেই পাবেন? ওই নম্বরেই যাবে নিশ্চয়ই আমাদের সব ফোন। ওদের কলগুলো, ফোন এখানে বাজছে। ওকেই বল না কেন, 'রং নাম্বার' বলে নামিয়ে না রেখে বরং আমাদের মেসেজটা নিয়ে রাখতে?

—আইডিয়াটা মন্দ নয়। খাসা, কিন্তু একজিকিউট করবি কেমন করে? ভদ্দল্লোককে পাব কোথায়?

—কেন ট্রাংক বুকিং ঘোরাও। এই তো তিনটে করে রিং হচ্ছে। ঠিক কানেকশন হয়ে যাবে। গেরো বাঁধা আছে না?—

ননদিনীগর্বে বুকটা ক্যাশিয়াস ক্লে-র মত চওড়া বোধ করতে থাকি। ডিরেকটারি খুলে ট্রাংক বুকিং নম্বর খুঁজে, সেইটে ঘোরাই। —হ্যালো?

হ্যালো—ট্রাংক বুকিং? গম্ভীর প্রশ্ন হয়।

—আজ্ঞে না। আমিই বলছিলুম, ঐ যে বাপির বৌদি—

—বুঝিচি। এখন আবার কাকে ফোন কচ্চেন?

—আপনাকেই খুঁজছিলুম আর কি!

—অ্যাঃ? রীতিমতো ভয়ের ছাপ ফোটে গলায়।

—মানে ডাক্তারের সেই কলটা তো পাচ্ছি না, তাই ভাবছিলুম আপনাকে একটা কথা বলে রাখি—

অ। তাই! কণ্ঠস্বরে স্পষ্টত রিলিফ।— বলুক, কী বলচেন?

—আচ্ছা, থ্রি ফাইভ ফোর সিক্স জিরো থ্রিতে কোনও ফোন যদি আপনার লাইনে আসে—

হ্যাঁ-হ্যাঁ এয়েছেল তো। ঐ নম্বরে এক ভদ্দল্লোক দুতিন—

—ঐ! ঐ! ঐ হচ্ছেন ভক্তি মেসোমশাই, উনিই তো জানাবেন ছেলেটাকে ইনটেনসিভ কেয়ারে ভর্তি করা গেল কিনা! ওই ফোনের জন্যই আমরা বসে আছি।

—কিন্তু লাইন তো জড়িয়ে গ্যাচে! কল তো আপনি পাবেন না।

—সেই তো মুশকিল। তাই জন্যেই আপনাকে একটা অনুরোধ করব ভাবছি—

—বলুন। —অসামান্য ভদ্র শব্দ হয়।

—ফের যদি থ্রি-ফাইভ-ফোর সিক্স জিরো থ্রি-তে কোনও কল আসে, দয়া করে রং নম্বর বলে নামিয়ে রাখবেন না।

—কিন্তু ওটা তো আমাদের নম্বর নয়।

—জানি! জানি! কিন্তু ওইটেই তো আমাদের নম্বর। ফের যদি ফোন আসে, আপনিই দয়া করে একটু মেসেজটা নিয়ে রাখবেন? ডক্টর ভক্তিব্রত ভট্টাচার্য, ডিরেক্টর, হেলথ সার্ভিসেস ফোন করবেন।

—ওঃ হো! তাই নাকি? কি সৌভাগ্য!

—আমাদের মেসোমশাই হন! বেশ গর্ব ফোটে গলায়।

—বা! বা! বেশ! বেশ!

—উনি যদি বুলটিকে চান,—

—আপনার নাম বুলটি?

—ঐ ডাকনাম আর কি, বুলা থেকে—

—আমার ভাইপোর নামও বুলু। বি কম পড়চে।

—ওমা! তাই নাকি? বেশ মজা তো! বুলা, বুলু একই। তা, যা বলছিলুম, ভক্তিব্রত মেসোমশাই যদি—

—কিন্তু উনি আমাকে মেসেজটা দেবেন কেন? আমার লোকাস স্ট্যানডাই-টা কী? হু অ্যাম আই?

—লোকাস স্ট্যানডাই? সে সব থাকগে। এইভাবে তো কাজটা হতে পারে? আপনি কি ডক্টর বি. বি. ভট্টাচায্যি? ডিরেক্টর হেলথ সার্ভিসেস? বুলটিদের লাইনটা জড়িয়ে গেছে—আমাকেই মেসেজটা নিয়ে রাখতে বলেছে। বাচ্চু কেমন আছে? ইনটেনসিভ কেয়ারে ভর্তি হলো কিনা?

—বা-চ-চু কে-ম-ন আ-ছে। ই-ন-টেন-সিব হোলড অন প্লীজ কে-য়া-রে—

—ও কি? আপনি কী করছেন?

টেকিং ডাউন ইওর মেসেজ ম্যাডাম। হ-ল—কিনা। ব্যাস। এটাই তো রিসেপশ্যনিস্টের কাজ। সারাক্ষণ তো এই কম্মোই কচ্চি। মেসেজ রাখা, আর মেসেজ দেওয়া। কল বুক করা আর কানেকশন দেওয়া। হ্যালো আর হোল্ড অন।

—ওঃ হো। স্যরি, আপনার দিল্লির বুকিংটা....

—ট্রাংক বুকিং ধরলে তো? নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্চে সব।

—তারা ধরবে কেমন করে? বাজছে তো আমাদের বাড়িতে। তারা তো জানেই না আপনি ডাকছেন।

—তাও তো বটে! ওঃ।

যাচ্ছেতাই। যাচ্ছেতাই। সব্বোধ্বংসী মহাকালের কুনজরে পড়িচি মশাই, দিদিমণি—সব ভেঙে পড়চে। পুরো কলকাতা শহরটা চতুর্দিক থেকে ব্রেকডাউন কচ্চে। যেমনি রাস্তাঘাটের অবস্তা তেমনি ট্রাম-বাসের অবস্তা, তেমনি তেল চিনি ক্যারাসিন তেলের অবস্তা। যেমনি আমাদের হাসপাতাল, তেমনি ইলেকট্রিক সাপ্লাই, তেমনি আমাদের জলের ব্যাবস্তা, রাস্তায় তো জঞ্জালের কাঁড়ি, এমনকি, গঙ্গানদীটা পজ্জন্ত নাকি বুঁজে যাচ্ছে শুনিচি। কী সব্বোনেশে কতা! মহাপাপের ফল। বুয়েচেন? একটা জাত অনেক পাপ কল্লে তবেই তাদের অমনটা হয়। একেবারে শেষ হয়ে যাবার আগে সভ্যতার এমনি অবস্তা হয়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর বলি, তা যা বলেছেন। সত্যিই জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে কলকাতাতে। উম... আচ্ছা, আবার বলি। যদি থ্রি ফাইভ ফোর সিকস জিরো থ্রিতে কেউ—

—ফোন করে, তবে মেসেজটা রেকে নেবো। থ্রি-ফাইভ— ফোর-সিক্স-জিরো-থ্রি- আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন....

—মেসোমশাইয়ের নাম ভক্তিব্রত ভট্টাচায্যি, ডিরেক্টর, হেলথ সার্ভিসেস....

--ভ-ক্তি-ব্র-ত— মেসোমশাই.... এই তো? ঠিক আচে। যিনি ফোন করুন, মেসেজ নিয়ে নেব। আমি তো বসেই রইচি। কিন্তু আপনাকে খবরটা ফের দেব ক্যামন করে?

—কেন? ওয়ান নাইন নাইন? ট্রাংক-বুকিং, ফায়ার, অ্যাম্বুলেন্স, হাওড়া স্টেশন, যা খুশি ঘোরাবেন। যাই ডায়াল করুন আমাকেই তো পাবেন।

—তা বটে। যাচ্ছেতাই। যাচ্ছেতাই। হোল সিস্টেমটা ব্রেকডাউন কচ্চে মশাই

--দিদিমণি। এখন যদি একটা কোনও এমারজেন্সি হয়—

—সত্যি! কী কাণ্ড। শালাদের— স্যরি—

—যাক গে, ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই, রেখে দিচ্ছি। গুড নাইট—

—গুড নাইট দিদিমণি, আমার অবিশ্যি এখন গুড নাইট নয় গুড আফটারনুন বলতে পারেন—টেন পি এম টু সিকস এ এম যখন ওয়ার্কিং ডে—

—সত্যি কী কষ্ট আপনার।

—কষ্ট আর কি! চাগরি। অব্যেস হয়ে গ্যাচে।

আপনি শুয়ে পড়ুন।

—কোনও খবর এলে আমি দিয়ে দোবো।

ঘণ্টাখানেক তন্দ্রা এসেছিল— আবার ফোনে তিনটি ট্রি-রি-রিং বাজতে লাগলো। অস্ফুট ইঙ্গিতের মতো। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড হাইজাম্প করে।

—হ্যালো!

—হ্যালো!

—ওঃ আপনি? পেলেন দিল্লি?

—ডিল্লি? নাঃ চেস্টা কচ্চি। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেসু। বুইলেন? কিন্তু আপনারটা এয়েছেল।

—এসেছিল? ভক্তিব্রত মেসোমশাই—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। রুগী ভালোই আচে। ইনটেনসিব কেয়ারে ভত্তি হয়ে গ্যাচে। ডাক্তার দাশগুপ্ত নিজে গে দেকে এয়েচেন এই রাত্তিরেই— তিনি বলেচেন রুগীর বয়েস কম, স্বাস্থ্য ভালো, দিব্যি ফাইট কচ্চে, ওষুদে অলরেডি রেসপনড করেচে—

—আপনাকে যে সত্যি, মানে কী যে বলব—

—আগে সবটা শুনে নিন, ধানাই-পানাইটা পরে হবে। ডক্টর ভটচায্যি মনে কচ্চেন সারভাইভ্যালের চান্স ভালই, তা সত্ত্বেও রুগীর আত্মীয়স্বজনদের খপর দিয়ে দেয়া উচিত— ওরা ভাবচে লক্ষণটা মেনিনজাইটিসের, —এখনো প্যাথলজিক্যাল টেস্টগুলো অবিশ্যি হয়নি, নেক-রিজিডিটি আছে, তাছাড়া ডিলিরিয়াসও —রুগীর বাপ-মাকে ইমিজিয়েটলি খবর দিতে বলেচেন।

—বাপ মা তো গৌহাটিতে।

—ট্রাঙ্ককল করুন। ফোন আচে?

—জানি না। কিন্তু ঠিকানা জানি।

—আর ফোন থাকলেই বা কি। এই ডিল্লির মতনই হবে। ফোনের যা অবস্থা! টেলিগ্রাম করুন।

—টেলিগ্রাম? এত রাত্তিরে কোথায় বেরুবো? দুটো বাজে বোধহয়—কাল সকালে করতে হবে।

—সকালের চেয়ে রাতেই তাড়াতাড়ি যাবে। দেরি করবেন না। দিন দিকি ঠিকানাটা? আর মেসেজটা দিয়ে দিন। আমি পাঠিয়ে দিচ্চি টেলিগ্রাম।

—আপনিই বা এত রাত্তিরে— ডেস্কের ডিউটি ছেড়ে—

—আমি যাবো কেন? হোটেলের ছোঁড়াগুলো রয়েচে কী কত্তে? এইখেনেই ফর্ম রয়েচে—আর পাশেই টেলিগ্রাম আপিশ— হোলনাইট ওপেন। দিন, দিন ঠিকানা আর মেসেজটা— কি লিকবেন? আগে তাদের নাম ঠিকানাটা বলুন—ফর্মটা বের করি দাঁড়ান। হ্যাঁ, রেডি। এইবার বলুন। .....কই? বলুন?....

—বলব?

—বলবেন না তো কি আমি হাত গুনবো? ছেলেটার বাপের নাম কি?

—সত্যেন বড়ুয়া।

—থাকে কোতায়?

—প্রফেসর্স কোয়ার্টার নম্বর ফাইভ, গৌহাটি ইউনিভারসিটি, গৌহাটি।

—বড়ুয়া? অসমীয়া? এখানে আচে যে বড়?

—ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে।

—তার বেলায় বাঙ্গালী বুজি বদ নয়? হুঁঃ। —হুঁ। যত্তোসব পলিটিকসের বদমাইসি আসলে।

—হ্যাঁ। সাধারণ মানুষ তো রাজনীতিকের হাতের পুতুল।

—বলুন, কী লিকবেন এইবার? ঠিকানা লিকে নিইচি। আর্জেন্ট করবেন কিন্তু। নইলে যাবেই না। আসামে যে তাণ্ডব চলচে। আর্জেন্ট করলেও যায় কি না দেকুন। কলকাতার টেলিগ্রাম তো!

—হ্যাঁ হ্যাঁ আর্জেন্টই করুন। নিশ্চয়ই। এ আর বলতে?

—ছেলেটার নাম কি?

—বাচ্চু।

—তবে লিকুন— বাচ্চু সীরিয়াসলি ইল— হসপিটালাইজড— কাম ইমিডিয়েটলি— তলায় নাম কি দেবেন?

—পাপি-ই দিয়ে দিন। আমার দেওর ওদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল গৌহাটিতে।

—শুনুন, শুনে নিন ভালো করে, আবার পড়চি: আর্জেন্ট টেলিগ্রাম। সত্যেন বড়ুয়া প্রফেসর্স কোয়ার্টার নম্বর ফাইভ, গৌহাটি ইউনিভারসিটি গৌহাটি। বাচ্চু সিরিয়াসলি ইল হসপিটালাইজড কাম ইমিডিয়েটলি। বাপি। এই তো?

—বাঃ খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু টাকাটা তো দেওয়া যাবে না?

—ওটা পরে হবেখনে। এটার খচ্চা বেশি নয়। কত আর, গোটা দশেকের মদ্যিই হয়ে যাবে। আরও কম হবে। এখন নিচে নাম ঠিকানা দিতে হবে। কী লিখব? সেনডারস নেম অ্যাণ্ড অ্যাড্রেস!

—কিন্তু টাকাটা—

—পরে হবে। অত ভাবনার কিচু নেই। নাম ঠিকানাটা আগে দিন। টাকাটা পরে কখন ওই দেওরের হাত দে পাটিয়ে দিলিই চলবে। বলুন, কী দোবো নাম ঠিকানা? অবিশ্যি ফোন নম্বরটা দিলেও হয়! বাপি, কেয়ার অব কী লিখব?

— কেয়ার অব এন কে দত্ত, থ্রি ফাইভ ফোর সিকস জিরো থ্রি।

—এ-ন-কে-দত্ত—থ্রি-ফাইব.....

এবার আপনারটা বলুন?

—বলচি। লিকে নিন। খাতা পেনসিল আচে?

—আচে।

—বেশ। লিকুন—জি পি চন্দর, জ্ঞানপ্রকাশ চন্দর, থ্রি ফাইব ফোর টু এইট ওয়ান।

—হয়েছে? জি পি চন্দর, থ্রি ফাইব.... হুঁ। হয়েছে। এবার ঠিকানা?

—ঠিকানা? চাগরির ঠিকানাটাই ঠিকানা। দিনের বেলায় মেস। রাত্তির বেলায় আপিস। ও আপনি অত বুজবেন না। বুজেও কাজ নেই। লিকুন, হোটেল শ্রীনিবাস—

—হোটেল শ্রীনিবাস.....

—হোটেল শ্রীনিবাসটা হচ্চে হ্যারিসন রোডের ওপরিই, প্রায় শ্যালদার অপোজিটে। —তিনতলা বাড়ি। সদ্য গোলাপী টালি লাগিয়েচে একতলার ভেতর সাইডে, বাইরের দ্যালেও। আপনার দ্যাওর ঠিক খুঁজে পাবে। আপনি এবার একটু শুয়ে পড়ুন দিকিনি? এভাবে সারারাত্তির উদ্বেগের মদ্দে! আপনার টেলিগ্রাম আমি এক্ষুনি করিয়ে দিচ্চি।

—টাকাটা আমি বাপিকে দিয়ে কালই নিশ্চয়— হাসপাতালও তো ওই কাছেই—

—হবে, হবে। ছেলেটা ভগবানের দয়ায় বেঁচে উঠুক তো আগে? বিদেশ বিভুঁয়ে—

—আপনাকে কী যে বলব মানে.... আপনার মত মানুষ . আজকের দিনে এমন মানুষ সত্যিই .... মানে

গম্ভীর গলায় মৃদু হাস্য করেন জি পি চন্দর। এই প্রথম হাসি।

—এইটুকুনি তো মানুষ মানুষের জন্য করবেই।

—এটুকু করবেই মানে? কেউ করে? কেউই করে না। সবে বসে একটু জায়গা পর্যন্ত করে দেয় না কেউ অন্যের জন্যে।

দেয়, দেয়। হোটেলে কাজ কত্তে কত্তে চুল পেকে গেল দিদিমণি, মানুষ কি কম

দেকিচি? মন্দও যেমন দেকিচি, ভালোও তেমনিই দেকিচি। এটুকুনি মানুষ মানুষের জন্যে করেই থাকে। আপনি কচ্চেন না? দ্যাওরের বন্ধুর জন্য? এবারে ছেড়ে দিন দিকিনি। এটকু শুয়ে পড়ুন।

—ঘুম হবে কি? হাসপাতালের খবর-টবর আসে যদি?

—সে এলে তখন উটবেন। এলে তো আসবে এখেনে। ধরবো তো আমিই। আপনি শুয়ে পড়ুন গে।

—থ্যাংকিউ মিস্টার চন্দর.... আপনাকে কী যে বলব।

—কিছুই বলতে হবে না বুলটি দিদিমণি, থ্রি ফাইভ ফোর টু এইট ওয়ানটুকু মনে রাকবেন, কোনও দরকার হলে মোটে সঙ্কোচ করবেন না। ইউ আর লাইক মাই ডটার, সুদ্ধু একটা ফোন করে দেবেন। লাইনের জটটা খুলে গেলে তো আর এরকম ডিরেকট সার্ভিস পাবেন না।

পরদিন সকালে বাপি যখন ফিরল, অসম্ভব উত্তেজিত। মুখ-চোখ লাল।

—বাচ্চু কেমন আছে?

—আগের চেয়ে ভালো। প্রেশারটা স্টেবিলাইজ করে গেছে। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে বৌদি। একেই বোধহয় মির‍্যাকল বলে, এই সকাল সাড় ছটা সাতটা নাগাদ, একজন বুড়ো মত লোক, ধুতি-শার্ট-পরা, সব চুল সাদা। এসে বাচ্চু বড়ুয়ার বন্ধুদের খোঁজ করল, —একেবারে বাপি, খোকন নাম ধরে! তারপর আমার হাতে এই স্লিপটা দিয়ে —বলতেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার বৌদি— এই স্লিপটা দিয়ে বলল —'বড়ুয়াকে টেলিগ্রাম করা হয়ে গেছে। এটা তার রসিদ। তোমার বৌদিদিকে দিও।' মানে আমরা তো... একেবারে স্টানড। স্পেলবাউন্ড! বিফোর উই কুড রিকভার ফ্রম দ্যাট ডেজ্‌ড স্টেট, হি ডিসঅ্যাপিয়ার্ড। হাওয়া হয়ে গেল বৌদি। জাস্ট মিলিয়ে গেল। আর দেকতেই পেলুম না। কে লোকটা? কী করে জানল বাচ্চুর কথা? আমাদের কথা? আমাদের নাম? তোমাদের কথা? কে? কে পাঠালো টেলিগ্রাম? রিয়্যালি বৌদি, টু, থিংক অফ ইট.... ও কি, তুমি হাসছ? জাস্ট লুক অ্যাট দিস চিট— অ্যাকচুয়ালি গেছে টেলিগ্রাম দেখছ তো? বাট হু ওয়াজ হি? নোবডি নোজ হিম.... সত্যিই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে বৌদি, এই দ্যাখো—

বাপি মুঠো করে আস্তিন-গোটান পেশি-বহুল হাতটা সামনে এগিয়ে দ্যায়। লোমগুলো খাঁড়া হয়ে উঠেছে। আমি আর হাসি না।

এমনি সময়ে খোকনের ফোন এল। তার মানে লাইনের জট খুলেছে। খোকনও অসম্ভব উত্তেজিত।

—'শুনেছেন তো? বাপি বলেছে সব? কী স্ট্রেনজ একসপিরিয়েন্স.... ভাবলেই গা শিরশির করে উঠছে, সত্যি বৌদি, দেয়ার আর মেনি থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ! দাদু তো শুনে বলছেন আর ভাবনা নেই, তোদের বন্ধু এ-যাত্রা বেঁচে গেল— আমি অবশ্য অতটা বলছি না, তবে ব্যাপারটা সত্যিই মির‍্যাকুলাস। একেই বোধহয় বলে

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি মিরাক্ল। না বৌদি? আচ্ছা, রিসীটটা আপনি হাতে নিয়ে দেখেছেন? ইটস আ রিয়্যাল রিসীট!'

ক্যান ইউ বিলিভ ইট? এমন যে হতে পারে— উত্তেজনায় খোকনের বাক্যি হরে যায়।

ভাগ্যিস রিংকুটা মর্নিং কলেজে বেরিয়ে গেছে! ফিরলেই বারণ করে দিতে হবে। জি পি চন্দরের কথাটা ছেলেদের কাছে কোনোদিনই ভাঙা চলবে না।

ওরা বড় দরিদ্র। বিশ্বাস বস্তুটির স্বাদ ওরা মোটেই পায় না। তার সুযোগই আসে না বেচারাদের জীবনে। এটুকু পেয়েছে, আহা, জমা থাকুক। সত্যিই তো, মির‍্যাকুলাস ঘটনা মিস্টার জি পি চন্দর।

স্লিপটা যত্ন করে তুলে রাখি। শেয়ালদার অপোজিটে, গোলাপী টালি, হোটেল শ্রীনিবাসে নিজেকেই দেখছি যেতে হবে টাকাটা ফেরত দিতে।

সেদিন দুজনে

এক যে ছিলেন কত্তা, তাঁর ছিল এক গিন্নি। কত্তাটি ফর্সা ধবধবে, লম্বা চওড়া —গিন্নি কালকাল, ছোটখাট। কত্তা স্বল্পভাষী, গিন্নি বাক্যিনির্ঝর। কত্তা যেমনই সভ্যভব্য, কেতাদুরস্ত শান্তশিষ্ট, ভদ্রলোক— গিন্নি তেমনি ছটফটে, দুরন্ত, সভ্যতাবর্জিত, বন্যপ্রাণী। দুর্ধর্ষ গিন্নিকে সামলাতে সামালাতে ভালোমানুষ কত্তার প্রাণ যায়-যায়। এহেন গিন্নিকে নিয়ে কত্তা সংসার পেতে বসলেন কোথায়? না সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে সেই মার্কিন মুলুকে। গিন্নি সেখানে ছাত্রী, আর কত্তা সেখানে মাস্টার। অবিশ্যি কত্তার বাড়িটাই গিন্নির পক্ষে ইশকুল। গিন্নি দিবারাত্র উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলে ফেলছেন। ভুলভাল কাজকম্ম করে ফেলছেন, আর কত্তা বেচারা সেগুলো কারেকট করতে করতে নাজেহাল।

যেমন ধরুন— একজন অতিথি এলেন চমৎকার একটা নতুন কোট গায় দিয়ে। আসবামাত্র গিন্নি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন— 'আরে! আরে! এই কোটটাই বুঝি তুমি কিনেছ? বাঃ। অমুক দোকানের সেলে তো? আমিও এটা শো-উইণ্ডোতে দেখেছিলুম। নেব-নেবও ভেবেছিলুম-ইশ, কী সস্তাতেই দিচ্ছিল ওটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিলুম না, কেননা, উনি বললেন রঙটা বড্ড ক্যাঁটকেটে, বাঙালমার্কা—। তাই না গো?'

কত্তা গোড়া থেকেই টেবিলের তলা দিয়ে গিন্নির শ্রীচরণে সতর্কতামূলক মৃদু ঠোক্কর দিচ্ছিলেন। এবারে বোধহয় ততটা মৃদু আর রইল না। কেননা গিন্নি ককিয়ে উঠলেন— 'উহ! ও কী হচ্ছে? লাগে না বুঝি? তোমার পায়ে শু-জুতো আর আমার পায়ে যে চটি?' অম্লানবদনে কত্তা বললেন— 'ওহো, লেগে গেল নাকি? দুঃখিত।' কিন্তু গিন্নি তাতেই যে থামবেন, স্তাত নয়।— 'আহাহা, তখন থেকে ইচ্ছে করে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে এখন আবার বলছ— লেগে গেল নাকি? বা রে মজা?'

এহেন ধর্মপত্নীকে জম্মের ভাত-কাপড় প্রমিস করে ফেলে কোন্ পতিদেবতার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে না? কখন যে গিন্নি কী করে বসেন। একদিন পাশের বাড়ির ডিনারসেট ধার করে এনে এক বিখ্যাত ব্যক্তিকে কত্তাগিন্নি নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছেন. মহামান্য অতিথি

বাসনের প্রশংসা করতেই গিন্নি মুখ খুললেন, 'এটা অবশ্য আমাদের জিনিস নয়। খুব সাবধানে ব্যবহার করবেন কিন্তু। স্মিথের বৌয়ের কাছে ধার করে এনেছি কিনা। আমাদের কাচের ডিনার সেট তো নেই, গত সেটটা উনি যে সাতদিনেই ভেঙে শেষ করে দিলেন। যাতে ওঁকে বাসনটা না মাজতে দেয়া হয়। আমিও তেমনি। ছাড়বার পাত্র নই। হুঁ হুঁ বাবা, এমন আনব্রেকেবল প্লাস্টিকের সেট কিনেছি। দেখি এখন কেমন না-মেজে পারেন?'

গিন্নির বাগবিস্তারে কত্তাবেচারার মুখের চেহারাটি তখন ভেঙে ফেলা কাচের বাসনের মতই; আর অতিথিদের মুখের চেহারা? ততোধিক করুণ! তাঁদের মুখে আনব্রেকেবল প্লাস্টিকের হাসি।

২

এহেন কত্তাগিন্নি একবার এরোপ্লেনে চড়ে আকাশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পাড়ি দিচ্ছেন, হেনকালে বাধিল প্রলয়। অর্থাৎ ঝড় উঠল। ওঃ, সে কী তুমুল ঝড়। যার মার্কিনী নাম বৈদ্যুতিক ঝঞ্ঝাবাত্যা (ইলেকট্রিক স্টর্ম)। যাত্রীরা প্রত্যেকে যে যার পেটে কোমরবন্ধ এঁটে ভয়ে কম্পমান— এমনকী স্টুয়ার্টদের পর্যন্ত সীটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বেল্টবন্দী করে। প্লেনটা নাগরদোলার মতো খেল দেখাচ্ছে উপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে। যেন স্বাধীনতা-দিবসে এয়ারফোর্সের শো দিচ্ছে। কখনো ঘাস-বিচালি, কখনো-বা দে দোল দোল। যাকে বলে ভীষণ— রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা। ঠিক তাই। জানালার বাইরে কালীপুজোর বাজীর মতন অঝোরে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে— যেন ডিজনিল্যাণ্ডের কোনও বানানো দুর্যোগের জগৎ। মিশকালো আঁধার ছিঁড়ে-খুঁড়ে জানালার বিদ্যুতের শিখা লকলক্ করে উঠছে। ক্যাপ্টেন সবিনয়ে এবারে জানালেন প্লেনের রাডারযন্ত্র অকেজো হয়ে পড়েছে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক চাপে— এখন ভগবানই ভরসা। একবার তো প্লেনটা এমনই ওঠানামা শুরু করলো যে সীটের মাথার ওপরে সরু তাক থেকে ব্রীফকেস, হ্যাটকেস ইত্যাদি ধুপধাপ নিচে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তখনকার দিনে ছোটো প্লেনে ওপরের তাকে ছোটো মালগুলো রাখতে দিতো। এখন অবশ্য আর দেয় না (ঠিকই করে)। এবারে প্লেনে মৃত্যুভয়ের হিম-শীতল আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে— গুনগুন করে ভ্রমরগুঞ্জনের মতো ইংরেজি প্রার্থনার মৃদুধ্বনি জমাট বাঁধছে বাতাসে। আমাদের কত্তাগিন্নিও বসে আছেন সেই প্লেনে। কত্তা একজন 'দায়িত্বশীল পুরুষ'। অতএব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেও সেটা চেপে রেখে 'ছেলেমানুষ' গিন্নির হাতটি নিজের শক্ত-মুঠোয় ধরে, নীরবে ভরসা যোগাচ্ছেন। মুখে বাক্য নেই। কামরার বাতাসে মেরজাপ টানলেই টং করে টংকার হবে, এমনই ঝনঝনে টেনশন। এই সংকটময় মুহূর্তেও শ্রীমতী বকতিয়ার খিলজির মুখে কথার যেন শেষ নেই। কত্তার মুখে শুধু মোনোসিলেবিক উত্তর। 'ওগো, উঃ কী ভীষণ ঝড়, না? হুঁ।'

—'আচ্ছা, আমাদের পাসপোর্টগুলো কোথায় গো?'

—'কেন?'

—'ঠিক আছে তো?'

—'পকেটে? বল না? কোনখানেতে আছে?'

—'আছে আছে মানে? কই? বের কর না? বুকপকেটে?'

—'ব্রীফকেসে।'

—'শিগগিরি বের কর না গো, লক্ষ্মীটি। খুব দরকার।'

—'কেন?'

—'আমারটা আমাকে দাও। তোমারটা তোমার কাছে থাক।'

—'কেন?'

—'কেননা প্লেনটা তো ঝড়ে পড়েই যাবে বলে মনে হচ্ছে।'

—'সেক্ষেত্রে আর পাসপোর্ট....!'

—'বাঃ? পাসপোর্টটা সঙ্গে থাকলে তবেই না ওদের ডেডবডিটা আইডেনটিফাই করতে সুবিধা হবে। তোমারটা তুমি রাখ আমারটা আমি। পুড়ে-টুড়ে তো ছাই হয়ে যাবো সব্বাই। ওরা চিনবে কী করে কে কোনজন? বাড়িতে খবরই বা দেবে কী করে? বিদেশ বিভূঁইতে অকালে মরছি। একটা খবর তো অন্তত...'

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঘোর সংসারি লোকের হিসেবি সুরে গিন্নি কথাটা অসম্পূর্ণ রাখেন। এত উদ্বেগেও হেসে ফেললেন কত্তা। এবং ঝরঝর করে অনেকগুলো কথা বলেও ফেললেন একসঙ্গে, গিন্নির নিরেট নির্বুদ্ধিতায় চমৎকৃত হয়ে।

—'দূর পাগলি। মানুষ পুড়ে যাবে, আর পাসপোর্টগুলো বুঝি পুড়বে না? এমন কথা কে তোমাকে শেখালো? পাসপোর্ট বুঝি ফারায়প্রুফ মেটিরিয়ালে তৈরি হয়?'

—'ওহো, তাই তো?' গিন্নি এবার খুবই লজ্জিত, যারপরনাই অপ্রতিভ। 'সত্যিই তো। আগুন লাগলে পাসপোর্টও তো পুড়েই যাবে। তবে? ইশ, কী বোকা আমি। ওই একটা ব্ল্যাকবক্স না কী যেন, কেবল সেটাই পোড়ে না, শুনেছি। তা তারমধ্যে তো ঢোকা যাবে না। যাক্‌গে, তার চেয়ে ওসব ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আমি এখন বরং একটু ভগবানের নামই করি বাবা। কথায় বলে 'মরণকালে হরিনাম।' তাই করি। 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেহরে।' তারপরই কত্তার কী করণীয়, সেই বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন গিন্নি।— 'কিন্তু তুমি তো আর ভগবান বিশ্বাস কর না। তুমি তাহলে কী করবে এখন?' গিন্নি ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে চশমা নাকে নামিয়ে খানিক ভাবলেন— 'গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন' বলা যায়। তারপরে ইউরেকা বলার মত আবিষ্কারের আহ্লাদে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন— 'এক কাজ কর। তুমি বরং লিটল রেডবুকের বাণীগুলো মনে কর।' (ঐ বইটা ঠিক গিন্নির খুদে লাল পকেট-গীতাটার মতই মিষ্টি দেখতে, হুবহু এক সাইজেরও)।

কত্তা এবার তেড়েফুঁড়ে ওঠেন— 'আজেবাজে ইয়ারকি রাখ তো। ইডিয়েটের মতো যত রি-অ্যাকশনারি রসিকতা। একটুখানি চুপ করে থাকবে? এ্যাঁ? একটু সিরিয়াস হও,

ফর হেভেনস সেক।' 'হোল্ড ইয়োর টাং— অ্যাণ্ড লেট মী? ... হুঁ হুঁ কী? লেট মী ... 'কী'?' চোখ গোল গোল করে, ফিক ফিক হেসে বোকা গিন্নি একা-একাই ইয়ারকি মারেন, বাইরে তখন অন্ধকার খানখান করছে, বিজলির উদ্দাম ঝলক, বাতাসের গতি সাইক্লোনিক, গিন্নি বলছেন— 'অবিশ্যি হেভেন্স সেক নয়, গডস সেক।' এবার বিরক্তিতে চোখ বুজে ফেলে কত্তা বলেন— 'ইনকররিজিবল।' ....কত্তার রাগ লাল মুখখানা দেখে গিন্নি এবার হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিত হন। যাক বাবা, এই তো কত্তার নরমল ভোকাবুলারি ফিরে এসেছে, আতঙ্কটা তাহলে কেটেছে। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। গিন্নিই এবার কত্তার হাতটি মুঠোয় চেপে ধরেন। আকাশ কিছুটা সামলে ওঠে ইতিমধ্যে, আর কত্তাগিন্নির উড়োজাহাজ অচানক অন্য এক বিমানবন্দরে নেমে পড়ে ঝুপ করে। তক্ষুনি গিন্নি সুর পালটে ফেলে, 'এই তো আমরা ফিলাডেলফিয়াতে এলুম, অথচ, হায়রে— ডনামারিয়ার সঙ্গে দেখাটা করা হল না!' —বলে কত্তার কানের কাছে অবিশ্রাম ঝিঁঝিট রাগিণীতে শোকগাথা গাইতে লাগলেন। অবশেষে 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক'— স্টাইলে কত্তা এই সান্ত্বনাবাক্যটি উচ্চারণ করলেন— 'নেকসট ইলেকট্রিক স্টর্মের সময়ে নেমে গিয়ে তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে গেলেই হবে।' —'এই বলে আমাকে তুমি ফাঁকি দিচ্ছ, হ্যাঁ।' বলে গিন্নি ঠোঁট ফেরালেন। ততক্ষণে 'অল এ্যাবোর্ড' হাঁক পড়েছে। ঝড় থেমে এসেছে, প্লেন উড়তে রাজী।

৩

কত্তাগিন্নি যখন সংসারটি সদ্য পাতছেন তখন নিত্যি-নিত্যিই কিছু-না-কিছু ক্রাইসিস উৎপন্ন হত। গিন্নি রান্নাবান্না শেখেননি তখনও, কিন্তু কত্তাকে দুটি রেঁধে-বেড়ে দিতে হবে তো? নইলে আর গিন্নি কিসের? অতএব ভাতের ডেচকি উনুনে চড়িয়েই টেলিফোন।

—'ললিতা? ছেড়ে দেব এবার?'

—'কী ছাড়বি এবার? সিনে ক্লাবের টিকিট?'

—'দূর! চালরে, চাল। ভাত হচ্ছে না?'

—'জল ফুটেছে?'

—'মানে?'

—'মানে জোরে ধোঁওয়া বেরুচ্ছে? জলটাতে কী বেশ বুদ্বুদ হচ্ছে? ঢাকনাটা নজর করে দ্যাখ দিকি, ওঠাপড়া করছে কিনা—'

—'ওহো, সেই জেমস ওয়াট? ধর, দেখে আসছি।' ফোন নামিয়ে গিন্নি হাঁড়ি পরীক্ষা করতে ছোটেন। কত্তাগিন্নির পবিত্র সংসারধর্ম তখন এই স্টেজে।

গিন্নিমার ছোটবেলায় দেশলাই জ্বালাতে খুব ভয় করত। এখন রান্নাঘরে ঢুকে সেই ভয়টা একটু একটু করে কমে আসছিল। কিন্তু একটা ঘটনায় আবার গিন্নি পুনর্মুষিক হয়ে গেলেন। সেই গল্পটাই বলি। আগাগোড়া কাঠের তৈরি তিনতলা বাড়ি। খুব পুরনো। পুরনো ধরনের গ্যাসের উনুন সেখানে, এ-দেশের মতই দেশলাই জ্বেলে ধরাতে হয়

(পাইলট ল্যাম্প নেই)। সদ্য-বিবাহিত কত্তাগিন্নি 'কপোতকপোতী সম উচ্চবৃক্ষচূড়ে' বাস করবেন বলে তিনতলার চিলেকুঠুরিটা অল্পস্বল্প টাকাতে ভাড়া নিয়েছেন। মাস্টারমশাই হলে কি হবে, কত্তার বয়সটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবার মত— তাই মাইনেও বেশ তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য করবার মতোই। তাই, ঘর সাকুল্যে মাত্র দেড়খানি। বড়ঘরটি পাঁচকোনা। পঞ্চম কোণে একটু রান্নার ব্যবস্থা আছে। এই ঘরটা গিন্নির পছন্দ, কেননা ঘরের ঢালু ছাদ, অসম দেয়াল, এবং মেঝে প্রায়ই আশ্চর্য আশ্চর্য জায়গায় এসে পরস্পরের সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ মিলেমিশে গেছে। বড় মজার, এবড়ো-খেবড়ো এই ঘরখানা— অদ্ভুত এলোমেলো তার গড়নপেটন। কখন পুরনো হয়ে যায় না। কোনা-ঘুপচিতে ভরা। কত্তাটি লম্বা মানুষ, কিন্তু সাবধানী। তাই যখন-তখন যেখানে-সেখানে নেমে আসা ছাদে তাঁর উঁচু মাথা কদাচ ঠুকে যায় না, অথচ, ছোটখাট গিন্নির মাথাটি অনবরত ঠুকে-ঠুকে যেন আলুকাবলির ঠোঙা হয়ে গেছে। এতই তিনি অন্যমনস্ক। হরেকরকম রঙের টিন আর বুরুশ কিনে মনের সুখে আশা মিটিয়ে ছাদে, দেয়ালে, যত্রতত্র এতোল-বেতোল রঙ করেছেন গিন্নি, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে রঙ-বেরঙের কুশন কিনে এনে ঘরময় ছিটিয়েছেন আরামপ্রিয় কত্তা। ঘরখানাকে বড়ই সুখী-সুখী দেখায়। বড় হাসিখুশি।

জীবনের প্রথম সংসার। বড় যত্নে বড় আদরে দুজনে মিলে তাই দেড়খানি কামরা সাজিয়েছেন-গুছিয়েছেন মরা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড আসবাবপত্র আর জ্যান্ত কচি সবুজ গাছপালা দিয়ে। একটা গাছে মস্ত মস্ত চওড়া সবুজ পাতার বাহার— আরেকটা গাছে বেগুনী ফুল ফুটে আছে থোকা থোকা, একটা ক্ষুদে গাছে ক্ষুদে ক্ষুদে কমলালেবু টুনি-বালবের মতো জ্বলছে, আর একটা ছোট লঙ্কাগাছে লাল টুকটুকে লঙ্কা ঝুমঝুম করছে। বসার ঘরে বাস। রান্না-খাওয়া, বাসনমাজা, পড়াশুনো, আড্ডা, আরাম— সব। আর আধখানা ঘরটাতে শোওয়া। প্রকৃত অর্থেই 'শয়নমন্দির' সেটা— জোড়া খাটটি ছাড়া আর কিছুই ও-ঘরে আঁটে না। অতি কষ্টে দেয়াল-আলমারির পাল্লাটা ফাঁক করা যায়। বাথরুমে একটা বাঘপেয়ে চটা-ওঠা বাথটাব আছে, যা কেবল জাংক ইয়ার্ডে আর মিউজিয়ামেই পাওয়া যায়। এখন সর্বত্র শাওয়ারের চল হয়েছে। আর বাথটাব মানেই টালি-পোর্সিলেনের রাজকীয় ব্যাপার। এমনি একখানা খুরোওলা বাথটাব দিয়েই দিব্যি বাড়িটার বয়স মাপা যায়। গোটা বাড়িটাই খুব ছোট্ট, দু-কামরার। তিনতলার চিলেকামরায় আমাদের বঙ্গজ কত্তাগিন্নি থাকেন, আর তাঁদের ঠিক নিচে দোতলার ফ্ল্যাটে দুজন ষণ্ডাগুণ্ডা মার্কিনী ছাত্রের বাস। তারা একটু একটু লরেল-হার্ডির মত। একজন দৈত্যাকৃতি, প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, অন্যজন বেঁটেখাট, তারা একদম মিশুকে নয়। দিনরাত্রি পড়াশুনো করে, আর ফাঁক পেলেই ভাল ভাল রাঁধে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কত্তাগিন্নির ঘ্রাণের-অর্ধভোজনম হয়ে যায়। সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা থাকেন সবচেয়ে নিচে, একতলায়, একা একা। এক খুনখুনে থুত্থুরে বুড়ি। তাঁর ফোকলা মুখের হাসিভরা 'গুডমর্নিং'টি গিন্নির বড়ই প্রিয়। বাড়িওলার নিজের বাসা চার্লস নদীর ওপারে, শহর বস্টনে। এই খেলনাবাড়িটি যতই ঝরঝরে হোক, কত্তাগিন্নির মনে দিব্যি

ধরেছে, এবং পকেটেও।

সন্ধ্যাবেলা কলেজ থেকে ফিরে কত্তাটি এককাপ গরম কফি আর একটি পড়ার বই হাতে করে, তিনতলার ছাদের আরামকেদারায় গা-এলিয়ে, পা দুটি দু-ডলার দামের টেবিলে তুলে দিয়ে, দেড় ডলার দামের স্ট্যাণ্ডিং ল্যাম্পটির আলোর তলায় গুছিয়ে বসেন। আর গিন্নি রান্নাঘরে অর্থাৎ তিনগজ তফাতে রান্নাবান্নার কোণটাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুটনো কোটেন কুটুর-কুটুর, বাসন মাজেন খুটুর-খুটুর, আর গড়গড় করে কথা বলেন। সারাদিন কলেজে কী হল, সেইসব। কত্তা বই পড়তে-পড়তে হুঁ-হাঁ করেন। কখন কখন ভুলভাল জায়গায় 'হুঁ' বলে ফেল্লেই সর্বনাশ— তক্ষুনি গিন্নি পিছন ফিরে তাকান। —'ওঃ, তুমি বই পড়ছ? কিছুই শুনছিলে না?' কত্তার অমনি ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়। কিন্তু সে-সব স্বীকার করার পাত্র তিনি নন। —'শুনব না কেন? তুমি জিজ্ঞেস কর না? প্রশ্ন করে দ্যাখ কী জানতে চাও? শুনেছি কিনা বুঝতে পারবে।'

গিন্নিও ছাড়বার পাত্র নন—

—'বল তো, আজ প্রফেসর হ্যারি লেভিন কার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন? এইমাত্র এটাই বললুম তোমাকে।'

—'কার সঙ্গে বল তো?' অপ্রস্তুত কত্তা শেষরক্ষা করতে পারেন না।

—'বলব না, যাও।'

—'দেখলে তো, কিচ্ছুই তার মানে শুনছিলে না!' অভিমানে গলা বুজে আসে, গিন্নি ঠোঁট ফোলান। কত্তার কফিও শেষ। অগত্যা বই নামিয়ে টেবিল ঠেলে কত্তাকে এবার উঠতেই হয়। সম্মুখে কর্তব্যপালনের গুরুদায়িত্ব। এখন আশু কর্তব্য : মানভঞ্জন।

পাঁচ মিনিট পরের দৃশ্য : গিন্নি আবার গুনগুনিয়ে গপ্পো করছেন, কত্তা আবার ভুরু কুঁচকে বই পড়ছেন, আর হুঁ-হুঁ করছেন। সামনে নতুন কফির ধোঁয়া।

৪

সেদিনও এমনিই চলছিল। গিন্নি একসময়ে বললেন— 'দেশলাইটা একটু দাও তো?' কত্তা তিন ইঞ্চি দীর্ঘ বিশাল কিচেনম্যাচেস দিয়ে অনবরত চুরুটটাকে ধরাচ্ছিলেন। আজকাল আবার কফির সঙ্গে এটা নতুন জুটেছে। কত্তা সিগারেট ছেড়ে চুরুট খেতে শিখছেন, কেননা চুরুট কত্তার কচিকচি চেহারায় বেশ একটা ওজন এনে দেয়, বেশ ভারি-ভারিক্কি দেখায়, মুখে মোটকা একখানা চার্চিল চুরুট গোঁজা থাকলে। কিন্তু ঝামেলাও কম নয়। একটু অন্যমনস্ক হলেই অভিমানী চুরুট নিভে যেতে চায়। কিছুতেই চুরুটটাকে একটানা জ্বলন্ত রাখার কায়দাটা আয়ত্ত হচ্ছে না কত্তার। তাই অনবরত ফস ফস করে দেশলাই জ্বালাতে হয়, অন্তত দশটা কাঠি লাগে— পরে চুরুট! গিন্নি চাইতে, অন্যমনে দেশলাইটা ছুঁড়ে দেন কত্তা গিন্নির দিকে। কিন্তু গিন্নি তো তখন পেছন ফিরে পেঁয়াজ কুচচ্ছেন, আর থেকে থেকে চোখ মুচ্ছেন। খানিকটা জল পেঁয়াজের জন্যে, আর বাকিটা সাতসমুদ্দুর তেরোনদীর পারে ফেলে আসা দুটি বুড়োবুড়ির জন্যে।

— 'আহা, সেই তো রাঁধতে শিখলাম। অথচ ওঁদের কোনোদিন রেঁধে খাওয়ানো হয়নি— কে জানে কবে পারব' —গিন্নি এইসব ভাবছেন আর চোখ মুছেন, আর পেঁয়াজ কুচচ্ছেন— মহামান্য দেশলাইয়ের শুভাগমন টের পেলেন না। আর— দেশলাই তো নয়, যেন স্বয়ং দুর্বাসা মুনি। বাপরে! প্রথমে ঠক— তারপরেই ফোঁসস। দুবার দুটি মৃদু শব্দ; একমুহূর্ত আগুনের ঝলসানি, গিন্নি পেছন ফিরে একঝলক তাকালেন, কত্তা বই থেকে একপলক চোখ তুললেন— অমনি 'দুম্‌ম্‌'— বিস্ফোরণের একটা চাপা গর্জন হয়েই বিপুল ধূম্রজালে বিশ্বচরাচর সমাচ্ছন্ন। ঘরের ও-প্রান্ত থেকে একটি আর্তরব উঠল।—

—'এই তো আমি। পারফেক্টলি অলরাইট!'

'তুমি?' বলতে বলতেই রামভক্ত গিন্নি এক লম্ফে সরু টেবিলটা ডিঙিয়ে কর্তার বক্ষলগ্না হন। গিন্নির বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি না, স্বভাবটা ঠিক চড়ুই পাখির মত চঞ্চল। কিন্তু নিজের সম্পর্কে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা যে তিনি আস্ত একটি বোধিবৃক্ষ, তাঁর তুল্য শান্ত, মাথাঠাণ্ডা, তথা প্রত্যুৎপন্নমতি ব্যক্তি ত্রিভুবনে বিরল। ত্রিভুবনে দ্বিতীয় কেউই অবশ্য গিন্নির এই ওরিজিন্যাল ধারণাকে মদত দেন না। তাঁর আত্মীয়, গুরুজন, ইয়ার-বন্ধু কেউই না। বরং উলটে তাঁরা মনে করেন গিন্নি ট্যালা, ক্যাবলা, অকারণে মাথা গরম করেন, এবং কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। পাগল-ছাগলও বলে কেউ কেউ। বললে কি হবে, গিন্নি কিন্তু আত্মবিশ্বাসে অটল। অমন কাকে-কান-নিয়ে-যাওয়া প্রকৃতি তাঁর নয়। গিন্নি লোকের লোকের মন্দ কথায় কদাচ কান দেন না। তিনি অনেকবার লক্ষ্য করে দেখেছেন, পদে-পদে মাথাটা গরম হলেও বিপদে-আপদে মাথাটা ঠিক ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যেমন সেবার এরোপ্লেনের বিজলি-ঝঞ্ঝার মধ্যে? এবারেও তাই হয়। কত্তাকে সান্ত্বনা দিয়েই নেকস্‌ট মুভ হিসেবে গিন্নি দৌড়ে নিজের ভারী ওভারকোটটি এনে ছুঁড়ে দেন আগুনে। অবশ্য আগুন-টাগুন দেখা যাচ্ছে না, ধোঁয়ায়-ধোঁয়া ঘর, দম আটকে আসছে। তবে কথায় বলে, 'যেখানেই ধোঁয়া আছে, সেখানেই অগ্নি।' তারপর গিন্নির হাত ধরে টানতে টানতে কত্তা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়েন। যাবার আগে সাবধানে দোরগুলো সব টেনে দিয়ে যান— যাতে আগুনটা সারাবাড়িতে ছড়িয়ে না পড়ে। (যেন আগুনের অভ্যেস ভদ্রলোকের মত দরজা দিয়ে বেড়িয়ে কলিং বেল টিপে অন্যের বাড়িতে ঢোকে!) মুচমুচে পলকা কাঠের বাড়ি তো? জতুগৃহের দশা হতে সময় লাগবে না। চটপট অন্যান্য বাসিন্দাদের খবর দেওয়া দরকার। কিন্তু তার আগেই আগুনে পশমের কম্বল চাপা দেওয়ার নিয়ম। পশমের কম্বল বাড়িতে একটাও নেই। সেন্ট্রাল হিটিং আছে বলে, এ-বাড়ির কম্বলগুখেলা সমস্তই নাইলনের। নাইলন তো বেশি বেশি জ্বালানি যোগায়। সেটা খেয়াল করে গিন্নি সে কম্বল না ছুঁড়ে কোট ছুঁড়েছেন সেটা কিনা পিওর উলের, এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য সিঁড়ি দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে গিন্নিকে একটু পিঠ চাপড়ে বাহবা না দিয়ে পারলেন না কত্তা। সেইসঙ্গেই বলে দিলেন— 'দোতলায় গিয়ে কথাবার্তা যা বলবার সেটা আমিই বলব কিন্তু।' কত্তার কাছে বাহবা পেয়ে গিন্নি খুব

খুশি, তারই মধ্যে দুঃখু-দুঃখু প্রাণে একটু ভাবলেন, 'আহা, অত দামী কোটটা এতক্ষণে ছাই হয়ে যাচ্ছে— কিন্তু প্রশ্নটা যেখানে মানুষের জীবন-মরণের সেখানে একটা তুচ্ছ কোটের মরণ-বাঁচন নিয়ে ভাবলে চলবে কেন!'

৫

দোতলায় নেমেই গিন্নি ভুলে ছাত্রদের বন্ধদুয়ারে দমাদম প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে গেলেন। বাড়ির জানালা-দরজা কেঁপে ওঠে ঝনঝনিয়ে। অমনি কত্তার মৃদু ধমক— 'ছি, বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে? হাজার হোক ওদের সঙ্গে আলাপ নেই তো?' তিনি তো সামাজিক আদবকায়দা সম্পন্ন মার্জিত ভদ্রলোক। গিন্নি হলেনই বা বুনোপ্রাণী! কত্তা শত বিপদেও সৌজন্য হারিয়ে ফেলেননি।

কিঞ্চিৎ লজ্জা পেলেও গিন্নি বলতে ছাড়েন না—

—'আহা, ডাকাত না পড়ুক, আগুন তো লেগেছে? আমরা কি পাড়া বেড়াতে এসেছি নাকি?' অতিকায় দীর্ঘদেহ কিশোরটি দোর খুলে দেঁতো হাসল—

— হায়! (হাহাকার নয় অবশ্য, প্রীতিসম্ভাষ।)

—'হ্যালো।' সহাস্যেই কত্তা বললেন।

—'ক্যান আই হেলপ ইয়ু?'

আর হাসি।

কত্তাও আর হাসেন। গিন্নি কেঁদে ফেলেন।

আর কি। ঘরে আগুন লেগেছে, সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়— এই সংকটের মুহূর্তে হায়-হ্যালো করে লোকলৌকিকতা করে কেউ? এই কি ভদ্রতার সময়? গিন্নির মুখের চেহারাতেই বোধহয় এস ও এস বার্তা লেখা ছিল। অথবা তাঁর দোর ঠ্যাঙানির ধরনে। সাহেব ব্যস্তস্বরে নিজেই বলল—

—'ডু ইয়ু হ্যাভ এনি প্রবলেম?'

কত্তা ভদ্রতায় গলে গিয়ে বলেন—

—'ধন্য, ধন্য—ভয়ের যদিও কোনও কারণ নেই, কিন্তু— দো দেয়ার ইজ নো কজ ফর প্যানিক, বাট—'

অকস্মাৎ গোমড়া হয়ে গেল ব্যায়ামবীর ছেলেটার শ্মশ্রুগুম্ফহীন হাসিমুখ।

তারপর সাড়ে ছ'ফুট শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে মুখখানা কত্তার মুখের খুব কাছে নামিয়ে এনে ভুরু পাকিয়ে খিঁচিয়ে উঠল—

—'প্যানিক? হোয়াই শুড আই প্যানিক, ম্যান?' কত্তাটিও দমবার নন। হলেনই বা পাঁচফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি। হাস্যবদনে সংযতকণ্ঠে তিনি জবাব দেন—

—'দ্যাটস রাইট! ইউ শুড নট প্যানিক। বাট দেয়ার ইজ এ স্মল ফায়ার আপস্টেয়ার্স।' অর্থাৎ কিনা ভয়ের কিছুই নেই, বাড়িতে কেবল যৎসামান্য আগুন লেগে গেছে। এই সৌজন্যপূর্ণ সংবাদটি শোনামাত্র ছেলেটার মুখের চেহারা পালটে যায়।

ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে ওঠে :

—'কী বললেন? আগুন? ডিড ইউ সে আ ফায়ার? স্টীভি। স্টার্ভি। দেয়াজ অ ফায়ার আপস্টেয়ার্স।' — এবং তৎক্ষণাৎ দমাদ্দম শব্দে ধরিত্রী প্রকম্পিত করে কাঠের সিঁড়ি প্রায় সে ভাঙতে-ভাঙতে ওপরে দৌড়তে থাকে। তার পেছন পেছন কত্তাগিন্নিও সিঁড়ি ভাঙতে ওপরে ঊর্ধ্বপানে ছোটেন। আর তাঁদের পশ্চাতে ছুটতে ছুটতে আসে স্টীভি নামক বেঁটে ছাত্রটি। তার হাতে একটা খুন্তি। সেও ডিনার রাঁধছিল মনে হয়। উঠে গিয়ে জোর দোর-ঠেলাঠেলি শুরু করেছে দৈত্যাকৃতি ছেলেটা—দোর আর খোলে না। এদিকে অজস্র ধোঁয়া বেরুচ্ছে তার ফাঁক দিয়ে। ছেলেদুটোর কাঁধের ধাক্কায় দোর যখন ভাঙ-ভাঙ, তখন সন্তর্পণে তাদের একটু ঠেলে সরিয়ে — 'নাউ, প্লীজ লেট মী ট্রাই—' বলে কত্তা এগিয়ে যান, এবং পকেট থেকে চাবিটি বের করেন।

—'ও-ও-হ্'.... বলে একটা কাতর হাল-ছাড়া শব্দ বেরোয় ছেলেদুটির মুখ থেকে এবং খুট করে দরজা খুলে যায়।

—'জাস্ট ইম্যাজিন, স্টীভি, —অল দা হোয়াইল হি হ্যাড দ্যাট কী....! এ্যাণ্ড.....।' অপ্রস্তুত স্বরে কত্তামশাই কৈফিয়ৎ দেন— 'আমাকে তো আপনারা সুযোগই দিচ্ছিলেন না খুলতে— আমি কি করব।'

গিন্নি ভেবেছিলেন ঘরে ঢুকে দেখবেন সিনেমায় দেখা অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্যের মত ঘরময় লকলক করছে লাল-হলুদ আগুন, যাকে বলে 'লেলিহান অগ্নিশিখার খেলা', চেয়ার টেবিলগুলো পটপট শব্দে পুড়ছে—পর্দাগুলো দাউদাউ করে জ্বলছে আর ফোমের কুশনগুলো ধিকি-ধিকি।

আহারে—কমলালেবু গাছ আর লঙ্কা গাছটার জন্যে খুব মায়া হয় গিন্নির। এগুলো— জ্যান্ত ফলন্ত জিনিস তো!

দরজা খুলে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শান্তিময় দৃশ্য। একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে। কেবল মেঝের একটাই জায়গা থেকে ঘোরতর ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। সেখানে মোটা শতরঞ্চিটা ক্রমাগত পুড়ছে। খুবই 'লোকালাইজড ধোঁয়া'। ঠিক তাঁর পাশেই কোটটা শান্ত হয়ে শুয়ে আছে পোষা কুকুরের মত। ঘরে কোনওই শান্তিভঙ্গের লক্ষণ নেই। সব ঠিকঠাক। প্লেটে কুচো পেঁয়াজের পাশে গিন্নির ছুরি মজুত, টিপয়ে কত্তার কফির পাশে খোলা অর্থনীতির বই। খুদে কমলালেবু, লাল লঙ্কা হাসি-হাসি মুখে যে যার টব থেকে কত্তাগিন্নিকে অভ্যর্থনা জানাল —'হায়'। আহ্লাদে গিন্নির চোখে জল এসে যায়।

আঃ, জীবন কত সুন্দর। ভগবান কত ভাল। কপালের ঘাম মুছে ছেলেদুটো বলল— 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কী বাঁচানই বেঁচেছেন। দয়া করে ভবিষ্যতে আর দেশলাই ছোঁড়াছুড়ি করবেন না, ওটি বড়ই বিপজ্জনক খেলা।— এদেশে কিচেনম্যাচেস সেফটিম্যাচেস হয় না।' কত্তা নাক কুঁচকে বললেন, 'আমাদের দেশে কিন্তু সব দেশলাই-ই সেফটিম্যাচেস হয়।' ছেলেটি গিন্নির কোটটি মেঝে থেকে তুলে পি সি সরকারের মত ঝেড়েঝুড়ে দেখাল

যে এত আগুনেও তাতে একটি ফুটো পর্যন্ত হয়নি।

কোট পরীক্ষা করে নামিয়ে রেখে স্টীভি খুব গম্ভীর মুখে বলে— 'নট শুড ইউ থ্রো ইওর কোটস ইন টু ফায়ার।' এই সময় দেখা গেল যে কোটের লাইনিংটা নাইলনের। কত্তাগিন্নিতে চোরাই চোখাচোখি হয়। হঠাৎ কপালজোরেই আগুনে পড়েনি লাইনিংয়ের দিকটা। ভাগ্যিস! কত্তাগিন্নির সেই ছেলেদের কিছুতেই চা-কফি-বিয়র-হুইস্কি-কোকাকোলা-সেভেন আপ, কারি-রাইস—কিছুই খাওয়াতে রাজী করাতে পারলেন না। নাঃ, এই গোবদা ছেলেদুটোকে মোটেই মিশুকে বলা চলে না। পুরো এক বছরের মধ্যে কত্তাগিন্নির সঙ্গে তাদের সামাজিক যোগাযোগ হয়নি।

৬

সামাজিক যোগাযোগ হয়নি, কিন্তু অসামাজিক যোগাযোগ একবার একটা ঘটেছিল। এতই মনুষ্যসমাজ-বহির্ভূত সেই বিরল সাক্ষাৎ, যে উভয়পক্ষেই তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ঘটনাটি চেপে না রেখে বলে ফেলাই ভাল।

মার্কিন দেশের লোকেরা সাত তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে নেয়, অফিস থেকে ফিরেই, ছ'টা নাগাদ। আর সূর্য ডোবেন তাঁর যখন খুশি, রাত্তির আটটা, নটা, দশটায়। খুব দীর্ঘ গোধূলি। সেদিন বড় সুন্দর বাতাস বইছে. দেশে যাকে বলে দখিনা বায়, মন রয় না রয় না রয় না ঘরে, মন রয় না। যদিও তখন শীতকালই, কিন্তু বসন্ত এই আসে কি সেই আসে বলে দারুণ শাসাচ্ছে। আবহাওয়াটি বড় মনোরম। ললিতলতা লবঙ্গলতা। পরিশীলন কোমল সেই সময় সমীরণে মোটেই ঠাণ্ডার কামড় নেই, কত্তাগিন্নি ভাবলেন, 'অহো, কি অপরূপ বসন্ত সন্ধ্যা। আজ আর রেঁধে কাজ নেই। একটু বাইরে থেকে খেয়ে আসা যাক।' কত্তাগিন্নির এই ভাবনাটির মধ্যে অবশ্য বিশেষত্ব ছিল না। সপ্তাহে দু-একদিনই তাঁরা এরকম ভাবতেন। প্রত্যেকবার কারণগুলো ভি ভিন্ন তৈরি করে নিতেন। যথা : 'আজ বড় সময় কম, অনেক পড়াশুনা আছে, রাঁধতে বসলে দেরি হয়ে যাবে.' অথবা —'আজ হাতে ঢের উদ্বৃত্ত সময়, একটু ঘুরেফিরে খেয়েদেয়ে এলে কেমন হয়?' আসল কারণ দুটি। প্রথমত, গিন্নি সদ্য রান্না শিখছেন, তখনও ঠিক 'রন্ধনে দ্রৌপদী' হননি, একেকদিন রান্না ফেল করে যায়— মুখে তোলা যায় না। দয়ার সাগর কত্তা যদিও তা স্বীকার করতে চান না, তবু তখন ডিম-রুটি-বেকন দিয়েই ডিনারের ফাস্ট ব্রেক করতে হয়। দ্বিতীয় কারণটি আর জোরালো, বাড়ির পাশেই দুটো যারপরনাই সস্তা খাবারের দোকান আছে— একটি গ্রীক, অন্যটি চীনে। দোকান দুটি প্রধানত দেউলিয়া, ভবঘুরে, ভিখিরিদের জন্য হ: · ও গরীব কত্তাগিন্নির মুখে সেই রান্না অমৃতসমান লাগত। বিশেষ বিলটা যখন আসত। দোকান দুটি প্রায় পাশাপাশি। পাঁচ মিনিটের হাঁটা রাস্তা। গিয়ে, খেয়ে, ফিরতে ঘণ্টাখানেক। অতএব কত্তাগিন্নি আজ আর কেউই ওভারকোটের অতিরিক্ত ভারবহন করলেন না, এই আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে। রাত তো হবে না, শীত পড়বার ঢের আগেই তাঁরা ফিরে আসবেন হালকা হৃদয়ে পলকা

পায়ে। কুহু কুহু করে বেরিয়ে পড়লেন। কত্তার পকেটে পার্স আছে বলে গিন্নি তার অহং-থলিটিও নিলেন না। গুনগুন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে গিন্নি বেরুলেন—কত্তার প্রাণে বেশি আনন্দ হলে আই পি টি এ-র গান গাইতে থাকেন। দুজনে দু'রকম গান গাইতে গাইতে গ্রীক দোকানে ঢুকলেন।

সেখানে গ্রীক গান বাজছিল জ্যাক-বকসে। গিন্নি মেনু দেখতে দেখতে বললেন, 'আহা, এখানে পয়সা ফেললে যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত হতো?' —'সেটা ভালো হতো না বিশেষ। বরং যদি 'পথে নাম সাথী' বাজত কিম্বা 'ইন্টারন্যাশনাল'— বলে কত্তা একটা বিয়র অর্ডার দেন। গিন্নি একটা কোকাকোলা। তারপর গ্রীক ল্যাম্বারাইস স্যালাড। গজার মত বাকলাভা। তুর্কী কফি।

পেটপুরে প্রাণভরে খেয়েদেয়ে বাড়িতে ফিরে এসে তিনতলায় উঠে, পরিতৃপ্তি সহকারে ক্লোভ এবং কার্ডামম চিবুতে চিবুতে কত্তাগিন্নি আবিষ্কার করলেন— সর্বনাশই সমুৎপন্ন হয়েছে। এবং এই সর্বনাশে এমনকি পণ্ডিতের অর্ধেক ত্যাগ করার উপায় নেই। পুরোটাই পরিত্যাগ করতে হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঘরবাড়ি ফ্ল্যাটে নো্ এ্যাডমিশান —কেননা কত্তার চাবিটি আছে তাঁর ওভারকোটের পকেটে, গিন্নির চাবি তাঁর বটুয়ায়। এবং কোট-বটুয়া দুটোই ঘরের ভেতরে থেকে গেছে। ঘরে চাবিবন্ধ। অতএব আপন ঘরে পরবাসী—ঢুকতে আর পারিনে। এখন ঘরে ঢুকতে হলে এতগুলো কাজ করতে হয় : ১. বাড়িওয়ালাকে বস্টনে টেলিফোন করে একস্টা চাবি প্রার্থনা করতে হবে। ২. সেটাও কোন ফোন বুথে গিয়ে। ৩. তারপরে সে-ই বস্টনে ছুটতে হবে চাবিটি আনতে (যদি তৃতীয় চাবি থাকে। কেননা দুটি চাবিই দিয়ে দিয়েছিলেন তিনি)। ৪. ইদিকে গাড়ির চাবিও তো রয়ে গেছে ঘরের মধ্যে— ঘরের চাবিরই সঙ্গে। অতএব টিউব ট্রেনে করে বস্টনে যেতে হবে। এবং ৫. ততক্ষণে শীত বেশ জাঁকিয়ে নেমে পড়বে। বসন্তকালে শীত নিশাচর, রাত হলেই ঝপাং করে তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়েন জনমনুষ্যের ওপরে, বাঘের মত। অথচ ওভারকোটগুলোও ঘরের মধ্যে বন্দী। এই শীতে নদী পেরিয়ে বিনা-কোটে বস্টন যাওয়া...। কত্তার ফর্সা মুখটি শুকিয়ে বাসি বকুলফুল। এখন পাঁচদাগ সমস্যা সামনে— প্রত্যেকটাই খাঁটি। হায়! হায়! কী গণ্ডগোলটাই যে পাকিয়ে গেল আজকে এই আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে!

হেনকালে গিন্নি লাজুক গলায় বেগনী-বেগনী মুখে কত্তাকে বললেন— 'হ্যাঁগো, এদেশে রেইন-ওয়াটার পাইপ হয় না? আমি কিন্তু পাইপ বেয়ে উঠতে পারি।'

গিন্নির বাক্যংশ্রুত্বা চমৎকৃত কত্তার প্রথমে বাক্যরোধ হয়ে গেল। তারপর সংবিত ফিরে পেয়ে তিনি ভাঙাগলায় বললেন— 'সে কি!' তাতেই যথেষ্ট উৎসাহ পেয়ে গিন্নি উবাচ— 'অবিশ্যি এসব বাড়ির তো ঢালু ছাদ! রেইন-ওয়াটার পাইপ নাও থাকতে পারে। তা না-ই-থাকল। চিমনির পাইপ-টাইপ যা হোক কিছু একটা থাকবেই নিশ্চয়?' বলেই নিচে ছুটলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। কত্তা আর কী করেন, তিনিও নিচে চললেন ছায়া ইব। যেহেতু কোনও সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান সাপ্লাই করতে পারছেন না।

আপাতত বিষয়টাই এমন স্থূল, আন-ইন্টালেকচুয়াল। অগত্যা গিন্নির সরল মোটা অ্যাপ্রোচটাই মেনে নেওয়া যাক।

বাড়ির পশ্চাদভাগে একটুখানি পোড়ো জমি। সেইখানে তিনটি ফ্ল্যাটের তিনখানি সুবৃহৎ আবর্জনা ভাণ্ড, মার্কিনী ভাষায় গারবেজ ক্যান, বসে আছেন কর্তাব্যক্তির মত সারি সারি সুগম্ভীর। এবং প্রায় অন্তঃসারশূন্যই, কেননা গতকালই পৌরসভার গাড়ি এক সপ্তাহের আবর্জনা কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। পাইপের সন্ধানে গিয়ে আর একটি বস্তু আবিষ্কার করে ফেলেছেন গিন্নি এদিকে। করে তিনি আহ্লাদে আত্মহারা, আরে বাঃ, সমস্যার সমাধান! সামনেই কিনা একটি— অতি দীর্ঘ লোহার মই! দেওয়ালে চমৎকার প্রলম্বিত। ঠিক কত্তাগিন্নির চিলেকোঠার শয়নকক্ষের বাতায়নই উৎসমূল। এবং সেই জানলা, নিচে থেকেই দেখা যাচ্ছে। আজ শীত-কম বলে ছিটকিনি দেওয়া নেই, এক-তৃতীয়াংশ খোলা। অর্থাৎ ওটাকে ঠেলে আরেকটু ওপরে তুলে দিতে পারলেই ঘরে ঢোকাটা তুচ্ছ। (ইংরিজি সিনেমায় দেখা বিদেশি জানালাগুলি পাঠকদের স্মর্তব্য : কুত্রাপি গ্রিল-গরাদের ঝামেলা থাকে না।)।

পাইপের বদলে মই পেলুম টাক ডুমাডুম ডুম।

পরম উৎসাহে গিন্নি বললেন, কত্তাকে—'তবে আর ভাবনা কিসের? তুমিই উঠে পড়'— হাজার হোক গিন্নি এটুকু জানেন যে ভদ্রসমাজে পুরুষকেই প্রথমে 'পুরুষের ভূমিকায়' একটা চান্স দিতে হয়। এবং মই বেয়ে ওঠাটা ঠিক নতুন বউয়ের যোগ্য রোল নয়। সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভ সুরে কত্তা বলেন, 'সে তো উঠতেই পারি! এ আর কে না পারে? ফুঃ!' তারপর নিজের ঝাঁকড়াচুলে একটু বিলি কেটে নিয়ে ফের বলেন— 'নো প্রবলেম। সহজ পন্থা তো সামনেই। যে কেউ উঠে পড়লেই হল।' কিন্তু কার্যত মই স্পর্শ করার কোনওই লক্ষণ দেখালেন না। অধৈর্য গিন্নি এবার তাড়া লাগালেন— 'কই, ওঠ?' বশংবদভাবে কত্তা বললেন— 'এই উঠছি।' বলে গম্ভীরভাবে একবার বাঁদিক থেকে, আরেকবার ডানদিক থেকে সিঁড়িটাকে খুব যত্নসহকারে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতায় পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। ধীর, সুস্থির, বিলম্বিত লয়ে পায়চারিপূর্বক। যেন বাঘের খাঁচার ব্যাঘ্র।

সরু আঠার ইঞ্চি চওড়া লোহার শিকের তৈরি মই। বিপজ্জনকভাবে সিধে উঠে গেছে স্বর্গের সিঁড়ির মত। ঠিক কর্তাগিন্নির জানলা পর্যন্ত। হাতল-টাতলের বালাই নেই। দেয়াল থেকেও ফুটখানেক দূরে। এবং মাটি থেকে প্রায় একতলা উঁচুতে নেমে এসে হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে। এর নাম 'ফায়ার এসকেপ'। বাড়িতে আগুন লাগলে এই মই বেয়ে বাইরে পালিয়ে আসতে হয়। শুধু নামবার জন্যেই এই মই, ওঠবার জন্য নয়। বাড়িতে আগুন লাগলে, এই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে শেষ ধাপ থেকে ওরাংওটাংয়ের মত দুই হাত ঝুলে পড়লে, পা মাটি থেকে খুব বেশি ওপরে থাকে না। তখন দুগ্‌গা বলে ঝুপ করে লাফালেই হল। কিন্তু মাটিতে দাঁড়িয়ে ঐ সিঁড়িতে নাগাল পাবার কোনও উপায় সাধারণ মানুষের নেই। নতুবা চোরেরা যে রেগুলারলি ওঠা-নামা করবে! মার্কিন দেশে

প্রত্যেক বাড়িতে এই লোহার সিঁড়ি আইনত অপরিহার্য। এবং জীর্ণ বাড়ির গিন্নির মতই ধনী বাড়ির ফায়ার এসকেপার বেশ নধর, পুষ্ট, রেলিং-টেলিংওয়ালা দোহারা চেহারা হয়, আর গরীববাড়ির ফায়ার এসকেপার হয় রোগা, সরু চিমসে। যেমন এইটে। এটার জন্ম হয়েছে যেন আইনের দৌলতে— নাম-কা-ওয়াস্তে। কাম-কা-ওয়াস্তে নয়।

কত্তার দ্বিধান্বিত দুশ্চিন্তিত পায়চারি দেখে গিন্নি ভাবলেন কত্তা নিশ্চয় ভাবছেন 'অত ওপরে মইটা ফুরিয়েছে— এখন উঠি কী করে?' বুনোগিন্নির মাথায় চমৎকার দুর্বুদ্ধির বৈদ্যুতিক উদ্ভাস এসে গেল। তাঁর শরীরে তো ঘেন্নাবৃত্তি নেই! তিনি বল্লেন —'এস আমরা একটা গারবেজ ক্যানের ময়লা আরেকটাতে ঢেলে নিয়ে খালি পাত্রটি উপুড় করে মইয়ের তলায় পাতি। তারপরে ওটার ওপরে চড়লে তুমি ঠিকই হাতে পেয়ে যাবে মইতে। তুমি যা লম্বা!' বলে কত্তার পাঁচ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যটিকে সপ্রশংস নয়নে বন্দনা করেন। আহা কী চেহারা— যেন শালপ্রাংশু। মহাভুজও কি নন? কত্তা তাতে ধন্য বোধ করলেও ডাস্টবিনে চড়বার কাজে খুব একটা উৎসাহ পেলেন বলে মনে হ'ল না। কিন্তু অধীর আগ্রহে প্রবলা সেই গিন্নিকে দমায় কে? অনতিবিলম্বেই একটা ময়লা ফেলার ড্রাম খালি করে ফেলে সেটা মইয়ের তলায় উলটিয়ে পাতা হয়ে গেল। মঞ্চ প্রস্তুত— এবার কত্তার তাতে উঠে পড়ারই অপেক্ষা।

হেনকালে গিন্নির অত্যুৎসুক আঁখিপল্লব এড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে নিরুপায় কত্তা আমতা আমতা করে বলেই ফেলেন— 'শোন, একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি।' গিন্নির মুখটি শুকিয়ে গেল। বলা হয়নি এমন কথা এখনও আছে? এই পাককা সাড়ে সাতমাস পড়েও? অর্থাৎ তিরিশ ইনটু সাত দু-শ দশ প্লাস পনের রাত্রি একাধিক্রমে গুঞ্জনের পরেও?

কত্তা অপরাধীর মত মাটিমুখো হয়ে যা-থাকে-কপালে-সুরে বলে ফেললেন, —'আমার ভার্টিগো আছে।' বিমর্ষ গিন্নি এবার আঁতকে উঠলেন। 'এ্যাঁ....?' গিন্নি অকাতরে কাতরে ওঠেন— যেন সিফিলিস— 'সে কি গো? সে তো একটা ভয়ংকর হিংস্র মনের রোগ, যা খুনীদের থাকে। শুনেছি হিচককের 'ভার্টিগো' নামে একটা ছবিতে এক স্বামীস্ত্রী....' কত্তাটি এবার হাঁ হাঁ করে ওঠেন —'ওরে নারে, খুনটুনের ব্যাপারই নয়, ভার্টিগো একটা তুচ্ছ অসুখ —অতি তুচ্ছ, অত্যন্ত সাধারণ, আ মোস্ট কমন প্রবলেম— যাতে ওপর থেকে নিচের দিকে তাকান যায় না। দেশের বাড়িতে দ্যাখনি, দেয়ালঘড়িতে বাবা দম দিতেন, ঠাকুর দম দিত, এমনকি মালীও দম দিত, অথচ আমি কদাচ দিতাম না। আমি যে মইতে চড়তে পারি না। চড়লেই মাথা ঘোরে। বুক ধড়ফড় করে, বমি পায়, মনে হয় পড়ে যাব, অথবা লাফিয়ে পড়ি। এইজন্যেই তো তোমার সঙ্গে কুতুবমিনারে কিছুতেই চড়লুম না।' 'উঃ, কি সর্বনাশ। মনে হয় লাফিয়ে পড়ি!' গিন্নিই লাফিয়ে ওঠেন। কিন্তু গলা শুনে মনে হয় না সর্বনাশের গন্ধ পাচ্ছেন। লাফিয়ে গিন্নি একেবারে গারবেজ ক্যানের ওপরেই উঠে সোল্লাসে বলেন—'খবর্দার, তোমার মইতে চড়ে কাজ নেই। আর্ট্র হলেই সর্বনাশ হয়েছিল আর কি! এত আমার ডালভাত। এ আমি

ইজিলি চড়তে পারি।' গিন্নির গলায় স্পষ্ট রিলিফ। বিয়ের পরেই দল বেঁধে সবাই কুতুবমিনারে গিয়ে গিন্নির সত্যি বড্ড মনে কষ্ট হয়েছিল। জেদ করে কত্তা নিচে দাঁড়িয়ে রইলেন। একা-একাই। কিন্তু ওদিকে যে একটা ভীষণ সাজগোজ করা পাঞ্জাবী মেয়েও নিচে দাঁড়িয়েছিল! গিন্নি তাই মিনারে চড়ে মোটেও মনে শান্তি পাননি। আজ বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল। এ-ই ব্যাপার ছিল তাহলে?

'সেই ব্যাপার নয়? তা-রা! জয় মা তারা (গিন্নি হঠাৎ মনে মনে তাঁর পিতৃদেবের মত হুংকার দিয়ে ওঠেন) তারা ব্রহ্মময়ী মাগো। বাঁচা গেল।'

দেড় মাস আগেই কত্তাগিন্নির বিবাহের অর্ধবর্ষপূর্তি জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেছে বটে কিন্তু দেখা যাচ্ছে 'এখনও গেল না আঁধার' — এখনও কত কি জানা বাকি। পরস্পরকে ভাল করে চেনাই হয়নি। এই সংকটমুহূর্তে গিন্নি প্রথম জানলেন তাঁর সর্বশক্তিমান কত্তা একটা জিনিস পারে না— আর কত্তা অবগত হলেন, যে গিন্নি সেইটে তো পারেনই, পরন্তু আরেকটা জিনিসও পারেন। গিন্নি জানালেন তাঁর কত্তা মইতে চড়তে অপরাগ— এবং কত্তাও এই প্রথম জানলেন যে গিন্নিটি রেইন-ওয়াটার পাইপ বাইতে ওস্তাদ, দুজনে দেখা হল, মধুযামিনী রে।

৭

হলে কি হবে, গিন্নির আঙুলের ডগাটুকুও পৌঁছল না মইয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত। পায়ের তো প্রশ্নই নেই। তখন পুরুষজাতির সম্মানরক্ষার্থে কত্তাও উঠে পড়লেন উলটানো আবর্জনা-পাত্রের পৃষ্ঠদেশে। কত্তাকে দেখে উদ্বিগ্ন গিন্নির মনে একটি ছবি ভেসে এল— 'আচ্ছা, একটু একটু কিষ্কিন্ধার রাজার মত দেখাচ্ছে না তো গো আমাদের?' কিন্তু কত্তা কেজো-মানুষ। ওসব নান্দনিক অপভাবনায় তাঁর সময় নেই।

'—দূর! যত্ত উটকো ভাবনা।' বলে কত্তা ততক্ষণে গিন্নিকে দুহাতে শক্ত করে শূন্যে তুলে ধরেছেন এবং টারজানের মতই অবলীলাক্রমে গিন্নির শাঁখা-নোওয়া পরা হাতদুটি মই ধরে ঝুলে পড়েছে। তারপর কত্তার স্বেচ্ছা-নিবেদিত স্কন্ধদেশে পদস্থাপনপূর্বক নববধূ মইতে পা তোলেন— অনেকটা প্যারালাল বারের কায়দায়। বীরপুরুষ কত্তামশাইয়ের মুখ ফসকে এই সময় একটি মৃদু অস্ফুট আর্তনাদ নিষ্ক্রান্ত হল। গিন্নি তাড়াতাড়ি জিব কাটলেন— 'এই যাঃ, লাগল তো? পায়ে চটি যে!'

এমন সময়ে একটি ঝনঝন শব্দ শুনে কত্তাগিন্নির চোখ চলে যায় সামনের জানালার দিকে। একতলার বুড়িমার রান্নাঘরের জানলার পর্দা সরানো। সিঙ্কের সামনে বৃদ্ধাটি অবশ দাঁড়িয়ে— একহাতে বাসনমাজার বুরুশ, অন্যহাতের প্লেটটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। পুরু লেন্সের তলা দিয়ে তাঁর চোখ দেখা যায় না, কিন্তু খুলে যাওয়া ফোকলা মুখের গোল হাঁটি কাতলা মাছের খাবি খাওয়ার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গির মধ্যেই বিশ্বের বিস্ময় স্তম্ভিত।

গিন্নি এবারে একটু লজ্জা পান। সৌজন্যসূচক হাসি একটু করে ছুঁড়ে দিয়েই তিনি

মই বেয়ে রাজমিস্ত্রির মত স্বচ্ছন্দে উঠে যান— তারপর বুড়ির স্তব্ধ দৃষ্টির সামনে দুপাটি জরির চটি শূন্য থেকে পুষ্পবৃষ্টির মতো খসে পড়ে। কত্তা ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসেন একটু। পরমুহূর্তেই পুনরায় ঊর্ধ্বমুখে, দুই কোমরে দুই হাত, গিন্নির সশরীরে স্বর্গারোহণের পুণ্যদৃশ্য ধ্যানস্থচিত্তে নিরীক্ষণ করেন। গারবেজ ক্যানের ওপর থেকে নামবার কথাটা তাঁর মনেও পড়ে না। চেয়ে চেয়ে দেখেন, আর মনে মনে তারিফ করেন।— বাঃ! গিন্নি তো দিব্যি উঠছেন! পায়ে পায়ে তো মন্দ প্রগ্রেস হচ্ছে না। খাসা! ওকি! হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? গিন্নির হল কী কত্তার ভুরু কুঁচকে যায়।

৮

ওদিকে গিন্নির এই হল। মই দিয়ে দিব্যি চড়ছিলেন উদবেড়ালের মত তরতরিয়ে, সহসা সামনে পড়ল পর্দাসরানো দোতলা জানালা। ঘরে আলো জ্বলছে। বেঁটে স্টীভি চেয়ারে বসে নীচু হয়ে পা থেকে মোজা খুলছে, পরনে কেবল আণ্ডারওয়্যার। কাঁধে তোয়ালে। অবশ্যই স্নানে যাচ্ছে এবং জানালার দিকে পিছন ফিরে সদ্যস্নাত দৈত্যটি আয়নার সামনে বাহুমূলে সবেগে পাউডার মাখছে, পরনে কেবল জন্মসূত্রে প্রাপ্ত দু গজ দু ইঞ্চি অম্লান সাদা চামড়া। এমন সময় আয়নায় কিছু দেখে ভূত দেখবার মত শিহরিত হল সে, হাত কেঁপে উঠে পাউডারের পাফ পড়ে গেল— মুখ থেকে শব্দও নির্গত হয়ে থাকবে, কেননা স্টীভি মুখ তুলে চাইল, দৃষ্টি বিস্ফারিত, ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত, যেন দুজনকেই ভূতে পেয়েছে। তারা দেখল দোতলার বাতায়নপথে নিষ্পত্র মেপল গাছের উঁচু ডগার ফাঁকে ধূপছায়া রঙ সন্ধ্যামেঘের গায়ে হেলান দিয়ে মহাশূন্যে উদিত হয়েছে তিনতলার গিন্নির সহাস্য বেগুনী বদনচন্দ্রিমা। একজন দেখল সেটা আয়নায়, থালার জলে সূর্যগ্রহণ দেখার মত, আর একজন দেখল সোজাসুজি। এবং একেই কবির ভাষায় বলা হয়েছে 'বিপথ বিস্ময়'। দৈত্যাকৃতি কিশোরটি লজ্জায় হঠাৎ বসে পড়ল। এইভাবে যে দোতলার জানালায় উঁকি দিয়ে কেউ কদাচ তাদের নির্জনতা ভঙ্গ করতে পারে— এ তাদের বন্যতম কিশোর-কল্পনারও বাইরে।

অথচ গিন্নি বেচারী কী আর করবেন? এ তো আর ইচ্ছে করে নয়! তিনিই বা কেমন করে জানবেন যে এই নচ্ছার ছেলেরা অমন ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হবার মত তক্ষুনি চান করে বেরোবে! বিপন্নতার ঘোর কাটতে না কাটতে ছেলেদুটি দেখল শাড়ির পাড়ে-ঘেড়া দুটি মোজাপরা শ্রীচরণ তরতর করে তাদেরই জানলার বাইরে দিয়ে অনন্ত ঊর্ধ্বলোকের দিকে উঠে গেল।

যতক্ষণে তারা সামলে-সুমলে আত্মস্থ হয়ে জানালায় এসে কাঁচ তুলে চেঁচামেচি জুড়ল, 'হে, হোয়াটস দা ম্যাটার', ততক্ষণে তিনতলার জানলা দয়া করে দ্বিধা হয়েছেন এবং গিন্নিও তাতে প্রবেশ করে ফেলেছেন। কেবল তখনও আনমন-মুগ্ধ-নেত্রে গারবেজ ক্যানের বেদীতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন কত্তামশায়। ওদের প্রশ্নের উত্তর, তিনি আপন পটভূমি বিস্মৃত হয়ে, স্বভাবসুলভ সম্ভ্রান্ত গলায় দেন— 'নাথিং রিয়্যালি, উই আর

জাস্ট লকড আউট।' শুনে বালকদ্বয় বিস্ময়সূচক আওয়াজ করল— 'জী ঈ-ঈ-ঈ-ঈ। কিন্তু আপনি গারবেজ ক্যানের ওপরে দাঁড়িয়ে কেন? ওটা যে ভেঙে যাবে!' সহসা সচেতন হয়ে কত্তা তাড়াতাড়ি নেমে পড়েন, মুখে লাজুক হাসি। জো পেয়ে লম্বা ছেলেটা ধমকে ওঠে—

—'লকড আউট তো সকলেরই হয়, তাই বলে ঘরে ঢোকবার প্রকৃষ্টতম পন্থা কি এইটে? হা ঈশ্বর! আপনি নিজেই বা ওঠেননি কেন? মেয়েদের কি একাজে পারেন ঠিক?'

বাঁটকুল স্টীভি অমনি ফোড়ন কাটে—

—'আপনার স্ত্রী যদি পড়ে যেতেন? অত লং ড্রেস পড়ে কেউ কখনও মই বেয়ে ওঠে? গুডনেস গ্রেশাস।'

কত্তা প্রাণপণে ভদ্রতার কানা আঁকড়ে চুপ করে আছেন। মার্কিনী জ্ঞান বিতরণ আর শেষ হয় না। কে আর স্নান করে বেরিয়েই অরক্ষিত অবস্থায় সন্ধের আবছায়ায় দোতলার খোলা জানালায় শূন্যে উড়ন্ত নারীমূর্তি দেখলে খুশি হয়? স্টীভি বলে —'এর চেয়ে আপনারা একটা ডুপ্লিকেট চাবি নিচেরতলার বৃদ্ধা মহিলার কাছে জমা রাখেন না কেন? জগতে আর-সবাই যা করে? আমরাও যা করেছি?'

কত্তা কোনও উত্তর ভাববার আগেই ঠং-করে একটা চাবি শূন্য থেকে এসে পড়ল গারবেজ ক্যানের মাথায়। তারপরেই ছিটকে গিয়ে মাটিতে। কত্তা চটপট কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে ভরেন।

'জী-ঈ-ঈ-ঈ'!! আবার বিস্ময়ে হতচকিত হয় বালকবৃন্দ। এবং লম্বুটা আরেট প্রস্থ ধমক লাগায়—

—'আচ্ছা, এটার কোনও প্রয়োজন ছিল কি? যদি ওপাশের ওই গারবেজক্যানটার মধ্যে গিয়ে পড়ত চাবিটা? তখন চাবি উদ্ধার করতে আপনারা টাই সুদ্ধু ময়লা ঘাঁটতে বসে যেতেন কি? হুমম? তার চেয়ে আপনি টুকটুক করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেই পারতেন? গিয়ে দোরে টোকা মারতেন, আপনার গিন্নি তো ভেতর থেকে দোর খুলে দিতেন। উড নট দ্যাট বি বেটার?'

কত্তাটি জাতে মাস্টার, সাহেব পুত্তুরদের জ্ঞান দেওয়াই তাঁর স্বধর্ম— তাছাড়া ছাত্রবয়সে দুর্ধর্ষ ডিবেটারও ছিলেন, —কিন্তু আজকে কী যে হয়েছে তাঁর? এই অর্বাচীন অপগণ্ড ষণ্ডামার্কা বোকা-পাকা দুটো পুঁচকে ক্রুকাটকুলো আকাট-মুখ্য আনডার গ্রাজুয়েটের বোম বক্তিয়ারির উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না অমন দুর্দমনীয় উঠতি-পণ্ডিত কত্তামশাই। মনে মনে গাল দিতে থাকলেন। কিন্তু মুখে শব্দ যোগাল না— ওদেরই পক্ষে অকাট্য যুক্তি। কত্তা অযৌক্তিক এঁড়েতক্কো করতে পারবেন না একদম —সেটাতে গিন্নিরই মনোপলি। কত্তা অগত্যা দুই পকেটে দু-হাত গুঁজে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে একটা সাবানকাচা হাসি হেসে ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে বললেন— 'তাই তো!' আর ভাবলেন, সিগারেট কই, সিগারেট?

ইতিমধ্যে ওপরের জানলার ফাঁকে গিলোটিনের আসামীর মত করে মুখটি বাড়িয়ে ব্যাপার-স্যাপার সযত্নে শ্রবণ-পর্যবেক্ষণ করছিলেন গিন্নি। তাঁর ভালমানুষ কত্তাটিকে বাগে পেয়ে এই দুটো ত্যাঁদড় ছোকরা যা-নয়-তাই বকুনি দিচ্ছে? এ কি গিন্নি সইতে পারেন? সায়েব-গুণ্ডা বলেই পার পেয়ে যাবে? কক্ষনো নয়। তৎক্ষণাৎ গনগনে লাভার মত, অগ্ন্যুৎপাতের মত, অথবা রাগী ভগবান জেহোভার দৈববাণীর মত— গিন্নি ওপর থেকে গরম গরম শব্দবৃষ্টি করতে থাকেন:

—'অযাচিত উপদেশর জন্য অনেক ধন্যবাদ— এবার থেকে নিশ্চয়ই শখ করে ফায়ার এসকেপ বেয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকব না আমরা— তবে চাবিটা কেন নিচে ফেলা হলো জানতে চাইলে, এই বলছি শুনে রাখ— যাতে উনি একতলার বৃদ্ধা মহিলার হাতে একেবারে চাবি জমা দিয়েই তবে ওপরে ওঠেন। জীবনে যাতে এরকম ভুল দ্বিতীয়বার না ঘটে। বুঝলে বাছারা? ও কে. কিডস? আর য়ু সাটিফায়েড?—'

দোতলার জানলা থেকে ডাবল গিলোটিনের মত দুই মুণ্ডু বাড়িয়ে থাকা দুই ছেলে বাক্যসুধা শুনল। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরের দিকে চাইতে সাহস করল না। সেই মুখ! সেই আলো-আঁধারিতে মুক্ত বাতায়নপথে দীর্ঘ মেপল গাছের নিষ্পত্র শাখার ফাঁকে সন্ধ্যা-মেঘের গায়ে হেলান দিয়ে মহাশূন্যে অভ্যুদিত সেই অলৌকিক বাদাম-রঙা মুখচ্ছবি— সে কি আর একবার দেখা সম্ভব? (তারা তো আর রবীন্দ্রনাথ পড়েনি, প্রিয়ার ছায়াও যে আকাশে এক-একদিন ভাসে, তাদের সে তত্ত্ব জানা নেই)। ও বাবা! এতদশ্রুত্বা ছেলেরা নিচের দিকে চেয়ে চেয়ে ধরিত্রীর বুকে পীসফুলি অধিষ্ঠিত কত্তাকেই বলল:

—'তাই বলুন! ওয়েল দ্যাট মেকস সেন্স। গুডনাইট।' এবং চটপট ঘরের মধ্যে মুণ্ডু টেনে নিয়ে জানলা নামিয়ে ফেলল। কী জানি আবার যদি মই বেয়ে নেমে আসে? বৃদ্ধার হাতে চাবিটি জমা দিয়ে, প্লেট-ভাঙার জন্য যারপরনাই দুঃখ জ্ঞাপন করে, অবশেষে নিজের ঘরে ঢুকে দু'ডলারের আরাম কেদারায় গা এলিয়ে, পঞ্চাশ সেন্টের মাটির মগে করে গরম গরম কফি খেতে খেতে কত্তা ভয়ে ভয়ে কথাটা পাড়লেন:

—'হ্যাঁগো, রমেশদের একটু ফোন করি? একটু আসতে বলি? বড্ড হুইস্কি খেতে ইচ্ছে করছে। স্ট্রেনটা তো বড় কম গেল না।' চোখ পাকিয়ে অদম্যস্পর্ধা গিন্নি বললেন— 'স্ট্রেনটা কার বেশি গেছে শুনি? আমি মই বেয়ে তিনতলা উঠলাম, আর হুইস্কি খাবে তুমি?' তারপর মিষ্টি হেসে কৃপাবর্ষণ করেন—'ঠিক আছে, ফোন করে দিচ্ছি।— বেশি রাত করা চলবে না। কিন্তু আজকে! কাল ভোরবেলা ক্লাস আছে।'

প্রশ্রয় পেয়ে আহ্লাদে গদ্গদ কত্তা কৃতজ্ঞচিত্তে দু'হাত তুলে গিন্নির মইতে চড়ার কৃতিত্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে থাকেন। এক সময়ে তারই ফাঁকে টুক করে বলে ফেললেন:

—'আচ্ছা, তুমি চাবিটা সত্যি সত্যি বুড়িকে জমা দেবার জন্যেই নিচে ফেলেছিলে?'

এতক্ষণে নিজের প্রশংসা শুনে খুশিবিগলিত গিন্নি খলবলিয়ে উঠলেন— 'আরে

দূর! তুমিও যেমন? ছোকরাগুলোর চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা শুনে মাথা গরম হয়ে গেল, তাই ওরকম বলে দিলুম। আসলে আমার মোটে মনেই ছিল না যে এসব ইয়েল লক, ভেতর-বাইরে দুদিক থেকেই খোলে। আমি ভাবছি তালাবন্ধ ঘরে আটকে পড়েছি—বাইরে থেকে না খুললে বুঝি.... তাইতো তোমাকে চাবিটা ফেলে দিলুম—'

হঠাৎ একটু ঘনিয়ে এসে, গিন্নির ডাঁশ গোলাপ জামের মত চিবুকটা ছুঁয়ে গলাটা বিরাট খাদে নামিয়ে কত্তা বললেন :

—'যাতে আমি গিয়ে আমার বন্দিনী কন্যেটিকে উদ্ধার করি?'

কত্তার গলায় কী যে ছিল, অমন গেছোগিন্নির মুখখানি হঠাৎ নিচু হয়ে-যায় —অমন বাক্যবাগীশ জিভে কেবল একটিই শব্দ যোগায়:

—'য্যাঃ।'

এক মিনিটের স্তব্ধতা।

তারপরেই গিন্নি টংটরিয়ে ওঠেন—

—'ওই বেল বাজল বলে, এক্ষুনি রমেশরা এসে পড়বে কিন্তু, হ্যাঁ।'
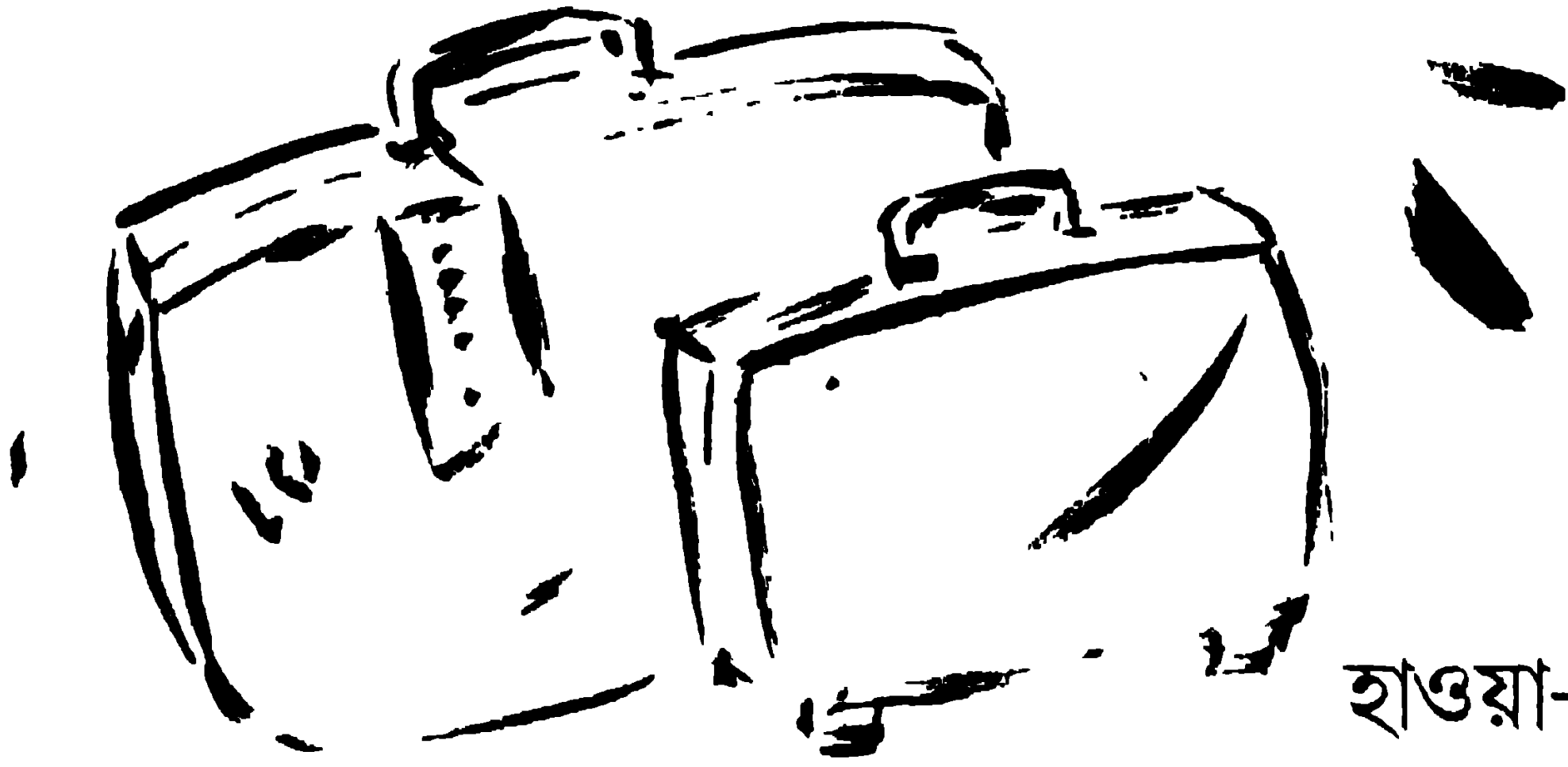
হাওয়া-ই-হিন্দ

বার বার অত যাওয়াই বা কেন, বারবার বাক্সপ্যাঁটরাগুল খোওয়ানই বা কেন? একেবারে কলকাতা থেকে না বেরুলেই তো সবদিক রক্ষা হয়।

এতবড় দুঃসংবাদটা শুয়ে স্বয়ং মামণি যখন এহেন অকরুণ মন্তব্য করলেন তখন চোখের জল বাঁধ মানতে চাইল না। এতদিন ধরে বিদেশ-বিভুঁয়ে তো গুচ্ছের হেলাচ্ছেদ্দা সহ্য করতেই হয়েছে, স্বদেশে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেও কিনা সমবেদনার নমুনা? নিম্নগামী চিরস্রোতা স্নেহেরেই যদি এই চেহারা হয়, তবে অল্পস্বল্প রিপু/টিপু ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎসর্যের কারবার যেখানে আছে, যা নাকি লকলক করে উর্ধ্বগামী বা সর্বত্রগামী, সেইসব সম্পর্কগুলোর তবে কেমনধারা চেহারা হবে? কে জানে।

একটা ব্যাপার একদম নিশ্চিত, যে আবার আমার সুটকেস হারিয়ে গেছে শুনলে এবারে কারুর কোন দুঃখ হবে না, মুখে হয়ত কেউ কেউ বলবে—'ওমা, সত্যি? ঈশ, কি কাণ্ড! চুক-চুক-চুক—এয়ারলাইন্সগুলো আজকাল যা তা হয়েছে—' কিন্তু মনে মনে সকলেই ঐকতানে গাইবে—'বেশ হয়েছে। খুব হয়েছে। যেমন যাওয়া। গেছলে কেন? যাও না, আরও যাও?' —থাক, কাউকে বলে কাজ নেই। খুঁজে এনে তো দিতে পারবে না কেউই। বেশ, আমার ক্ষতি হয়েছে জানিয়ে তোমাদের ওটুকু উপকার করব না আমি। কেনই বা মনের আহ্লাদ বাড়াব আমি তোমাদের? তার চেয়ে, থাক তোমরা মন-গড়া ভাবনা নিয়ে বসে। 'না জানি কত কি ফরেন ইম্পোর্টেড মালপত্তর নিয়ে এসেছ নবনীতা। ঈশশ...গুচ্ছ গুচ্ছ নাইলন শাড়ি, ডজন ডজন টেরিলেন শার্ট...তাড়া তাড়া ব্লু জীনস...থলে থলে লিপস্টিক আর কার্টুন ভর্তি পারফিউম।' ভাবই না তোমরা। দ্যাখই না তোমরা মনশ্চক্ষে—আমার কাঁধের হাতব্যাগের থেকে বেরুচ্ছে গণ্ডা গণ্ডা ক্যামেরা, ক্যালকুলেটর, রেডিও, ক্যাসেট, টেপরেকর্ডার। ইলেকট্রনিক হাতঘড়ি, বোতল বোতল ব্র্যাণ্ডি-হুইস্কি-শ্যামপেন। বেশ। তাই যা হোক। যা ইচ্ছে করে তাই ভেবে নিয়ে কষ্ট পাও তোমরা, যারা হিংসুটে, যারা আমাকে ভালবাস না। আমার যে এদিকে পরনের শাড়িটা

ছাড়া সর্বস্ব চলে গেছে মহারাজা এয়ারওয়েজের খপ্পরে, সেটি ফাঁস করে আমি তোমাদের প্রাণের আরাম আর আত্মার শান্তি বাড়তে দেব না, যাও।

এইরকম নীচস্যনীচ কথাবার্তা ভেবে, মনস্থির করে ফেললুম, শীতল শয়তানের মত এবার নিস্পৃহ থাকব। যে যা বলবে, শুধু তার জবাব দেব। সেধে কাউকেই আমার সুটকেস হারানোর দুঃখটা জানাব না। যে স্নেহময়ী মামণি আমাকে এত ভালবাসেন, আমার জন্যে আলাদা কত কাণ্ড করে বড়ি, আচার তৈরি করে দেন, তাঁরই যখন এরকম অনীহা! মনস্থির করবার খানিকক্ষণ পরেই রুনুদি এলেন। —

'কি রে? কবে ফিরলি? সাতদিন আগেই ফেরবার কথা ছিল না? একবার বিদেশ গেলে আর বাড়ি-টারি ফিরতে ইচ্ছেই করে না বুঝি?'

শুনলুম উত্তরে আমি বলছি—কাতর এবং উত্তেজিত গলায়, 'দেরি হবে না? দেরি কি আর ইচ্ছে করে? ওদিকে আমার সব্বোনাশ হয়ে গেছে যে!'

'কী সর্বনাশ হলো আবার? সুটকেস হারায়নি তো? অ্যাঁ?' হাসতে হাসতে বললেন রুনুদি।

'হ্যাঁ। ঠিক তাই। দুটোই রুনুদি।'

'দুটো মানে?'

'দুটো মানে দুটো সুটকেসই।'

'হারিয়ে গেছে?' মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে তাঁর।

'লণ্ডন টু নিউইয়র্কের মধ্যে।' আমি আরও গম্ভীর।

'প্লেনের ভেতর? দূরদূর। তুমি এসব নিশ্চয়ই বানাও। একই লোকের বারবার এরকম হতে পারে কখনও? নাও বের কর দিকিনি কী কী এনেছ আমাদের জন্যে।'

'তোমাদের জন্যে কী আর আনব ভাই, নিজের পরনের শাড়িটা ছাড়া কিছুই তো সঙ্গে ছিল না—'

'সে তো প্রত্যেকবারই শুনি। যত বাজে কথা। তা, কী করে পাওয়া গেল এ-যাত্রায়? পুজোসংখ্যার জন্য নতুন কোন গল্পটা বানিয়ে আনলে, বল শুনি?'

'যায়নি পাওয়া।'

'যায়নি? অ্যাঁ? সে কি কথা?' মুহূর্তেই রুনুদির মুখ সমব্যথায় ঝুলে পড়ল। নাঃ, সবাই মোটেই হিংসুটে হয় না। এই তো সমব্যথী পাওয়া গেছে।

—'মানে অফিশিয়ালি যায়নি।'

'কী কী ছিল ভিতরে? কাগজপত্তর ছিল কিছু? গয়নাগাঁটি?'

'নাঃ-সেসব ঠিক আছে। ব্রীফকেসটা তো হারায়নি? কাগজপত্তর আমি সর্বদা ব্রীফকেসে রাখি। আর গয়নাগাঁটি তো তেমন পরিই না।'

'তবু ভাল। তা কী কী গেল? কাপড়চোপড়?'

'কাপড়চোপড়, আর ইংলণ্ডে যা যা কিনেছিলুম, সব।'

'কী কী কিনেছিলি?'

'অনেক ঘুরে অনেক খুঁজে কেনা একগাদা ভাল ভাল বই গেল। দালির রেট্রসপেকটিভ এগজিবিশন থেকে কেনা টেট গ্যালারির স্যুভেনির বইটাও গেল। রেয়ার জিনিস। কয়েকটা অফপ্রিন্টও গেল অন্যদের দেওয়া। যাবার সময় প্লেনে কেনা পারফিউমটাও।'

'বই যায় যাকগে। বইপত্তর ঢের পাবি। ভাল কাপড় কী কী খোয়া গেল? পারফিউমটার জন্য কষ্ট হচ্ছে। আহা রে!'

'সেই ব্রাউন টেম্পল শাড়িটা—'

ঈ-শ। সেই টেম্পল-', দুঃখে রুনুদির বাকরোধ হয়।

'এর চেয়ে যদি আমাকেও ওটা দিতিস। আর? আর কী গেল?'

'তিনটে কাঞ্চিপুরম, একটা বাটিক (ফুলশয্যার সেই হলুদ রঙের, সুমনের সই করা শাড়িটা)-একটা বেনারসী, দু'খানা কাশ্মীরি শাল-'

ঈশ-এ-ত! তি-ন তিনটে কাঞ্চিপুরম? কত টাকা লোকসান হলো? বেশ ভালরকম?'

ও কি? একটু একটু করে রুনুদির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যেন? হ্যাঁ, ঠিকই। মুখে স্পষ্টই আহ্লাদ।—

'আর বেনারসী? বেনারসী কোনটা গেল? ব্লু-টা নয়ত? অ্যাঁ? সত্যি? ব্লু-টাই?'— আনন্দে রুনুদির মুখে এরকম এখন আলো ঝলমল করছে। দেখে বুকে যেন ছোরা বসে গেল। ঈশ-রুনুদিও এরকম?

'আর ভেবে কী হবে রুনুদি, চল ওপরে চল-মামণি চমৎকার পাটিসাপ্টা করেছেন—'

'প্রসূনকে একবার বল'— রুনুদি পাটিসাপ্টা দিয়ে চা খেতে খেতে বলেন, 'প্রসূন ঠিক পারবে হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে তোর বাক্স উদ্ধার করে দিতে।'

'প্রসূনকে কি বলিনি নাকি? ওই তো চেষ্টা-চরিত্র চালাচ্ছে যেটুকু সম্ভব! কিন্তু ব্যাপারটা খুব গোলমেলে।'

'তবে কি জগদীশকাকুকে একবার লিখবি? উনি তো ওখানেই রয়েছেন।'

'কত হাতী গেল তল, মশা বলে কত জল? এর ভেতর জগদীশকাকু কী করবেন শুনি? ওখানে থাকলেই বুঝি হল? শুনবে তুমি ব্যাপারটা কদ্দুর গড়িয়েছিল? শুনলে তো আবার বিশ্বাস করতে পারবে না। আবার বলবে— 'এই খালি খালি যতসব গপ্পো বানাস।' কী না করেছি আমি সুটকেস উদ্ধারের জন্য? গোড়া থেকে বলি তবে শোনো।

[কিন্তু আসল ক্ষতিটার কথা তো কাউকে বলতেই পারছি না। মুশকিল সেইখানে। বাক্স-বাক্স করে প্রাণটা বের করে ফেলেছি কেন যে, আসলে তো কাঞ্চিপুরমও নয়, বেনারসী নয়। এ ছটফটানি কিসের জন্য, তা তো কেউ জানেই না। কোনো তালিকায় উল্লেখ নেই সেই হারানো বস্তুটার। উল্লেখ করা যাবেও না। এ হল চোরের মায়ের কান্না।]

২

গণ্ডগোলটা হয়ে গেছে আসলে আগেই। নিউইয়র্কে প্লেন বদল করে লস এঞ্জেলেসে যাব। হাতে ঘণ্টা দুই সময়। লাগেজ কালেক্ট করে কাস্টমস চেকিং করে, অন্য বিলডিংয়ে গিয়ে প্লেন ধরতে হবে। এদিকে লাগেজ আর বেরয় না। প্লেনে এক দাড়িওয়ালা বেহালাবাদকের সঙ্গে ভাব হয়েছিল, সে স্ট্যাটেন আইল্যানডে থাকে, বলেছিল আমাকে লস এঞ্জেলেসের প্লেনে মালপত্তর সুদ্ধু তুলে দেবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কখন যেন সে কেটে পড়ল। আরেক বৃদ্ধ দক্ষিণী, যাবেন মিনেসোটা, তাঁকে ধরলুম। অতবড় দুটো বাক্স নিয়ে অন্য এয়ার টার্মিনালে গিয়ে প্লেন ধরা মুখের কথা নয়। বহুক্ষণ সঙ্গ দিয়ে তিনিও শেষটা মার্জনা চেয়ে চলে গেলেন, নইলে তাঁর প্লেন ধরতে পারতেন না। এখনও আমাদের ফ্লাইটের বেশ কয়েকজনের মাল চাতালে আসেনি। এ কী রে বাবা? এমন তো হয় না? একটি শিখ ছেলে দেখছি ঘুরে ঘুরে যাত্রীদের সহায়তা করছে, হাওয়াই-ই-হিন্দ-এর পোষাকপরা। তাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম— 'ব্যাপার কী? আমার প্লেন যে চলে যাবে? মাল কখন বেরুবে?' —শান্ত হয়ে যুবকটি বলল— 'ক'টায় প্লেন?' টাইমটা শুনে সবিনয়ে জানাল— 'ওটা আপনি মিস করেই ফেলেছেন। এখন ধরবার সময় নেই। তাছাড়া এখানে এখন আপনার কিছু করণীয় কাজকর্মও আছে। আপনি কি ভিক্টোরিয়া বাস টার্মিনাসে মাল জমা দিয়েছিলেন?'

ছেলেটি কি হাত গুনতে পারে? জানল কেমন করে? 'আজ্ঞে ঠিক তাই। কি করে বুঝলেন?'

'তাহলে আপনার মালপত্র আসেনি। ওইখানে কমপ্লেন কাউন্টার খোলা হয়েছে। যান, ফর্ম ফিল আপ করুন আগে। তারপরেই নতুন ফ্লাইট বুক করতে ছুটবেন, মনে করে।'

আমাদের এই ফ্লাইটের মালের গোলমালের জন্যে বিশেষ কাউন্টারে ফর্ম দিচ্ছেন শাড়ি ব্লাউজ পরা একটি প্লাস্টিকের তৈরি ভারতীয় নারী। খুব গম্ভীর। একটু রুক্ষ। অথচ কী রংচং কী সাজসজ্জা। ক্ষণে ক্ষণে বেঁটে চুল ঝামরে তুলছেন কপাল থেকে ওপরে। যারাই বাসে হিথরো এসেছিলেন, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে মাল চেক ইন করে, তাদের কারুরই মাল আসেনি। কিন্তু থেকে-যাওয়া মালগুলির তালিকা ও রসিদ নম্বর এসে গেছে টেলেক্সে। ছাপান ফর্মে হারানো মালের জন্যে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে। যাতে মাল লোকেট করা সহজ হয়। আমি একা নই। এক সারি যাত্রী কিউ দিয়ে ফর্ম ভর্তি করছেন। এক ফরাসী দম্পতিও তাঁদের শিকাগো ফ্লাইট মিস করে ছটফট করছেন। ছুটে ছুটে যাচ্ছেন অন্য লোকদের মালপত্রের দিকে। আর ফিরে আসছেন কাঁদো কাঁদো মুখে। আমার দুটি মালের একটি টেলেক্স তালিকায় আছে। অন্যটির নো-পাত্তা। এটা কোনটা অবশ্য জানি না। কালো ছোটটা না বড় বাদামীটা। কালটা পার্থ'র। [বাদামীটাই আমার] মাত্র একটা বাক্স এনেছি অথচ দুটি নিয়ে যাওয়া যায়। ফ্রম দি ইউ.এস.এ এবং টু দি ইউ এস এ মাল আজকাল ওজন হয় না কেবল গুনতি হয়। টু প্লাস ওয়ান। পিস কনসেপ্ট।

না ভিয়েৎনামের পিস নয়, মালপত্রের মাথাগুনতি অন্যের বাক্সপ্যাটরা নিয়ে যেতে অসুবিধা নেই। এভাবেই গতবারে অঞ্জলিদির বাক্সটা নিয়ে গিয়েছিলাম। এবারে পার্থর'টা নিয়ে যাচ্ছি ইংলন্ড থেকে ভায়া আমেরিকা, কলকাতায় কিন্তু টেলেক্সে যেটার নম্বর নেই, সেটার জন্যে আমাকে আলাদা করে কমপ্লেন্ট ফর্ম ভরতে হল— ও কমপ্লেন করা যে-সে লোকের সাধ্য নয়। ওই ফর্ম দেখেই লোকে বলবে, 'থাক আমার বাক্সে দরকার নেই।' এমনিই জটিল। গোলমেলে। তার জন্য আলাদা এলেম থাকা চাই। —প্রথমে ৫/৬ রকমের সুটকেসের নকশা দেখান হলো। ১০/১২ রকমের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপগুণ চরিত্র চিত্রণের বর্ণনা পড়ানো হল। এবার বল কোনটি তোমার? রূপগত বৈশিষ্ট্য, গুণগত পার্থক্য? বিশেষ চিহ্ন? তিল-জড়ুল? আমার যা বেমালুম স্বভাব। প্রত্যেকটা বর্ণনাই মনে হয়— 'ঠিক এইরকম আমারটাও।' কে আর কবে মাল-বিশারদ হবার জন্যে সুটকেসের রূপগুণ মুখস্থ করে রাখে? নিজেরটা যদিও বা জানি, পার্থ'রটা তো ভাল করে দেখিওনি। তার গুণাগুণ কিছুই মনে নেই, কাল, জিকাওলা, এবং আমারটার চেয়ে ছোট, এটুকু ছাড়া। তার পাশের স্ট্র্যাপ আছে, কি নেই? থাকলে এদিকে, না ওদিকে? হাতলটা চ্যাপ্টা? না গোলালো? প্লেন? না কিরকিরে? সাইডপকেট আছে কি? কটা? তাতে জিপ? না বোতাম? চাকা লাগানো? চাকা একজোড়া, না দু জোড়া? 'এ কি আমার পাত্রী পছন্দ করছি নাকি? এত খবর কে রাখে?' অমনি প্লাস্টিকের মহিলা এক ধমক লাগান— 'নিজের বাক্স নিজেই জানেন না কেমন দেখতে, তো আমরাই বা জানব কী করে কোনটি আপনার?'

'আমার একটা বাক্সের রসিদ নম্বর তালিকায় নেই কেন?'

'আমি জানব কেমন করে? আমিই কি টেলেক্সটা পাঠাচ্ছিলাম লণ্ডন থেকে?'

'বাক্সটার কি হবে এখন?'

'সেটাই বা আমি জানব কোত্থেকে? আমার কাজ তো কেবল ফর্ম জমা নেওয়া। আচ্ছা জ্বালাতন করলে তো এরা? যত বাজে কথা।'

'কিন্তু, আমার বাক্স—'

'হায়ার অফিসারদের বল গে যা। এই দ্যাখ নাম ছাপানো আছে। এই ফোন নম্বর। এখন যা, ভাগ। নে, সইটা কর। সই করে যা।'

কে বলেছে ইংরেজিতে 'তুই' সম্বোধন নেই? ইনি যে ইংরিজিতে 'তুই' বলছিলেন, তা যে-কোন ভারতীয়ই অনায়াসে বুঝতে পারত। ভয়ে ভয়ে দুটো ছবিতে 'যা থাকে কপালে' বলে টিক মার্ক দিয়ে ফর্ম সই করে দিলুম। ছোট্ট ছোট্ট চৌকো চৌকো অনেক খুপরি। ঠিক গ্রাফপেপারের মতন। ঢ্যাড়া আর টিক দিয়ে খসখস করে আধ মিনিটে ভর্তি করে দিচ্ছে মেয়েটাই। আমি তো ভাল করে পড়তেই পারছি না। চশমাটা ফিরে গিয়েই বদলাতে হবে। বড্ড খুদে হরফে লেখা। ফর্ম ভরতি করতেই ঘন্টা উৎরে গেল।

৩

ফর্ম ভর্তি শেষ হতেই আমি কাঁদুনি শুরু করি। 'অ মা-জননী, আমার লস এঞ্জেলেস যাবার কী হবে? বাক্সপ্যাঁটরা সব তো গেল, কানেকটিং ফ্লাইটও মিস হয়ে গেছে-নেক্সট ফ্লাইটটা আমাকে ধরিয়ে দাও?'

মা-জননী খিঁচিয়ে ওঠেন— 'আমাকে এসব বলে কী হবে? এটা কি ফ্লাইট বুকিংয়ের কাউন্টার, মাথায় কিছু ঢোকে না দেখছি।'

'কোথায় যেতে হয় তাহলে?'

'কেন. ঐ তো সামনেই আর একটা কাউন্টার রয়েছে।'

'অ মশাই'— নতুন কাউন্টারে গিয়ে শুরু করতেই তিনি বলেন-'এ কাউন্টার বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরের কাউন্টারে গিয়ে বলুন যা বলার।' এবার বেরিয়ে যাচ্ছি-অমনি কাস্টমসের লোকটি আটকায় 'বাক্স কই? ক্লিয়ারেন্স হয়েছে?'

'বাক্স? অল ক্লিয়ার ভাই। বাক্সই আসেনি। আমি এখন ট্র্যাভেলিং লাইট।'

'অঃ। যান। আর কিন্তু ঢুকতে পাবেন না।'

'ঢুকবার দরকারও নেই।'

স্মার্টলি চলে যাই। কাস্টমসের এত সহজ ক্লিয়ারেন্স জীবনে হয়নি। বেরুচ্ছি, পেছন থেকে হঠাৎ কে বলল 'বুকিং হয়ে গেছে তো?' সেই শিখ ছেলেটা।

'না, এই যাচ্ছি।'

'যান. যান. শিগগিরি— ওকি বাইরে কেন, এখানেই হল না?'

'বন্ধ হয়ে গেছে।'

বাইরের কাউন্টারে কিউ। আমার টার্ন আর আসে না।

'অ মশাই, শুনছেন? আমি অমুক ফ্লাইটে লণ্ডন থেকে এসেছি. আমার তমুক ফ্লাইটে লস এঞ্জেলেস যাবার কথা আবার লাগেজ আসেনি বলে ওয়েট • তে করতে ফ্লাইট মিস করে গেছি, —দয়া কবে একটু—'

'ভেতরের কাউন্টার। ভেতরের কাউন্টার।'

'ওটা বন্ধ।'

'বন্ধ নয়। বন্ধ নয়। খোলা।'

'ওরাই পাঠিয়ে দিলে এখানে।'

'হতে পারে না। আবার যান। এখানে হবে না। নেক্সট প্লীজ?'

যেদিক দিয়ে বেরিয়েছিলুম সে দরজা দিয়ে ঢোকা যাবে না। যেদিক দিয়ে ঢুকতে হবে, তাতে প্রচুর ঘুরতে হয়। ঘুরে ঘুরে যখন ঢুকলুম, ভেতরের কাউন্টারটাতে যেতে হবে আবার সেই কাস্টমসের দরওয়ানটিকে পেরুতে হবে। সে আটকে দিল।

'আবার কোথায় যাচ্ছেন?'

'টিকিট বুকিং করতে'—

'এই যে গেছলেন বুকিং করতে'—

'ওখানে হলো না'—

'এখন ঢোকা অসম্ভব— একবার বেরুলে—'

'তাহলে কী করব? ওরা বলছে ভেতরে যাও, আপনারা বলছেন বাইরে যেতে আমি কী করি মশাই, পাগলা হয়ে যাব যে— কেন যে মরতে'...

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, যান তবে পাসপোর্টটা রেখে যান।'

পাসপোর্ট রেখে ফের 'বন্ধ' কাউন্টারে দৌড়ই। কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ ভেতরে দাঁড়িয়ে অবসর বিনোদন করছেন। গল্পসল্পের আমেজ, তাকালেই বোঝা যাচ্ছে।

'এক্সকিউজ মি, আমার লস এঞ্জেলেসের'...একসঙ্গে তিনজন হাওয়া-ই-হিন্দের উর্দিপরা স্ত্রী-পুরুষ আমাকে মারতে উঠলেন। —'ইংরেজি বোঝেন না নাকি? তখন থেকে এক কথা বলে বিরক্ত করছেন। বলছি না এ কাউন্টার বন্ধ? বাইরের কাউন্টারে যান?'

'ওরা বলল করবে না। ভেতরে পাঠিয়ে দিল। কেউ একজন প্লীজ করে দিন?'

'দেখেছ, দেখেছ, কী বদ? ইচ্ছে করেই ভেতরে ফেরৎ পাঠিয়েছে। দেখি কেমন করে কাজটা না করে? হবে না। যান। বাইরে যান। এটা বন্ধ। আচ্ছা, এটাকে ঢুকতেই বা দিল কী করে? আশ্চর্য তো? ইনএফিশিয়েন্সির চূড়ান্ত হয়েছে! শুনুন! উই আর ক্লোজ। প্লীজ গো এলসহোয়্যার। আণ্ডারস্টুড?'

'হোয়্যার এলস?'

'টু দি আউটসাইড কাউন্টার। অ্যাজ উই হ্যাভ অলরেডি টোলড সেভারেল টাইমস।' —এবারে একটি স্বাস্থ্যবান লোক দাঁতে-দাঁত দিয়ে এমনভাবে শান্ত সুরে কেটে কেটে কথা বলল, যে রীতিমত মর্ম মর্মে ভয় করল। হিন্দি ছবির ভিলেনরা এভাবে শান্ত হয়ে কথা বলবার পরেই ঘুষি মারে।

পাসপোর্ট ফেরৎ দিতে গিয়ে পুলিশটা হাসল।

'ডান? নট ইয়েট? গুড লাক নেক্সট টাইম।'

৪

আবার সেই কিউ।

এবার কিউ ভেঙে গোড়ায় গিয়ে রেগেমেগে বলি: 'ওরা বন্ধ। মিছিমিছি আমাকে দৌড় করালেন। লস এঞ্জেলেসের নেক্সট ফ্লাইটটা—'

'ট্র্যাভেলার্স লজ। ট্র্যাভেলার্স লজে চলে যান, আপনাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিন। কাছেই। কাল সকাল ৮টায় আসবেন। প্রচুর ফ্লাইট আছে।'

'কী? কোথায় যাব?'

'ট্র্যাভেলার্স লজ মোটেল। খুব কাছেই।'

'ইয়ার্কি পেয়েছেন? আপনাদের দোষে একটা মালপত্র নেই. কানেকটিং ফ্লাইট নেই, লস এঞ্জেলেসে আমার বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করে গেলাম— এখন থাকব

গিয়ে মোটেলে?'

'খরচা আপনার নয়। চলে যান। একটু রেস্ট করুন। কাল সকালে—'

'খরচা যারই হক। আমি সিধে মোটরে চেপে লনডন থেকে এলুম? হাওয়া-ই-হিন্দ কি মোটরগাড়ির টিকিট বেচেছিল? কিসের জন্যে মোটেলে যাব? ভদ্র এয়ারলাইনস এরকম অবস্থায় পড়লে ফাইভস্টার হোটেলে তোলে, শেরাটন-হিলটনে তোলে—'

'যান না আপনি শেরাটন-হিলটনে। নিজের পয়সায়। কে বারণ করছে—'

'কেন যাব? নিজের পয়সাতে তো সোজা লস এঞ্জেলেস যাচ্ছি— দয়া করে এক্ষুনি কানেকশনটা বুক করে দিন— এটা আপনার আবশ্যিক দায়িত্ব।'

'বুকিং দিন বললেই বুকিং দেয়া যায় না। এখন ইউনাইটেডে কোনো ফ্লাইট নেই'।

'না থাক। আমেরিকানে দেখুন। টি ডবলু এ দেখুন— হাজারটা এয়ারলাইনস আছে'..

'হাজারটা আর দু-হাজারটা যাই থাক, তাতে বুকিং নেই আপনার।'

'দোষটা আপনাদের। বুকিং চেঞ্জ করে দিন অন্য এয়ারলাইসে।'

'যা হয় না-তা'—

'একশবার হয়।'

'জায়গা নেই।'

'কে বলল? জায়গা করে দিতে হবে।'

'জায়গা হবে না।'

'দেখুন বাজে কথা বলছেন কেন? আমি তো দেখতেই পাচ্ছি আপনি খোঁজই নিচ্ছেন না। কানেকশন দেবার দায়িত্ব আপনার। আজ আপনাদের দোষই আমি এখানে স্ট্যানডেড হয়ে গেছি।'

'দোষের ব্যাপার নয়। স্ট্র্যানডেড হবার দায়িত্ব আপনারও যতটা, আমাদেরও ততটা। কাউকে ব্লেম করা বৃথা।'

'আমার দায়িত্ব কি রকম? হ্যাঁ, একটা অবশ্য দায়িত্ব আছে, ভুল করে হাওয়া-ই-হিন্দে এসেছি। মোটেলে আমি যাব না। একটা ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে নিয়ে চলুন। এবং ওভারনাইট থাকার ক্ষতিপূরণটা দিয়ে দিন।'

'কিসের ক্ষতিপূরণ?'

'আমি নিয়ম জানি না ভেবেছেন? রাত্রিবাস বাথরুমের স্লিপার, মাজন-সাবান-বুরুশ ইত্যাদি, তোয়ালে, সোয়েটার, একপ্রস্থ বিজনেস স্যুট— সবকিছুই আপনাদের দেবার কথা। এক্ষুনি। কই, দিন?'

[এরা যে লং ট্র্যাভেলে সত্যি বেরোয় কি করে? হাতে একটা ওভারনাইট কেসও রাখেনি?] 'কি? এখন চাইছেনটা কী?' 'সাম ডো?' মালকড়ি? জেনে রাখুন এখন ওসব হবে না। কাল সকালে অ্যাকাউন্টস ওপন করলে আসবেন। অন্য লোকে ওসব ব্যাপার

দ্যাখে। আমি না। কিন্তু কাল আপনাকে স্যুটকেসই দিয়ে দিচ্ছি আমরা।'

'ওসব লম্বা বাক্য ছাড়ুন। আমি সব নিয়ম জানি। ক্ষতিপূরণ হাতে হাতে দেবার কথা। আগেও আমার বাক্স কি হারায়নি নাকি? সাত বছর আগে আমেরিকান এয়ারলাইনস ইন্টারনাল ট্রাভেলেই পঁচিশ দিয়েছিল, রাত বারোটার সময়। এখন, ইন্টারন্যাশনালে রাত নটায় কেন দেবেন না শুনি? অন্তত পঞ্চাশ তো নিশ্চয়ই হয়েছে— ক্ষতিপূরণের নতুন অঙ্কটা সাত বছরে বেড়েছে নিশ্চয়?'

'ডলার কি গাছে ফলে ম্যাডাম? আর হাসাবেন না। যান, ট্র্যাভেলার্স লজে চলে যান—'

'একটা সস্তা স্লিপিং স্যুট বারো, সস্তা হাউসকোট আঠারো, চটি-পাঁচ ছয়, সস্তা মাজন সাবান বুরুশ চিরুনি-চার, আণ্ডার গারমেন্টসের চেঞ্জ এক সেট আঠারো, তোয়ালে প্রভৃতি দশ, বিজনেসস্যুট বাদই দিচ্ছি-কত হল? ষাট-সত্তর? তাও তো অন দ্য স্পট মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টসের তালিকা এতেই শেষ হয়নি— আর আছে—'

'কেন বাজে বকছেন? অ্যাকাউন্টস বন্ধ হয়ে গেছে। শুনলেন না?'

'এটা অন্য অ্যাকাউন্ট। এত লোকের ব্যাগেজ আসেনি, একটা নতুন কাউন্টারই খুললেন, অ্যাকাউন্টেরও নিশ্চয় নতুন কাউন্টার খোলা হয়েছে। টাকা আমি চাই না, জিনিসপত্তরগুলো কিনে দিন। আর এগুলো রাখবার জন্যে একটা ওভারনাইট কেস। তিরিশ। এই ধরুন একশো মতন লাগবে।' ভদ্রলোক প্যান্টের দুই পকেটে হাত ভরে, পাইপটা কামড়ে দাঁতের ফাঁকে হেসে বললেন, 'ম্যাডাম, ইউ আর ওয়েস্টিং মাই টাইম। নট আ সেন্ট। নট আ ফার্দিং। আই ক্যান গিভ ইউ নাথিং। চাপ দিয়ে লাভ নেই। হাওয়া ই-হিন্দ আপনাকে কিছুই কিনে দিতে বাধ্য নয়।' তারপর পাইপ সরিয়ে বলেন, 'চলে যান, মোটেলেই তোয়ালে সাবান দেবে। বাকীগুলো ছাড়া এক রাত্রি দিব্যি চলে যায়। অ্যাটাচড শাওয়ার। হাউসকোট দিয়ে কী হবে? আর আমার তো শার্ট প্যান্ট পরেই দিব্যি ঘুম হয়। শাড়ি তো আর কমফরটেবল গারমেন্টস।'

'আপনিই বরং এবার থেকে শাড়ি পরে কমফর্টেবলি ঘুমোবেন। —আমি এক্ষুনি লস এঞ্জেলেস চলে যেতে চাই, কানেকশনটা করে দিন। দেখি, বরং সেখানে গিয়ে যোগাড় করব ক্ষতিপূরণ।'

'কানেকশন নেই। আর দেরি করলে ট্র্যাভেলার্স লজেও বুকিং পাবেন না।'

'ঐ এ-বি-সি গাইডটা একটু দেখি তো?'

'নট ফর দ্য প্যাসেঁনজারস। স্যরি।'

'নিজেও কানেকশন দেবেন না? আমাকেও খুঁজতে দেবেন না? যত দেরি করছেন— তত ওদিকে রাত বেড়ে যাচ্ছে না?'

'না। ওটা পশ্চিম। ওখানে দেরিতে রাত হয়।'

ভদ্রলোক কাজে মন দেন।

নাঃ, আর 'আয়রন উওম্যান' ইমেজ থাকছে না। এবার আমি কাতর হয়ে পড়েছি

মনে মনে।

'কেন মিছিমিছি এত ঝামেলা করছেন ভাই, বলুন তো? লং জার্নি করে এসেছি, বাক্সটাক্স হারিয়ে গেছে, সামনে আরেকটা লং জার্নি, কেন বাজে ঝুট-ঝামেলা করছেন? দিন মশাই, কানেকশনটা করে দিন-', ঠিক তক্ষুনি, 'একি! আপনি এখনও এইখানে?' একটি বিস্ময়বিদীর্ণ ধ্বনি কানের কাছে বাজল।

৫

সেই শিখ ছেলেটি।

কেনেডি এয়ারপোর্টের এই ট্র্যাজিডিতে যে বারবার ভগবদ-প্রেরিত দূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে।

'এখানে কী করছেন? লস এঞ্জেলেসের প্লেন যে সব বেরিয়ে গেল— আর দেরি করলে আজ যেতেই পারবেন না— ঈশ! চলুন চলুন, দেখি সাড়ে নটা নাগাদ একটা ফ্লাইট আছে বোধ হয়-কিন্তু আমেরিকানের না ইউনাইটেডের ঠিক মনে পড়ছে না—', কথা বলতে বলতেই, সামনের টেলিফোনের সুরেলা বোতামগুল টিপতে থাকে ছেলেটা— 'হ্যালো, ইউনাইটেড?' দু-চারটে কথা হয়, তারপরেই প্রচণ্ড একটা তাড়া পড়ে যায় আমাকে ঘিরে— ঠাৎ হাত থেকে ব্রীফকেসটা ছিনিয়ে নিয়েই ছেলেটা দৌড়ুতে থাকে। আমাকেও প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে— 'ছুট ছুট ছুট-সময় নেই একটুও— আমাদের অন্য টার্মিনালে যেতে হবে— পথে ট্যাক্সি ধরতে হবে—' বলতে বলতে সে আগে আগে ছোটে, পেছন পেছন কোঁচা ধরে হাইহিল খটখটিয়ে অত্যন্ত হাস্যকরভাবে আমিও ছুটি, চেঁচাতে চেঁচাতে।

'কিন্তু আমার কাছে যে ফরেন এক্সচেঞ্জ নেই— আগে ব্যাংকে আগে ব্যাংকে...।'

'ব্যাংক পরে হবে— আগে প্লেন—'

কেনেডি এয়ারপোর্টের সব চোখ মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায় এই অপরূপ শোভাময় যাত্রার দিকে। ছুটে বাইরে বেরিয়েই যে-কোন একখানা লিমুজিন থামিয়ে চট করে ছেলেটা দোর খুলে আমাকে ঠেলে ভেতরে পুরে দেয়, নিজেও ঢুকে প্রায় আমার কোলের ওপর বসে পড়ে শোফারকে বলে— 'ইউনাইটেড, জলদি'— লিমুজিনটায় অন্য কোনও একটা এয়ারলাইনের নাম ছিল। শোফার হাসতে থাকে। পিছনের সিটে বসা তার যাত্রীরাও। ছেলেটার কানে হাসি-টাসি ঢুকছে না। উদগ্রীব হয়ে বসে আছে আমার ব্রীফকেসটা বগলে চেপে। 'টিকিট শেষ করুন, টিকিট'-বলতে বলতে ইউনাইটেডের বাড়ি এসে যায়। নেমে, একগাল দেঁতো হেসে লিমুজিনওলাকে ধন্যবাদ দিয়েই সে আমাকে নিয়ে দৌড়ে ভেতরে ঢোকে— 'সোজা এই পথে দৌড়ে যান, অমুক নম্বর গেটে দিয়ে টিকিটটা দেখান, আমি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে আসছি— এই নিন ব্রীফকেসটা—।'

আমার মুখের অবস্থা দেখে তার কী মনে হয়, পিঠে হাতটা রেখে, মিষ্টি হেসে

বলে— 'সব ঠিক হো জায়গা। ডরনেকা কুছ নহী হ্যায়-আইল বি ব্যাক ইন আ মিনিট—।'

কান্নার স্বভাব কুকুর জাতীয়।

প্রশ্রয় পেলেই কান্না চোখের মাথায় চড়ে বসে।

ছুটলুম অমুক নম্বর গেটের দিকে।

বাপ রে বাপ। এয়ারপোর্ট বটে একটা। এক একটি টার্মিনালই এক একটা নেতাজী স্টেডিয়াম। এক গেট থেকে আরেক গেটে যাওয়া মানে নেতাজী স্টেডিয়ামের এপাশ থেকে ওপাশ অবধি দৌড়ে পার হওয়া। বুড়োমানুষ হলে কী করতুম কে জানে?

হাঁপাতে হাঁপাতে যাকে টিকিট দেখালুম, সে হেসে বললে— 'রিল্যাক্স। সীট খালি নেই। ওয়েটিংয়ে রাখছি তোমাকে। কেউ যদি নো শো হয় তখন যেতে পারবে।'

বসে আছি তো বসেই আছি।

এত তাড়াহুড়ো করে এসে কী লাভ হল? প্লেনও বসে আছে। একে একে অন্য অন্য জায়গার প্লেনগুলো ছেড়ে দিল। ঘর এখন প্রায় খালি। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করি— কিছু হল?

সে হাসিমুখে বলে— এখন না।

পাগড়ীর চিহ্ন নেই।

বুঝতেই পারি, পালিয়েছে। আমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যখন দেখেছে হল না, তখন লজ্জায় পালিয়েছে। এসে করবেই বা কী সে? জায়গা তো হল না। এখন আমি কোথায় যাব? ব্যাংকে। টাকা ভাঙাব। ব্যাংক কি খোলা? তারপর ট্র্যাভেলার্স লজে? নাকি বন্ধুবান্ধবদের ফোন করে দেখব, কে কে আছে। এইটে সামারের মুশকিল, কেউই থাকে না শহরে।

এবার এঞ্জেলেসের ফ্লাইট ঘোষিত হল। ডাক শুরু।

হল না। আমার যাওয়া হল না আজ। এটাই নিউইয়র্ক থেকে শেষ প্লেন। শিখ ছেলেটাও কেটে পড়ল? 'ম্যানেজারের ঘরে যাচ্ছি' বলে চলে গেল। এটাতেই বড় বেশি মর্মাহত লাগছে। কেননা মুহূর্তের জন্যে ওকে মনে হয়েছিল, আমার স্বজন। মানুষ সত্যি আজকাল বড্ড সামান্য হয়ে গেছে, বড় তুচ্ছ।

এসে বলে তো যেতে পারত, 'স্যরি পারলুম না?' আসলে কেউ কারুর জন্যে কেয়ার করে না। জগৎটাই এইরকম হয়ে গেছে। সবাই এক। ক্যালাস। স্বার্থ না থাকলে, কিছু করে না। হেনকালে এ কী হেরি?

ছুটন্ত একটি পাগড়ি। হাসিমুখে হাত নাড়ছে। সোজা কাউন্টারে গিয়ে কিছু বলল, তারপর আমার কাছে এসে আবার বলা নেই, কওয়া নেই, ব্রীফকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, 'ভেরি স্যরি। কিছুতেই ব্যবস্থা করা যাচ্ছিল না। ফুললি বুকড— অবশেষে পেরেছি। যাক বাবা, লাস্ট ফ্লাইট ফ্রম নিউইয়র্ক আজ এটাই—।' ততক্ষণে আহ্লাদে ছেলেটাকে জাপ্টে ধরেছি আমি।

'আরে আরে করেন কি! করেন কি!'

তুমি কী করেছ, তা মুখে তো বলতে পারলুম না। আরেকটু হলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিল আমার। লাস্ট ফ্লাইট ফ্রম নিউইয়র্কই তো কেবল নয়, আরেকটাও খুব জরুরি ফ্লাইট ধরিয়ে দিয়েছ যে ভাই! যার গন্তব্য সুদূর বিস্তার, অনেক গভীরে, অন্তর্লীন ভবিষ্যতের মধ্যে সেই যাত্রা। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ।

'আপনাকে কেঁউ নিতে আসবে তো?'

'এসেছিল নিশ্চয়। আমার তিন বোন। ফিরেও গেছে নিশ্চয়।'

'তবে? এখন কী করা? পয়সা ভাঙানরও তো আর সময় নেই। এটা তো আবার পৌঁছবে গিয়ে ইন্টারনাল টার্মিনাসে, সেখানে ব্যাংক খোলা না থাকতেও পারে।' সত্যি সত্যি চিন্তিত দেখায় তার তরুণ মুখ।

'এঞ্জেলেসে নেমে বাড়িতে ফোন করতে হলেও তো পয়সা চাই', পকেট থেকে একমুঠো খুচরো বের করে সে আমার হাতের মুঠোতে গুঁজে দিতে চায়-'এগুলো রেখে দিন—'

'কি মুশকিল আমার দরকার নেই—।'

'যদি নেমে ফরেন কারেন্সি ভাঙাতে না পারেন? যাচ্ছেন মধ্যরাতে। ব্যাংক বন্ধই হয়ে যাবে ততক্ষণে। এটা তো ইন্টারন্যাশনালে যাচ্ছে না— অত রাত্রে ট্যাক্সি করে একা মেয়েদের যাওয়াটাও লস এঞ্জেলেসে খুব নিরাপদ নয়। কেউ যদি নিতে আসত।'

'তুমিই একটা ফোন করে দাও না ভাই আমার বোনকে?'

'গ্রেট! সেই-ই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। তিনঘন্টার মধ্যে নিশ্চয় খবরটা দিয়ে দিতে পারব। দেখি নম্বরটা।' ফোন নম্বরটা হাতের পাতায় লিখে নিতে নিতে চোখ তুলে ছেলেটি বলে— 'ডোন্ট ওয়ারি, যদি ফোনে আপনার বোনেদের নাও পাই, তবুও সামবডি উইল বি দেয়ার। আপনার নম্বরটা না পেলে আমার কাকাকেই বলে দেব-কাকা-কাকীও লস এঞ্জেলেসে থাকে— নামটা ডাক্টর দেও সেন তো? সামবডি উইল টেক চার্জ অফ ইউ দেয়ার অ্যাট দি এয়ারপোর্ট।' ধবধবে হাসে ছেলেটা— সিকিউরিটির দবজায় ঢুকতে ঢুকতে ওর হাত থেকে ব্রীফকেসটা নিই— শেষ মুহূর্তে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি— 'তোমার নাম কী ভাইয়া?'

'বেদী। বেদী ইন দি এয়ার ট্রাফিক...'

৬

নেমে দেখি ভগ্নীদ্বয় খেপে লাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে আবার খুদে ভগ্নীটি, রিনিও হাজির। নামবামাত্র প্রথম বাক্য—

'প্রত্যেকবার? প্রত্যেকবার স্যুটকেস হারিয়ে আসবে? ফ্যান্টাস্টিক!'

'ইচ্ছে করে হারিয়েছি নাকি? কিন্তু তোরা জানলি কী করে?'

'একমাত্র তোমারই অনবরত এমন হয়। এত লোকে তো আসে, কারুর তো হারাচ্ছে না?'

'কেন? প্রসূনেরও তো হারিয়েছিল?'

'সেও তোমার মহারানী এয়ারওজেরই দৌলতে।'

'পেয়ে তো গেছল শেষপর্যন্ত। অনেক ঝঞ্ঝাট করে।'

'তুমিও তো পাও শেষ অবধি। আমসত্ত্ব-টত্ত্ব সবসুদ্ধুই। কিন্তু বেডানর মেজাজটা মাটি।'

'দুটোই গেছে রে এবার। দুটো বাক্স ছিল।'

'আমাদের আমসত্ত্ব ছিল?'

'ছিল।'

'বেদী বলে একটা লোক ফোন করেছিল নিউইয়র্ক এয়ারপোর্ট থেকে— বলল, তোমার বাক্স আসেনি বলে পর পর প্লেন মিস করেছ। জার্নি ডিলেইড— এই ফ্লাইটে আসছ, সঙ্গে ফরেন এক্সচেঞ্জ নেই— লোকটাকে বেশ ভালমানুষ বলে মনে হল— অতি অবিশ্যি এয়ারপোর্টে থাকতে বলল কাউকে।'

'এত কথা বলেছে ছেলেটা?'

'আরও বলে দিল তোমার কাছে কমপ্লেন্ট-ফর্মে নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর সব দেওয়া আছে, নিউইয়র্কের হাওয়া-ই-হিন্দের অফিসে টেলিফোন করতে হবে— কলেক্ট কল করলে পয়সা লাগবে না, ফোনে খোঁজ নিতে হবে বাক্সের কী হল। এল কিনা।'

'আশ্চর্য তো। ছেলেটা কটা মিনিটই বা দেখেছে আমাকে?'

'তারই ভেতর বুঝে নিয়েছে তুমি কী অপরূপা বস্তু। বয়স কত?'

'কার?'

'তোমারটা জানি। সেই বেদি ব্যক্তিটির?'

'কত আর? তোদের থেকেও ছোট, খুবই ছেলেমানুষ—'

'তাই এখনও এতটা ফর্মে আছে আর কি।'

'কিন্তু আরেকটাও লোক ছিল, বুঝলি? অতি পাজী, সে না—?'

'বয়েস কত?'

'এই পঁয়তাল্লিশ?'

'ওটা পেজোমিরই বয়েস, দিদি!'

সকালে উঠেই খুকু বলল, 'দাও কমপ্লেন্ট ফর্মটা আর টিকিটটা। আগে কয়েকটা জেরক্স কপি করে নিই। এক্ষুনি তো দু একটা হারিয়ে ফেলবে। তাহলেই সব গেল। মালের রসিদ দুটো আছে? তারও জেরক্স কপি করানো দরকার।'

রুঙ্কু বলল, 'দুখানা বাক্সই হারিয়ে এলে? নাঃ, তোমার সত্যি এলেম আছে। চল, কিছু দরকারী জিনিসপত্তর কিনে দি তোমাকে যা যা লাগে। এবারে আর অক্সফ্যামে বা স্যালভেশন আর্মিতে নয়, ভাল দোকানে চল।

জমানা বদল গয়া। গতবারে যখন বাক্স হারাল, তখন ওরা ছোট। ছাত্র। কিছু পয়সাকড়ি নেই। আর এখন? মান্যগণ্য ভদ্রলোক। চাকরি বাকরি করছে, রোজগারপাতিও মন্দ নয়— সারি সারি ফুলন্ত ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার বীথিতে ছবির মতন লাল টুকটুকে বাংলো বাড়িটি নিজেদের পয়সায় কেনা। তাতে সিল্কের রুমালের মতন সবুজ একটুকরো ঘাসজমি পাতা, শ্যাওলামাখা পাথরের ফোয়ারা আঁটা। গ্যারাজে আবার দু দুখানা গাড়ি। অবশ্য মনীষার কাকুর মতন এখনও নয়। মনীষার কাকুর একটা গাড়ি বাইরে পড়ে থাকে। মনীষা বললো, 'কাকু, সাদা গাড়িটা বাইরে কেন?'

'গ্যারাজে যে জায়গা নেই রে।'

'কেন? কী ভরেছ গ্যারাজে?'

'আবার কী? দামী গাড়িগুলো।'

'চেহারা দেখে ওটাও তো বেশ দামী গাড়ি বলেই মনে হচ্ছে। অমন লম্বা ফিনফিনে দেহ, আবার কনভার্টিবল ছাদ— কী গাড়ি ওটা?'

'ওটা? ক্যাডি।'

'অ্যাঁ? ক্যাডিলাক হচ্ছে গিয়ে তোমার সস্তা গাড়ি? অন্যগুলো তবে কী কী?'

'একটা মার্সিডিস; অন্যটা', একটু লজ্জা পেয়ে কাকু বলেন, 'রোলস।' এখন তাঁদের হল গিয়ে 'ভ্যানডারবিলট' জীনসের কোম্পানিতে হংকং থেকে মাল সাপ্লাই-এর ব্যবসা। লণ্ডন-নিউইয়র্ক-প্যারিস।

আমার বোনেরা এখনও অতটা এগয়নি। একজন মাস্টারি, আরেকজন এঞ্জিনিয়ারিং করে। ছোটটার পড়াশুনো শেষ হয়নি। এখন, ওরা তো বলল দোকানে চল। কিন্তু আমি বললুম, 'এক্ষুনি কী হবে কিনে? আজকাল তো সবাই সব সাইজ পরে। তোদের জামাকাপড়েই কদিন চালিয়ে দিই। ততদিনে পেয়ে যাব বাক্সটাও।'

'তবু হাতে পেয়েছ যখন কিছু, কিনে নাও।'

'কত দিলে?'

'কী দেবে?'

'কমপেনসেশন?'

'কিছু দেয়নি রে হাওয়া-ই-হিন্দ।'

'সে কী গো?'

'যাঃ! হতেই পারে না।'

'হয়েছে। কিছু দেয়নি।'

'হাওয়া-ই-হিন্দ কি খেপেছে?'

'না তুমিই খেপেছ?'

'ওরা খেপবে কেন? যদি না দিলেও চলে, তবে দেবে কেন? টাকাটা হয়ত নিজেরাই নিয়ে নেবে, প্রত্যেক প্যাসেনজারের নামে অ্যাকাউন্ট দেখাবে। প্যাসেনজাররা কে আর

লেগে থাকবে ওই টাকার জন্যে? লোকের টাইম কই?'

'দোষটা দিদিরই। তেমন করে চায়নি আর-কি।'

'তুমি ছেড়ে দিলে কেন? আদায় করে নেওয়া উচিত ছিল।'

'তোমার মতন গা-ছাড়া প্যাসেনজারদের প্রশ্রয় পেয়েই ওদের চোরামি চালাতে পারছে—'

'ওরে! দিল নারে, দিল না। সে বড় কঠিন ঠাঁই। চাইনি কি আর? অনেক করে চেয়েছিলুম। কিছুতেই দিল না। উলটে ট্র্যাভেলার্স লজে পাঠিয়ে দিচ্ছিল আরেকটু হলেই-'

'কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছিল?'

'ট্র্যাভেলার্স লজে—'

'সেটা কী জিনিস?' রুঙ্কুর ভুরু কুঁচকে ওঠে।

'মোটেল-'

'মোটেল কেন?' খুকুর মুখ হাঁ হয়ে যায়।

'হাওয়া-ই-হিন্দের প্যাসেনজারদের ঐখানে সস্তায় বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্টে পাঠিয়ে দেয়।'

রিনি অবিশ্বাসের হাসি হাসে। 'যাঃ। মোটেলে? এয়ারলাইন্স? দিদিটা যে কী বলে।'

'হ্যাঁ মোটেলে। আমাকেও দিচ্ছিল, কিন্তু আমি যাইনি।' খুকু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে— 'রুঙ্কু, বুঝেছিস ব্যাপারটা? আজকাল যে গাদা গাদা অশিক্ষিত গ্রাম্য ভারতীয় ইমিগ্রান্টস আসছে, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা।'

'ভাগ্যিস যাওনি। বোকা পেয়ে দিদিকেও ঠেসে দিয়েছে তাদের মধ্যে। সবাইকে নিশ্চয়ই ওখানে পাঠায় না। কেবল বোকাদের। ঐভাবে পয়সা বাঁচায়।'

'তাই তো বলছি।'

'কিন্তু এ তো খুবই অন্যায়। একই ভাড়া সবাই দেবে, অথচ দুরকম সার্ভিস পাবে? এ তো চিটিংবাজি—'

'এই প্লেনটা যদি না ধরতে পারতুম, এতক্ষণে ট্র্যাভেলার্স লজে! তার ওপর ট্যাক্সিভাড়া যেত, এবং খাবার খরচ।'

'ভাগ্যিস প্লেনটা ধরতে পেরেছ—। টাকার জন্য ওয়েট করনি?'

'কিসের পরওয়া কর তুমি? ফুঃ—'

'ঠিক! কে চায় ও-ব্যাটাদের টাকা? চল, চল কী কী চাই, সব কিনে দিচ্ছি।'

'কিছু চাই না রে বলছি তো, তোদের পোশাকপত্তরেই আমার চলে যাবে কটা দিন—'

'দেখি তো দিদি, হাওয়া-ই-হিন্দের নিউইয়র্কের ফোন নম্বরটা— এক্ষুনি কমপ্লেন কর—'

'দিদিকে ফোন করতে দিস না খুকু, সব গুবলেট করে দেবে। তুই নিজে কথা বল—'

'সে আর বলতে? আমিই কথা বলছি, দাঁড়া— এই তো নম্বর, কলিং কলেক্ট-টু ওয়ান টু—'

৭

'হ্যালো, টু ওয়ান টু-ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স— লস এঞ্জেলেস থেকে বলছি, হারানো লাগেজ বিষয়ে— মিস্টার গিজদার আছেন? ও, গিজদারই বলছেন? এটা আপনার নিজস্ব নম্বর? ও। সুপ্রভাত। আমি ডক্টর সেন বলছি,' অম্লান বদনে খুকু বললে, 'অমুক ফ্লাইটে আমার দুটি কেস গতকাল— কমপ্লেইন্ট নম্বরটা চাই?'

'এই যে—'

'এক মিনিট? হ্যাঁ, ধরে আছি। কী বলছেন? আপনারা বাক্সটা পেয়ে গেছেন? বাঃ। পালোস ভের্দেসের ঠিকানায় পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে? ইউনাইটেড এয়ারলাইনসে খোঁজ নেব? না, থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ— শুনুন...হ্যালো? হ্যালো? হ্যালো?...উফ-দিলে কেটে, কথা শেষই হল না। আচ্ছা লোক তো? অন্য স্যুটকেসটার কথা মোটে বলাই হল না।'

'আগে একটাই তো আসুক?' রুস্কু সান্ত্বনা দেয়।

'দেখি ইউনাইটেডে একবার ফোন করে।'

'হ্যালো, ইউনাইটেড? গুড মর্নিং। আপনাদের কার্গো ডিভিশনকে একটু— হ্যালো, গুড মর্নিং। আজ সকালে হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে কি একটি বাক্স ডক্টর সেনের জন্যে পালোস ভের্দেসের ঠিকানায়— কী বলছেন? হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে কোন বাক্সই আসেনি? কোন জরুরি মেসেজ? তাও না? ডক্টর সেনের জ. ।—? কী বললেন? ডাক্তার-পেশেন্ট কারুর জন্যই কিছু নেই? ধন্যবাদ।'

'হল তো? নো নিউজ। কি আশ্চর্য। সত্যি। সায়েবগুলো একদম পালটে গেছে, দেশটাই আর হেলপফুল নয়। চেনা যায় না আমেরিকান বলে। — হ্যালো মিঃ গিজদার? ইউনাইটেড বলল ওরা কোন মেসেজ পায়নি হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে। ভুল বলেছে? লস এঞ্জেলেসে বাক্স পৌঁছে গেছে? বেলা দুটো থেকে পাঁচটার মধ্যে বাড়িতে থাকব? এখানেই পৌঁছে দিয়ে যাবে? বেশ বেশ। ওঃ, থ্যাংকিউ। থ্যাংকিউ। কিন্তু অন্যটার কী হবে? মানে আমার আরেকটা বাক্সও তো বাকী আছে? নেই? সে কি কথা। [দিদি, নেই বলছে যে?] আরে আছে আছে। আমার কাছে রসিদ রয়েছে তো। নম্বর? এই যে, রসিদ নম্বর— দশ মিনিট পরে? আচ্ছা আচ্ছা, নিশ্চয় নিশ্চয়, আমার নম্বর? থ্রি ওয়ান টু জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ..হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়িতেই আছি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।'

'দিদি, দুটো থেকে পাঁচটার মধ্যে তোমার লাগেজ পৌঁছে দিতে আসবে। ওই

গিজদার খুব হেল্পফুল মনে হচ্ছে— ও নিজেই ফোন করে অন্য স্যুটকেসটার কথা জানাবে বলেছে। একটু খবর নিয়ে নিচ্ছে।'

দশ মিনিট কেন সারাদিনেই কোন ফোন এল না। বাক্সও না। তিনদিনের মধ্যে না। খুকুর সঙ্গে রোজই ফোন হচ্ছে।

'কী? বললেই হল? দেব না মানে? ট্রেস নেই? নো ট্রেস? তবে সেটার দায়িত্ব কার? আমার? বাঃ, আপনারও না? কী চমৎকার। তবে কি স্যুটকেসের নিজের?' খুকুর গলা উত্তপ্ত হতে থাকে—

'আমি একটা জরুরি কাজে এসেছি এখানে। সব নষ্ট হয়ে গেল আপনাদের জন্য। দেখুন মশাই, ওরকম রেলা দেখিয়ে কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি— তিনদিন সারা দুপুর ২-৫ বাড়িতে বন্দী হয়ে আছি। ইউনাইটেড আবার জানিয়েছে, ওদের কোনও ফ্লাইটেই আপনারা কোন মালই পাঠাননি। দে হ্যাভ রিসিভড নো মেসেজ ফ্রম ইউ। নো লাগেজ আইদার। হোয়াট? হুজ লাইং? আই অ্যাম মেকিং ইট অল আপ? আই অ্যাম বিইং প্যানিকি? আ নুইসেন্স। ফর নো রিজন?

'ওয়েল মাই ডিয়ার মিস্টার গিজদাঘিচাং, লিসিন কেয়ারফুলি, আয়াম গোয়িং টু স্যু ইওর প্যান্টস অফ ইউ। ইউ হিয়ার মি? ইউ ডোন্ট? আই সী।'

'ও কে, ইউ শ্যাল হিয়ার ফ্রম মাই ল্যইয়ার দেন। রাইট? [খটাস] অতি পাজী লোক এই গিজদার।'

'ও কি! ও কি! খুকু! ওতে কী জীবনে আর বাক্স ফেরত পাব ভেবেছিস? হয়ে গেল। যাঃ— জন্মের শোধ—', প্রায় কেঁদেই ফেলি।

'থাম তো দিদি। বাক্স-বাক্স করে লাইফ হেল করে দিচ্ছ। জীবনে বাক্সটাই সব নয়। আত্মসম্মান সবার আগে। ব্যাটা আমাকে অপমান করেছে, ব্যাটা অতি দুঃসাহসী। বলে কিনা—'

'যাক গে, পাঁচটা তো এখনও বাজেনি'— রুঙ্কু সান্ত্বনা দেয়, 'এসে যেতেও তো পারে আজকে?'

'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ'— বলেই আমি এক ধমক খাই—

'এখনও ইয়ারকি?' — সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়াস কথা বলি:

'আর কোনওদিন হাওয়া-ই-হিন্দে চড়ব না।'

'হ্যাঁ, সেটা যেন মনে থাকে।'

'আসলে বাক্সটায়, আমার কিছু জরুরি জিনিস—'

'জরুরি জিনিস ব্রীফকেসে রাখনি কেন?'

এর উত্তর নেই। সত্যিই ব্রীফকেসে রাখা উচিত ছিল।

৮

সেদিনও এল না। ছটা বেজে গেল।

রিনি ঠাণ্ডা মানুষ। চট করে মাথা গরম করে না রুঙ্কুও। তারা দুজনে কনফারেন্সে

বসল পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে।

'অত ধমকাধমকি করলে হবে না, স্বার্থটা আমাদেরই।'

'মিষ্টি করে বলতে হবে। তাতে যদি উদ্ধার হয়।'

খুকু ধমক দেয়— 'তুই নিজেই বলগে যা মধুর স্বরে। আমি আর পারব না। গিজদার ব্যাটা আমাকে বলে কিনা মিথ্যেবাদী? নিজে মাইল মাইল লম্বা মিথ্যে কথা বলছে— ব্যাটা চোর—'

আমি বলি, 'বেশ তো রুক্কুই কথা বল না একটু এবারে—'

'আমি বাবা অঙ্ক-কষিয়ে মানুষ, কথাবার্তা বলতেই পারি না। বরং রিনি বলুক—'

'বেশ তো, তোমরা যদি বল, আমিই না হয় একটু দেখি চেষ্টা করে—'

'হাতি ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল।'

এটাই লিমিট। রিনিটা একদম গুড়গুড়ে। খুকু রুক্কুর চেয়েও অনেক বছরের ছোট। সেও কিনা আমার চেয়ে নিজেকে বেশি এফিশিয়েন্ট বলে বিশ্বাস করে।

রিনিই ফোন করল এবারে, তার কচি গলায় 'হ্যালো— ও? ইজ দ্যাট মিস্টার গিজদার? গুড মর্নিং মিস্টার গিজদার। হাও আর ইউ দিস মরনিং? স্যরি অ্যাবাউট ইয়েস্টারডে। মী? ওঃ, চিনতে পারছেন না? আশ্চর্য— ডক্টর সেন। ফ্রম লস এঞ্জেলেস। রিমেমবার? মাই ভয়েস? ও, ইয়েস। হাউ রাইট ইউ আর। হ্যাঁ, গলাটা বড্ড ভেঙে গিয়েছিল কদিন, ইন দ্য স্ট্রেস অ্যানড স্ট্রেইন অফ লিভিং উইদাউট মাই বিলংগিংস আই সাপোজ, তা, বাক্সদুটোর কী হবে? একটা ব্যবস্থা করুন? ইউনাইটেড থেকে তো কালও দেয়নি। আজও বলছে কোনও বাক্স বা মেসেজ আপনারা ওদের দেননি। অন্য বাক্সটার খবর পেলেন? পাচ্ছেন না? ওটার জন্য তবে কমপেনসেশনটা দিয়ে দিন। কত? চল্লিশ ডলার? মাত্র? সে কি কথা। প্রতি কেজিতে বিশ ডলার? কি বললেন, দু কেজি? অন্য স্যুটকেসের ওজন ছিল দু কেজি। এটা আপনি কী বলছেন? ত্রিশ ইঞ্চির স্যুটকেস, খালি অবস্থাতেই ওজন অন্তত ছ কেজি তো হবেই। এটা মালপত্রে ভর্তি ছিল।'

— কী? মোট মালের ওজন লেখা আছে বিশ কেজি? একটাই আঠার? যেটা পাঠিয়েছেন? অতএব অন্যটা দুই হতে বাধ্য?

পাগল হয়েছেন নাকি? বললেই হল যা খুশি। এটা কি মগের মুলুক। আপনার উপরওলাকে ডেকে দিন। হবে না? ব্যস্ত? নামটা বলুন। এবার ফোন নাম্বার দিন। ঠিক আছে। গুডবাই। উঃ, কী অ্যাবসার্ডলি বজ্জাত এই লোকটা দিদিভাই।'

'কী? হল? মিষ্টমধুর সম্ভাষণে কাজ কিছু এগুল?'

'একবার লোকটাকে আই শ্যাল স্যু ইওর প্যান্টস অফ বললে কি আর তাকে দিয়ে কাজ এগয়?'

'বেশ তো আই শ্যাল কিস ইওর ফেস ক্রিমসন, বলেই দ্যাখ না।'

'আসলে লোকটা ভাল নয়। নইলে এত শত্রুতা করবে কেন? ওর লাভ কী হচ্ছে এতে? জাস্ট ম্যালিশ্যাস ডিলাইট? আশ্চর্য সত্যি।'

এদিকে আমার যে ক্ষতিটা হল, সে লোকসান তো চল্লিশ ডলারে অথবা চারশ ডলারেও মাপা যাবে না। কিন্তু একথাটা বলাও যাচ্ছে না কাউকেই— খালি বুক ভেঙে চোখে জল এসে যাচ্ছে, আর ওরা ভাবছে শাড়ির জন্যে দিদি কেঁদে ভাসাচ্ছে—

৯

'হ্যালো, ইউনাইটেড? সুপ্রভাত। ডক্টর সেন বলছি। আই বিলিভ দেয়ার ইজ আ স্যুটকেস ফর মি ফ্রম, হাওয়া-ই-হিন্দ—'

'প্লিজ ডু নট বিলিভ ইন সাচ রিউমারস। আমাদের কাছে কারুর কোনও স্যুটকেস নেই—'

'কিন্তু আমি যে শুনেছি ৮ই এসেছে? পাঁচ নম্বর ফ্লাইটে, নিউইয়র্ক থেকে—? প্লিজ একটু খুঁজে দেখুন না?'

'অনেককিছুই শুনতে পাওয়া যায় জগতে ডক্টর সেন। গুজবে কান দিতে নেই। আর এই নিয়ে একশ তিরাশিবার আপনি আমাদের ফোন করলেন।'

'দুঃখিত, খুবই দুঃখিত। কিন্তু একটু যদি খুঁজে দেখতেন?'

'যথেষ্ট খোঁজা হয়েছে। আপনি কি ভেবেছেন খুঁজে না দেখেই আমরা উত্তর দিচ্ছি? এতই দায়িত্বহীন আমরা?'

'না-না, তা-কেন, তা-কেন, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তাই তাহলে? কিছুই আসেনি বলছেন? আমি দুঃখিত। বা-ই।'

'আচ্ছা।'

'আচ্ছা দিদি এটা কী? সত্যি দিদি, এসে অবধি কেবল স্যুটকেসের ধ্যান-ধারণায় রইলে? কিছু দেখলে না, বেরুলে না, রোজ সকালে উঠে নিউইয়র্কে নিয়ম করে কালেক্ট কল করা, আর সারা দুপুর— 'এই বুঝি বাক্স আসে—' বলে ঘর আগলে বসে থাকা। রবার্ট ব্রুসের বড় বোন তুমি ভাই, তোমায় নমস্কার করি।'

'এই করে হপ্তা ঘুরে গেল, না পেলে একপয়সা কমপেনসেশন না একটাও বাক্স। এর মানে কী?'

'এ-যাত্রা তোমার নিশ্চয় ত্রয়স্পর্শে যাত্রা ছিল। অযাত্রা।'

'সঙ্গে আচার, ডিম কি কলা এনেছিলে কি?'

'বেস্পতিবারের বারবেলায় লণ্ডন ছেড়েছিলে কি?'

'ইয়ারকি মারিসনি বলছি। প্রত্যেকের তো এলেম দেখলুম। কেউ কিছু পারলি? আমি ইচ্ছে করে ঘরে বসে আছি? আমার বাক্স—'

'কে কী পারবে? হাওয়া-ই-হিন্দ তোমাকে যে মোগলাই ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে, সেখানে আমরা তো কচুকাটা হয়ে যাচ্ছি—'

'বাপু-বাছা করেও হচ্ছে না। শালা-শুয়োরের বাচ্চা বলেও হচ্ছে না। ওরা একেবারে চোখের চামড়াকাটা দিদি। তুমি বরং নিউইয়র্কে চলে যাও—'

'গিজদার নিশ্চয় সেই লোকটা, যাকে আমি এয়ারপোর্টে দেখেছিলুম। যে আমাকে প্লেনের কানেকশন পর্যন্ত দিচ্ছিল না, কেবল ট্র্যাভেলার্স লজে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। সেই অতি পাজীটাই—'

'ওর বসের সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে হবে। সত্যি সত্যিই পাওয়ারফুল পোস্টে যারা থাকে, তারা ছোট ব্যাপারে এমন হাতের সুখ করে নেয় না।'

'ফোন করেই দ্যাখ না। তুমি নিজেই কব এবার।'

'হ্যালো, গুড মরনিং। মিস্টার আইখমান? আমি আপনাদের এক প্যাসেঞ্জার, ডক্টর সেন, গত অমুক তারিখে...ফ্লাইটে হীথরো থেকে আসার সময়—'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যুটকেস আসেনি? আপনি এই নম্বরে—'

'মিস্টার গিজদারকে তো? তিনি খবর পর্যন্ত দিতে পারেননি আমার বাক্সগুলো কোথায়।'

'তিনিই পারবেন। তিনি না পারলে আমিও পারব না, এটা তাঁরই ডিপার্টমেন্ট। দেখুন মালপত্র বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, আমি বরং বলে দিচ্ছি মিস্টার গিজদারকে'

'উনি একটাকে মোটে ট্রেসই করতে পারেননি, অন্যটা বলছেন পাঠিয়েছে ইউনাইটেড মারফৎ লস এঞ্জেলেসে, কিন্তু ইউনাইটেড বলছে কিছু আসেনি। আমি কিছুই পাইনি। ওভার নাইট কমপেনসেশনটুকু পর্যন্ত নয়— আপনারা যে এতটা ইনএফিশিয়েন্ট এবং আনহেলপফুল—'

'সেকি কথা? আপনি পঞ্চাশ ডলার নেননি?'

'দিলে তো নেব?'

'এক কাজ করুন। যা যা কিনেছেন তার রসিদগুলো সমেত লস এঞ্জেলেসের অফিসে চলে যান। সাতদিনের মত হতে চলল এখনও নেন ? কী আশ্চর্য! তবে দেড়শর বেশি খরচা করবেন না। অবশ্য একটা স্যুটকেস তো পেয়েই গেছেন?'

'তাহলে আর বলছি কী? পাইনি, পাইনি। একটাও পাইনি। দুটোই আপনারা হারিয়ে দিয়েছেন।'

'সেকি কথা? দাঁড়ান এক মিনিট। একটু অপেক্ষা করুন।'

'এই যে, ডক্টর সেন, এখানে কথা বলুন।'

'হ্যালো।'

'দেখুন ডক্টর সেন, এই নিয়ে আপনি আম্পটিনথ টাইম আমাকে একই কথা বলতে ফোন করছেন। অকারণে মিস্টার আইখমানকে বিরক্ত করেছেন। একটা, অর্থাৎ কাল স্যুটকেসটা আপনি পেয়ে গিয়েছেন, আমরা জানি।'

'কে বলল পেয়ে গিয়েছি? ইউনাইটেড বলেছে? আমাকে রসিদটা দেখাবেন। আমি তো পরশু নিউইয়র্কে যাচ্ছি, বলে আসব আপনাদের অফিসে।—'

'আপনিই ডক্টর সেন কথা বলছেন?'

'অফ কোর্স। হু এলস?'

'হাউ মেনি পার্সনস আর মাস্কারেডিং অ্যাজ দিস ডক্টর সেন, আই ওয়ানডার? আপনাকে নিয়ে তিন রকম গলা হল। একজন তো আমাকে মামলা করে সর্বস্বান্ত করে দেবে বলেছিল। আপনিই বোধহয়। নাকি আর কেউ? মোস্ট মিস্টেরিয়াস।'

'কি যে বলেন। অমন কথা কখন আমি বলতেই পারি না। কিন্তু নো-ট্রেস ব ঃ টারই বা কী হবে?'

'ঐ বাক্সটারই খোঁজে আমরা ছবার লণ্ডনে ফোন করেছি— সতেরটা টেলেক্স পাঠিয়েছি। নো-ট্রেস। নো-ট্রেসের জন্যে চল্লিশ ডলার কমপেনসেশন। আর কালটা তো অলরেডি ডেলিভ'রড অ্যাট ইওর রেসিডেন্স। ও কে? অল সেটলড্?'

'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মিস্টার গিজদার। ইউ মাস্ট বি ক্রেজি।'

'আয়াম নট। ইউ আর। ডক্টর সেন। আর ডক্টর জেকিল। হু-এভার উড মাইট বি। অ্যাণ্ড ইউ আর ড্রাইভিং আস ক্রেজি।' ঠং করে রিসিভার নামিয়ে রাখল নিউইয়র্ক।

১০

'আমাকে ডক্টর জেকিল বলল, খুকু। শুনেছিস?'

'তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে? আইখমানকে অমন গিজদার গিজদার বলছিলে কেন? তাই বলেছে।'

'গিজদারই তো কথা বলল।'

'সে কি? প্রথমে তো মনে হল আইখমানকে ধরেছিল।'

'ধরেছিল, তারপর গিজদারকে ধরিয়ে দিল তো।'

'যাচ্চলে।'

'তুমি নিজে নিউইয়র্কে না গেলে কিছু হবে না দিদি। ব্যাটারা যা তা করছে।'

'কিন্তু আমাকে যে ডক্টর জেকিল বলল।'

'ও কিছু না। কত কথাই বলে লোকে, সব কিছুতে মন দিতে নেই দিদিভাই। খুকুদি, আমি, তুমি—তিনজন মিলে বলেছি কিনা, তাই ঘাবড়ে গেছে।'

'কিন্তু কাল বাক্স যে 'ডেলিভারড অ্যাট ইওর রেসিডেন্স' বলল? কিছুতেই শুনল না আমার কথাটা।'

'বললেই তো হল না? তুমি দুটো স্যুটকেসের জন্য কমপেনসেশন চেয়ে অ্যাপ্লিকেশন করে দাও। রাজা-কুমকুমদেরও বাক্স হারিয়ে গিয়েছিল। ওঁরা সাত হাজার টাকা মোট ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলে।'

'সা-ত-হা-জা-র? বলিস কি?'

'তা আর এমন কী? দুটো স্যুটকেস, আটশ ডলার তো পেতেই পারে। শুনতেই অত।'

'আমিও পাব?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু টাকা কে চায়? আমি চাই বাক্সটা।'

'ফের যত।'

'বোকা কথা? দিদি?'

'ঐ টাকা দিয়ে তুমি অনেক বেশি শাড়ি কিনতে পারবে।'

'কিন্তু ওই শাড়িগুলো তো পাব না? আমার ফুলশয্যার তত্ত্বের কাঞ্চিপুরম তিনখানা, সাধের বেনারসী শাড়িটা, একুশ বছরে জন্মদিনে পার্সেল করে বিলেতে পাঠানো মায়ের উপহার, আরেকটি শাড়ি শাশুড়ি মায়ের, (হায়রে-আসল শোকের কথাটা তো বলতেই পারছি না, যে জন্য এত অস্থির হাহাকার। যে জিনিসটা ঐ বাক্সর সঙ্গে হারিয়ে গেল সেটা শাড়ি নয়— কিন্তু তোদের বলা তো যাবে না। —তোরা ভাবছিস দিদির কী বিশ্রী শাড়ি-শাড়ি স্বভাব হয়েছে)।'

'এনেছিলে কেন গুচ্ছের দামী কাপড়-চোপড়?'

'তুমি কি ইন্দিরা গান্ধী?'

'খবর্দ্দার ঐ ভুলটি আর করবে না।'

'কেবল নাইলন, আর জীনস। বুঝলে?'

'বাইরে কক্ষনো দামী কাপড় নিয়ে আসবে না।'

'দেশেও তো পরা যায় না কিছু, ট্রেনেও ডাকাতি, ট্যাক্সিতেও ছিনতাই। সত্যি আর পারি না। ভাল ভাল জিনিসপত্তর কখন পরবে লোকে?'

'পরবে না। ইন্দিরা গান্ধী হও, তখন পরবে। ততদিন নাইলন। চল, বাজারে।'

'চল—। যথা লাভ। রসিদগুলো তো জমা দিতে হবে।'

'তাছাড়া নিউইয়র্কে যাবার আগে পরনের জিনিসপত্তর কিছু কিনতেই হবে। ওখানে তো তোরা নেই? পরব কী?'

'তাও তো বটে। কদিন থাকা তোমার নিউইয়র্কে?'

'তা পাঁচ-ছ দিন তো বটেই।'

'তাহলে তো শ'দুই ডলারের জিনিসপত্র এমনিতেই লেগে যাবে। ওরা কত দেবে বললি? দেড়শ, না?'

'হাওয়া-ই-হিন্দ লেজ ডাউন দ্য রেড কার্পেট ফর ইউ।'

লস এঞ্জেলেসের অফিসে ঢুকতেই রংবেরঙের চমৎকার বিজ্ঞাপন। ঘামতে ঘামতে রশিদ-টশিদ নিয়ে জমা দিতে গেলুম যে ভদ্রলোকের কাছে, সেই সাহেবি ছদ্মবেশে পার্শি ছেলেটি সত্যি খুব ভদ্র। যথাসাধ্য সহানুভূতি প্রদর্শন এবং দুঃখ প্রকাশ করে বলল: 'রেখে যান, যথাসাধ্য শীঘ্র বিল তৈরি করে চেক পাঠিয়ে দেব।' কিন্তু কোথায়? এখানে? না ইনডিয়াতে? বোনেদের ঠিকানাই দিয়ে দিই।

'এদের কাছে ধার করেছি। টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেবেন এদেরকেই।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। একজনকে অথরাইজ করে যান। তবে, কত টাকা যে দেবে, তা

বলতে পারছি না। নিউইয়র্কের ওপর সবটা নির্ভর করে তো?'

'সে কি?'

'হ্যাঁ হাওয়া-ই-হিন্দ-এর মেন অফিস ওইটেই। আমি তো নগণ্য শাখামাত্র।'

'কি সর্বনাশ।'

'সর্বনাশের কী হয়েছে?'

'নাঃ। ইউনাইটেডের কাছে বাক্সের খবরটা পেলেন কিছু?'

'কিসের ইউনাইটেড?'

'ইউনাইটেড এয়ারলাইনস। আপনারা ওদের কনট্যাক্ট করেননি আবার স্যুটকেসের জন্য?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছেন না? শুনুন তবে। হাওয়া-ই-হিন্দ-আমার একটা স্যুটকেস নাকি ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের মাধ্যমে গত ৮ই লস এঞ্জেলেস পাঠিয়েছে এবং বলছে যে আপনারা সেটা আমাকে ডোর-টু-ডোর ডেলিভারি দিয়েছেন। এসব খবর আপনারাই কি দেননি মিস্টার গিজদারকে?'

'কেন দেব? এসবের অর্থ কী?'

'ইউনাইটেডে আপনাদের কোন মালপত্তর আসেনি সম্প্রতি? নিউইয়র্ক থেকে?'

'না তো। আমার অজ্ঞাতসারে আসাটা হাইলি আনলাইকলি। আমিই তো এখানে ইনচার্জ। দাঁড়ান, তবুও একটু জেনে নিচ্ছি। মেরিলিন ডিয়ার ইউনাইটেডে একবার খোঁজ নাও তো প্লীজ— ডক্টর সেনের'—

'কী হলে মেরিলিন? খোঁজ পেলে?'

'স্যরি, জামশেদ, ওরা কিছুই জানে না। কোন বাক্সটাক্স আসেনি ওদের ওখানে— আমাদের এয়ারওয়েজ থেকে।'

'দেখলেন তো?' ছেলেটি কাঁধ ঝাঁকায়।

'আপনিই দেখুন। আপনি আজই জানান এটা মিঃ গিজদারকে। তিনি তো বলছেন বাক্স পাঠিয়েছেন। সেটা নাকি বাড়িতে পৌঁছেও দেওয়া হয়ে গেছে। তাই তার জন্য আর কমপেনসেশন দেওয়া হবে না আমাকে। আর তার ওজন আঠার বলে হারানো বাক্সটার ওজন মাত্র দুই। কিছু বুঝলেন?' পার্শি ছেলেটির মুখে এবার নীরক্ত ভদ্রতার কঠিন মুখোশ। হাসিমুখেই সে বলল, 'দেখুন, এটা আমার বোঝবার ব্যাপার নয়। ওটা মিস্টার গিজদারেরই বোঝার কথা।'

'যে আসে লংকায়, সে হয় রাজা।'

'এক্সকিউজ মি?'

'কিছু না। তুমিও ব্রুটাস।'

'ব্রুটাস? ব্রুটাস একেরমান? ইউনাইটেডের? ওকে চেনেন নাকি?'

'নাঃ। অন্য লোকের কথা বলছি। ঠিক আছে। চলি। থ্যাংকিউ।'—

১১

শূন্যহাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে। নিউইয়র্ক যাচ্ছি। বিষণ্ণবদনে তিনবোনই এসেছে আমাকে প্লেনে তুলতে। এসেও বকুনি দিচ্ছে।—

'দিদিভাই, তোমার এবারের আসাটা ঠিক আসাই হল না কিন্তু।'

'কেবল স্যুটকেস-স্যুটকেস করেই কাটালে। একটা কিন্তু অস্বাভাবিক চেঞ্জ হয়েছে তোমার। এতটা জিনিসপত্র-সর্বস্ব মন যে তোমার কবে থেকে হল? এমন তো একটুও ছিলে না আগে? মোস্ট মেটিরিয়ালিস্টিক অ্যাণ্ড বোরিং কোম্পানি।'

'যাক না তোমাদেরও দু বাক্স 'সর্বস্ব' খোয়া। বিদেশ-বিভুঁইয়ে ব্রীফকেস বগলে ঘুরে বেড়াও না। দেখব কেমন মোস্ট স্পিরিচুয়ালিস্ট অ্যাণ্ড ইনস্পায়ারিং পার্সোনালিটি হয়ে থাক!'

একটা স্যুটকেস যা হোক কিনতে হয়েছে কাপড়চোপড় সাবান গামছাও কিছু তাতেই ভরতে হয়েছে, নিউইয়র্কের সাতদিন যাতে কেটে যায়। কিন্তু মনে শান্তি নেই। গেল। সেগুলো সব গেল। কেন যে সঙ্গে ব্রীফকেস রাখলুম না? ওদিকে প্রকৃতপক্ষে নো-ট্রেসই হয়ে গেল পার্থর বাক্সও। ওদেরই বা কী বলব।

সময়ের অনেক আগে পৌঁছেছি। আমেরিকান এয়ারওয়েজের টার্মিনালে অলস চোখে বসে আছি। চারদিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ চোখে পড়ল ওদের অফিসঘরের বাইরে সারিবাঁধা ৭/৮টা স্যুটকেস। — ওগুলো কাদের রে? কেন আছে ওখানে? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কেউই জানে না ওগুলো কাদের। কেনই বা আছে। আনক্লেমড ব্যাগেজ পড়েই থাকে ওরকম। তারপর লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড অফিসে জমা চলে যাবে।

'যদি আমারগুলোও ওরকম পড়ে থাকে কোথাও?'

'হতেই পারে। তবে হীথরোতে নেই। জে এফ কে তেও নেই। ওগুলো তো খোঁজা হয়েছে তন্ন তন্ন করে।'

'যদি এখানেই পড়ে থাকে? এই এয়ারপোর্টেই? আর জীবনে পাওয়া যাবে না।'

'ওরা বারবার জোর দিয়ে বলছে একটা লস এঞ্জেলেসে পাঠিয়েছে—'

'দিদি, তুমি সত্যি গল্প লিখতে লিখতে বড্ড ইম্প্র্যাকটিক্যাল হয়ে গেছ। ওসব গল্পেই হয়। লাইফে হয় না। ওরা বলুকগে।'

'তবু ঘুরেই আসবি নাকি ইউনাইটেডের টার্মিনালটায় একবার? যদি ঐরকম আনক্লেমড পড়ে থাকে? ধর গিয়ে, দেখলুম আমার বাক্সও এক ধারে পড়ে আছে ঐরকম?' ভয়ে ভয়ে যেই বললুম, অমনি খুকু-রুক্কু এই মারে তো এই মারে। 'কী যে পাগলামি শুরু করেছ দিদিভাই। পড়ে থাকলে কি ওরা পাঠিয়ে দিত না? অতবার করে তুমি তাগাদা দিলে, আমরা অত অনুনয় বিনয় করলুম? থাকলে ওরা নিশ্চয় এতদিন পাঠিয়ে দিত। পড়ে থাকতে পারে না। এরা আমাদের মতন অত ক্যালাস নয়, এখনও কিছু সিভিক সেন্স, কিছু সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির ট্রেস আছে ওদের চরিত্রে। নইলে এতদূর এগোতে পারত না।' ---ভাগ্যিস রিনিটা ছোট আছে। এখনও চাকরি-বাকরিতে

ঢোকেনি। ওকে একটু সাধ্যসাধনা করতেই রাজী হল ইউনাইটেডে নিয়ে যেতে। চিনিও না তো কোথায় কী? এয়ারলাইনের বাড়িগুলো সব দূরে দূরে আলাদা আলাদা। বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে। খুকু-রুঙ্কু এখানে গার্জেনের রোলে। ওরা বলল, 'আমরা তোমার পাগলামিকে বৃথা প্রশ্রয় দেব না। তুমি নিজেই ঘুরে এস। হাতে সময় আছে। যাও, মনের শান্তি করে এস।'

গিয়ে দেখি ইউনাইটেডেরও একটি ক্ষুদ্র কিউ রয়েছে আনক্লেমড ব্যাগেজের। ঠিক ওদের অফিসঘরের কাচের দরজা, কাচের দেয়ালের গায়েই ঠেস দেওয়া আছে গোটা চার-পাঁচ স্যুটকেস। নানান সাইজের, নানা রঙের। একটা কাল। সাইজে পার্থর স্যুটকেসেরই মতন। অবিশ্বাসী চোখে এগিয়ে যাই। পায়ে পায়ে। অবশ্যই হতে পারে না, নিশ্চয়ই নয়, তবুও, দেখতে ক্ষতি কী? বাক্সটার গায়ে দুটো লেবেল সাঁটা। একটা হাওয়া-ই-হিন্দ-এর। আরেকটা গ্রেট ব্রিটিশ এয়ারলাইনসের। আরও একটা ট্যাগ হাতলে বাঁধা। ইউনাইটেডের। তাতে লালকালিতে লেখা immediate % Rush—এবং আমার নাম, তথা লস এঞ্জেলেসের ঠিকানা। সঙ্গে তারিখ— ৮ইয়ের। ৬ দিন হয়ে গেছে। রিনি এবং আমি চোখাচুখি করলুম, দুজনের চোখেরই ভাষা এক। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে স্বপ্নচালিত ব্যক্তির মতন এগিয়ে গিয়ে আমরা দুজনে স্যুটকেসটি হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে চলে এলুম। কেউই আমাদের কিছু বললে না। দুটি মহিলা চেকার ব্যাজার মুখে তাকিয়ে রইলেন দরজার দুই পাশে। কিছু প্রশ্নও করলেন না। ব্যাগেজের রসিদও দেখতে চাইলেন না। রিনি খুশি গলায় বলল, 'দিদিভাই, চল যাই আমরা আরও গোটাকতক বাক্স-প্যাঁটরা তুলে আনিগে। সবগুলো তুলে নিলেও তো ওরা কিছুই বলবে না দেখছি।' 'কী কাণ্ড বলত? আমাদের যথাসর্বস্ব এতটা আনসেফভাবে পড়ে থাকে? যে কেউ তো যখন খুশি তুলে নিয়ে যেতে পারে। আর কখনো ইনশিওর না করে ট্র্যাভেল করছি না।'

উদ্ধৃত স্যুটকেস হাতে যখন খুকু আর রুঙ্কুর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ান হল, তখন তাদের মুখের জ্যামিতিক সারল্য দেখবার মতন। এমনও যে হয়, হতে পারে, এই বেগবান, সর্বশক্তিমান, এফিসিয়েন্ট ইউ. এস. এ. তে এটা ওদের পক্ষে অভাবনীয়। Rush লেখা, নাম ঠিকানা সমেত বাক্স বসে রইল হপ্তাখানেক। কেউ জানলও না। বারবার নানাভাবে খোঁজ নিলুম, তারা প্রত্যেকবারই না দেখে মিছে কথা বলল। অম্লানবদনে ভুলভাল জবাব দিল। এমনকি একটা এয়ারওয়েজকে পর্যন্ত বাজে খবর দিল? সত্য সেলুকাস!

এবার বোনেরা পই পই করে শিখিয়ে দিল। নেক্সট স্টেপে কী কী করণীয়।

'খবর্দার, তুমি গিয়েই যেন ব্যাটা গিজদারকে জানাবে না যে কাল বাক্সটা পাওয়া গেছে। তোমার পাগলামির জন্যেই ওটা কুড়িয়ে পেয়েছ। নেহাৎ বদ্ধ পাগল বলেই। আমাদের মত নর্মাল লোকজন হলে ওভাবে লাস্ট মোমেন্ট ইললজিক্যাল অ্যাকশন একেবারেই নিত না— খুঁজতেও যেত না। পেতও না। তুমি সোজা নিউ ইয়র্কে চলে

গেলে ওটা কি আর জীবনে পাওয়া যেত? ওদের হাতে কোনো রসিদ নেই, কোনো প্রমাণ নেই, কে বাক্সটা নিয়ে গেছে। ওদের অকারণ হ্যারাসমেন্টের দাম এবার তুমি তুলে নাও।

এবার ওদের তুমি খানিকটা হ্যারাস কর। সমানে দুটো স্যুটকেসই ক্লেম করে যাও। ওদের প্রমাণ করবার কোনই উপায় নেই যে এটা কদাচ রিকভার করা হয়েছে। বুঝলে? খবর্দার ওদের বলে দিও না যেন যে এটা কুড়িয়ে পেয়েছ। ওরা বড়টাকে মাত্র দু কেজি বলছে অন্যায় করে। অন্ততপক্ষে তো ওটা বিশ কেজি ছিল? অতএব এটার কথা আর বল না। তাহলে বিশ কেজিই পাবে। নাকের বদলে নরুণ তো হোক।'

'কিন্তু দিদি তো পৌঁছেই আগে ঐ কথাটা বলে দেবে।' রিনি হতাশসুরে বলল।

'পেটে কোন কথা থাকে ওর?'

১২

'এতবড় আস্পর্ধা? এমন কথা বলেছে? 'ডক্টর জেকিল' বলেছে? উপরন্তু বাক্স না দিয়ে-টিয়েও বলে কিনা দরজায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে? নাঃ। সত্যি হাওয়া-ই-হিন্দ বড্ড পেয়ে বসেছে দেখছি।'

ইলুদি তো খেপেই গেলেন। বললেন, 'দাঁড়াও! আমি কাপাদিয়াকে বলছি। ওরা দস্তুরী-মিস্তিরি থেকে গাদা গাদা টিকিট করে। হিন্দকে কাঁদিয়ে ছাড়বে।'

নিউইয়র্কে ইলুদি-সুহাসদাদের চেনে না এমন ভারতীয় প্রায় নেই। ইলুদির বাবা ছিলেন বিখ্যাত গান্ধীবাদী-স্বাধীনতা সংগ্রামী। গুজরাটের সকল মানুষের শ্রদ্ধা কুড়িয়ে গেছেন। আর সুহাসদার চাকরি ইউনাইটেড নেশনসে বহুৎ বছর হলো।

'তোমার বোনেরা অ্যাবসলুটলি করেক্ট', বললেন সুহাসদা। 'ঐ টকেস ফেরৎ পাওয়া সম্পূর্ণ ভাগ্যচক্র। তার ক্রেডিট হিন্দ-এর নয়। তাছাড়া হিন্দ তো তোমাকে মস্তবড় প্রতারণা করছে, বত্রিশ ইঞ্চি স্যুটকেসের ওজন দু কেজি ধরে নিচ্ছে। তুমি কেন ওদের 'নিজেদের রসে নিজেরা সিদ্ধ' হতে দেবে না? টিট ফর ট্যাট।'

'হ্যালো! মিস্টার গিজদার?'

'ডক্টর সেন, আই প্রিজিউম।'

'ঠিক ধরেছেন।'

'একটা আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অন্যটা নো-ট্রেস। চল্লিশ ডলার। ব্যাস। হয়ে গেল?'

'শুনুন মিস্টার গিজদার, আমি এখন নিউইয়র্কে।'

'কনগ্র্যাচুলেশনস। তাতে আমার কী?'

'আপনার কাছে আসব শিগগিরই।'

'তাতে এক্সট্রা কোন লাভ হবে না আপনার, তবে হ্যাঁ, ঐ চল্লিশ ডলার হাতে করে ক্যাশ নিয়ে যেতে পারবেন।'

'ঐ চল্লিশ ডলার আপনাকেই দিলুম মি. গিজ্জদার, কীপ ইট ইওরসেলফ। ইটস আ প্রেজেন্ট।'

'কী ভেবেছেন আপনি নিজেকে? প্রেসিডেন্ট অব ইনডিয়া?'

'কী ভেবেছেন আপনিই বা নিজেকে? প্রেসিডেন্ট অব দি ইউনাইটেড স্টেটস?'

'উই ও ইউ ওনলি ফর্টি ডলারস। নাথিং মোর।'

'আচ্ছা জেদী জানোয়ার তো। জন্মে দেখিনি বাপু।'

'যার সঙ্গে যেমন।'

'ঠিক আছে '

'ঠিক আছে।'

'আপনাদের মত অপরূপ পাবলিক রিলেশনস কিন্তু আর কোন এয়ারলাইনসের নেই।'

'নেই তো নেই। আমরা কিছু লোকসানে চলছি না তার জন্যে। আপনার মত যাত্রী না পেলে আমাদের কোম্পানি লাটে উঠবে না।'

'সত্যি? উঠবে না তো?'

'সত্যি! বিশ্বাস করুন ডক্টর সেন, আপনি একটি মাথাব্যথা ভিন্ন কিছু নন।'

১৩

সন্ধেবেলায় আমার সব জেবক্স করা ডকুমেন্ট সমেত ইলুদি আমাকে দস্তুরী অ্যাণ্ড মিস্তিরির বড় কত্তার বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেখানে একটা ডিনার চলছিল। সকলেই প্রায় দস্তুরী অ্যাণ্ড মিস্তিরির লোক। দুজন বঙ্গসন্তান ইনক্লুডেড। ছোটখাট একটি প্রবাসী ভারতবর্ষ। উঁচুতলার। মুহূর্তের মধ্যে ইলুদির কল্যাণে (নাকি রাই-হুইস্কি বার্বনের গুণে?) উপস্থিত নিমন্ত্রিতরা প্রত্যেকেই হাওয়া-ই-হিন্দ-এর অবর্ণনীয় আচরণে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

'মোটেও ছেড়ে দেয়া হবে না। যা খুশি তাই করবে?'

'আপনাকে একা স্ত্রীলোক পেয়ে ওরকম শুরু করেছে—'

'দেখি, অমন করা বের করছি। মাসে প্রায় তিরিশটা ইন্টারন্যাশনাল টিকিট কাটি একমাত্র এই অফিস থেকেই আমরা? নো-ট্রেসকে কী-উপায় ট্রেস করা যাবে, দেখছি, দাঁড়ান না—'

নানারকম সান্ত্বনা পাচ্ছি। যত্ন করে গৃহকর্তা কাগজপত্তরগুলো নিলেন। কালই বাঁশ দেয়া হবে।

'হ্যাঁ, একটু বেগ দেওয়া হক ওদের— সত্যি বড্ড বাড় বেড়েছে। সেবার আমারও ভেনেজুয়েলা থেকে জাপান যাবার পথে, ব'ক্সটা দিল হারিয়ে-'

'আর আমার? রোম টু কোপেনহেগেন ঐটুকু ছোট্ট ট্রিপ, তার মধ্যেই বাক্সটি আমার চলে গেল অস্ট্রেলিয়া। দু হপ্তা পরে দেশে ফিরে পেলাম। ওঃ বাইরে কী কষ্টেই না দিন

কেটেছে। ঐ শীতের দেশে। —তবে খুবই ওদের ব্যবহার ভাল, ডাচ এয়ারলাইনস তো হাওয়া-ই-হিন্দ নয়...'

মুহূর্তেই বাক্স হারানোর সরস কাহিনীতে জমে উঠল ঘর। সরস কাহিনীই— কেননা সব বাক্সই শেষটায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে। ট্রাজিক কেস ছিল না একটাও।

কাপাদিয়া পরদিন টেলিফোন করে বললেন, 'আপনাকে ঐ বাক্সটার জন্য ৪০ ডলারের বেশি কিছুতেই দেবে না। অন্য বাক্সটার কথা বলব? ওটার জন্যই চেপে ধরা যাক। ওরা আপনাকে নির্লজ্জভাবে ঠকাচ্ছে।'

তা ঠকাচ্ছে। তাই বলে—? ভাবতেই আমার ভেতো বাঙালী পেটের মধ্যে হি হি করে ঠাণ্ডা বাতাস বইল। বাক্সটা হাতে পেয়েও আবার তারই জন্যে টাকা চাইব?

না বাবা।

ও পারব না।

কাউকে শাস্তি-টাস্তি দিয়ে আমার কাজ নেই।

'নাঃ, থাকগে। ওটা তো পেয়েই গেছি।'

'কিন্তু ওরা তো দেযনি? ওটার জন্য আপনি সহজেই কমপেনসেশন পাবেন কিন্তু। আমি বলছি।'

'নাঃ, থাক।'

১৪

ইলুদি চটে লাল।

'নাঃ? থাকগে?' ওরা জোচ্চুরি করে জোরগলায় বিশ কেজিরটাকে দু কেজি বলবে, চারশর জায়গায় চল্লিশ ডলার দেবে, আর তুমি বললেন 'নাঃ থাকগে?' এ হতেই পারে না। এ তোমার অন্যায়টাকে সাপোর্ট করা। 'অন্যায় যে সহে' সেও দোষী। না, এবারে আমি নিশানকে বলছি, দাঁড়াও। দস্তুরী অ্যাণ্ড মিস্তিরি যদি না পারে, কোকাকোলা কোম্পানি তো পারবে?'

গড়গড় করে ছোট্ট সাদা টেলিফোনে কয়েকটা নম্বর ঘোরালেন ইলুদি।

'হ্যালো? নিশান?' তারপরেই শুরু হয় বিশুদ্ধ গুজরাতিতে আমার দুরবস্থা বর্ণনা। 'ভাই নিশান, ওর বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, ওর স্বামী আমার ছোট বোনের ক্লাসমেট ছিল, ও নিজেও আমার ছোট বোনের মতন, খুব ভাল মেয়ে, গল্প-কবিতা লেখে— ওর এমন হেনস্থা তুমি সহ্য করবে?'

নিশান পটেল বিখ্যাত ভি. আই. পি. লোক. দেশেও যেমন শক্তিমান ছিলেন, এখানেও তেমনি. আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে কোকাকোলা কোম্পানির অধিনায়কত্ব তাঁরই। দেশে থাকতে পুরো কোকাকোলা কোম্পানির সর্বাধিনায়ক ছিলেন। বড় সোজা কথা নয়। স্ত্রীটি শান্তিনিকেতনের মেয়ে। সুন্দরী, সুরুচি-সম্পন্না, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন ভাল। নিশান নিজেও সাহিত্য-শিল্পে উৎসাহী। ইলুদির তিনি ক্লাসমেট।

'নিশ্চয় করে দেবে তো? এই নাও, সব রেফারেন্স নম্বর-টম্বরগুলো। ফোনেই দিয়ে দিচ্ছি। রসিদ নম্বর এই.. , কমপ্লেন্ট নম্বর এই..., আমার বন্ধুটির নাম এই...। দ্যাখ ভাই, উদ্ধার করে দাও। বাক্সটার জন্যে অত না, যতটা জরুরি ওদের শিক্ষা দেওয়া। অকারণ ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছে মেয়েটাকে। শুধু শুধু ওকে অপমান করছে, গিজদার বলে একদম বাজে লোক। বত্রিশ ইঞ্চি মালভর্তি বাক্সর ওজন জবরদস্তি করে বলছে, দু কেজি। বুঝতেই পারছ, কী পাজি!'

ঠিক এমন সময় একটা টেলিফোন এল। ইলুদি বললেন— 'তোমার ফোন।'

'কি, ডক্টর সেন? কী ভেবেছেন? ভেবেছেন দস্তুরী অ্যাণ্ড মিস্তিরিকে দিয়ে বলালেই চল্লিশটা চারশ-তে তুলতে পারবেন? ও গুড়ে বালি। চল্লিশের এক সেন্ট বেশি নয়। আমিও গিজদার। হুঁ। আপনার ফর্মে লেখা আছে ওজন মোট বিশ কেজি। আপনার যতই কানেকশনস থাকুক, আমার পক্ষে আছে আইন। বুঝলেন?' ঠাক করে রিসিভার নামিয়ে রাখল গিজদার। গুডবাইও বলল না। আমি তো 'হ্যালো' আর 'ইয়েস' ছাড়া কিছুই বলিনি।

ইলুদি বলল, 'কে ফোন করল? সেই পাজি লোক? বেশ করেছ,.কথা বলনি।'

'আমি বলিনি তো নয়, বলার চান্স দেয়নি।'

'সে যাই হোক। ওর সঙ্গে আর একটাও কথা নয়।'

আবার একটা ফোন এল।

'নিশান, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।' ইলুদি বললেন।

'নমস্কার। নবনীতা বলছি। হ্যাঁ, বলুন? বলুন? অ্যাঁ? বয়েস? হঠাৎ? ওটা পাসপোর্টেই তো আছে। ওরা? আমাকে কখনও দেখেনি। কেন বলুন তো?'

'পার্সোনাল কারণে? আমার বয়েসটা আপনিই জানতে চাইছেন, আপনারই পার্সোনাল কারণে? অ। কী? আমি ইলুদির ছোট বোনের চেয়ে বয়সে ঠিক ক'বছরের ছোট? আমি আপনার কথা ঠিক শুনছি তো? ঠিক? — মাত্র পাঁচ বছরের। কেন বলুন তো? কী বলছেন? — বেঁচে গেলেন? মানে? কী ব্যাপার বলুন তো? কিছুই বুঝতে পারছি না। এর সঙ্গে হাওয়া-ই-হিন্দের যোগ আছে কি? আছে? কী বলুন তো?'

'ওঃ। হাঃ হাঃ হাঃ। সত্যি। না না না ঠিক আছে, ঠিক আছে। থ্যাংকিউ, থ্যাংকিউ। আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। কিছু মনে করবেন না মিস্টার পটেল।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। দেব ইলুদিকে? আচ্ছা রাখছি। থ্যাংকিউ।'

ইলুদির মুখের চেহারা অস্থির।

'কী বলছিল নিশান?'

'কিছু না। উনি বলছিলেন, আমার বয়স কত।'

'কেন? কী দরকার? হঠাৎ? মেয়েদের বয়েস দিয়ে নিশানের কী দরকার?'

'আমিও তো তাই ভাবছি। তা ..উনি বললেন...'

'অত হেস না। আগে বল কী ব্যাপার।'

'উনি প্রথমেই বললেন, 'আপনাকে মহারাজা এয়ারওয়েজে কেউ দেখেনি তো?' আমি বললুম— 'না, কিন্তু কেন?' তখন উনি জানতে চাইলেন, অপুর চেয়ে আমি ঠিক কত বছরের ছোট। মাত্র পাঁচ শুনে খুব নিশ্চিন্ত হলেন।'

'কেন? কেন? কেন?'

'উনি বললেন, আমি এক্ষুনি ওদের জেনারেল ম্যানেজারকে বলেছি, যে আপনি আমার পঁচিশ বছরের পুরনো বন্ধু। তারপরেই দুর্ভাবনা হল— কে জানে আপনার বয়স কত? অ্যাট অল পঁচিশ হয়েছে কিনা? অপুর থেকেও ছোট যখন! তাই জানতে চাইছিলাম।'

'এ— ই, হাঃ হাঃ হাঃ—'

'এই।'

'নিশানটা যা ছেলেমানুষ রয়ে গেছে না, সত্যি? কে বলবে অতবড় চাকরি করছে।

'উনিই ঠিক পারবেন, মনে হয়।'

'তা পারবে না? কোকাকোলা কোম্পানি যদি তেমন চাপ আনে, হাওয়া-ই-হিন্দ হাওয়া হয়ে যাবে। হুঁঃ...'

'দেশে তো উল্টো হল। কোকাকোলা তো—'

আধঘণ্টা বাদে আবার ফোন। আমিই ধরি।

'এই যে ডক্টর সেন। নেক্সট স্টেপটা কি পেন্টাগন?'

'তার মানে?'

'দস্তুরিকে দিয়ে হল না, এবার দেখছি কোকাকোলাকে দিয়ে চাপ আনা হচ্ছে। ওসব ওপরওলাদের দিয়ে কিছুই হবে না। সাকুল্যে চল্লিশ ডলার আপনার কপালে নাচছে। যে যাই বলুক না কেন, আমি তাদের ঠিক বুঝিয়ে দেব। আইন আমার দিকে। যতই যার দড়ি-খিঁচবার শক্তি থাক না কেন। লাভ হবে না।'

'কোন আইনেই মালভর্তি বত্রিশ ইঞ্চি চামড়ার স্যুটকেসের ওজন দু কেজি হয় না, গিজদার। আমিও দেখে নেব।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। আমার বসকে ধরা হয়েছে। এত বড় আস্পর্ধা।'

'এর পরে যে কী করব, তা তো জানেন না।'

'এর পরে আপনি যাই করুন, পেন্টাগনকে দিয়ে বলান, আর হোয়াইট হাউসকে দিয়েই বলান, ইউ গেট ওনলি ফর্টি ডলারস। নট এ সেন্ট মোর, সী?'

১৫

'এত বড় কথা?'

এবার সুহাসদাও আর সইতে পারলেন না।

'দাঁড়াও মজা বের করে দিচ্ছি। তুমি কবে যাচ্ছ? পরশু? তার দরকার নেই। যাওয়া ক্যানসেল কর। পরশুদিনই আমাদের বিদেশমন্ত্রী নিউইয়র্কে আসছেন। ইউ এন-য়ে তাঁর

রিসেপশন আছে। তোমাকে আমি সেখানে নিয়ে যাব। সেখানে তুমি নিজেই তাঁকে প্রবলেমটা বলবে। — দয়া করে উনি যদি ওদের একটা ফোন করে দেন, দেখি কোন শালা হাওয়া-ই-হিন্দ তোমাকে চল্লিশটি ডলার ঠেকায়, দু-দুখানা মালভর্তি বাক্স হারিয়ে দিয়ে।'

'একটাকে তো—'

'ওটা পাওয়া নয়। ওটা অ্যাকসিডেন্ট।'

'তবু—'

'ফরগেট ইট।' কিন্তু সুহাসদা প্রকৃতপক্ষে বড়ই এভার-সৎ ভালমানুষ বঙ্গসন্তান। শেষ পর্যন্ত 'অধম' করতে সাহস নেই। অতএব পাঁচ মিনিট পরেই— 'ঠিক আছে। তোমার কথাই থাক। উই শ্যাল ওভারলুক দেয়ার শ্যাবি ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ব্ল্যাক কেস, কিন্তু ব্রাউনটার জন্য বলতেই হবে বিদেশমন্ত্রী মশাইকে। হুঁ হুঁ, দেখি কেমন করে না দেয় বেটারা!'

সুহাসদার কথায় বাধা দেন ইলুদি· 'কিন্তু নিশান তো বলেছে, ফলো আপ চালিয়ে যাবে। ল'-এর সাহায্য নিতে হলে তাও নেবে। ও বলছে, ঐ বাক্সটাকে মাত্র দু কেজি বলবার মধ্যেই ওদের মরণবাণ লুকিয়ে আছে। ওটা ইমপ্রবেবল একটা সিলি থিওরি। কেননা, নিশান সব দেখে বলল ওদের কমপ্লেন্ট-ফর্মটাতেই বাক্সটার বর্ণনায় আছে, ওটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে কত। তাতেই ৬/৭ কেজি ওজন অন্তত হয়। শূন্য হলেও। ভেতরে কী কী আছে, তারও তালিকা দেওয়া আছে। তারও ওজন ঠিক করে দেওয়া যাবে খুব সহজেই। নিশান বলেছে, হিন্দ-ব্যাটাদের আর কিছুতেই এসকেপ নেই। মিনিমাম চারশ ডলার ফব ঈচ কেস। তার ওপর পেনালটি ফর দা বদারেশন। মন্ত্রীকে এসবের মধ্যে জড়িয়ে কী হবে? মশা মারতে কামান?'

'সে নিশান যেটা করে করুক না? এখানে যা চলছে তা চলুক না? তা বলে নবনীতা এতবড় সুযোগটা ছাড়বে কেন, ওদের কড়কে দেবার? উনি তো ওর ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্টই পরিচিত— সেই যে লিখেছিল না ওর কুম্ভমেলার গল্পে? ও একবার মিনতি করে মন্ত্রীমশাইকে বললেই, উনি ভডকে দেবেন নিশ্চয়—'

'যখন ওঁকে চিনতুম, তখন তো মন্ত্রী ছিলেন না। এখন কি চিনবেন? কে জানে'

'খুব চিনবেন। দাও বুকিং ক্যানসেল করে।'

'গোল বাধাল হাওয়া-ই-হিন্দ। বুকিং ক্যানসেল করা গেল না। তাহলে আরও একহপ্তা বসে থাকতে হবে নেক্সট বেস্পতিবারের ফ্লাইটের জন্যে। রাও আমায় এককালে স্নেহ করতেন বলে 'বকে দাও' বললেই যে আজ তিনি কাউকে বকে দেবেন তার কোনই ঠিক নেই। — তার জন্যে এত কাণ্ড করে থেকে যাব?'

'দেবে দেবে। কেন দেবে না? শুধু-শুধুই গোলমাল করছ তুমি। অকারণ বজ্জাতি করছে·হাওয়া-ই-হিন্দ।'

'অথচ ওরাই আগে কত হেলপফুল ছিল।'

'দোষটা কোম্পানির তো নয়। দোষটা হচ্ছে ইনডিভিজুয়াল-এর। বাক্স তো হারাতেই পারে। তা বলে এই দুর্ব্যবহারটা কেন?'

'চিটিংবাজিই বা চালাবে কেন?'

'না দিয়েছে অ্যাপলজি চেয়ে চিঠি, না দিয়েছে ক্ষতিপূরণ, প্রথম থেকেই ব্যবহারটা যা করছে— সেই মোটেলে পাঠানোর কথাটাও যেন রাওকে বলতে ভুল না-'

'দেশের নাম ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে—'

'সেটা দিচ্ছে বলে মনে হয় না। এই আচরণটা নিশ্চয় রিজার্ভড ফব দেশওয়ালী ভাইয়োঁ ঔর বেহেনোঁ। ফরেনারদের সঙ্গে ওদের রেড কার্পেটের সম্পর্ক। তখন আলাদা মূর্তি দেখবে ঐ গিজদারেরই।'

'যত ডাবল স্ট্যানডার্ড— শুধু ইনডিয়ার বৈশিষ্ট্য।'

'এবার মন্ত্রীমশাই এসে বাঁশটি দেবেন, তখন উচিত-শিক্ষা হবে গিজদার বাছাধনের।'

১৬

কিন্তু আমার লজ্জা করল।

ফ্লাইট ক্যানসেল করে একহপ্তা চাকরি কামাই করে, পরের বাড়িতে বসে থেকে কী করছি? নালিশ করে বালিশ পাচ্ছি! দূর! পাগল নাকি! ওই নিশানই যা করেন করুন। কাগজপত্র থাক। আমি চলে যাই। এতক্ষণে ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। এই জিনিসগুলো যদি কোন দিনই না থাকত? — মা'র ফিলসফিটা মনে করবার চেষ্টা করি। যাবার আগে গিজদারকে ফোন করে বলে যাব বরং কাল বাক্সর গল্পটা। ওটা ভেতরে খোঁচাচ্ছে। —ওদের জানা দরকার ইউনাইটেড কত দায়িত্বহীন।

'হ্যালো। মি. গিজদার?'

'এখনও যাননি? এখনও এখানে? পেন্টাগন কী বলল?'

'আপনি কি জানেন, আমার কাল বাক্সটা এখন কোথায়?'

'আপনারই কাছে।' —গলায় অসীম ধৈর্য গিজদারের।

'কী উপায়ে এল, ওটা আমার কাছে? সেটা জানেন কি?'

'আমরাই ডেলিভার করেছি আপনার দরজায়। মনে পড়েছে?'

'কে বলল আপনাকে এই খবরটা, গিজদার?'

'আমার কাছে সমস্ত কাগজপত্র মজুত আছে। বাজে বকবক কববেন না ম্যাডাম। আমরা ব্যস্ত।' খটাং করে রিসিভার নামানর শব্দ।

সত্যি কথায় কারুর প্রয়োজন নেই। একে বলার আর দরকার নেই, বাক্সটা কী করে পেয়েছি। সত্য সেলুকাস। কী দায়িত্ববান এই কোম্পানি! দুটো বাক্সর জন্যেই পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপূরণ চাওয়াই এদের যোগ্য উত্তর হবে। বেশ তাই করব। দেখাক গিজদার কী তার কাগজপত্র।

ইলুদি, সুহাস, কাপাদিয়া, নিশান, পটেল, টুনুদা, এককালে তিনি আবার হাওয়া-ই-হিন্দেরই একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন— এখন অবসরপ্রাপ্ত, সবাই বললেন, থেকে যাও। বিদেশমন্ত্রী একবারটি বললে ওরা ঝেড়ে কাশতে বাধ্য হবে। হয় বাক্স, নয়ত ভালরকমের উচিত খেসারত অবশ্যই পাবে। কিন্তু আরও থাকতে আমি কিছুতেই রাজী নই। বাক্স যাকগে চুলোয়। জীবনের যেটুকু অমূল্য সৌরভের জন্যে এই আয়াস, আয়াসেই তার সুরভি সব ধ্বংস করে দিচ্ছে।

কিন্তু এখন আমি আর বাক্স চুলোয় যাক বললেই বা কী হবে? এটা রীতিমত একটা জনগণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ লড়াই মানের লড়াই। এ এখন চলছে— চলবে, স্টেজে চলে গেছে। অতএব, উঁহু ছাড়া চলবে না। টুনুদা স্বয়ং ফিলডে নামলেন, 'দিল্লীতে তো তুমি নামছই। সোজা চলে যাও-ট্যুরিজমের মন্ত্রীকে ধরগে। ওঁর টেলেক্স তাগাদা এলে বিদেশমন্ত্রীর চেয়েও ভাল ফল হবে। উনিই ওদের খাস মনিব কিনা? আবার ভুলে যেওনা যেন, কোন মন্ত্রী, তুমি যা ভুলো, খেয়াল রেখো— দিল্লিতে, ট্যুরিজমের মন্ত্রী। এ-ঠ্যালা সামলান গিজদারের এলেমে কুলোবে না।'

এবার সবাই বললেন— 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই সবচেয়ে সোজা হবে। সেটাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। অমনি কনফারেন্স বসল। সবাই মিলে আমার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বর্গের সিঁড়িও তৈরি করে দিলেন। কোথায় গিয়ে কাকে ধরলে কার কাছে যাওয়া যাবে। কোন ধাপে পা রেখে কোন বারান্দায় উঠলে শেষ অবধি ট্যুরিজম মন্ত্রীর মসনদের সামনে পৌঁছুব। খাতা খুলিয়ে ফোন নম্বর ঠিকানার পর ঠিকানা লিখিয়ে দিলেন বন্ধুরা মিলে। এই ব্যাপারে সমবেত টিউশন এতটা নিখুঁত হলে যাতে ডিস্টিংশনে পাস করা বিষয়ে সন্দেহ রইল না। দিল্লিতে মাত্র একদিনের মধ্যে কাজটি উদ্ধার হয়ে যাবেই। এবং তারপর, হিন্দ সামলাক ঠ্যালা।

১৭

প্লেনে বসে বসে মনে হতে লাগল: 'নিয়ে নিলেই হতো চল্লিশ ডলার! শেষ পর্যন্ত তো কিছুই পাব না। আমার যা অলস স্বভাব, একদিন কেন, গোটা একমাস দিল্লিতে থাকলেও ঐসব মহান ব্যক্তি, যাঁদের নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বরে আমার ডায়েরি ওঁরা ভরে দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে না। মন্ত্রী পাকড়ান আমার কম্মো নয়! ও বাক্সটা জলেই গেল। দেখি, কলকাতা গিয়ে প্রসূন, কিংবা চাওলাকে ধরব।'

এসব ভাবতে ভাবতে, আর বীভৎস একটা নির্বাক সিনেমা দেখতে দেখতে (পয়সা দিয়ে হেডফোন নিইনি, তাই শুনতে হচ্ছে না) আর অল্প অল্প ঘুমোতে ঘুমোতে হীথরো এসে গেল। এখানে চারঘন্টা বিশ্রাম।

নেমেই ট্রানজিট লাউনজে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের টেলিফোন করতে লাগলুম। হাওয়া-ই-হিন্দ-এও ফোন করে বাক্স-হারানর ডিটেলস দিলুম। ওরা বলল, হ্যাঁ, নিউইয়র্ক থেকে কয়েকটা টেলেক্স এসেছিল বটে কিন্তু বাক্সটার নো-ট্রেস।

এবার মন খারাপ করে লাউনজেই ঘুরছি। নানান এয়ারলাইনসের ছোট ছোট কাউন্টার আছে এই ট্রানজিট লাউনজে। — হঠাৎ দেখি, হাওয়া-ই-হিন্দের কাউন্টারে একটি স্বদেশী তরুণ ঠ্যাং টেবিলে তুলে নিজের মনে হ্যাডলি চেজ পড়ছে।

অমনি মনে হল, যাই, ওকেই বলে দেখি। ওই ইউনাইটেডের মতন এখানেও যদি কোনও আনক্লেমড ব্যাগেজের গুচ্ছ পড়ে থাকে, আর আমার বাদামী ফেদার ওয়েটটি যদি সেখানেই জমা পড়ে থাকেন? কপাল বলে কথা। কিছুই তো বলা যায় না? ছেলেটি ব্যস্ত নেই যখন, তখন ওকে ধরতে দোষ কী?

সত্যি সত্যি, একটা কাজ পেয়ে সে ছেলেটা দেখি মহা খুশি। সিন্ধি ছেলে। এয়ার ট্রাফিকে কাজ করে। ঠিক যেমন নিউইয়র্কে বেদী। এখানে তেমনি এই, নিজহানী। কী চমৎকার ছেলে! আমার কমপ্লেন্ট ফর্ম আর টিকিট, দুটোই ভাল করে নেড়েচেড়ে, ঘেঁটে দেখে, বলল— 'ওরা ওই 'বিশ কেজি' ওজনটা পাচ্ছে কোথায়? হীথরো-টু-নিউইয়র্ক তো মাল ওজন করা হয়নি?'

'তবে কেন বলছে, যে—'

'ওটা তো মাত্র একটা স্যুটকেসের ওজন। কলকাতা থেকে তো একটাই এসেছিল হীথরো অবধি। সেটা বিশ কেজি ছিল। ও হিসেব দমদম-হীথরো সেকটরের। ওটা ক্যানসেলড। এখান থেকে গেছে দুটো। ওজন না-করা বাক্স। চল্লিশ কেজি তো ধরাই যায়। একটা যদি আঠার হয়, অন্যটা হবে বাইশ? তারও দরকার নেই। পিস-কনসেপ্টে একটা বাক্স ত্রিশ কেজি পর্যন্ত ধরে নেওয়া যেতে পারে। ওজন যেহেতু করা হয়নি; আপনি ক্লেম হাজির করবেন ত্রিশ কেজির জন্য। পেয়ে যাবেন। কালটা অবশ্য, —যখন লাকিলি পেয়েই গেছেন— আর না-ঘাঁটাই উচিত। তবে যেভাবে পেয়েছেন সেটা মিরাক্ল ছাড়া কিছুই না।'

'ভাই নিজহানী, যদি কালটার মত বাদামীটাও পেয়ে যাই? মিরাক্ল তো বারবার ঘটে? আমি ছশ ডলার চাই না-বাক্সটা চাই। ওই বাক্সে আমার খুব জরুরি একটা জিনিস আছে ভাই। একটু খুঁজে দেখবেন? এদিকে ওদিকে? যদি কোথাও পড়ে থাকে, ওই কালটার মতন? দি গ্রেট ব্রিটিশ এয়ারলাইনসের বাসে চড়ে এয়ারপোর্ট এসেছি, তাদেরই কাউনটারে বাসে বাক্স জমা দিয়েছি। হয়ত তাদেরই কোন প্লেনে উঠে অন্যত্র চলে গেছে? কিংবা পড়ে আছে লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড গুদামে? কিংবা আনক্লেমড কাউন্টারে?'

'আমি অবসর সময়ে খুঁজে দেখতে পারি পার্সোনালি। আমাকে বরং একটা তালিকা দিয়ে যান জিনিসপত্তরের। আর বাক্সর বর্ণনা।'

'এই লিস্ট তো অকেজো। ইনডিয়ানদের সব বাক্সতেই শাড়ি থাকবে, শাল থাকবে, জুতো থাকবে। ডিটেইলস কই? কী-রকম শাড়ি? দুএকটার বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিন।—

সুমনের সই করা বাটিকের শাড়ি, লাল কাশ্মীরি শালের ড্রেসিং গাউন, বাদামী টেম্পলশাড়ি— যা যা মনে পড়ল বললুম। ছেলেটা অধৈর্য হয়ে বলে—

'এনিথিং স্পেশাল? সামথিং দ্যাট মে আইডেনটিফাই দিস কেস অ্যাজ ইওরস?'

'এনিথিং স্পেশাল?' — বুকের মধ্যে ধড়ফড় করতে থাকে— ওকে বলব? ওকে বললে ক্ষতি নেই। বলেই দি, — যদি এতে পাওয়া যায়?

'ইয়েস। দেয়ার ইজ সামথিং ভেরি স্পেশাল। একটা সিল্কের স্কার্ফ জড়ান, একটা প্লাস্টিকের থলিতে ভরা আ বাঞ্চ অফ লেটার্স ইন বেঙ্গলি।' যার জন্যে এত হাহাকার— যার জন্যে এই অসীম চেষ্টা— সেই গোপন কথাটি শেষ পর্যন্ত নিজহানীকে বলে ফেলতে হল। কেন এই বাক্সটার জন্য মাথাকোটা। এ জীবনে যা আর ডুপ্লিকেটেড হবে না।

'বাঞ্চ অফ বেঙ্গলি লেটার্স...র‍্যাপ্ট ইন আ সিল্ক স্কার্ফ...গুড। ভেরি গুড। এতেই হবে। দেখি, কী পারি।' নিজহানী উপদেশ দেয়— 'জীবনে আর এভাবে কদাচ নাম-ঠিকানাবিহীন বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না। ওপরে তো বটেই— বাক্সর ভেতরেও একপ্রস্থ নাম ঠিকানা লিখে রাখবেন। ওপরেরটা অনেক সময় ছিঁড়েখুঁড়ে যায়। দেশের ঠিকানা রেখে যান। আমি খুঁজতে চেষ্টা করব। ঘাবড়াবেন না ম্যাডাম। হয় বাক্স, নয়তো ত্রিশ কেজির ক্ষতিপূরণ, এ আপনি নিশ্চয়ই পাবেন।'

১৮

কেবল চিঠির অংশটা বাদ দিয়ে বিশিষ্ট বস্তুটি কী? না 'এ বুক অফ বেঙ্গলি পোয়েমস' বলে গল্পটা রুনুদিকে বললাম।

রুনুদি শুনে বলল— 'সত্যি সত্যি তো কপালেই ঘটেও বাপু! তা দুটোই হারিয়েছিস, এটা তো সত্যি নয়? ফেরত পেয়েছিস তো বাবা একটা। অবশ্য পার্থরটা না পেয়ে, নিজেরটা পেলেই ভাল হত, কি বল? তা যেটা কিনলি হাওয়া-ই-হিন্দের পয়সায়, সেইটে কেমন দেখি?'

ইতিমধ্যে বেশ খানিকক্ষণ হল দাদামনিও এসে পড়েছেন, রুনুদিকে নিয়ে যেতে।

নতুন বাক্স দেখে রুনুদি বলল, — 'ওমা। এই? এর চেয়ে একটু ভাল দেখে কিনতে পারলি না? পরের পয়সাতেও কিপটেমি? স্বভাব যাবে কোথায়।'

দাদামণি বললেন, 'এবার থেকে যেখানেই যাবি, 'ক্যারি-অন-ফ্লাইট' ব্যাগ নিয়ে যাবি। আর তাতে কেবল নাইলন কাপড়।'

রুনুদি ফুটুনি কাটে, 'আর ভাল কাপড়-চোপড় তো রইলও না বিশেষ। কুম্ভে কতগুলো ভাল কাপড় জলে চুবিয়ে শেষ করে আনলি, আর এখানে তো বাকীগুলো জন্মের শোধ ঘুচিয়েই এসেছিস।'

আমিই এবার পজিটিভ একটা স্টেটমেন্ট করি। 'তবু লাভ এই যে শিক্ষাটা হল!'

দাদামণি এক হুংকারে সেটা উড়িয়ে দেন। 'আর শিক্ষা। যাইহোক, অ্যাপ্লিকেশনটা করে ফেল তাড়াতাড়ি। দেরিটা যেন করো না। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা তো করলে না দিল্লিতে। করলেই ঠিক হত। একটা চিঠি অন্তত দিয়ে দাও। তাইতেই হয়ত কাজ বেশি হবে।'

'দেখি।'

দাদামণি অধৈর্য হয়ে পড়েন। 'দেখি দেখি করে দেরি করিসনি খুকু— অ্যাপ্লিকেশনটা করে দে। ঐ নিজহানী যেমনটি বলেছে, তেমনি করে।'

'করব।'

দাদামণি যাবার সময়ে বারবার তাড়া দিয়ে গেলেন— 'করব করব নয়। এক্ষুনি অ্যাপ্লাই করে ফেল।'

ঠোঁট উল্টে মামণি বললেন— 'যা গেঁতো, ও আর করেছে অ্যাপ্লিকেশন। যদিও-বা লেখে, সেটা ওর টেবিলেই থাকবে। ডাকে আর যাবে না।'

১৯

কলকাতায় এলে যা হয়। কাজকর্মে, রোগে-রাগে অনুরাগে বাক্সটা উদ্ধারের চেষ্টা আর হল না। মনে মনে ধরে নিলুম-যা গেছে তা গেছেই। চিঠির চেয়ে বড় জিনিসই তো— চলে গেছে। আর চিঠির জন্যে কেঁদে কী হবে। এই উল্টোপাল্টা দুঃখ করা কাঁদুনি-গাওয়া এবং সহানুভূতি না-পাওয়াতেই গল্প শেষ হত, যদি-না হঠাৎ একটা টেলিফোন আসত হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে। ফেরার পর মাস তিনেক হয়ে গেছে তখন।

'ডক্টর সেন? একটা মেসেজ এসেছে আপনার জন্য। মি. নিজহানীর কাছ থেকে।'

'কার কাছ থেকে?'

'মি. নিজহানী লণ্ডনের।'

'তিনি কে?'

'হীথরোতে এয়ার ট্র্যাফিকে কাজ করেন—'

'ও হো, হ্যাঁ হ্যাঁ— বলুন, কী মেসেজ?'

'আপনার বাক্সটা পাওয়া গেছে।'

'অ্যাঁ।'

'উনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন, দু'তিনদিনের মধ্যেই পাবেন।'

'অ্যাঁ।'

'এলে আমরা আবার খবর দেব।'

'ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।'

'এ তো কর্তব্যমাত্র।'

দু-দিনের মধ্যেই বাক্স এসে গেলো। শীলমো র করা অবস্থায়। আমাকে দমদমে গিয়ে কাস্টমস ক্লিয়ার করিয়ে আনতে হল। ইনট্যাক্ট আছে। সব আছে। সেগুলোও কিছু এদিক-ওদিক হয়নি। নিজহানীর মুখখানা কিছুতেই মনে পড়ল না। কেমন দেখতে ছিল ছেলেটাকে? এ-বাক্স কোথায় পেল সে? কী করে উদ্ধার করল? সেদিনই একটা কাজে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে দক্ষিণে রওনা হচ্ছি। চিঠিপত্রের বাক্স খালি করে ব্যাগে ভরে নিলুম। ট্রেনে উঠে দেখি, আরে দাদামণি যে! দাদামণিও যাচ্ছেন সঙ্গে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত।

চিঠিপত্রগুলো খুলতে খুলতে দেখি মহারাজার দুটো চিঠি এসেছে। একটি হাওয়া-ই-হিন্দ হীথরো থেকে, আরেকটি হাওয়া-ই-হিন্দ নিউইয়র্ক। দাদামণি বললেন— 'হীথরোটাই আগে খোল।' মোটাসোটা মোড়ক। নিজহানীর নিজহাতে লেখা লম্বা চিঠি। দাদামণি বললেন, 'জোরে জোরে পড়, শুনি।'

'ম্যাডাম, আপনি হয়ত আমাকে চিনতে পারবেন না। কিন্তু আমি আপনার বাক্সের কথা ভুলিনি। ঐ দু কেজির ব্যাপারটা মনে হলেই ভয়ানক রাগ ও লজ্জা হত। এরকম লোকদের জন্যেই কোম্পানির নিন্দে হয়। তাই হাতে সময় থাকলেই আমি গ্রেট ব্রিটিশের এবং হাওয়া-ই-হিন্দের লস্ট প্রপার্টি আর আনক্লেমড ব্যাগেজ এর ওয়্যারহাউসে ঘুরে আসতাম। একদিন দেখি একটা বাদামী বিলিতি কেস আপনার সেই বর্ণনামত, চারটে দেশি ক্লাম্পস আঁটা তাতে। নাম লেখা আছে মিসেস কাপুর। কিন্তু তিনি ওটা রিফিউজ করেছেন। এসেছে টোকিও থেকে। আমি তখন আপনার কাগজপত্তর নিয়ে গিয়ে ওটা খোলানোর ব্যবস্থা করলাম। খুলে দেখি হ্যাঁ, এই তো রয়েছে আপনার', ইয়ে, (একটু কেশে নিয়ে বলি): 'বুক অব বেঙ্গলি পোয়েমস র‍্যাপ্ট ইন আ সিল্ক স্কার্ফ—' (খুব একটা মিথ্যে বলাও হয় না। যে-চিঠির গুচ্ছটি হারাতে বসেছিলুম, তা কি কবিতার চেয়ে আলাদা?) 'ব্যস, আর সন্দেহ রইল না। টেলেক্সটা পাঠিয়ে দিলাম। আপনি খুবই ভাগ্যবতী। আমিও। যে আপনাকে সত্যিই সাহায্য করতে পারলাম। আপনি কখনও জাপান ও কানাডা গেছেন কিনা জানি না, কিন্তু আপনার বাক্সটি ভ্যাঙ্কুভার, টোকিও দুই-ই ঘুরে এসেছে। আশা করি ঠিকমত পাবেন সব কিছু। ইতিমধ্যে কি টাকাটাও পেয়ে গেছেন? পেলেও ক্ষতি নেই। স্যরি ফর দ্য ট্রাবল। প্রীতি নমস্কার নেবেন। আপনার, বিশ্বস্ত, নিজহানী।'

দাদামণিকে চিঠিটা পড়ে শোনাতে হল পুরোটা। ভাগ্যিস ওঁর চশমা স্যুটকেসে। পড়তে চাইলেই তো হয়ে গিয়েছিল। দাদামণি বললেন— 'জামাই করবার মত যুবক। কিন্তু তোমার কন্যারা এখনও জামাই পাবার যোগ্য হয়নি এই যা দুঃখ। কি? কবিতার খাতাটা হারিয়েছিলে বুঝি? তাই অত আপসোস? যাক, এবার অন্যটা পড়।' অন্যটা এসেছে আইখমানের কাছ থেকে। যিনি বলেছিলেন আমি কিছু জানি না, গিজ্জদারকে বল। খুবই বিনীত চিঠি। খানদানী কাগজে, আই. বি. এম. টাইপরাইটারে, ছাপার হরফে।

'প্রিয় ডক্টর সেন,

আমরা খুবই দুঃখিত যে আমরা অনেক চেষ্টা করেও আপনার এত নম্বর (বাদামী) এবং এত নম্বর (কাল) স্যুটকেস দুটির কোনটিকেই ট্রেস করতে পারছি না। এ দুটির জন্য যথাযোগ্য রিজনেবল ক্ষতিপূরণ নিশ্চয়ই আমরা দেব। এ বিষয়ে দিল্লিতে অমুক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি। আপনার অসুবিধা সৃষ্টির জন্য হাওয়া-ই-হিন্দ যারপরনাই দুঃখিত। আশা করি অবিলম্বেই সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে। ইতি। আন্তরিকভাবেই আপনার ইত্যাদি।'

বুঝলুম একগুঁয়ে নিশান পটেল সত্যি সত্যিই হাওয়ার পশ্চাদ্ধাবন করছেন।

পেন্টাগনে কি বিদেশমন্ত্রকে যেতে হয়নি, বিশুদ্ধ কোকাকোলার বোতলই যথেষ্ট হয়েছে। কলকাতায় কে না জানে সোডার বোতলের মহিমা? ইলুদির জয় হয়েছে।

দাদামণি বললেন— 'দাও এবার অ্যাপ্লিকেশনটা ঠুকে। ওদের ডান হাত কী করছে বাঁ হাত জানতে পারে না। হীথরো কী করছে জে. এফ. কে. যেমন জানে না, তেমনি দমদমে কী হল, তা পালামে জানবে না। দাও, দু-খানার জন্যে ত্রিশ-ত্রিশ ষাট কেজি, ইনটু কুড়ি ডলার, ইজ ইকুয়ালটু বারোশ ডলার, এক্ষুনি অ্যাপ্লাই করে দাও। দেরি নয়। শালারা পাকা চোর। বাটপাড়ি করলে ক্ষতি নেই।'

বাটপাড়ি করবার বদ ইচ্ছেটা বোধহয় মাথায় ঢুকেছিল। নইলে ভগবান শাস্তি দিলেন কেন?

বাঙ্গালোরে নেমেই ব্যাগসুদ্ধ চুরি হয়ে গেল। সে দুখানা চিঠিও গেল, ফেরার টিকিটও গেল, সভার পেপারখানাও গেল। ব্যাগটা আর উদ্ধার হয়নি। কে দেবে? বাঙ্গালোরে তো কোন নিজহানী নেই, নিশান পটেলও নেই। এমনকি দাদামণিও না।

রুনুদি যখন বাঙ্গালোরের গল্পটা শুনবে, কী বলবে কে জানে? আর মামণিই বা বলবেন কি?

জগমোহনবাবুর জগৎ

কলকাতা এসেছি দিন কয়েকের জন্যে। কাকার কাছেই উঠব। কাকা বছর কয়েক হল বাড়ি করেছেন নিউ আলিপুরে। একটু ভেতরদিকে, বাস থেকে নেমে রিকশা নিয়ে যেতে হয়।

দুপুর নাগাদ কাকার বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখি বাড়ির সামনে মস্ত জটলা। আফটারনুনে রিটায়ার্ড রিকশাওয়ালা, বাকস হাতে নাপিত, চাবির গুচ্ছ হাতে চাবিওলা, ছোট খুকির হাত ধরে বিস্ফারিত নেত্র অন্ধ ভিক্ষেওলা এবং অগুন্তি ঝাড়া হাত পা ভিড় করনেওলা— রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই দুপুর রোদে ঊর্ধ্বমুখী তপস্যা করছে। কারুর মুখে রা নেই। ব্যাপার কী?

কিছু দেখছে। কী দেখছে?

আরে সর্বনাশ। এ কী কাণ্ড?

কাকার বাড়ির পাশের উঁচু পাঁচিলে মই লাগিয়ে চড়েছেন পক্ককেশ এক বৃদ্ধ, তাঁর পরনে কেবল একটা আজানুলম্বিত গামছা, এবং একগুচ্ছ উপবীত। এবং হাতে একটি দীর্ঘ বাঁশ। বাঁশটা দিয়ে নিষ্ঠাভরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উনি আমার কাকার দোতলার ঘেরা বারান্দার একটি জানলার কাচের সার্সি ভাঙবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু ওঁর হাতের টিপ ভাল নয়। এবং জানলাটার খিল দেওয়া নেই বলে সেটা বাঁশের খোঁচায় সরে যাচ্ছে। রেজিসট্যান্স নেই, কাচও ভাঙা যাচ্ছে না।

এই রোমহর্ষক দৃশ্যে পথচারীদের মহা উৎসাহ এবং কারুর কোনও উদ্বেগ আপত্তি নেই। এমনকি কাকার বাড়ি থেকেও কাক-পক্ষীটির সাড়াশব্দ হচ্ছে না। এই মহতী জনসভা ও তার সভাপতিকে দেখে বেশি কিছু ভাববার আগেই আমি শুনতে পেলুম রিকশায় বসে বসেই আমি বিকট চেঁচাচ্ছি—

অ কাকা। অ কাকীমা। তোমরা কি সব মরে গ্যাছো নাকি? এই লোকটা যে তোমাদের জানলা দরজা সব ভেঙে ফেললে—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোতলার বারান্দায় দৌড়ে এলেন কাকীমা, ময়দা মাখছিলেন,

দু'হাতে ভিজে ময়দার তাল আর দু'চোখে বিশ্বের বিস্ময়।

বেরিয়েই কাকীমা ফ্রিজ শট।

তারপর শুরু হল স্লো মুভমেন্ট। এবং সাউনড।

প্রথমে সস্নেহে—খোকা এসে গেছিস? আয় ভেতরে আয়। তারপর বজ্রনির্ঘোষে —বলি ও জগমোহনবাবু। ওটা কী হচ্ছেটা কী শুনি? বাঁশটা ফেলে দিন।

কাকীমার বাজখাঁই আওয়াজে কেঁপে উঠে জগমোহনবাবু, পাঁচিলের ওপর থেকে পড়তে-পড়তে বাঁশের সাহায্যে অতি চমৎকারভাবে ভারসাম্য সামলে নিলেন। দর্শকদের মধ্যে বাঃ বাঃ শব্দটা শোনা না গেলেও অনুরূপ ভাবখানা ফুটে উঠল। রাস্তায় যারা দড়ি-হাঁটার খেলা দেখায় তাদেরও লজ্জা দিত জগমোহনবাবুর ঐ চকিত-চমকিত পটুত্ব।

জবাব না দিয়ে উনি বেশ আস্থার সঙ্গে পুনরপি স্বকর্মে মনোনিবেশ করলেন। কাকীমা এবার ধমক লাগাল—

—'নামুন বলছি এক্ষুনি পাঁচিল থেকে। পড়ে যাবেন যে। বাঁশটা ফেলে দিন।'

জগমোহনবাবু মূর্তিমান বিদ্রোহ। বাঁশও ফেলেন না, নামারও নাম নেই।

—'তবে রে? দাঁড়ান তো, দেখাচ্ছি মজা—' কাকীমা সবেগে ঘরে ঢোকেন এবং ময়দার তাল রেখে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করেন। এবার বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে বাঁশের ডগাটা চেপে ধরে ফেলেন। বাঁশ ধরে টানাটানি শুরু হতেই পাঁচিলে দাঁড়ান জগমোহন বাঁশটি ছেড়ে দেওয়াই মনস্থ করেন এবং হাঁকেন— 'হরি'!

অমনি জটলা থেকে একটি হাফ প্যান্ট পরা কিশোর ছিটকে চলে আসে পাঁচিলের সামনে। জগমোহন এবার হাঁকেন—

—'মই!' ছেলেটা গিয়ে মই চেপে ধরে। বীর পদক্ষেপে জগমোহন নামেন। নেমেই বলেন—

'ও-কাচ আমি ভেঙে দেবই!' ডান হাতে ঘুষি পাকান। ঘুষির বদলে চোখ পাকিয়ে বাঁশটা তুলে নিতে নিতে কাকীমা বলেন— 'ভেঙে দেখুন না একবার। অন্যের প্রপার্টি আপনি ভাঙলেই হল?'

—'বলি বাঁশটা নিয়ে নিচ্ছেন যে? বাঁশটা কি আপনার প্রপার্টি?'

—'যারই হোক এটা দিয়ে আমার কাচ ভাঙা হচ্ছিল। এটা আপনার জরিমানা।'

—'জরিমানা মানে? কাচ তো ভাঙেনি? ভাঙলেও জরিমানা নেই। ওটা ভাঙা আমার রাইট।'

এবার কাকীমার আত্মবিশ্বাস টলে যায়।

—'অন্যের কাচ ভাঙা আপনার রাইট?'

—'বলি মাসটা কী? খেয়াল আছে কিছু?'

—'মাস দিয়ে কী হবে?'

—'হবে, হবে। কী মাস এটা?'

—'মার্চ মাস বোধহয়। নারে খোকা?'

—'মাচ-ফার্চ নয় বাংলায় বলুন। কোন মাস?

—'চৈত্র।'

—'তবে? জেনেশুনে চোত মাসে আপনি জানালা খুলে রাখবেন, আর আমার ভাঙবার রাইট নেই?'

—'চোত মাসে জানলা খোলা যাবে না কোন, পঞ্জিকায় এমন বিধান আছে শুনি?'

—'রসিকতা ছাড়ুন। বলুন দিকি চোত মাসে কী হয়?'

এবার কাকীমা স্পষ্টত মুশকিলে পড়েন চৈত্র মাসে তো কত কী হয়।

—'কী হয়? মেলা? চড়ক? গাজন? নীলের ডপস গোষ্ঠ? বর্ষ শেষ উৎসব? রবীন্দ্রজয়ন্তী? কখনও কখনও দোলও হয়—' জগমোহনবাবু কেবলই মাথা নাড়েন। শেষে বলেন— 'আপনার মাথা আর মুণ্ডু। চোত মাসে কালবৈশাখী হয়। আর কালবৈশাখী হলেই আপনার ঐ জানালার কাচগুলো সব ভেঙে ভেঙে আমার প্রপার্টিতে পড়বে। আর আমরা আনপ্রিপেয়ার্ড ইনোসেন্টলি ঐ ভাঙা সার্সির টুকরোয় পা দিয়ে ফেলে রক্তগঙ্গা হবো। দেখতেই পাচ্ছেন আপনার ঝুলবারান্দার জানলার পাল্লা আমার গলির ওপরে খুলেছে। ও-জানালা আমি যদি ভাঙি, আমি লিগ্যালি ও-কে, বুয়েচেন? নইলে আর দিনদুপুরে, একগঙ্গা লোকের সুমুখে... হুঁঃ। শুনুন, নিজের প্রপার্টিতে এসে পড়া ফরেন জিনিস আমি নিশ্চয় ভেঙে দিতে পারি। যেমন গাছের ডালপালা। তেমনি জানলার পাল্লাই বা নয় কেন? ভেবেচিন্তে আগে থেকেই ভেঙে রাখলে আর পরে যখন-তখন কাচ ভেঙে হাত-পা কেটে উনডেড হবার ভয় থাকবে না। ওই দেখুন। প্রিপারেশন কমপ্লিট।' গলির দিকে আঙুল দেখালেন। চেয়ে দেখি গলিতে রেড কার্পেটের মতো করে চট বিছানো।

—'কাচ ভেঙে ওইতে পড়বে, ওইতে করেই গুটিয়ে নিয়ে গিয়ে কাবাড়িওলাকে বেচে দেবে। এবার বাঁশটা দিয়ে দিন। কাচটা ভেঙে ফেলি।' জগমোহনবাবু কনফিডেন্টলি হাত বাড়িয়ে দেন ওপর দিকে।

দুই চক্ষু কপালে তুলে, ময়দা মাখানো হাত গালে দিয়ে কাকীমা বললেন—

—'অ। বুঝিচি। কবে কালবৈশাখী উঠবে, তখন যদি আমার জানলা খোলা থাকে, তবে কাচ ফাটতেও পারে আর সেই ফাটল যদি বাড়ে তবে একদিন সার্সি ভেঙে যেতে পারে, আর সার্সি ভাঙলে সেই কাচের টুকরো আপনার গলিতে খসে পড়তে পারে, আর আপনি সেই ভাঙা কাচের ওপরে ইচ্ছে করে চোখ বুজে, জুতো খুলে হেঁটে-চলে বেড়িয়ে আপনার পা কেটে ফেলতে পারেন। তাই আগে থেকে সতর্ক হয়ে আপনি আমার নতুন জানলার সার্সিগুলো বাঁশ দিয়ে ভেঙে রাখছেন? বা, বেশ বেশ।

আজ বাদে কাল আপনার ছেলেটা বড় হবে, আমার মেয়ে তদ্দিনে বিদেশ থেকে ফিরতে পারে, আপনার ছেলে তার সঙ্গে ঘুরে-টুরে বেড়াতে চাইতে পারে, সে বড় কেলেংকারি হবে, আমিও বরং সাবধান হই। আপনার ছেলের হাত-পাগুলো এইবেলা

ভেঙে রাখি? তখন আর কষ্ট করে গুণ্ডা-টুণ্ডা লাগাতে হবে না।'

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে জগমোহনবাবু বললেন, 'এই তো আপনাদের লিগ্যাল নলেজ না থাকার ফল। ভুল অ্যানালজি ভুল আরগুমেন্ট, সব ভুল। দুটো কেস মোটেই এক নয়। যা বললেন তেমন কেস যদি হয় তখন লিগ্যাল যা যা করার আমি তা করব। সে যাক। আপনাদের জানলাটা আমি ভাঙবই। আজ না হোক, কাল। দিনে না হোক রাতে!'

—বলে গটমট করে বাড়িতে ঢুকে গেলেন জগমোহনবাবু। এতক্ষণ মই ঘাড়ে হরি অপেক্ষা করছিল, পেছু পেছু সেও ঢুকল।

কাকীমা একটু বাদে শপথ-কঠিন স্বরে বলেন,

—'কী করে কেউ ভাঙে আমার জানলা, আমি দেখব। জানলাটা খুলবই না।' আশ্চর্য! ও-বাড়ির জানলা থেকে জবাব চলে এল চটপট—'জানলা যদি নাই খোলে কেউ তবে আমিই বা ভাঙব কেন? আমার প্রপার্টির ওপরে ইনফ্রিনজমেন্ট না হলে তো লিগ্যালি আমি অন্যের জানলা ভাঙতে পারি না?' জগমোহনবাবুর পেছনে হরিও উঁকি মারছে।

—'লিগ্যাল কখন কেউই কারুর জানলা ভাঙতে পারে না'—এতক্ষণে আমি আসরে নামি। 'আপনি তখন থেকে যা-তা বলছেন।'

—'পারে মশাই পারে। ওসব আপনি বুঝবেন না, বড় জটিল তত্ত্ব। লিগ্যাল সেন্স ইজ নট কমনসেন্স বুঝলেন?' তারপর কাকীমার দিকে আঙুল দেখিয়ে— 'উনি তো আরই বুঝবেন না, একটি ঘোর অশিক্ষিত মূর্খ স্ত্রীলোক বৈ তো নন।' মুহূর্তের মধ্যে পিছন ফিরে দৌড়ে জানলা থেকে অন্তর্হিত হন জগমোহনবাবু, চট করে কাকীমাকে মন্দ কথাটা বলেই পিছন পিছন দৌড়য় হরিও। জানলা ফাঁকা। কেবল একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল পড়ে আছে।

এবার আমি ভয়নাক রেগে উঠি। ব্যাটা কাপুরুষ। কাকীমা কিন্তু রাগেন না! হেসে ফেলেন। এবং আমাকে টেনে ঘরে নিয়ে যান।

—'দূর দূর। ও-পাগলের সঙ্গে কথা বলে কী হবে খোকা? ওটা কি মানুষ? তবে জানলাটা সত্যি সামনে-সুমলে খুলতে হবে! পাগলাকে বিশ্বাস নেই। তুই না এসে পড়লে হয়ত আজই দিত ভেঙে।

—'পাগলা মানে? এদিকে আইন-বুদ্ধিটা তো টনটনে। সেয়ানা পাগল।'

—'পাড়ার ছেলেরা ওকে পাগল-জগাই বলে খ্যাপায়। আর ও তখন ছাতাটা তুলে ওদের মারতে ছোটে।'

কাকা স্নান করে বেরিয়েছেন। ব্যাপার বুঝে নিয়ে বললেন—

—'লোকটা কিন্তু সত্যি সত্যি উকিল। রিকশাওয়ালা, ইট পাতা নাপিত ওদের কী সব লাইসেন্স-টাইসেন্স করিয়ে দেয় কোর্ট থেকে। ওরা তো ওকে উকিলবাবু বলেই ডাকে। ও দিব্যি ফ্রি চুল দাড়ি কাটিয়ে নেয়। বাস স্টপ থেকে বাড়ি অবধি ফ্রি রিকশা

চেপে আসে। এই ইমপসিবল ক্যারেকটার। জগমোহনবাবুর কাণ্ডকারখানা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না রে খোকা। এই নিউ আলিপুর তল্লাটে ওরকম গামছা পরা বাড়িওলা, ফুটপাতের উকিল তুই আর দুটি পাবি না।'

সারাদিন কেবল জগমোহনবাবুর কীর্তিকলাপ শুনতে শুনতেই কেটে গেল। সত্যি সেলুকাস সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার মতন বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তি। আমার কাকা মোটেই পরচর্চা করার টাইপ নন, কথাই বলেন তিনি অতি সামান্য। সেই কাকাই শুরু করলেন জগমোহন প্রসঙ্গ—

—'এই ফাঁকা প্লটটায় বাড়ি করে অবধি জগমোহনবাবু আমাদের পাড়াসুদ্ধ প্রত্যেকের পেছনে উড়িবেড়ি দিয়ে লেগেছেন। কেবল কি আমার সঙ্গেই? মোটেই না। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে যে যেদিকে আছে প্রত্যেকের ওঁর সঙ্গে ঝগড়া। ওঁর সরু লম্বাটে এক চিলতে জমি পড়েছে মাঝখানে, এধারে পাশাপাশি আমরা দু বাড়ি, আমি আর ডকটর ধর, ওপাশে সামনে দিকের ছোট প্লটে সেনগুপ্তরা, আর পেছন দিকের বড় প্লটে ঐ দশতলা বাড়ি উঠেছে আর ওর পেছনে পুরো উত্তর দিকটা জুড়ে আছেন হৈমন্তী দেবী, তোদের ফিলিম স্টার। জগাই প্রত্যেকটি বাড়ির সঙ্গে কিছু বাধিয়ে রেখেছে।

তুই আজ সচক্ষে দেখলি, তাই। নইলে আমি যদি থানায় ফোন করে বলি, বেলা বারটার সময়ে পাঁচিলে চড়ে বুড়ো জগমোহনবাবু বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে ইচ্ছে করে আমার জানলার সার্সি ভাঙছেন, তুই কি মনে করিস পুলিস আসবে? ওর ওটাই মজা। এমন কাণ্ড করে চোখে না দেখলে, কানে শুনে কারুর বিশ্বাস হবে না। তোর কাকীকে জিজ্ঞেস কর, সব বলবে।'

কাকীমা বললেন— 'কত বলব? কত শুনবি? কোনটা দিয়ে শুরু করব? এই ধর সেদিন সেনগুপ্তের মেয়ের বিয়ের ঘটনাটাই। গায়ে হলুদ হচ্ছে, ছাদে মেয়েরা সবাই গেছি, কোথায় যেন ক্যাচর ক্যাচর করে একটা শব্দ হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। কিসের শব্দ? কিসের শব্দ? শেষে দেখা গেল জগাই এই ঠিক আজকের মত মই নিয়ে পাঁচিলে চড়েছে, চড়ে, একটা কাটারি দিয়ে সেনগুপ্তের ম্যারাপের বাঁশের ডগাগুলো কুপিয়ে কুপিয়ে কাটছে। সেনগুপ্ত ছুটে গেল। 'ওকি মশাই! ওকি মশাই!'

জগা বললে— ওইসব বাঁশের ডগারা কেন ইললিগ্যালি জগার বাড়ির গলির মধ্যে বেরিয়ে রয়েছে? সেনগুপ্তের বাড়ির সীমানা পেরিয়ে? জগা তার গলির সীমানার মধ্যে অন্যের বাঁশের খোঁচা বেরুনো কখনই সহ্য করবে না। তাই বাঁশের একটা বেআইনি ডগাগুলোকে সে কেটেকুটে প্লেন করে 'লিগ্যাল' করে দিচ্ছে। খানিকটা করে বাঁশ যেই কেটে ফ্যালে অমনি টুকরোটার সঙ্গে হাতের কাটারিখানাও খসে পড়ে গলিতে। জগা নিজেও পড়ো পড়ো হয়। কিন্তু বুড়োর ব্যালান্স কি। ম্যারাপটা ধরেই সামলে নিচ্ছে। আর গলির ভেতরে নিরাপদ দূরত্বে মুণ্ডুটি বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রামভক্ত হনুমানের মত। ঐ হরি, জগার একমাত্র পুত্র! পড়ে-যাওয়া কাটারিটা ভক্তিভরে বাপের হাতে তুলে তুলে দিচ্ছে। কাটারিটা ভোঁতা হয়ে যেতেই রান্নাঘর থেকে মায়ের আঁশবটিটা এক ছুটে

এনে দিলে। ওঃ! সেদিন জগাইকে থামান না গেলে কী সর্বনাশই হতে যাচ্ছিল ভেবে দ্যাখ। এভাবে বাঁশ ছেঁটে দিয়ে প্যাণ্ডেলের পুরো ব্যালান্স আপসেট হয়ে যাচ্ছিল। বেশ কিছু দড়িদড়াও খুলে গেছিল, সব বাঁধন-টাধন আলগা হয়ে, বিশ্রী ব্যাপার।

'আরেকটু হলেই প্যাণ্ডেলটা ভেঙে পড়ত লোকজনের মাথার ওপরে আলো— পাখা-টাখা সুদ্ধু। কী কেলেঙ্কারি হতে যাচ্ছিল ভাব একবার? আমারই তো কান্না পেয়ে গেছল সেনগুপ্তের অবস্থা দেখে। দমকল ডাকবে, না পুলিস ডাকবে, ভেবেই পাচ্ছে না— কী উপায়ে জগাকে আটকাবে।'

কাকা বললেন—'জগা যা করে সব সে আইন বাঁচিয়ে করে। ব্যাটা উকিল হয়েছিল যেন কেবল এইসব বেয়াক্কেলে বজ্জাতি করবার জন্যেই। উঃ! পাড়ার লোকের হাড়ে দুব্বো গজিয়ে দিলে।'

আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি— 'তারপর? তারপর? শেষ পর্যন্ত থামানো হল কেমন করে ওকে?'

—'কেমন করে আবার? পাড়ার ছেলেরা মার-মার শব্দে তেড়েএল যেই হকি স্টিক নিয়ে, তক্ষুনি বাঁশ কাটা বন্ধ হয়ে গেল। সেই থেকে সেনগুপ্তের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নেই।' বলে কাকা চুরুট বের করলেন।

—'মুখ দেখাদেখি কার সঙ্গেই বা আছে?' কাকীমা বললেন— 'ওপাশের হৈমন্তী দেবীর ব্যাপারটাও বল খোকাকে।' কাকা চুরুট ধরাতে ব্যস্ত ছিলেন— বললেন —'তুমিই বল।'

—'হৈমন্তীদের সঙ্গে আরেক কাণ্ড।' কাকীমা মহোৎসাহে শুরু করলেন। হৈমন্তী তো ফিলিম স্টার, গর্বে তার মাটিতে পা পড়ে না, পাড়ার সব যেন লোক না পোক, কারুর সঙ্গেই যাতায়াত নেই। বাড়িটা মস্ত কম্পাউণ্ডে ঘেরা আর কম্পাউণ্ডের চারিদিকে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের মাথার ওপর তারের জাল, আর সেই জালের গায়ে খুব সুন্দর কী একটা স্পেশাল ফুলের লতা লাগান। যেমনি সুন্দর দেখতে, তেমনি মিষ্টি তার গন্ধ।

'হৈমন্তীদের বাড়িটাকে পুরো যেন বোরখা পরিয়ে রাখে ঐ লতার বেড়া। ডক্টর ধরের বাড়ির গায়েও ঐ কমন উত্তরের পাঁচিল পড়ে, জগার বাড়ির গায়েও। ধর সায়েবরা তো সবসময়ে ঐ ফুলের গন্ধের কথায় বলেন— 'বিদেশি একটা রেয়ার ফুল, ফোকটে দিব্যি গন্ধটা এনজয় করতে পারছি—', আমার হিংসেই হয় মাঝে মাঝে।'

'হঠাৎ হল কী, হৈমন্তীর মালী দেখে জগার বাড়ির গায়ের লতাটা কেবলই ঝামরে পড়ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে, ফুলসুদ্ধু লতা মরে মরে যাচ্ছে। শুকতে শুকতে ঐ দিকের পাঁচিলের গা থেকে লতা খসে পড়তে লাগল। হৈমন্তীদের বাড়ির আব্রু গেল ঘুচে। বাগানের পার্টি-ফার্টি সব দেখা যায় জালের ফাঁক থেকে। গাছে পোকা ধরল, না কী যে হল কিছুতেই বের করতে পারে না মালী। হৈমন্তী তো মালীর ওপরে খাপ্পা, প্রিভেসি থাকছে না তার বাড়ির।'

—'ফিলিম আর্টিস্টের রহস্যমত নষ্ট হয়ে গেল আর রইল কী?' কাকা ফোড়ন

কাটেন।

—'এদিকে জগার বউয়ের খুব মজা, সে তার মেয়েদের নিয়ে দোতলার ছাদে উঠে দূরবীন লাগিয়ে হৈমন্তীর বাড়ির ভেতরের কাণ্ডকারখানা দেখছে মনের সুখে। মালী বেচারাই পড়ল মুশকিলে— খুব ভাবনা তার। বেছে বেছে ঐকুটু অংশের লতাই বা মরে যাচ্ছে কেন? আবার নতুন লতা লাগিয়ে দিলে, আবার কদিন যেতে না যেতেই, যেই একটু বেড়েছে অমনি লতাটা ঘাড়-মুখ গুঁজে নেতিয়ে পড়ল। ব্যাপারটাও বোঝা গেল এবারে।

'জগা প্রতিদিন ইয়া বড়া এক কাঁচি নিয়ে ওই মইতে চড়ে, তারের বেড়ার এদিক থেকে কচকচ করে লতার গুঁড়িগুলো কেটে রেখে দিচ্ছে। গাছ মরবে না তো কী?

'ব্যাপার শুনে হৈমন্তীর সেক্রেটারি তো দৌড়ে এল কোমর বেঁধে ঝগড়া করবে বলে। সেক্রটারিরই বা চাল কী? হাতে বিলিতি পাইপ, গলায় বাহারে বেনারসী টাই।

'জগা স্বীকার করলে, হ্যাঁ, সে রোজ দাড়ি কামানর সময় নিয়ম করে লতাটা কেটে দেয়।'

—'কেননা ওতে এ-বাড়ির স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে। আলো বাতাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতো উঁচু বেড়া দেওয়া বেআইনি কাজ। বেআইনি বেড়া জগা থাকতে দেবে না।'

—'কই অন্যেরা তো আপত্তি করেননি? ধর সায়েব তো এতবড় ডাক্তার, তিনি তো কই বলেননি যে লতাটা অস্বাস্থ্যকর?'

—'জগা বললে ধর সায়েব যাই বলুক, সেটা জগার বেলাতে প্রযোজ্য নয়। অনেকে তো ডাস্টবিনের খাদ্যও কুড়িয়ে খায়? তারা ওটা অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করে না।'

—'ধরসায়েবের আলোবাতাস না লাগতে পারে। জগার লাগবে।'

তখন সেক্রেটারি বললে— কিন্তু ওটা তো উত্তর দিক— উত্তুরে বাতাস না এলে এমন কি লোকসান হবে স্বাস্থ্যের দিক থেকে? আর আলোর কথাই যদি ওঠে, তবে পূর্বদিকটা অন্ধকার করে ওই যে দশতলা বাড়ি উঠছে —কই সেটা কি জগা কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে পারছে?

'এর উত্তর না দিতে পেরে জগা খেপে টং হয়ে বললে— বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে, ফের প্যানপ্যান করলেই দোবো কেস ঠুকে!'

'এই বলে তেড়ে গেল হৈমন্তীর সেক্রেটারিকে।'

আমি খুব ইমপ্রেসড।— 'বড়লোকের নোকরকে ছাতি তুলে তেড়ে যাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। গাটস আছে বলতে হবে।' কাকা বলেন।

—'ও তো পাগলের গ্যাটস। তেড়ে গেলে কী হবে? টাকার জোর যার তার সঙ্গে পারবে কেন? জগার 'কেস-ঠুকবো'-তে ঘাবড়ে না গিয়ে সেও দিয়েছে মুখের মতন জুতো। জগার বাড়ির অংশটুকুতে তাদের বেড়ার বদলে খাড়া কংক্রিটের দেওয়াল তুলে দিয়েছে বিশাল উঁচু করে। এখন সত্যি সত্যি আলোবাতাস আটকে গেছে বেচারার। ভাঙতেও পারছে না। বুঝছে ঠেলাখানা। অকারণে অন্যের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার ফল।

—'তবু বিশ্বাস নেই কাকা', আমি বলি— 'উনি যেমন মানুষ মনে হচ্ছে, একদিন দিলেন হয়তো ডিনামাইট বসিয়ে পাঁচিল উড়িয়ে। জেদ যদি চাপে।'

—'তা খুব ভুল বলিসনি খোকা।' কাকা নির্বিকার গলায় মন্তব্য করেন— 'তাও জগা পারে। কিছুই ওর পক্ষে অসাধ্য নয়। ডক্টর ধরের বাগানে তো আগুনের গোলা ছুঁড়ছিল ক'দিন আগেই।'

—'সে কি কাণ্ড!'

—'আর বলিস কেন? ভাগ্যিস উঠোনে কেউ ছিল না। কিন্তু ভিজে কাপড় শুকুচ্ছিল! ভাগ্যিস ভাল করে নিংড়ান হয়নি, ভিজে জবজবে ছিল তাই রক্ষে। যদি কাপড়গুলো শুকিয়ে যেত তবে কী ঘটতে পারত ভাব দিকিনি একবার? অগ্নিকাণ্ড হতে হতে বেঁচে গেছি সবাই। গায়ে গায়ে লাগোয়া সব বাড়ি।'

—'আগুনের গোলা? তার মানে?'

—'তার মানে বোঝা রীতিমত শক্ত বাছা!'

কাকীমা পুনরায় আসরে নামেন।— 'ধরগিন্নির কাপড়খানা পুড়ে এই এত বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে পুড়ছে, আগুন যে ধরে যায়নি, এই বাঁচোয়া। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে আমিই প্রথম দেখতে পেলুম যে ধরদের উঠোনে বড় বড় আগুনের বল এসে পড়ছে। চেঁচামেচি করতেই ধরগিন্নি বারান্দায় বেরিয়ে দেখলেন জগা তার বাড়ির গলিতে দাঁড়িয়ে শুকনো পাতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে গোল্লা পাকাচ্ছে, তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়াল টপকে এদিকে ছুঁড়ছে। ধরগিন্নি বললে—

—'একী কাণ্ড? একি হচ্ছে? এ কি সর্বনেশে ইয়ার্কি।'

—'ইয়ার্কি কে বললে? আপনাদের গাছের পাতা ঝরে ঝরে আমার ঘরদোর নোংরা করছে। তাই আপনার সাধের গাছের পাতা আবার আপনাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

—'তা আগুনটা কেন?'

—'ওটা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, এক্সট্রা। গাছটা এদিক থেকে আমি তো কেটে ফেলতে পারব না, ওটা আপনাকেই কাটতে হবে।'

ধরগিন্নি বললেন— 'কক্ষনো গাছ কাটব না।'

জগা বললে—

'অবিলম্বে কাটুন। না যদি কেটেছেন, আর পাতা যদি আরও পড়েছে, তবে কিন্তু আমি ফের পাতার ডেলা পাকিয়ে ছুঁড়ব— এবারে বিকেলের দিকে। ঠিক কাচা কাপড় যখন শুকনো।'—

'বাপরে বাপ। কী লোক।' আমি না বলেই পারি না।— 'ডক্টর ধর কী করলেন?'

—'করবেন আবার কি? গাছটা সত্যি সত্যি কাটিয়ে ফেললেন। বলা তো যায় না, আগুন লাগিয়ে দিতে কতক্ষণ? যা ডেনজারাস ব্যক্তিটি। সেই থেকে ধরদের সঙ্গেও আদায়-কাঁচকলায়।'

—'কিন্তু ও যা চায় তাই পেয়ে যাবে? কুচক্রী আর পাগলাটে বলে?'

—'কোথায় আর পাচ্ছে? ওই তো হৈমন্তী মুখের ওপর দেড়তলা দেয়াল তুলে দিলে আলোবাতাস আটকে। আমরাও কি আর গ্যারাজটা তুলিনি?'

—'তার মানে?'

—'যখন গ্যারাজটা বানান হচ্ছে.... মানে তোর কাকার তো আগে গাড়ি ছিল না,' —কাকীমা শুরু করলেন,

—'এখন গাড়িটা কিনেছেন, গ্যারাজও তৈরি করাতে হল। ওমা। রাজমিস্ত্রিরা এসে আমাকে বললে, 'এক বাবু কাম সব গড়বড় করে দেতা হ্যায়, বহুত হল্লাগুল্লা করতা, কাম করনে নেহি দেতা।' কী ব্যাপার? গিয়ে দেখি, দু হাতে কোমরে গামছাটি চেপে ধরে জগাই ছুটে পালাচ্ছে। সদ্য-গড়া দেওয়ালটুকু লণ্ডভণ্ড ভাঙা। ইঁট সিমেন্ট সব ছরকুট্টে আছে। দেখে তো আমার মাথা গরম হয়ে গেল। এতবড় আস্পদ্দা? আমার বাড়িতে ঢুকে আমার দেওয়াল ভেঙে দেওয়া? এ আবার কোন আইনে চলে? তোর কাকাকে গিয়ে বললুম। কাকাও তেমনি। তিনি জগাকে গিয়ে বললেন—

—'কী মশাই? আপনি নাকি আমার গ্যারাজের দেওয়াল ভেঙে দিয়ে পালিয়ে এসেছেন?'

—'পালাব কী জন্যে? দেখতেই পাচ্চেন আমি নিজের বাড়িতে বসে রয়েছি।'

—'আমার গ্যারাজ ভেঙে দিয়ে এসেচেন কি না?'

—'তা দিইচি।'

—'কেন, বলতে পারেন?'

—'ওটা ইললিগ্যাল কনস্ট্রাকশন। করপোরেশনকে খবরটা দিলে, ওরাই এসে ভেঙে দেবে। আমি বরং আপনার পয়সা বাঁচাতে আগেই ভেঙে দিচ্ছিলুম।'

—'আপনার মাথা। আপনার আইনের নিকুচি করেছে। নিজের তো গ্যারাজ করেননি, ওই আইনগুলো আপনার জানা নেই।'

—'খুনের সাজা কী, তা জানতে নিজে খুন করবার দরকার হয় কি?'

—'থামুন মশাই, কবে আইন পড়েছিলেন, সব ভুলে মেরে দিয়েছেন, পড়ুন গে আপনার লয়ের টেকস্টবইগুলো আরেকবার করে। আইনে বলে আমার বাড়িতে আমি এগার ফুট পর্যন্ত উঁচু গ্যারাজ করতে পারি, বুঝলেন? যা পারি, তাই করচি। করবও। বেশি ঝঞ্ঝাট করলে পুলিস ডাকব।' নিজের বুকে টোকা মেরে জগা বললে— 'পুলিস? সেও এই আইনেরই চাকর, বুয়েচেন?'

পরদিন জগা একটা টিনের চেয়ার পেতে ওর দিকের গলিতে এসে বসল। হাতে একটা এলুমিনিয়মের গজফিতের কৌটো। যেন আমাদের কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজার। মিস্ত্রিরা দেওয়াল গাঁথে আর মাঝে মাঝে রোককো বলে লাফিয়ে এসে পিড়িং পিড়িং করে কৌটো থেকে স্প্রীংয়ের গজফিতে বের করে জগা এসে হাইট মাপে। এগার ফুট হতে-না-হতেই— ব্যাস ব্যাস স্টপ-স্টপ করে সে কী চেঁচামেচি।'

কাকা এইবার যোগ দিলেন—

'শুধু কি তাই? ওই দেয়ালটুকু তুলতে আমার ডবল খরচ করিয়ে দিয়েছে। জগার জন্যে মিস্ত্রিরা দু'দিনের কাজ চার দিনে করে ডবল রোজ নিয়েছে। ওরা কাজ করবে কি, পাঁচিলের ওপাশে জগা ওঁৎ পেতে বসে আছে চেয়ার পেতে।

গলিতে যেই একটু বালি সিমেন্ট ঝরে পড়চে অমনি জগা চেঁচাচ্ছে— এ্যাইও! ইধার আও। আভি ময়লা সাফ কর। আমার গলি নোংরা হচ্ছে। মিস্ত্রিরা যত বলে এখন একটু অমন পড়বেই, দিনের শেষে গিয়ে একসঙ্গে সব ধুয়েমুছে দিয়ে আসব, —তা চলবে না। জগা হোল ডে চেয়ার পেতে বসে দেয়াল মাপছে, আর এ্যাইও— করে চুনসুরকি তোলাচ্ছে ওর গলি থেকে। সে কী অত্যাচার, তোকে কী বলব।'

কাকার মত স্বল্পভাষী মানুষের মুখে এত কথা শুনে সত্যি সত্যি অবাক লাগছিল। কতটা তিতিবিরক্ত করলে তবে মানুষকে এতটা বদলে ফেলা যায়। চায়ের সময়ে সবাই বারান্দায় বসেছি— জগার বাড়ির দোতলার দিকে চোখ পড়ে গেল। দোতলাটা অদ্ভুত দেখতে। আধখানা সম্পূর্ণ হয়েছে, আধখানা হয়নি। কেমন খাপছাড়া মতন হয়ে, শ্যাওলা ধরে যাচ্ছে। ছাদটাতে বেখাপ্পা এ্যাজবেস্টস, আধখানা দেওয়ালের ইট বের করা, বাকি আধখানা প্লাস্টার করা। এখানে টিন, ওখানে ত্রিপল দিয়ে জোড়াতালি মারা এক কিম্ভুত চেহারা। অথচ একতলাটা বেশ সুন্দর।

—'আচ্ছা কাকীমা, অমন তালি-তাপ্পি মারা কিম্ভুত চেহারা কেন জগমোহনবাবুর দোতলার? অমন আধখ্যাঁচড়া হয়ে পড়ে রয়েছে কদ্দিন ধরে? ওটা উনি কি কমপ্লিট করবেনই না? ছ্যাৎলা ধরে যাচ্ছে যে।'

কাকা-কাকীমার একবার চোখাচোখি হল। কাকা চুপ। কাকীমা ইতস্তত করে বললেন—

—'ওকথা আর বলিসনি। সে এক বৃহৎ কেলেঙ্কারি।'

—'মনে পড়লে রাগও হয়, দুঃখও হয়।'

—আশ্চর্য মানুষ বটে একটা, কাকা আবার ফেটে পড়লেন— 'হোল ফ্যামিলিটাকে নষ্ট করছে।'

—'কেন কাকা?'

—'কেন আমি বলতে পারব না, আমার ভাবলেই চড়চড় করে প্রেশার চড়ে যেতে থাকে। ও তোর কাকীর কাছে শুনিস।' বলে কাকা উঠে গেলেন। কাকীমার দিকে প্রশ্নসূচক চোখে তাকাতেই কাকীমা শুরু করলেন,

—'সত্যি, ব্যাপারটা এমন বিশ্রী না— তোর কাকা এই প্রসঙ্গটাই সইতে পারেন না। ঐ যে ওপাশে দশতলা বাড়িটা দেখছিস না, ওইটে যখন উঠছে, জগমোহনের দোতলাটাও সেই সময়ে উঠছিল। ঝরঝর করে দিব্যি লিন্টেল অবধি উঠে গেল, এমন সময়ে একদিন রাত্তিরে পাড়ায় প্রবল হইচই। দশতলা বাড়ির দরওয়ানরা চোর ধরেছে।

'কী ব্যাপার? পাড়াসুদ্ধু ভেঙে পড়ল চোর দেখতে। তোর কাকাও গেসলেন। দরওয়ানদের ঘরে এক অপূর্ব দৃশ্য। বেঁটখাট এক নেপালি দরওয়ান দু হাতে জাপটে

ধরে আছে এক বিপুল বপু জগা-গিন্নিকে। জগা-গিন্নি যেন পাথর। মুখে একটিও শব্দ নেই। মাথায় এক হাত ঘোমটা। হাতে এক বালতি সিমেন্ট। আর গলিতে সারবন্দী বালতি ভরে ভরে সিমেন্ট, বালি, চিপস সাজানো, আর নিচু পাঁচিলের মাথায় থাকে থাকে ইঁট রাখা। পাঁচিলের ওধারে জগা। নিজের উঠোনে দাঁড়িয়ে খুব লম্ফঝম্ফ করছে। পরনে গামছা। হাতে বালতি। এ-বাড়িতে না-এসেই চেঁচাচ্ছে—

'এ্যাইও। ছোড় দো আমার পত্নীকে। কার হুকুমে ওসকো পাকড়ায়া? কোন সাহসে তুম উসকো গায়ে হাত দিয়া? রাসকেল কাঁহাকা— আভি হাম কেস কর দেগা তোমাদের প্রত্যেকের নামে'—

এদিকে দরওয়ানরা জগার গিন্নিকে ঘিরে রেখেছে। মোটেই ছাড়ছে না। কেস করবে শুনে বাহাদুর বললে—

—'হাম থোড়াই বিবিজীকো আপকো ঘরসে পাকড়কে লায়া? উও আয়া কিঁউ হমারা ঘরপে?'

—'উনি তো তোমাদের টিউকল থেকে জল আনতে গেছেন—'

—'ইতনি গহরী রাতমে? তো বালটিমে পানী নেহী, সিমেন্ট কিঁউ?'

—'রাত্তিরে অত দেখতে পায়নি।' জগা ডেসপারেট।

—দরওয়ানরা বললে রোজ রোজ এই কাণ্ড হচ্ছে। এইসব বালতি ভরে উনি পাঁচিলের ওপারে দিব্যি পাচার করেন। ইঁট সিমেন্ট চুন সুরকী সবকিছু। ওদিকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েরা জগমোহনবাবুর নেতৃত্বে। আর পাঁচিলে উঠে বসে এবাব-ওপার করে, হরি তার বাবা-মাকে সাহায্য করে বালতি-চালাচালির কঠিন কর্মে। সে ঝুপ করে নেমে পালিয়েছে। ধরা পড়েছেন কেবল গজগামিনী জগমোহিনী।

—'হররোজ মাল চোরি হো রহা, কন্ট্রাকটর সাহাব হামলোগকো বহোৎ পরেশানী করতে হেঁ— লেকিন চোর নাহি পকড় যাতা—'

—'আঃ, চুরি কেন হবে?' জগমোহন হাঁক পাড়ে নিজের বাড়ি থেকে—'একে মোটেই চুরি করা বলে না।'

—'রাত মে ঘরকা অন্দর ঘুসকর চীজ উঠাকে ভাগনেকো ক্যা কহ যাতা হ্যায়, বাবুজী?'

—এ্যাও। একদম চোপ। আভী ছোড় দো হামারা ওয়াইফকো। নইলে আমি এক্ষুনি পুলিস ডাকব— , জগা ভাঙে তো মচকায় না। দরওয়ানরাও পুলিস ডাকতে যাবেই। শেষে পাড়ার সবাই মিলে অতি কষ্টে জগার বউকে বাঁচাল।'

—'তবে যে কাকা বললেন জগমোহনবাবু সর্বদা আইন বাঁচিয়ে চলেন—এর বেলায় তো পুরোই বেআইনী কম্মোটি করলেন?'

কাকা ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন চুরুট ধরিয়ে।

—'বেআইনী হলে কি হবে? ব্যাটা ঘুঘু, নিজে ঠিক বেঁচে গেছে। সে তো এপাশে মোটে আসেইনি। চুরি করতে নিজে-না এসে মোটা বউটাকে পাঠান কেন?'

'যা বে-আইন পরে পরে। নিজে তো বমাল সমেত গ্রেপ্তার হয়নি? হয়েছে তার বউ। খুব চালু লোক।'

—'কী পাজি দ্যাখো।' কাকীমা বলেন— 'বউটাকে জেলে পাঠিয়ে নিজে দোতলা বাড়িতে থাকবার মতলব।'

—'তো কেন?' কাকা বাধা দেন। 'অত সোজা নয়। ব্যাটা আরও কুটিল। বউকে পাঠানর মধ্যে তার একটা অনুমান কাজ করছিল— এটা একটা চিরকেলে কৌশল। মহাভারতের যুগের। সেই শিখণ্ডী-ট্রিক আর কি। ঠিক ও যেটা আঁচ করেছিল, তাই হল। যে-জন্যে ওর মোটা থপথপে বউকে দিয়েই চুরি করান, চটপটে ছোকরা হরিকে দিয়ে নয়—, সেই প্ল্যানও ওর ফেল করল না। ব্যাটা কম চালু? আমরা পাড়ার কত্তাব্যক্তিরাই গিয়ে দশতলা বাড়ির মালিকদের ধরলুম—জগার বউ বেচারি গিন্নিবান্নি মানুষ, ছেলেপুলের মা, ওকে ধরে চোর বলে পুলিসে দিলে গোটা পাড়ার পক্ষেই বড় লজ্জার কথা হয়। একটা মিটমাট করে নেওয়া ভাল। ওরাও সেটা মেনে নিলে ভদ্রতাবশত। প্রতিবেশী বলে কথা! দরওয়ানগুলো হইচই করে গিয়ে জগার বাড়ি থেকে ওদের সিমেন্টের থলে, চুনের কড়া, থাক থাক ইঁট, বস্তা বস্তা বালি সব ফেরত নিয়ে গেল। ফলে ওদের সাধের দোতলাটি আর কমপ্লিট হল না।'

—'ওখানেই শেষ', কাকী বললেন— 'উপসংহারটুকুও শোন। একদিন দেখি দুটো রাজমিস্ত্রী জগার গলায় জগারই ছাতার বাঁট লটকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। প্রাপ্য শোধ করেনি। বলেছিল টাকার বদলে নাকি সিমেন্টের বস্তা দেবে— তাও দেয়নি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওরা কিছুই করতে পারলে না— কেবল ওর ছাতাটা কেড়ে নিয়েই চলে যেতে হল ওদের। যাবার আগে জগাকে রাস্তায় রীতিমত ছাতাপেটা করে গেল। বউ বারান্দা থেকে চেয়ে দেখলে। বাধা দিলে না।'

রাত্তিরে খাবার পরে আমরা শোবার উদ্যোগ করছি, এমন সময়ে একটা উত্তেজিত তর্কাতর্কি শোনা গেল সরু মোটা দুরকম গলায়। মনে হলো জগমোহনবাবুদের বাড়িতেই মনে হচ্ছে?'

কাকীমা চুপ করে একটু শুনলেন কান পেতে, তারপর বললেন— 'আজ কত তারিখ বল দিকি? মাসের শেষ কি?'

—'মার্চ মাস প্রায় শেষ হয়ে এল— চৈত্রের মাঝামাঝি।'

—'মার্চের শেষ তো?' কাকীমা উৎসাহের সঙ্গে বলেন—

—'চল খোকা তোকে একটা মজা দেখাচ্ছি, চল।'

কাকা ব্যস্ত হয়ে আপত্তি করতে থাকেন— 'না না, ওসব ঠিক নয়, ওসব ঠিক নয়। তোমার যতসব মেয়েলী বুদ্ধি। খবদ্দার ও কুকর্মটি কর না—'

কিন্তু কাকার কথায় কান না দিয়ে কাকীমা খড়খড়ি ফাঁক করে জুলজুল করে জগমোহনবাবুর ঘরের দিকে তাকিয়ে রইলেন— আমাকেও ডাকলেন। প্রতিবেশীর পবিত্র কর্তব্য যেমন, আমিও সেইমত কাকীমার পাশে গিয়ে খড়খড়িতে বাধ্য ছেলের

মত নেত্র স্থাপন করলুম। কাকা যতই বারণ করুন, কাকীমা এবং আমি দুজনে একসঙ্গে ওঁৎ পেতে 'কুকর্মটি' করছি দেখে দুঃখ পেয়ে কাকাই ঘর থেকে চলে গেলেন।

ও-বাড়িতে জানলা খোলা। ঘরে বাতি জ্বলছে। ভাগ্যিস লোডশেডিং নয়। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দুপাশে দুজন দুই চেয়ারে। একজনের পরনে গামছা ও পৈতে। অন্যজনের মাথায় বড় করে ঘোমটা, মুখ দেখা যায় না। শাঁখা রুলি পরা মোটা-সোটা একখানি ফর্সা হাত টেবিলে রাখা, মুঠোতে একটি ফর্দ। অন্য হাতে হাত পাখা। ফিসফিস করে কাকীমা বললেন—

—'ঘরে ফ্যান নেই।'

—'বাজেট মিটিং। প্রত্যেক মাসে হয়।'

জগমোহনবাবুর টিয়াপাখি-নাকে নিকেলের গোল গোল হাফ চশমা, হাতে হেড এগজামিনারদের মতো মোটকা লালনীল পেন্সিল। ফর্দটা কেড়ে নিয়ে ঘ্যাঁচ করে একটা কী কেটে দিলেন। অমনি ঘোমটার নিচে থেকে বিদ্রোহী জেহাদ ঘোষিত হল। বপুর তুলনায় অস্বাভাবিক কচি গলাতে।

—'হবে না, হবে না, ইয়ার্কি নাকি? ছেলেমেয়েদের দুধের হিসেবে টাকা কমান চলবে না—'

—'টাকা নেই।'

—'তবে তোমার নস্যির টাকাটা ছেঁটে দেয়া হোক।'

—'ছেলেমেয়েগুলো তো ধেড়ে-দামড়া হয়ে গেছে, এখন দুধ খাবে কি?'

—'তাহলে কি নস্যি নেবে?'

—'দুধ না খেলেই নস্যি নিতে হবে কেন? চা খাবে।'

—'চায়েও তো দুধ লাগবে।'

—'র টি দাও। র টি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। চাইনীজ জাপানীজ জাতগুলোর বড় হবার পেছনের সিক্রেট কী? ওই র টি। মাথা পরিষ্কার রাখে।'

—'বেশ, তোমাকে কাল থেকে তাই দেব। আমি কিন্তু বিনা দুধে চা খেতে পারব না।'

—'খেতে হবে— দুধ-চা খাও বলেই অত অম্বল হয়—' ঘ্যাঁচ। ফর্দে আরেকটা কী যেন কাটা পড়ল।

—'ওকি। ওকি। ওটা যে কেরোসিন? ওগো কেরোসিন বাদ দিলে চলবে কি করে?' কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না, এদিকে লোডশেডিং, সন্ধে থেকেই অন্ধকার—

—'সন্ধে সন্ধে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে সব। রাত্তিরে কোনও কাজ করবে না।'

—'হরির পড়া তৈরি করা আছে—'

—'করতে হবে না। ভোরে উঠে প্র্যাকটিস করুক। চারটের সময়ে ফর্সা হয়ে যায়। হ্যারিকেন মোটে জ্বালবার দরকার নেই। চোখের পক্ষে হার্মফুল।'

—'স্টোভ জ্বালবারও কি দরকার নেই? বললুম যে কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না।'

—'কয়লা নেই, কাঠকুটো জ্বাল। স্টোভ জ্বালতে হবে না।'

—'মরণ। অত কাঠকুটোই বা পাব কোন চুলোয়? তোমার কি সুন্দরবনটা ইজারা নেওয়া আছে?'

—'পাড়ার প্রত্যেক বাড়িতে বাগান রয়েছে, গাদাগুচ্ছের গাছগাছালি লতাপাতার চোটে বাড়িতে আলোবাতাস বন্ধ, শুকনো পাতার জ্বালায় ঘরে টেকা যায় না, —আর বলছ কিনা কাঠকুটো পাবে কোথায়?'

—'তা কাঠকুটো যে চেয়ে নিয়ে আসবো তারও কি উপায় রেখেছ? পেত্যেকের সঙ্গে তো ঝগড়া। সেদিন এক কলসী জল চাইতে গেছল বড় খুকি ও-বাড়ির টিউকল থেকে— ওরা নাকি বলেছে—বাড়িতে আগুন দিয়ে, আবার জল চাইতে আসা হয়েছে। লজ্জাও করে না। আমাদের কেউ ঢুকতে দেবে বাগানে?'

—'তাহলে আর উপায় নেই— রাস্তা থেকে ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে আনতে পাঠাও হরিকে—'

—'না। যাবে না হরি। হ্যাঁগো। তোমার কি লজ্জা করে না? বাড়িসুদ্ধ লোককে তো চোর করেছ— এবারে পথের ভিকিরিও করবে? রাস্তায় রাস্তায় কাগজ কুড়োতে যাবে ছেলেটা?

—'না গেলে গুষ্টির পিণ্ডি রান্না করবে কি দিয়ে?'

—'কয়লা দিয়ে। এবং কেরোসিনের ইস্টোভ জ্বেলে। ও টাকা কমান চলবে না। ও টাকা আমি কিছুতেই কমাতে দোব না। তুমি তো একটা বদ্ধ উন্মাদ— আমার বাপ-মা আমাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলে এর চেয়ে ভাল করত— একটা ঝি রাখবে না, একটা চাকর রাখবে না— ইসকুল থেকে টেনে বের করে এনে মেয়ে তিনটেকে বিনা কারণে ঘরে বসিয়ে রেখেচ। বিয়ে দেবার নাম নেই, কলেজেও দেবে না— ছেলে-মেয়েগুলো সব ঝি-চাকর হয়ে গেল গো— ঘর মুছতে বাসন মাজতেই দিন যায় তাদের— এখন বলছ রাস্তায় কাগজ কুড়নী হতে? —হায় আমার কপাল!'

—'বিয়ে দেবার মতন টাকাটা কোতা? আর কলেজে পড়ে তো কেবল বিবি বনবে। তার চেয়ে এই ভাল।'

—'টাকা নেই? কিপ্টে কোথাকার। টাকা নেই? মোটে একটা মাত্তর ছেলে সবেধন নীলমণি হরি। সেই ছেলেটাকে পর্যন্ত একটা বাজে ইসকুলে দিয়ে ইহকাল বন্ধ হচ্ছে—'

—'বাজে কেন হবে, চ্যারিটেবল ইনস্টিট্যুশন। অনাথ আতুরদের জন্যে তৈরি—'

—'আমার হরি কি অনাথ? নাকি সে আতুর? তুমিই আসলে একটি ঘোর বজ্জাত— স্যায়না পাগল বুঁচকি আগল— কই, নস্যির টাকার বেলায় তো কখন বাজেট কমতি হয় না?'

'ওই যে। ওই যে। নিজের বেলায় আঁটিশুটি পরের বেলায় দাঁত কপাটি—', মুখটি উঁচু করে জগমোহনবাবু তখন নস্যি নিচ্ছিলেন, খড়খড়িটা নামিয়ে দিতে দিতে কাকীমা ফিসফিসিয়ে বলেন,

—'এবার মারামারি হবে। চ উঠে যাই। যত উন্মাদের কাণ্ড।'

—'জগা মারেও?' আমি চোখ কপালে তুলি।

—'জগা নয়। জগার বউ। হাতপাখার বাড়ি দু-চার ঘা দেয়। দিয়ে তবে দুধের টাকা, কেরোসিনের টাকা পাস করিয়ে নেয় বাজেটে। এই একই কাণ্ড প্রত্যেকবার। বউটার জন্যে কষ্টও হয়।'

একটু পরেই শোনা গেল দমাদ্দম শব্দ আর— 'ও কে, ও কে, দুধ সাঁইতিরিশই রইল। দুধ সাঁইতিরিশই রইল। দুধ সাঁইতিরিশ, পরের আইটেমে চলে এস।' জগার গলা।

—'পরের আইটেম কেরোসিন।' জগার বউ। তারপরেই আবার ধপাধপ আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গেই জগার স্বর—

—'অলরাইট। অলরাইট। কেরোসিন পাঁচ লিটার। নেকসট আইটেম। নেকসট আইটেম?'

—'নেকসট আইটেম মেয়ের বিয়ে। ফাগুনে দিলে না, চোত পড়ে গেল। বোশেখ মাসে দিতেই হবে—নইলে'—

ক্লান্ত স্বরে কাকীমা বলেন— 'তোর কাকা সত্যি ঠিকই বলেছিল। না শোনাই উচিত। এ আর সহ্য হয় না। চল, চলে যাই। এবারে জগার পালা। জগা তড়পাবে, বউটা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবে— মেয়েদের জন্যে, সে ভারি বিচ্ছিরি'— সত্যি সত্যিই আমরা উঠে গেলুম।

কিন্তু কাকীমার কথা ফলল না। গিন্নির কান্না শোনা গেল না। বাজেট সভার চেঁচামেচিও আর কানে আসছে না। ব্যাপার দেখে কাকা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। মহা দুশ্চিন্তায় পড়া গেল। হল কী? কাকা সমেত এবার আমরা তিনজনেই খড়খড়িতে ফিরে যাই। গিয়ে দেখি— গিন্নি হাতপাখাটি নাড়তে নাড়তে হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছেন, ঘোমটা তুলে। আর জগমোহনবাবু পা নাচিয়ে নাচিয়ে লাল পেন্সিল দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে বলছেন— 'ওদের বাড়িতে একটা সোন্দরপানা ছেলে দেখলুম আজ! রিকসো থেকেই চেঁচাচ্ছিল— কাকী কাচ ভেঙে ফেললে, কাচ ভেঙে ফেললে! স্যায়না ছোঁড়া— জমাই করলে মন্দ হয় না!'
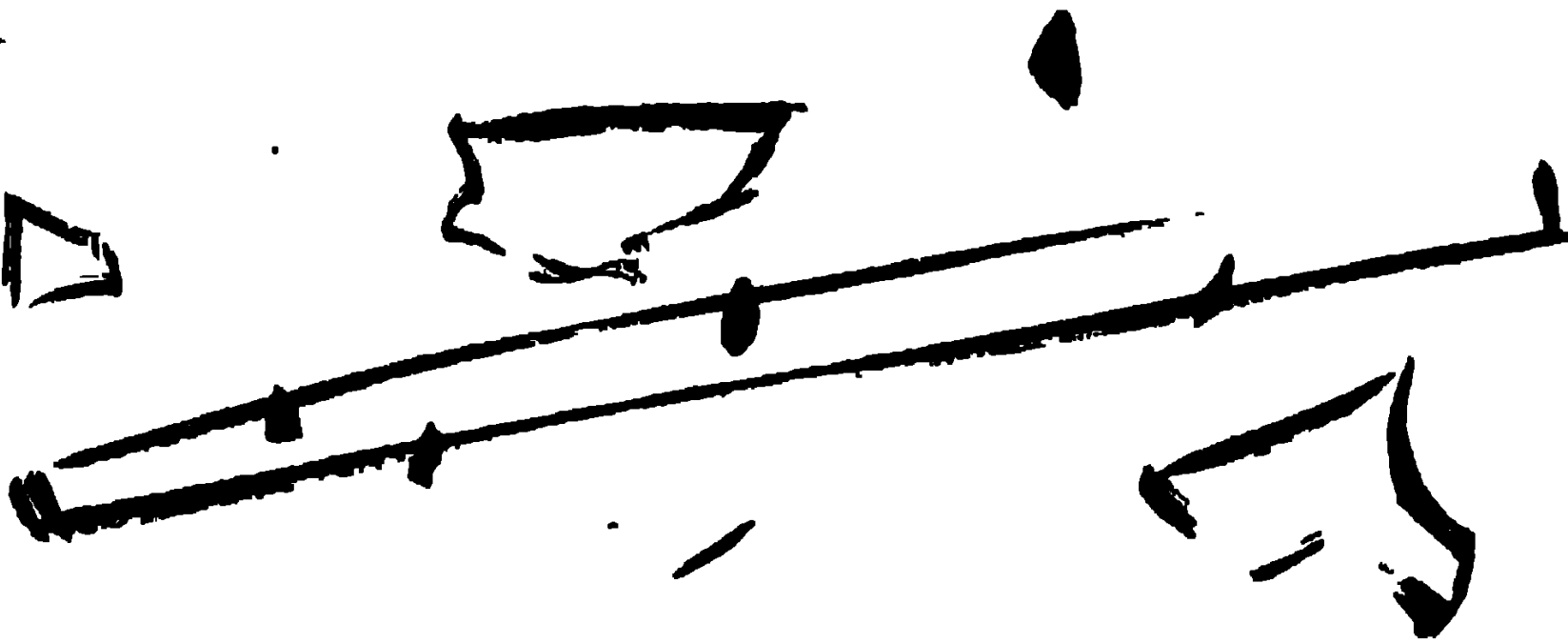
পরীক্ষা

সর্বদাই হুহু করে মন, বিশ্ব যেন মরুন মতন। বন্ধুকে বন্ধু বলে মনে হয় না, শত্রুকে তেমন শত্রু শত্রু লাগে না। মানুষমাত্রেই সুদূর। মোহমুদ্‌গরই জগতে একমাত্র সত্য—একটু বদলে নিয়ে, কান্ত কান্ত কা তে কন্যা কিছুই ভাল লাগে না। মেয়ে যে কেবলই খেলে হয় আগাথা ক্রিস্টি, নয় ব্যাডমিন্টন, নইলে ঘুম। সারাদিন সারারাত ঘুম। পড়বে কখন? কিছু বলতে গেলেই তার দিম্মা বলেন,— 'আহা, ও বড় দুর্বল। ঘুমুতে দে।' ঘুমতে ঘুমতে প্রিটেস্ট হয়ে গেল।

এই সময়ে চার নম্বর অঙ্কের স্যার চাকরি ছেড়ে দিলেন। এইট থেকে টেনের মধ্যে এই নিয়ে চারবার। অসিতবাবুর পর প্রদীপ। প্রদীপের পর শ্যামলবাবু। শ্যামলবাবু বহু চেষ্টা করেছিলেন। হাফ ইয়ারলির রেজাল্ট বেরুনোর পরই হাসপাতালে গেলেন। পেটে মস্তবড় আলসার। অপারেশনের পরে আবার সাহস করে পড়াতে এলেন, কিন্তু আমিই সাহস পেলুম না। শ্যামলবাবুর পরে অলোকবাবু। অলোকবাবু একদিন টাকাটা খামসুদ্ধ ফেরত দিয়ে বললেন— 'ও টাকা আমি নিতে পারি না।' আমি তো থ। তিনি সবিনয়ে খাতা খুলে দেখালেন— 'এই দেখুন খাতা। এত মাসে একটাও অঙ্ক কষাতে পারিনি। প্রত্যেকটা আমি নিজে কষেছি। নিজে অঙ্ক কষেছি বলে অন্যের কাছে টাকা নেব কেন?' ধরে-বেঁধে আধখানা মাত্র নেওয়ান গেল, বাকিটা টেবিলে রেখে গেলেন।

দেখতে দেখতে টেস্টও হয়ে গেল। স্যার-বিহীনভাবেই। প্রিটেস্টে ইতিহাসে ঊনতিরিশ ছিল, টেস্টে হলো সাতাশ। তার মানে ফাইনালে হওয়া উচিত পঁচিশ, এইরকম নিউমেরিক্যাল প্যাটার্ন অনুযায়ী— মেয়ে জানাল রসিকতা করে 'দুই দুই করে কমছে।' —হাতে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট।

—'কলেজে উঠলে কক্ষনো হিস্ট্রি নেব না; যা ট্রেচ. স সাবজেক্ট!'

—'কলেজে ওঠ তো আগে?'

—'সে উঠে যাব।' র‍্যাকেটের ওপরে শাটলককটা শূন্যে নাচাতে নাচাতে ঊর্ধ্বমুখেই মেয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

'উঠে যাব' বললেই তো হল না। পড়তে হবে। ইতিহাসের জন্য এক স্যারের বাড়িতে ওকে ধরে নিয়ে গেলো আরাধনা। টিউটর পাই কোথায়? টেস্টের পরে কেউই নতুন ছাত্র নেন না। শেষটায় আমার এক গুণ্ডা বোনপোকে যিনি পড়িয়ে শায়েস্তা করেছেন, পাসটাস করিয়ে কলেজেও গুঁজে দিয়েছেন, তাঁকেই ধরে আনা হল। তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখি সিলেবাসটা।' মেয়ে বললে, 'দাঁড়ান, ফোন করে জেনে নিচ্ছি। আমার বন্ধুরা জানে।'

—'ছিল তো, —হারিয়ে ফেলেছি। ফোন করি?'

—'অঙ্ক বইটা দেখি। কে সি নাগটা। ফোন পরে হবে।'

—'টেস্টের সময়ে স্কুলে ফেলে এসেছিলাম, আর পাইনি।'

—'দেখি, কলমটা আর খাতাটা দাও।'

—'বোন স্কুলে নিয়ে গেছে কলমটা। এই যে খাতা।'

—'বাঃ বাঃ বাঃ। বাড়িতে আর কলম নেই।?'

—'থাকতেও পারে। এই নিন পেনসিল।'

—'এতটুকুনি? এ তো ধরাই যাবে না।'

—'দাঁড়ান, ম্যানেজ করে দিচ্ছি। পেনসিলটাকে এই ঢাকনিতে ফিট করে নিন, ব্যাস তাহলেই ধরা যাবে। এভাবে ছোট পেনসিলও কাজে লাগে।'

—'চমৎকার। একটা জিনিস শিখলুম।' এমন সময়ে চা-ডালমুট এল।

—'এসব কে খাবে?'

—'আপনার জন্যে।'

—'এ তো বিষ। চা-ডালমুট দুটোই লিভার ড্যামেজ করে। আমি ওসব খাই না।'

—'দুধ? সন্দেশ খাবেন, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।'

—'ইয়ার্কি হচ্ছে?'

—'সে কি? ইয়ার্কি হবে কেন? এই তো ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ওটা খাবেন না এটা খাবেন তা তো মা জানেন না? আগের স্যার চা-ডালমুট ভালবসতেন।'

নতুন স্যার বললেন, 'আপনার মেয়ে তো যত্ন-আত্তি খুব করে, বুদ্ধি-সুদ্ধিও আছে। কিন্তু মহা ফাঁকিবাজ। আর আপনিও হয়েছেন যেমন, দিনরাত্তির লেখালেখি পদ্যফদ্য নিয়েই আছেন। অমন মেয়েকে নিজে না পড়ালে হয়?'

মরমে মরে গিয়ে মনস্থির করলুম। ইংরেজি বাংলা ছাড়া আমার আর কিছুই পড়ানর ধৈর্য নেই। তাই বললুম, 'বাংলা বইটা নিয়ে আয়।'

—'টাকা দাও।'

—'টাকা কেন?'

—'বই তো দোকানে।'

—'এটাও হারিয়েছিস?'

—'হারাব কেন? কেনাই হয়নি এ-বছরে।'

—'হয়েছিল না?'

—'সে তো নাইনে কিনে দিয়েছিলে।'

—'সেটাই তো টেনের টেক্সট।'

—'নাইনের বই টেনে থাকে? তুমি যে কী!

বই কিনে এনে ফোন।

—হ্যালো, আরাধনা? বাংলার সিলেবাসটা কী রে? মা জিজ্ঞেস করছেন। হ্যাঁ, মার সঙ্গেই কথা বল।

খানিক পর— হ্যালো ভাস্কর? অঙ্কের পুরো সিলেবাসটা কী রে?

—'আরাধনাকেই তো জিজ্ঞেস করতে পারতিস। দুবার দুটো ফোন করবার কী দরকার ছিল?'

—'সে তুমি বুঝবে না। আরাধনা কী ভাবত? আমি কোনও সিলেবাসই জানি না মনে করত।'

—'সে তো জানিসই না।'

—'জানতুম তো। এখন না হয় ভুলে গেছি। দুবছর ধরে কখনো মনে থাকে? মা, তুমিই বল?'

পড়ানো চলছে। এপ্রিলে পরীক্ষা। আমার এক প্রিয় ছাত্রীকে টিউটর রাখলুম ফেব্রুয়ারি মাসে। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি পড়িয়ে দিতে। একটা ছোট ভাই ফিজিওলজির ভাল ছাত্র ছিল। তাকে বললুম বায়োলজিটা দেখিয়ে দিতে। ছাত্রীটির সঙ্গে খুবই ভাব হয়ে গেল মেয়ের। আড্ডা, গল্পের বই এক্সচেঞ্জ, পরচর্চা। একটু একটু পড়াও দিব্যি চলতে লাগল ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু এই মামা বেচারীর সঙ্গে তার পিঠোপিঠির মতো সম্পর্ক— নিত্যই যুদ্ধ।

বই নিয়ে বসাই হল না। দুপক্ষ থেকেই অনবরত নালিশ। তবে দীপুমামা বাঁশিটা বাজায় ভাল। বায়োলজি শেখা না হোক, টেস্টের পরই মেয়ে 'এ আর এমন কি' বলে হঠাৎ আড়বাঁশি বাজানো রপ্ত করে ফেলল। দিবারাত্রি বাঁশি বাজছে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে। নীরোর বেহালার মত। কিছু বললেই বলে,— 'একটু রিল্যাক্স করছে।'

ইতিমধ্যে একদিন একটি বাউল আমার কাছে তার দোতারাটি বিক্রি করে গেল একশ টাকায়। আর যাবে কোথায়। কোথায় অঙ্ক, কোথায় ইতিহাস— দোতারা নিয়ে পড়লেন মেয়ে। দুদিনের মধ্যেই বাউলের দোতারাতে 'হোয়্যার হ্যাভ অল দ্য ফ্লাওয়ার্স গন লং টাইম পাসিং' বাজতে লাগল। ঠিক গীটারের স্টাইলে! সঙ্গে ছোট বোন গান গাইতে লাগল। এবং মামার বাঁশি। সুন্দর একটা ফ্যামিলি কনসার্ট গ্রুপ তৈরি হয়ে গেল। অগত্যা দোতারা এবং বাঁশি নিয়ে মূর্তিমতী শিল্পশত্রুর মত আলমারিতে তালাচাবি দিয়ে রাখলুম।

মেয়ে খুব সিভিলাইজ্‌ড, নিয়মিত তিনখানা কাগজ পড়ে। ইন্দিরা, মোরারজী, চরণ বিষয়ে গভীর জ্ঞানী। ভুট্টোকে নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে। পরীক্ষার দিন

সকালে বিশেষত টেস্টের সময়ে রেগুলারলি দেখেছি। ইদানীং দেখেছি খবরের কাগজ খুলে শিস দিতে দিতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। —যাক, তবু পরীক্ষার ভাবনাটা মাথায় ঢুকেছে। এমন সময়ে মেয়ে একদিন কথা কয়ে উঠলো— 'আজকাল বেড়ালছানারা আর ছানা নেই মা। ওদের দুধটা কমিয়ে মাছটা বাড়াতে হবে। নইলে ওদের গ্রোথ হবে না ঠিকমতন।'

—'ও! তুমি শিস দিতে দিতে বেড়ালের ভবিষ্যৎ চিন্তা করছিলে? নিজের নয়?'

—'নিজের? নিজের কী চিন্তা?'

— . .ও চিন্তা নেই?'

—'না. মানে কোনও স্পেসিফিক চিন্তাটার কথা বলছো?'

—'পরীক্ষাটা' —হার মানা গলায় বলি।

—'সে তো আছে-ই। জান মা, বন্যা আর বিদ্যুৎ সঙ্কট essay আসছে।'

সেইজন্যে বিদ্যুৎ সঙ্কট নিয়ে গভীর ভাবনা হয়েছে মেয়ের। রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা ভাবছে। আলো নিবলেই ভাবতে শুরু করে— সকাল ২টো পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র ভাবনা। মাঝে শতবার আলো ফিরলেও ডেকে তোলা যায় না।

সেদিন এক ভদ্রলোক এসেছেন আমার কাছে। কলকাতার বাইরে একটা সাহিত্য উৎসবে নিয়ে যেতে চান ১লা বৈশাখ। মেয়েরা পাশে এসে যথারীতি বসে আছে। চোখ গোলগোল করে শুনছে—তিনি কত যত্ন করে নিয়ে যাবেন টানা মোটরে, ওখানে কী কী দ্রষ্টব্যস্থান। যেই বললুম —'এখন তো যাওয়া অসম্ভব, পরীক্ষাটা হয়ে যাক',— অমনি মেয়ে বাধা দিয়ে ওঠে —'চল না মা, চল না? কি সুন্দর। খুব ভাল লাগবে, চল না মা—'

—'আরে! পরীক্ষা না তখন?' আমি তো তাজ্জব!

—'কী পরীক্ষা? ও! তখন এম-এ চলবে বুঝি?' একেবারেই সরল চোখ। অসহ্য রাগ হয়। রাগ চেপে রাখা আমার স্বভাব নয়। তবু যথাসাধ্য দাঁতে দাঁত চেপে বলি —'কী পরীক্ষা? জান না পয়লা বৈশাখ মানে চোদ্দই এপ্রিল। সতেরই এপ্রিল থেকে কার পরীক্ষা?'

—'সতেরই...? ওঃ হো! স্যরি স্যরি, বুঝেছি।' লজ্জায় একগাল হেসে ফেলে বলে, 'স্কুল ফাইনাল! আমাদের তো?'

আমি মরিয়া হয়ে বলি— 'এটা মার্চ মাসের সাত তারিখ। একমাস দশদিন মাত্র বাকি। এখনও জিজ্ঞেস করছ, কার পরীক্ষা মা? আমি কি বিষ খেয়ে মরব?'

সভ্যতা ভব্যতা বিস্মৃত হয়ে জনসমক্ষে ইতরজনের মত কাতরে উঠি। বেগতিক দেখে ভদ্রলোক— 'আচ্ছা, নমস্কার। এবার তাহলে থাক। বরং সামনের বছরে—' বলে ছুটে পালিয়ে যান। খুব অপ্রস্তুত মুখে মেয়ে গিয়ে পড়তে বসে। বাঁহাত কুকুরের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে। তাতে পড়া ভাল হয়।

লক্ষ্মী এসে নালিশ করে— 'বড়দিমণি রোজ রোজ নিজের দুধ আর সন্দেশটা

মাস্টারমশাইকে খাইয়ে দিয়ে, নিজে চা-ডালমুট খাচ্ছেন।'

—'সে কি কথা?'

—'আমি রোজ দেখতে পাই বড়দিমণি পড়তে পড়তে ডালমুট চিবোচ্ছেন, আর মাস্টারমশাইয়ের গোঁফে সর।'

—অ। কাল থেকে দুজনকেই দুধ-সন্দেশ। চা-ডালমুট মোটে টেবিলে দিবি না।

তিন মাস আমি কোনও নেমন্তন্ন যাই না, সভা-সমিতিতে যাই না, লৌকিকতা বন্ধ। মেয়ে এদিকে শনি-রবিবার নিয়মিত টিভিতে সিনেমা দেখে, বেস্পতিবার চিত্রমালা দেখে, বন্ধুদের জন্মদিনে কার্ড আঁকে, দীর্ঘ দীর্ঘ ফোন করে। বুক ফেয়ারে গেলে সময় নষ্ট হবে বলে আমি সন্ধেবেলায় না গিয়ে দুপুরবেলায় নিয়মরক্ষে ঘুরে এলুম। মেয়ে কিন্তু তিনদিন পরপর মাসিপিসিদের সঙ্গে সন্ধেবেলায় রাত দশটা পর্যন্ত বুক ফেয়ারে বেড়িয়ে ঘুগনি খেয়ে এল! আমি উদ্বেগে অস্থির। আমার শুভার্থীরা আমার থেকেও বেশি অস্থির। সবাই আমাকে বকছেন। আমার মেয়ের জন্য সবার চিন্তার শেষ নেই। — 'কেবল হিল্লিদিল্লি লেকচার মেরে বেড়ালে আর গল্পকবিতা লিখলে কারুর ছেলেপুলে মানুষ হয়? কেবল নিজের পড়া আর নিজের লেখা নিয়ে মত্ত। তার ওপরে আজ হাঁপানি, কাল হার্টের রোগ, পরশু হাই প্রেশার, অসময়ে যত ঝামেলা বাধিয়ে তুই-ই বরং ওকে আরও ডিসটার্ব করিস। মেয়েটা পড়বে কখন?'

সবই সত্যি। মেয়েটা সত্যি খুব সেবা করে। অবোলা কুকুর বেড়াল, রুগ্ন মা, ছেলেমানুষ বোন, বুড়োমানুষ দিম্মা প্রত্যেকের। আবার এও সত্যি যে সকাল থেকে সকাল পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা ওর পেছনেই আছি। ভোর পাঁচটায় অ্যালার্ম দিয়ে উঠি। উঠে মেয়েকে তুলে দিই। আবার ঘুমিয়ে পড়ি। সাড়ে পাঁচটায় আবার উঠি। আবার মেয়েকে তুলে দিই। আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ফাইনালি ৬টায় উঠে চা খেয়ে গায়ে জোর পেয়ে রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করি। এবার মেয়ে ওঠেন। গজগজ করতে করতে পড়তে বসেন। আশ্চর্য! পড়ে প্রধানত Test Papers টা। কেবলই মন দিয়ে প্রশ্নগুলো পড়ে আর হিসেব কষে। তার পড়ার ঘর থেকে টেবিল নামিয়ে এনে আমার ঘরে পেতেছি। দিনরাত প্রশ্ন ধরে আনছি আর টুকছি। প্রশ্ন ধরা মানে মেয়ের বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের খাতা চেয়ে আনছি, স্কুলে সাজেস্টেড প্রশ্নগুলো (আমার মেয়ে ওসব টোকে না, যদিও রোজই ক্লাসে উপস্থিত থাকে। শুনতে শুনতে নাকি লিখতে পারে না) টুকে নিচ্ছি। মায়েতে আর ছোট বোনেতে খাতার পর খাতা ভরে ফেলেছে— উত্তর না-জানা প্রশ্নের মালায়।

What is hydro-static paradox? What is blood? What is mitosis? What is Sannyasi Bidroha? What is $K_2Cr_2O_7$? এরপর বই দেখে দেখে উত্তরগুলোও লিখতে হবে। যদি মেয়ে না লেখে উপায় কি?

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি বিহারী দত্তকে, তাঁর সেই জাহাজে আমিও ভেসে যাচ্ছি। আমার শুভার্থী বন্ধুরা কী এ সব ঘটনা জানেন? বিহারী দত্তের সমুদ্রযাত্রা? আমাকে

উত্তর লিখতে হয়। আমাকে জানতে হয়।

What did the Selfish Giant see? How was Tenner rewarded?

আমাকে পাগলের মত ছুটোছুটি করে বোরিকতুলো, কাঁচি, ডেটল, ব্যাণ্ডেজ আরও পঞ্চাশ রকম টুকিটাকি কিনে আনতে হয়, একটা ভাল দেখে বক্স যোগাড় করে তাতে ধপধপে কাগজ আঠা আঁটতে হয়, তাতে লাল কাগজে রেডক্রস কেটে লাগিয়ে First Aid Box তৈরি করে দিতে হয়। এই বাক্সের জন্য দশ নম্বর মাত্র বরাদ্দ, আমাকে প্রত্যেকটা Practical খাতা ভাস্করের খাতা দেখে দেখে এঁকে দিতে হয়। আমি বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলেই কতরকম প্যাটার্ন দেখতে পাই— কক্রোচ-এর এ্যালিমেন্টারি সিস্টেম, ফ্রগ-এর ইউরিনো-জেনিটাল সিস্টেম—ফীমেল টোড-এর রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম। এত কষ্টের মূল্য নাকি মাত্র দু নম্বর। তাছাড়া কিছুদিন হল মেয়েকে ভাত খাইয়ে দিতে হচ্ছে। তার হাতটা জ্বলে গেছে। কেননা ওয়ার্ক এডুকেশনে সাবান তৈরি করেছেন তিনি। সে সাবানের সোজা পোটেন্সি? একটা কাঠের ট্রেতে রাখা ছিল। তাতেই ট্রেটাতে ঠিক শ্বেতীর মত ছোপ ধরে গেছে। এ সাবান কিন্তু গায়ে মাখার জন্যে। নীল, হলুদ, গোলাপী, লোভনীয় স্বপ্রিল প্যাস্টেল রঙে, ফ্রী পাওয়া যায়। আমাদের বাড়িতে এখনও গোটা দশেক আছে। চাই?

ওয়ার্ক এডুকেশনের জন্যে মেয়েরা না হক আমাদের হোল ফ্যামিলির যেমন ওয়ার্ক তেমনি এডুকেশন হল। মাটি মাখা, মাটি ছানা, মূর্তি গড়া কতকিছু আমি করতে পারি এখনও। সেই মূর্তি থেকে প্লাস্টার অফ প্যারিসের ছাঁচটা শিবুই বানিয়ে দিয়েছে অবশ্য। সেই ছাঁচে ফেলে final মূর্তিটা বের করেছে মেয়ে নিজেই। দীপু ওটাকে স্প্রে-পেন্টিং করে দিয়েছে টুথপেস্ট-টুথব্রাশের ছিটে মেরে— ভাস্করের ইনস্ট্রাকশনে। মেয়ে বলছে, 'চলবে'।

পিঠে একটা বিশাল নম্বর আঁটা, ওর final পরীক্ষা ছাপানো রোল নম্বর।

—'কিরে হয়ে গেল?'

—কথা বল না! সময় নেই। স্কুল পারফরম্যান্স খাতা লাগবে এক্ষুনি— কেউ কি দেখেছ খাতাটা কোথায়?

মেজাজ একেবারে মিলিটারি। যেহেতু সবগুলো খাতায় সযত্নে বাহারী মলাট লাগাল আমারই বৈধ কর্তব্য, আমি তক্ষুনি মনে করতে পারলুম স্কুল পারফরম্যান্স খাতাটা কোথায় দেখেছি— এবং খাতা বগলে 'থ্যাংকিউ' বলেই মেয়ে ছুটল। রিকশার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল বোনটি এবং মামাটি। রিকশা দাঁড়াল না। বিকেলে ফিরে শুনলুম তারা ছুটতে ছুটতে স্কুল অবধিই গিয়েছিল— 'ঢুকেই শুনি ঠিক দিদিরই রোল নম্বরটা ডাকা হচ্ছে। পি টি পরীক্ষার জন্য। দিদি তক্ষুনি দৌড়তে দৌড়তে হলে ঢুকে গেল। বগলে খাতা। আমাদের দিকে তাকালই না।'

—'অমন হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে কেমন পি টি-র কায়দা দেখিয়েছে কে জানে!'

পরীক্ষার তিনদিন বাকি। মেয়ে এসে বললে— জান মা, আরাধনাটা এত

অন্যমনস্ক—অ্যাডমিট কার্ডটাই হারিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য এখন খুঁজে পেয়েছে।

— তোরটা আছে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আছে। জান মা, অলকা লাহিড়ীর ব্যাপারটা আরও খারাপ। ধোপার বাড়িতে চলে গিয়েছিল, কুড়মুড়ে হয়ে ফিরে এসেছে। কী হবে?

—তোরটা কই? বের কর তো?

—কী হবে বের করে? এই তো ড্রয়ারে।

—তবু, একবার দেখা না?

—এই দ্যাখ বাবা, দ্যাখ!— খুব কনফিডেন্টলি ড্রয়ার খুলেই মুখ শুকিয়ে এতটুকুনি! তারপরেই ড্রয়ার তোলপাড়! তারপর সারা বাড়ি তোলপাড়। মুহূর্তেই প্রবল মাস মোবিলাইজেশন ঘটে যায়। বাড়িসুদ্ধু প্রত্যেকেই প্রত্যেকটা আনাচ-কানাচ, বাক্স-ড্রয়ার, তন্নতন্ন করে ঘাঁটছে। ঘাঁটতে ঘাঁটতে যে যা খুঁজে পাচ্ছি নিয়ে নিচ্ছি। ছোট মেয়ে নিল একটা শক্ত ইরেজার, আমি পেলুম মর্চে পড়া কাঁচিটা, মা পেলেন একটা জর্দার ডিবে, শিবু পেল স্ক্রু-ড্রাইভারটা। —শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজের ডাঁই থেকে বেরিয়ে পড়ল মেয়ের অ্যাডমিট কার্ড, আর মায়ের হারিয়ে-যাওয়া মাইনের চেকটা। পরীক্ষার ডামাডোলে খুঁজে পাচ্ছিলুম না, গত মাস থেকেই। কাউকে বলিনি। এখন কে কাকে বকবে? ডবল কেলেঙ্কারি। আমি দুটোই চটপট আলমারিতে তুলে ফেলি। মেয়েকে যেই বলেছি— 'অ্যাডমিট কার্ডটা না পেলে তুই কি করতিস?' অমনি আমার মা জবাব দেন— 'বোর্ডে গিয়ে তোমাকেই ডুপ্লিকেট নিয়ে আসতে হত। কিন্তু চেক না পেলে তুমি কী করতে?'

হোল নাইট প্রোগ্রামগুলো আমাদের মা-মেয়ের এখন যুগলবন্দী হয়ে গেছে। ঠিক লুচি ভাজার প্রসেসে কাজ দ্রুত এগুচ্ছে। বেলা, ভাজা, খাওয়া। লুজ শীটে আমি একটা একটা প্রশ্নের গরম গরম উত্তর লিখে এগিয়ে দিচ্ছি, আর শেষে সে নিয়ে একটা একটা প্রশ্নোত্তর কপাকপ গিলে ফেলছে—। হ্যাঁ। এগুলো সব আগেও লিখে দিয়েছিলুম— প্রিটেস্টের আগে। টেস্টের আগেও খাতাতেই। কিন্তু সেইসব খাতা এখন আর নেই। জন্মের শোধ কিছু হারিয়ে গেলে আমার মেয়ে বলে— 'কোথাও মিসপ্লেসড হয়েছে।' মেয়ের শরীরে উদ্বেগ নেই। সত্যি 'স্থিতধী' প্রাণী। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ। মন্দ রেজাল্টেও ভীত নয়, ভাল রেজাল্টেও স্পৃহা নেই।

পরীক্ষার আগের দিন বাড়িতে বিজয়ার মত জনাসমাগম— ফোনের পরে ফোনে শুভেচ্ছা আসছে— প্রণাম, মিষ্টান্ন, উপদেশ, স্মৃতিচারণ, অ্যাডভান্স সান্ত্বনা, আগাম সহানুভূতি, ফ্রী। লাস্ট মোমেন্ট সাজেশানস। পুরো দিনটাই গেল। অত শুভেচ্ছায় শেষ মুহূর্তে মেয়ের অমন লোহার নার্ভও ফেল করল। মোটা মোটা চশমার কাঁচের পেছনে ভীতু জল চকচক করে উঠল— সদ্য পঞ্চদশী হয়েছেন, ঠিক টেস্টের আগেই। খুবই গ্রোন-আপ ভাবছিলেন নিজেকে। এমন সময়ে দিম্মা কোলে নিয়ে বললেন— 'ভয় কি রে? তোর মা ফাঁকিবাজ ছিল, ঘাবড়াসনি তুই!'

মেয়ের মন ভাল করতে একটা নতুন ক্লিপবোর্ড কিনে তাতে নাম লিখে দিলুম। ওপরে শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ লিখতে গিয়ে কিরকম একটু লজ্জা করল। লিখলুম, 'জয় বাবা ফেলুনাথ।' ফেলুদের নাথ তিনিই। মা সরস্বতীকে কেন আর কষ্ট দেওয়া?

পরীক্ষার দিন। ভোর চারটেয় উঠেছি। মেয়েও চারটেয় উঠেছে। আমি এখনও দ্রুত উত্তর লিখছি— কালকের সাজেস্টেড প্রশ্নের। মেয়ে অলস চোখ বোলাচ্ছে, বোরড মুখে। তুমি কার। কে তোমার। বোনও চারটেয় উঠেছে। কলমে কালি ভরছে, পেন্সিল কাটছে, ইরেজার, রুলার মোজা রুমাল এইসব গুছিয়ে রাখছে— জুতো পালিশ করছে, বোতলে জল ভরছে। দিম্মাও চারটেয় উঠেছেন। পরীক্ষার ভাত রেডি হচ্ছে, টিফিন তৈরি হচ্ছে। পোশাক প্রস্তুত। র‍্যাশন কার্ডের খাপ থেকে কার্ড বের করে ফেলে দিয়ে, অ্যাডমিট কার্ড ভরে দিলুম। যাতে ছিঁড়ে না যায়। মেয়ে চান করতে গেল। যেন গায়ে-হলুদের সকাল। বাড়িময় এমন তাড়া লেগেছে ভোররাত্তির থেকে। মেয়ের চান হতে হতে মায়েরও চান হয়ে গেল— মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাও গরম গরম ভাত খেয়ে রেডি— পৌঁছতে যেতে হবে তো? মায়ের গাড়ি যখন-তখন বিগড়ে যায়, তাই বিশ্বস্ত গাড়ি এসে গেছে অনেকক্ষণ, গাড়িতে আরেক প্রস্থ টিফিন, এবং মাসীমা বসে।— কিন্তু মেয়ে কোথায়? রান্নাঘরে। কুকুর-বেড়ালের লাঞ্চ বেড়ে দিতে গেছেন। ধরে এনে দিম্মাকে প্রণাম করাতেই তিনি যাত্রা করার মন্ত্র জপ করে দিলেন নাতনির মাথায় হাত রেখে। মেয়ে এবার দিম্মাকেও প্রণাম করল। তার পরেই ছোট বোনকে— 'ও কি দিদি? ও কী করছ?' বোনটি কুল-কুলিয়ে হেসে ফেলে। —'ওঃ স্যারি।' গাম্ভীর্য একটুও না হারিয়ে স্থিতধী দিদি বলেন— 'লাইনে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? স্টুপিড?' দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে, হঠাৎ আমি দৌড়ে আবার ওপরে উঠতে থাকি।

—আবার কোথায় যাচ্ছ মা?

—যাই, মাকে প্রণামটা করে আসি।

—'তুমি?' মেয়ে এবার গাম্ভীর্য হারিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে— 'তুমি প্রণাম করবে? তোমার কি পরীক্ষা? পরীক্ষা তো আমার!'

অট্টহাসির রোলের মধ্যে তো দুগগা বলে রওনা হলুম। গেটে দু-চারজন, বারান্দায় দু-চারজন হাত নাড়তে লাগল— মেয়ে যেন বিলেত যাচ্ছে।

পরীক্ষার হলে মেয়েকে পৌঁছে দেওয়া আরেক পর্ব। জগৎ পারাবারের তীরে মায়েরা করে খেলা। কিছু কিছু বাবাও আছেন। আমরাও তো একদিন পরীক্ষা দিয়েছি, মা তো ধারেকাছেও যেতেন না? বন্ধুরা বন্ধুরা মিলে চলে যেতুম, টিফিন বাক্স সঙ্গে নিয়ে— আজকালকার ছেলেমেয়েরা বেশি বেশি আদুরে হয়েছে। তারা বাপ-মার কথা কম শোনে, আদর-আহ্লাদ তত বেশি পায়। আমাদের কালে টিউটর থাকতেন একজন (যদি অ্যাট অল থাকতেন), এখন প্রতি সাবজেক্টে অন্তত একজন। যেসব ছেলেমেয়েরা একা একা বটানিকসে-ডায়মণ্ডহারবারে চলে যেতে পারে, পরীক্ষার হলে তাদেরও কিন্তু প্রত্যেকদিন বাপ-মাকে পৌঁছে দিতে হবে। ফের দুপুরবেলায় অঞ্জলিতে টিফিন নিয়ে মা-

বাবারা অফিস কামাই করে হত্যে দেন ইস্কুলের গেটে। বিকেলে ছুটতে ছুটতে পুনরায় হাজির, নীলমণিদের ফেরত নিতে। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক। বাপ-মায়ের এই পুণ্যে যদি-বা ছেলেমেয়েরা তরে যায়! যাক, শুরু হয়ে গেল বড় খেলা।

পরের দিন সকালে, আজ অফ ডে। মেয়ে দরজা বন্ধ করে ফোন করছে। আমাদের বাড়িতে এটার চল নেই। আমি তো জোর করে ঢুকবই ঢুকব— গোপন ফোন চলবে না চলবে না!— অন্তত ষোল বছর তো হোক? মেয়ে বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দিয়ে ফোনে ফিরে গেল।

—আছে? কী দেখলি? আছে তো? এই, প্লীজ একটু দিয়ে যাবি? আচ্ছা, থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ। দশটার মধ্যে, কেমন? ফোন খতম।

—কী ব্যাপার রে?

—কিচ্ছু না। বায়োলজির বইটা। আরাধনার কাছে ছিল।

—কালই তো ইংরিজি আর বায়োলজি? কবে থেকে তোর বই ওখানে আছে?

—টেস্টের পর থেকেই। আচ্ছা মা, আমাকে তো ও কতবার কত খাতা ধার দিয়েছে। দেব না বই?

—এতদিন কী দিয়ে পড়লি?

—কেন খাতা? অন্য অন্য সব বই— কত তো বই আছে।

—কিন্তু ওটাই তো টেক্সট বইটা!

—ও কিছু না।

তিনদিন পরে।

—'সকালে ফিজিক্যাল সায়েন্স, বিকেলে সংস্কৃত। এই সংস্কৃত খাতাগুলো টিফিনের সময়ে নিয়ে যেও ঠিক মা!' মনে করিয়ে দিল মেয়ে বেরুনর সময়ে। গাড়ি থেকে নামতে নামতে দেখলুম ইস্কুলের সামনে আরাধনা দুলে দুলে সংস্কৃত পড়ছে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। — 'ও কি রে?' আমার মেয়ে যেচে জ্ঞান দিলেন— 'এখনই সংস্কৃত পড়ছিস? এখন যেটা পরীক্ষা সেইটে পড়বি তো?' আরাধনা অবাক হয়ে তাকায়।

—'সেইটেই তো পড়ছি। এখন স্যান্সক্রিট না?'

—'কি?' আমি বিষম খাই। 'এখন স্যান্সক্রিট? তবে যে বললে এখন ফিজিক্যাল সায়েন্স— সংস্কৃত বিকেলে?'

—'আবা-র?' আরাধনা আর্তনাদ করে ওঠে। 'আবার তুই টেস্টের মতন করলি?' আমিও আর্তনাদে জয়েন করি। এবার স্থিতধী কন্যা আমাদের প্রতি সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করেন— 'যাগগে মা— ওবেলা না-হয় এবেলায়। কী এসে যায়? দিনটা তো ঠিকই, স্যান্সক্রিট খাতাপত্তর আর আনতে হবে না।' স্থিতধী নাচতে নাচতে ভেতরে চলে যান। আমরা ব্যাকুল মা-বাপেরা ঘণ্টা পড়ার অপেক্ষায় হাঁ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় শুনি শূন্য থেকে দৈববাণী হচ্ছে: 'মা! মা! এই দ্যাখ, আমরা কোথায়?' ভীষণ রোদে ভুরু কুঁচকে ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ উঁচিয়ে দেখতে পাই— ঠাঠা রোদ্দুরে টিলের ছাদে

দু-তিনটে ইউনিফরম পরা ঝাঁকড়াচুল মূর্তি একগাল হাসতে হাসতে হাত নাড়ছে,যেন এভারেস্টের চুড়োয় তেনজিং ইত্যাদি।

উপসংহার: এরপর নিশ্চয় স্কোরবোর্ডটা দেখতে চান? যেমন খেলোয়াড়, যেমন পিচ, তেমনি খেলা; আর তেমনই রেজাল্ট। হোল ফ্যামিলির অসামান্য টীমওয়ার্কের টোটাল স্কোরিং সাড়ে তিয়াত্তর পার্সেন্ট। দুটো মাত্র লেটার। তার একটা আবার বায়োলজিতেই। ঘরময় দৌড়ে দৌড়ে ধপধপ শব্দে একটা বল বাউন্স করতে করতে মেয়ে বলল—

—'মা, তোমাদের সত্তর, আমার সাড়ে তিন— এফর্টওয়াইজ। দিম্মাকে সেই প্রণামটা তুমি যদি করতে, স্টারই পেয়ে যেতুম নির্ঘাত।'

জীবে দয়া

মা টেরেসা নোবেল পুরস্কার পেয়ে অবধি দেশে জীবে দয়ার ট্রেনিং শুরু হয়েছে। আমাদের এক প্রতিবেশী সেদিন দেখলুম একজন ভিখিরিকে ডেকে এনে ছেঁড়া লুঙ্গি দিচ্ছেন। সেজপিসেমশাই একজোড়া আস্ত স্যানডাল চটি দিয়ে দিলেন রিকশাওলাকে (গত বছর এক বেচারী চোর ও-বাড়িতে চুরি করতে ঢুকে, চটি জোড়া ফেলে পালিয়েছিল)। লতুবৌদি এক খাঁচা বদ্রীপাখি কিনে দিলেন ছেলেকে। —'যা দিনকাল পড়েছে, একটু মায়ামমতা প্র্যাকটিশ করুক। প্রাইভেট টিউশন ছাড়া কিছুই তো শেখে না ছেলেপুলেরা, পাখিদের যত্ন করতে করতে যদি জীবে দয়া শেখে।'

জীবে দয়া করে যদি ক'লাখ টাকা ঘরে আসে, তো আসুক না, ক্ষতি কি? জীবে দয়ার যে এতটা আর্নিং পোটেনশিয়ালস আছে তা কি আগে জানা ছিল? যেমন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার পরে কবিতার আর্নিং ক্যাপাসিটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা পালটে গেল, আর গাদা গাদা ইংরেজি কবিতা লেখা হতে লাগল।

কিন্তু আমাদের বাড়ির ব্যাপার স্যাপার আলাদা। এ-বাড়িতে প্রচণ্ডর..ম জীবে দয়ার ট্র্যাডিশন—আমার মেয়েরা অষ্টাবক্র মুনির মত জীবে দয়ার ট্রেনিং সমেত ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তাদের দয়ামায়ার অত্যাচারে বাড়িসুদ্ধু অতিষ্ঠ। কিছু বলতে গেলেই আমার মা বলেন, 'বোঝ এখন নিজে আমার কষ্টটা। মা যেমন, মেয়েরা তেমনিই হয়েছে।' এর ফলে তাদের জীবের-দয়া বাধাবন্ধহারা হয়ে আরও দিগ্বিদিকে ধাবিত হয়। দিকে চেয়ে বিদিকেই বেশি। ওদের বুকে জীবে দয়া যত বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার সংসারের অশান্তিও চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে যাচ্ছে। অথচ, মুশকিল এই যে, সংসারটাকে আমার কিছুতেই খুব সীরিয়াস ব্যাপার বলে মনে হয় না। মার সংসার ছিল আসল সংসার। আমারটা যেন খেলাঘর। সেই বাড়িঘর, সেই [illegible], সেই আমি, এবং আমার মেয়েরা—এবং গাদা গাদা পুষ্যি (যেমন আমারও ছিল)—নেই কেবল বাবা। বাবা ছিলেন—মায়ের সংসারে মাথা ছিল। আমার খেলার সংসারে কোনও মাথা নেই, তাই সংসার নিয়ে আমার মাথাব্যথাও নেই। যেমন রান্নাবাড়ি খেলছি—ঘরকন্নাটাকে

কিছুতেই আমার বাস্তব বলে আর বিশ্বাস হতে চায় না। এ-সংসার যেন ভবসংসার—এর কাণ্ডারি সত্যি করে তিনিই, যিনি এই অখণ্ডমণ্ডলাকার ব্রহ্মাণ্ডটিকে চালাচ্ছেন। আমার সংসারে আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা আছে দ্বার।

ছেলেবেলায় আমি যখন কানাখোঁড়া কুকুর বেড়াল, ডানাভাঙা পাখি, বাসাভাঙা কাঠবেড়ালী, কাকের ছানা, এমনকি চামচিকে পর্যন্ত ধরে এনেছি—মা কখনও কখনও সইতেন, কখনও গুনিয়াভাইকে দিয়ে পগারপারে ভাসিয়ে দিতেন। আমি পারি না। ফলে আমার সংসারে জীবজন্তু আসে, আসে, আসে। এবং থাকে, থাকে, থাকে। আমাদের নিজেদের যত কৌটো চাল লাগে, কুকুর বেড়ালদের চাল লাগে তার চেয়ে বেশি। নিজেরা মাছমাংস খাই না-খাই—কুকুরের হাড়, বেড়ালের মাছ চাই-ই।

মা মাঝে মাঝে খেপে উঠে বিদ্রোহ করেন। যখন অতিথিরা এসে দাঁড়িয়ে থাকেন সবগুলো কোচের গদিতে এক-একটা আদুরে বেড়াল রোঁয়া ফুলিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। ঠেললেও ওঠে না। 'এও বাহ্য', টুল, মোড়া, মাদুর পেতে অতিথিদের বসাই। যাবার সময় তাঁদের অনেক সময়ে খালি পায়ে যেতে হয়। জুতোগুলি এ-বাড়ির কুকুর ইতিমধ্যে চিবিয়ে রেখেছে। কেউ কেউ খালি পায়ে যেতে রাজী হন না, আমাদের জুতো পায়ে দিয়ে যান। প্রত্যেকটি পর্দা, চাদর, টেবিলক্লথ চিবোন, ঝুল্লি ঝুলছে। প্রত্যেক চেয়ার টেবিল আলমারির পায়া চিবোন এবড়ো, খেবড়ো। প্রত্যেকটি চেয়ারের সমস্ত চামড়ার গদি ছিন্নভিন্ন, তুলো বেরুনো—ওতে বেড়ালরা নখে শান দেয়। সর্বত্র ওডোনিল ঝুলছে, প্রত্যেকটি ঘরেই তাজা, ফ্রেশ স্যানিটারি সুবাস। যেমন দামী হোটেলের বাথরুমে। (নইলে মনে হবে চিড়িয়াখানা)।

মা দুঃখে হাসেন। হাসবেন না? তিনি যখন গিন্নি ছিলেন, তখন সংসারে লক্ষ্মীশ্রী ছিল। জীবে দয়া করতে-করতে কী বাড়ি কী হয়ে গেল লণ্ডভণ্ড।

কিন্তু এহেন বাড়িতে আরো জীবে দয়া করা সম্ভব। সেই স্কোপ এখনও আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? ঘটনাটা শুনুন, বিশ্বাস হবে।

অ্যানুয়াল পরীক্ষা চলছে। সন্ধেবেলায় হঠাৎ রাস্তায় একটা গণ্ডগোল। পড়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠে মেয়েরা তো জানলায়। একটু পরে ছোট এসে বলল— 'মা! মা! শিগগির এস। একটা কুকুরছানাকে না, (কী সু—ঈ—ট, ছো—ওট্ট, এখনও চোখই ফোটেনি ভাল করে) দুষ্টু ছেলেগুলো ঢিল মারছে, পা দিয়ে লাথি মেরে বল খেলছে, এমন মাড়িয়ে দিয়েছে যে পেছনের দুটো পা কেমন লম্বা হয়ে গেছে!' এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল সাংসারিক ভূমিকা কী হওয়া উচিত ছিল কে জানে, আমি তো আবাল্যের অভ্যেসে লাফিয়ে উঠেছি—

—'কই—কই? কোথায়? চল তো দেখি—'

—'দিদি ওদের বকে দিয়েছে। ছেলেরা পালিয়ে গেছে।'

—'আর কুকুরছানাটা?'

—'দিদির কোলে।'

—'আর দিদি?'

—'গেটে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে আনবে কি?'

মুহূর্তেই বুঝে ফেলি ব্যাপার। ঢোকেনি যখন, তখন নিশ্চয় সে গৃহে প্রবেশের যোগ্য নয়। সেবারে যখন কাকে ঠুকরে একচোখ গলে-যাওয়া, পেছনের পা—প্যারালাইজড বেড়াল ছানাটাকে এনে ওরা শোবার ঘরে খাটে শুইয়ে পরিচর্যা করেছিল, আমার মা কুরুক্ষেত্র করেছিলেন। এবারে তাই সাবধানতা নিয়েছে মেয়ে। মুহূর্তেই আমার কর্তব্য স্থির। —'খবরদার, ভেতরে আনা হবে না। ওই সামনে, সদর উঠোনে যে-কোণটায় একটু ঢাকা মতন আছে, সেখানে রেখে দাও।' —'রাখি? থ্যাংকিউ! থ্যাংকিউ! মা, তুমি সত্যি খুব ভাল।' তারপরেই ছুটোছুটি। —'মা একটু দুধ? একটা সসার? বোরিক তুলো? ডেটল।?'

আমি তো জীবনে মাকে থ্যাংকিউ বলেছি বলে মনে পড়ে না যদিও শ্বাস প্রশ্বাসে আমার মায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা। এরা বলছে, বলুক। বলতে বলতেই কৃতজ্ঞতা আসে হয়ত আজকাল।

রাত্রে খেতে বসে আলোচনা হচ্ছে দুই বোনে। দিদি বলছে— 'ফ্রিজের দুধ দিসনি, একটু গরম করে দে, নইলে কিন্তু খাবে না।'

—'একটু মাংসের স্টু দেব, দিদি? তুলোর পলতেয় করে?'

—'ও ভীষণ উইক, ঠিক কুকুরের মত ডাকতেও পারে না মা, বেড়ালছানার মত ডাকে।'

—'বেড়ালছানাই নয় তো?' মা ফোড়ন কাটেন।

—'কী যে বল দিমা। আস্ত কুকুর। দিই স্টু?'

—'পাগলা!' বড় মেয়ে বলে, 'স্টু দেয় না। চোখই ফোটেনি, নুন খাওয়ালে মরে যাবে। বরং এক ফোঁটা ভিটামিন ড্রপ দিতে পারিস।'

—'খবরদার এখন ভিটামিন দিস না। মা হাঁ হাঁ করে ওঠেন – 'সর্বনাশ হবে, পেটের অসুখ করবে যে। সদর উঠোন একেবারে নষ্ট করে ফেলবে।' তারপরেই যথানিয়মে— 'আর তোমাকেও বলিহারি যাই খুকু। মেয়েদুটোকে কী নষ্টই করছিস। অ্যানুয়াল পরীক্ষার মধ্যে পড়াশুনো ছেড়ে উঠে গিয়ে ঐসব নোংরা জিনিস ঘাঁটছে—ছি ছি!—'

—'মাদার টেরেসা তো কুষ্ঠরুগী ঘাঁটেন।' বড় মেয়ে উত্তর দেয়।

ছোট মেয়ে সগর্বে বলে,— 'দিদি তো বড় হয়ে মাদার টেরেসা হবে। না দিদি।'

—'আর তুমি? সিস্টার নিবেদিতা?'

—'আমি? লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প!' এ বছরে ওদের টেক্সটে আছেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। ঝুপ করে আলো নিভে গেল। সারমেয়-জননী ব্যাকুল।

—'ওমা! দশটা বেজে গেল যে?' এক্ষুনি ওকে দুধ খাওয়াতে হবে। চার ঘণ্টা হয়ে

গেছে।'

—'হোক গে, অন্ধকারে নিচে যেতে হবে না।'

—'অন্ধকার তো কী? আমি টর্চ ধরে থাকব।'

লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প জবাব দেন। টেরেসা জুনিয়র দুধ, তুলো, টর্চ নিয়ে রেডি। শুশ্রূষাপার্টি লোডশেডিং উপেক্ষা করে সদরে বেরিয়ে গেল। পিছন পিছন গেল চঞ্চলা আর লক্ষ্মী। যেন গায়ে-হলুদের তত্ত্ব যাচ্ছে। ওরা যাচ্ছে পাহারাদার হয়ে। খোঁড়া কুকুরছানাকে কোলে তুলে অতি যত্নে দুধ খাইয়ে, ওপরে এসে ডেটলে হাত পা ধুয়ে সে-পোশাক বদল করে, দুই দয়াবতী পড়তে বসলেন মোমবাতি জ্বেলে। এগারটায় আলো ফিরবে।

আজকাল বাড়িতে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়া। অ্যানুয়াল পরীক্ষা বলে কথা। রাত্রে খাবার পরেও পড়তে বসা হয়। পৌনে বারোটার সময়ে মা তাড়া লাগাতে শুরু করেন—'বারটা বেজে গেছে, উঠে পড়। আর পড়তে হবে না।' অবশেষে সাড়ে বারটায় তাঁরা উঠে ফ্রিজ খুললেন।

—'মা, দুধ?' মা টেরেসার প্রশ্নের উত্তর দিই,— 'আজ সকালে দু'বোতল দুধ কেটে গেছে। যা ছিল তোমার দশটার ফিডেই খতম।'

—'দুধ নেই? তা হলে কী খাবে ও?'

—'কিছু ভাবিস না। ঠিক হয়ে যাবে।' বোনকে সান্ত্বনা দেয় দিদি।— 'দেশলাই আছে? দীপুমামা?' ঘুমন্ত দীপুমামাকে ঠেলা মেরে জিজ্ঞেস করেন তিনি।

—'যা যা; ঝামেলা করিস না। এত রাত্তিরে দেশলাই দিয়ে কী হবে? কারেন্ট এসে গেছে।'

—'গ্যাস জ্বালব।'

—'গ্যাস?' দীপুমামার একটা চোখ খুলে যায়। 'কেন রে? চা হচ্ছে বুঝি?' দেশলাই বেরিয়ে পড়েছে বালিশের নিচে থেকে।

—'চা না। দিদি জল গরম করবে, নিউট্রামুল গুলবে।'

—'কে খাবে, নিউট্রামুল? এত গুডগার্ল কে হয়েছে?'

—'কেউ না। কুকুরছানা।'

—'এই মাঝ রাত্তিরে নিউট্রামুল খাবে ব্যাটা কুকুরছানা? দে আমার দেশলাই ফেরত দে!'

—'খিদে পায় না তার? সেই দশটায় খেয়েছে।'

—'ঘন্টায় ঘন্টায় খাবে নাকি? হোলনাইট প্রোগ্রাম? তার চেয়ে ওকে চা করে খাওয়া না বাপু? চা খুব নিউট্রিশাস ড্রিংক। আমিও একটু খেতুম।'

—'দুধ নেই।'

—'যা ব্বাবা।'

রাতবিরেতে গ্যাস জ্বেলে জল গরম হয়। কাচের গেলাসে প্রচণ্ড সিরিয়াসলি চামচ

নেড়ে ঠনঠনাঠন মহাশব্দ করে পাড়া জাগিয়ে নিউট্রামুল তৈরি হতে থাকে। সব ঘরে আলো জ্বলছে। যেন বিয়েবাড়ি। সবাই সজাগ, কাজের লোকেরাই কেবল যা নিদ্রাবহুল। দুই মেয়ের সেবাসুন্দর মাতৃমূর্তি দেখলেও চোখ জুড়োয়। মধ্যরাত্রে কী প্রবল ব্যস্ততা। দীপুমামা বলেছে, 'তুলোয় করে কত খাওয়াবি? ড্রপারে করে তাড়াতাড়ি খাবে।' তাই কালি ভরবার একমাত্র প্লাস্টিকের ড্রপারটি গরম জলে ধুয়ে ধুয়ে নিষ্কলুষ তথা স্টেরিলাইজ করা হচ্ছে। পরিষ্কার ড্রপারে টাটকা নিউট্রামুল নিয়ে হাতের উল্টোপিঠে ফোঁটা ফোঁটা ফেলে পরীক্ষা করা হচ্ছে, উষ্ণতা ঠিক সারমেয় শাবকের নরম জিভের যোগ্য কিনা। বড় মেয়েকে দেখে মনে হচ্ছে আঁতুর ঘরের ডিউটিতে এক্সপার্ট নার্স। বোনটি একটু কম এক্সপার্ট। আয়া। ইনস্ট্রাকশন ফলো করে সে দিদির।

—'চল। সব রেডি; পোশাকটা বদলেছিস তো?'

—'কিন্তু এখন রাত্তির একটা। এত রাত্রে আমরা একা একা সদরের উঠোনে বেরুব?' বোনের প্রশ্ন।

—'দীপুমামাকে ডাক।'

—'নো! নেভার।' দীপুমামা গর্জন করে। 'চা করবার বেলায় পারলি না। আমি যেতে পারব না। একা একাই যা। ওখানে জ্যোতিবাবুর পুলিসরা বেড়াচ্ছে। ওরা দেখবে'খন।'

—'ঠিক আছে। চলরে, আমরা যাই।'

—'কি হচ্ছে কি। তোমাদের মার কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই? কুকুরছানা না খেয়ে থাকে থাকুক।' হায়ার অথরিটি থেকে ইনজাংশন জারী হয়ে যায়।

—'দীপুমামা, প্লীজ ওঠ মা যাবেন না, দিম্মা বকছেন——' অগত্যা দীপু ওঠে।

—'হয়েছেও বাবা এক আজব বাড়ি। রাত্তির দুটোর সময় দুটো বাচ্চামেয়ের চোখে ঘুম নেই। কি? না—রাস্তায় কুকুর খাওয়াবে! —চল চল।' আর যাবে কোথায়। দীপুর গজগজানি থেকে শুরু হয়ে গেল মার লেকচার। —'খুকুরই আহ্লাদ দেবার কুফল এসব। তুমি ছেলেপুলে মানুষ করতে জান না খুকু।' আমি দুড়দাড় করে পালিয়ে যাই, যাবার আগে বন্যার মুখে খড়কুটো ধরার মত আউড়ে নিই— 'রাত্তির একটা বেজে গেছে, মা— এটা কি বকুনি দেবার সময়?'

মাকে যুক্তিতে বাগ মানাব তুচ্ছ আমি? ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়েকে?

—'যদি দুটো কচি মেয়ের পক্ষে, এই শীতের রাত্তিরে, মাথায় হিম ঝরিয়ে, সদর রাস্তায় হটর হটর করে বেরিয়ে গিয়ে পথের নেড়িকুকুরের রুগ্ন ছানা নিয়ে খেলাধুলা করবার পক্ষে সময়টা উপযুক্ত হয়, তাহলে তাদের গার্জেনকে বকবার পক্ষেই বা এটা সুসময় নয় কেন?'

আমি বারান্দায় পালাই। উঁকি মেরে দেখি বড় মেয়ে পাঁচিলের ধারে বসেছে সিঁড়িতে। কুকুরছানা কোলে করে দুধের বদলে মধ্যরাত্রের অমূল্য ভালবাসা গুলে, ড্রপারে করে খাওয়াচ্ছে। কোলে একটি ন্যাপকিন পেতে নিয়েছে। ওই ন্যাপকিনটা

ফেলে দিতে হবে।

ছোট কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হুকুমের অপেক্ষায়। রকের ওপরে একটা সিগারেট জ্বলছে। অর্থাৎ দীপুমামাটি সেখানে। পাহারা দিচ্ছে আর জ্ঞানের বাণী উচ্চারণ করছে।

—'ওটার গায়ে গ্যামাক্সিন পাউডার দিয়েছিস তো? দিসনি? এবার দ্যাখ কি সর্বনাশ হয়। তোদের মাথায় রাস্তার কুকুরের পোকা চড়ে বসবে, সেই পোকা এসে উঠবে বাড়ির অন্য কুকুর-বেড়ালের গায়ে। তখন ঠেলা বুঝবি।'

—'যা তো টুমপুস, সেভিন পাউডারটা নিয়ে আয়! প্লীজ। কি সর্বনাশ।'

—'কোথায় আছে? এখন তো অনেক রাত্তির।'

—'এখন তবে থাক, কাল সকালে দিলেই হবে।' দীপু বলে।

—'বাঃ। ততক্ষণে যদি আমাদের মাথায়—'

দীপুমামা ফের সলিউশান দেয়।— 'ওপরে গিয়ে বরং তোরা মাথায় সেভিন পাউডার মেখে শো। সকালে শ্যাম্পু করে নিবি।'

—'সকালবেলায় তো পরীক্ষা। কখন মাথা ঘষব?'

আমি বারান্দা থেকেই স্থানকাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠি— 'খবর্দার! সেভিন দিবি না মাথায়। মানুষের মাথায় কখন কুকুর-বেড়ালের পোকা হয়? অ্যাদ্দিন জীবজন্তু পুষছিস, এও জানিস না?'

এমন সময়ে টহলরত দুটি পুলিস এসে দাঁড়ায় পাঁচিলের পাশে। উঁকি দিয়ে দেখে এত রাত্রে কী অঘটন ঘটছে এ-বাড়ির উঠোনে। কুকুর সেবা দেখে একজন পুলিস সস্নেহে জিজ্ঞেস করে— 'মর গিয়া?' ব্যস, দুই বোনে একসঙ্গে বকুনি লাগায়— 'কিঁউ মরেগা? দুধ পীতা দেখতা নেই?' পুলিসরা হেসে বলে যায়— 'আবতক জিন্দা হ্যায়? তাজ্জব কি বাত।'

এমন সময় ছোট মেয়ে ওপরে মুখ তুলে বলে— 'মা! একটা সোয়েটার দাও শিগগির।'

—'কেন রে? শীত করছে?'

—'আমি না, কুকুরছানার জন্যে। ও শীতে কাঁপছে।' পেছন পেছন দীপুমামার ফোড়ন—

—'ও রাইগার জগতের কোন সোয়েটারে থামাতে পারবে না। ও হল মরবার আগের কাঁপুনি।'

গুম গুম করে কিলের শব্দ এবং দীপুমামার গলায় 'বাপরে মারে'। তারপরে দেখি মেয়ে ওপরে চলে এসেছে— হাতে নিজের ছোট্টবেলার একটা লাল-নীল সোয়েটার নিয়ে নেমে যাচ্ছে। ওরই পুতুল খেলার বস্তু।— 'এটা নিচ্ছি?'

—'নে! কিন্তু সোয়েটার তো ওকে পরাতে পারবি না। ওর আসলে শীত করছে ঠাণ্ডা সিমেন্টের মেঝেয় শুয়ে আছে বলে।'

—'পাপোশটা নিয়ে নেব তাহলে, গেট থেকে?'

—'মোটেই নেবে না পাপোশ'— ও—ঘর থেকে মা বাধা দেন। ফাইনাল গলায়। জীবে দয়ার কারণে বাড়িসুদ্ধ সবাই জাগ্রত। সব দরজা খোলা। সব আলো জ্বালা।

—'তবে কী নেব?'

—'গোটা কয়েক স্টেটসম্যান আর আনন্দবাজার ভাঁজ করে বিছানা পেতে দে। দিব্যি গরম হবে।'

—'ওই সোয়েটার পরা কুকুরছানাটাই কাল ইস্কুলে পাঠিয়ে দিস খুকু। তোর মেয়েদের পরীক্ষাগুলো দিয়ে-টিয়ে আসবে।' মা বলেন।

একটু পরে, ফের ডেটলে হাত-পা ধুয়ে, শোবার পোশাকে, কোলের কাছে শুয়ে বড়টি বলল— 'কাল ওকে তুমি বন্দেল রোডের ভাল ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাবে, মা? ওর পেছনের পা দুটোতে সেই বেড়ালছানার মতন প্যারালিসিস না হয়ে যায়— ভেঙেই গেছে মনে হচ্ছে।'

—'হবে হবে। এখন তো ঘুমো।'

সকালে উঠে নেজাল ড্রপের ড্রপারটা দিয়েই মেয়ের কলমে কালি ভরে দিলুম। পুনরায় সাড়ম্বরে কুকুর-পরিচর্যার পর্ব সমাধা করে, তাঁরা পরীক্ষায় বেরুলেন।— 'জিওমেট্রি বক্স যে পড়ে রইল'— আমি পেছন পেছন ছুটি। নির্বিকারভাবে ফিরে এসে জিওমেট্রি বক্স নিয়ে ছুটতে ছুটতে জীবে দয়াবতী রিকশায় ওঠেন গিয়ে। যেন এটাই নিয়ম।

—'আমি দেড়টায় এসে ফের খাওয়াব।'

—'দুগগা দুগগা! ভাল করে লিখিস।'

সেদিনই আমার ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরতে ফিরতে রাস্তার আলো জ্বলে গেল। বাড়ির সামনে এসে দেখি এক নাটকীয় দৃশ্য।

পাঁচিলের ওপরে একটি দীর্ঘ মোম জ্বলছে, তার পাশে গেটে হেলান দিয়ে একজন, পাঁচিলে কনুই ভর রেখে একজন, মাথা নত করে অ্যাটেনশন হয়ে মিলিটারি কনডোলেন্সের স্টাইলে আর একজন— একটি মৌন মিছিল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। দেখেই বুঝেছি কী হয়েছে।— দীপুই দৌড়ে আসে।

—'দিদি, সর্বনাশ হয়েছে। সেই ছানাটা—'

—'মরে গেছে তো? যাবেই, জানতুম।'

—'ও কি? অমন করে বলতে হয়? বাচ্চাদের খুব মন খারাপ—'

—'মা, এখনই গাড়ি তুলো না। একটু গঙ্গার ধারে যেতে হবে'— বড় বলে।

—'কিংবা পার্ক স্ট্রিটের সেমিট্রিতে'— ছোট বলে।

আমি সিধে গাড়ি গ্যারাজে তুলে দিই।

—'ওকি? যাবে না?'

—'ওই কুকুর নিয়ে? পেট্রল কে দেবে?' উঠোনের সেই কোণটাতে গিয়ে দেখি

সিঁড়ির ওপরে একটি জুতোর বাক্সে স্প্যানের কাগজ বিছিয়ে শবশয্যা প্রস্তুত। ছোট্ট কফিন। কিছু ফুলদানি থেকে তোলা রজনীগন্ধার মঞ্জরী তার পাশে, আর চন্দন ধূপ জ্বলছে। একগাদা খবরের কাগজের বুকে, মোমবাতির রহস্যময় মৃদু উদ্ভাসে, স্বয়ং একটি শোক সংবাদের মত নিজেই নিজের অবিচুয়ারি হয়ে শুয়ে আছে ছোট্ট, অতীব খুদে একটি প্রাণহীন প্রাণী। তার গায়ে আমার মেয়ের রংচঙে সোয়েটার। খুব মায়া হয়। কিন্তু হতকুচ্ছিত। একেই ওরা বলেছিল 'সুইট?' কেমন জামাই পছন্দ করে আনবে কে জানে? মোমবাতি, ধূপ, ফুল, কফিন সব রইল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজগুলোর দুপাশে ধরে স্ট্রেচারের মত তুলে ওকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে নামিয়ে দিলুম রাস্তায়, নর্দমাতে। ঠিক নাক বরাবর টুল পেতে বসে দুজন পুলিস আমার কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গেটের বিপরীতেই এটা ঘটছে। মুদ্দোফরাসীতে মনে হল আমার এতই নৈপুণ্য যেন এই কর্মই করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনভর বুঝি মড়া ফেলতে ফেলতে রপ্ত হয়ে গেছে কাজটা।

ওপরে এসে গা ধুয়ে কাপড় বদলে চা খেতে বসেছি, মেয়ে বললে— 'ও কি ওখানেই থাকবে?'

—'তা কেন? ভোরবেলা জমাদার এলে নিয়ে যাবে। মন খারাপ করিস না, ও বাঁচত না রে।'

—'বাঁচলে তো হাঁটতে পারত না, সে ভীষণ কষ্টের বাঁচা হত। ছানাটা মরে বেঁচেছে।' মা সান্ত্বনা দেন। মেয়েরা কিছুই বলে না। চুপচাপ পড়তে বসে। ফের পরশু দিন পরীক্ষা। বেড়ালগুলো গিয়ে ওদের পড়ার বইয়ের ওপর চড়ে বসে। ওরা সরিয়ে দেয় না।

—'কই জমাদার তো নেয়নি, মা?' —সকালে উঠেই উঁকি মেরেছে।— 'কিন্তু খবরের কাগজগুলো নেই।'

—'ঠিক চারটের সময় ঝাঁটার শব্দ পেয়েছি।' মা বলেন। 'খবরের কাগজগুলো তখনই নিয়ে গেছে নিশ্চয়।' যে-গেট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি বেরুবে, লাল নীল সোয়েটার পরা কুকুরছানা নর্দমায় শুয়ে রইল তার সামনেই। যেন দোলনায় ঘুমুচ্ছে।

—'এতগুলি গণমান্য পুলিসের সামনেও ফেলে গেল? ধন্যি পৌরকর্মী!'

—'দশটার আগেই ক্লিয়ার করে দেবে, ভাবিস না'— দীপুমামার টিপ্পনি। —'চীফ মিনিস্টার বেরুবেন তো।'

'দশটায় জ্যোতিবাবু যাত্রা করলেন। উঁকি মেরে দিপু বলল—

—'নেই। নিয়ে গেছে। যা বলেছিলুম।'

—'নেয়নি। ওই তো, সরিয়ে রেখেছে কেবল—'

—'এই তো ফুটপাতে, ঘাসের ওপরে—'

—'এই তো আমাদের বাড়ির গায়েই—'

—'এই তো আমাদের গেটের ধারেই—'

—'কত মাছি এসেছে, ঈশশ।'

মাছি? শকুন নয় তো? যাক বাঁচা গেল। ঐ সোয়েটারের দৌলতেই কিনা জানি না— এখন যে কাক চিল শকুনিরা টের পায়নি তবুও রক্ষে।

ছোট বলে— 'এখন কী হবে, ওখানেই থাকবে?'

বড় বলে— 'তখনই বললুম গাড়ি তুলো না— শুনলে না তো—'

—'দ্যাখ, জীবে দয়া ভাল। কিন্তু আমিও তো একটা জীব? সারা দিনের শেষে ফেরামাত্র ওপরে উঠতে দেবে না, মরা কুকুর সৎকার করতে নিয়ে যেতে হবে? ভোর থেকে উঠে তোমাদের খাবার তৈরি, জামা ইস্ত্রি, কলমে কালি ভরা, জিওমেট্রি বক্স নিয়ে পেছু পেছু ছোটা—আমাকে তোরা পেয়েছিস কী?'

বকুনি খেয়ে মেয়েরা করুণ মুখে চুপ করে থাকে। তখন আবার বলতে হয় —'দেখি ওই জুতোর বাক্সটা কোথায়? এখন তো তাহলে গাড়িটা বের করতেই হয়—'

—'ওই কুকুরের বাসি মড়া কি এখন ফুলের মালা দিয়ে গাড়িতে তোলা হবে?' মা বলেন।

'তা ছাড়া আর উপায় কী?'

'উপায় করপোরেশনে খবর দেওয়া।'

মা আমার সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ। কত কিছু জানেন। রাস্তায় কুকুর মরে পড়ে থাকলে কী করতে হয় তা জগতে কজনে জানে? আমার মা জানেন।

—'দি করপোরেশন অফ ক্যালকাটা, হেলথ ডিপার্টমেন্ট ডিরেক্টরি খুঁজে বের করে নে। ঠিকানা দিয়ে বল, মুদ্দোফরাস পাঠাবে। অরডিনারি জমাদারে মড়া ফেলে না, ওদের ওটা কাজ নয়।'

খুব সোজা ব্যাপার। মাত্র সাতবারের চেষ্টাতেই টু-থ্রি এক্সচেঞ্জ পাওয়া গেল। দুই মেয়ে হাঁটুতে চিবুক রেখে স্থির বসে আছে। উদ্বিগ্ন মাতৃমূর্তি। মা টেরেসা জুনিয়র। অ্যাণ্ড অ্যাসিস্টান্ট। অনেকক্ষণ ফোন বেজে গেল, বেজে গেল। তারপর একজন ধরলেন। মনে হল না, নামানুযায়ী ইনিই হেলথ অফিসার।

—'কুত্তা মর গয়া? কাঁহা? জ্যোতি বসুকা ঘরকা সামনে? কওন জ্যোতি?'

'ওহো, চীফ মিনিস্টার? ঠিক ঠিক, আভি সাফাই হো জায়গা। ইয়ে সেন্ট্রাল অফিস হ্যায়—আপ ডিস্ট্রিক্ট 'ক' অফিসমে ফোন কিজীয়ে— ফাইভ সিকস।'

—'লিখে নে, লিখে নে, শিগগির—'

এক মেয়ে কলম এগিয়ে দেয়, অন্য মেয়ে হাতের পাতায় চটপট লিখে নেয় ফাইভ সিক্স। —'ডিস্ট্রিক্ট 'ক' অফিস, টালা ব্রিজেকো পাসমে বরানগর ওহী এরিয়া হ্যায়।'

—বরানগর যেন বলল? ভাবতে ভাবতে ফোন করি।

—হ্যালো, 'ক' হেলথ অফিস? আজ্ঞে, চীফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনে একটা কুকুরছানা কাল থেকে মরে পড়ে আছে।

—তা এখানে কেন? জ্যোতিবাবু কি এখানে থাকেন? বরানগর তাঁর

কনস্টিট্যুয়েন্সি, তাঁর রেসিডে   নয়। এও জানেন না? এমন লোক এখন আছে এ শহরে?

—আজ্ঞে? তা তো জানিই— আমি তাঁর বাড়ির সামনে থেকেই বলছি তো। হিন্দুস্থান পার্ক থেকে।

—তা এখানে কেন? এটা তো কাশীপুর—

—কিন্তু আমাকে তো করপোরেশন থেকে এই নম্বরেই...

—আঃ হা— তাতে কি হয়েছে? মানুষমাত্রেরই ভুল হয়। ভুল করেছে। আপনি ফোন করুন ডিস্ট্রিক্ট 'খ'তে। ফোর টু...ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। খুব বুঝেছি।

—হ্যালো, ফোর টু...?

—হ্যাঁ, বলুন।

—চীফ মিনিস্টারের গাড়ির সামনে একটা মরা কুকুরছানা পড়ে আছে। দয়া করে যদি—

—চীফ মিনিস্টারের বাড়ি? অর্থাৎ হিন্দুস্থান পার্কে? ওখানে একটা কুকুরছানা মরেছে?

—ভীষণ মাছি উড়ছে— হেলথ হ্যাজার্ড...

—বুঝেছি বুঝেছি। খুব মুশকিলের কথা। কিন্তু এটা তো ডিস্ট্রিক্ট 'খ'র অফিস। আমরা কী করতে পারি বলুন?

—আজ্ঞে দয়া করে যদি একটু সরিয়ে নেন—

—তা তো বুঝছি, মুশকিলটা কী জানেন, আপনারা তো আমাদের অফিসের আনডারে পড়েন না?

—পড়ি না? আমরা ডিস্ট্রিক্ট 'খ'নই? তবে আমরা কী?

—উদ্বেগের কিছু নেই। আপনি বরং ডিস্ট্রিক্ট 'গ'র অফিসে, ফোর ফাইভ—এ ফোন করুন। ওরা পারবে।

—লিখে নে! ফোর ফাইভ...মেয়ের হাতের ক্ষুদে চেটো উপচে পড়ে এখন কনুইয়ের কাছাকাছি লেখা হচ্ছে ফোন নম্বরের তালিকা।

—ফোর ফাইভ-এ ফোন করব তো?

—হ্যাঁ। করে ডিসিওকে চাইবেন। শুনুন, শুনচেন, যাকে-তাকে বললে দেরি হবে, সোজা ডিসিওকে চাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। কিছু মনে করবেন না, এটা তো ভুল অফিস—মানে, আপনরা ভুল এরিয়া— বুঝেছেন।

—থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ! লিখে নে ডিসিও— বুঝেছি, আমরা ভুল এরিয়া।

—হ্যালো! ফোর ফাইভ? ডিস্ট্রিক্ট 'গ'র হেলথ অফিস?

—ইয়েস।

—সিডিও আছে? সিডিও।

—কে? কাকে চাইছেন?

(নেপথ্যে এদিকে মেয়েদের চীৎকার)—

—সিডিও নয় মা! সিডিও না! ডি সি ও! বল, ডি সি ও? এই যে লেখা আছে—

স্যরি! সি ডি ও নয়, ডি সি ও! উনি আছেন? ডি সি ও? (নেপথ্যে ফোনের ভেতরে আকুলে প্রশ্নোত্তর। 'ডিসিও কে চাইছে। কী বলব? আছে, না নেই?')

—'আমি কি জানি? দেখে আয়। থাকলে বলবি আছে, না থাকলে বলবি নেই।'

—এইরকম বলব তো?

আবার অন্যরকম কী বলবি? তুই সত্যি যাচ্ছেতাই— ইতিমধ্যে আর একজন ফোন ধরলেন—হ্যালো। কাকে চাই আপনার?

—ডিসিও'কে।

—কেন..কী দরকার?

চীফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনেব উল্টোদিকের ফুটপাতে একটা কুকুরছানা মরে পড়ে আছে।

—অ। তা আমাকে বলে কি হবে? ডিসিওকে বলুন।

—তাঁকেই তো চাইছিলুম।

—একটু ধরুন—

—হ্যালো। হ্যালো। শুনছেন?

—আবার কী হলো?

—আচ্ছা, ডিসিও মানে কী, বলতে পারেন?

—তাও জানেন না? আচ্ছা লোক তো? ডিস্ট্রিক্ট কনজারভেটরি অফিসার। ডি সি ও। বুঝেছেন? আপনারা ওসব বুঝবেন না, এই নিন— কথা বলুন।

—দাঁড়ান দাঁড়ান, কনজারভেটরি? না কনজারভেন্সি?

—ফের ঝামেলা? ওই একই হলো। ধরুন—

—হ্যালো। ডিসিও বলছেন? নমস্কার। নমস্কার। আমি বলছি হিন্দুস্থান পার্ক থেকে। (তখন চীফ মিনিস্টার ইত্যাদি...)

—'ওঃ। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে কুকুরছানা মরেছে? ঠিক আছে। কিছু ভাববেন না। এক ঘন্টার মধ্যে ক্লিয়ার করিয়ে দিচ্ছি।'

—ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।

—কী আশ্চর্য, ধন্যবাদের কি আছে। এ তো আমাদের ডিউটি। এখুনি লোক যাচ্ছে।..

ফোন নামাতেই মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—কেন তুমি সিডিও বলছিলে?

—কিসের ইনিশিয়ালস্ তা না জানলে আমাব অমন অক্ষর মনে থাকে না —বিডিও এসডিও—র মতোই সিডিও বলছি। বেশ করেছি।

—ওরা তোমাকে কী ভাবল?

—আমাকে চেনেই না। তা ছাড়া আমি মরলে তো ওদের খবর দিলে চলবে না, হিন্দু

সৎকার সমিতির নম্বরটা ফোনের খাতায় লিখে রেখে যাব। যাও তো এক কাপ চা করে আন দেখি। বাপস রে! এর থেকে গাড়িতে নিয়ে গেলেই হত।

বলেছিলুম তো। এই বেলা বারোটায় চা?

—কেন? রাত দুটোয় নিউট্রামুল তৈরি করতে পার—

—রাত দুটো নয়। একটা। ছোট মেয়ে শুধরে দেয়।

—আর অসময়ে খাওয়াবার ফলটাও তো চোখে দেখলে? বড মেয়ে মন্তব্য করে।

—তোমাদের যত এনার্জি সব জীবজন্তুদের বেলায়— আমি কিছু বললে হাত পা নড়ে না—

—ছি ছি মা, তুমি কুকুরছানাটাকে হিংসে করছ?

—তা করছি। আমি যখন বুড়ো হব, তখন তোমাদের এই মনগুলো কোথায় চলে যাবে কে জানে?

—দিম্মা তো বুড়ো হয়েছেন। তোমার মনটা কি কোথাও চলে গেছে? এতক্ষণ ফোন করল কে?

এমন সময়ে ওপর থেকে মার গলা পেলুম-- 'খুকু। মেয়েদের নিয়ে ওপরে আয় দিকিনি এই মুহূর্তে। মুসম্বির রসগুলো পড়ে পড়ে তেতো হতে লাগল— বেলা বারটা বাজে। ভোর থেকে কেবল একটা মরা কুকুর নিয়ে নেত্য করছিস? আমি তো একটা বুড়ো মানুষ, আমার প্রতি কি তোদের দয়ামায়া হয় না রে?'

হুড়মুড়িয়ে ওপরে ছুটি পাল্লা দিয়ে তিনজনে— মা ক্ষেপে গেলে সর্বনাশ, জীবে দয়া বেরিয়ে যাবে প্রত্যেকের।
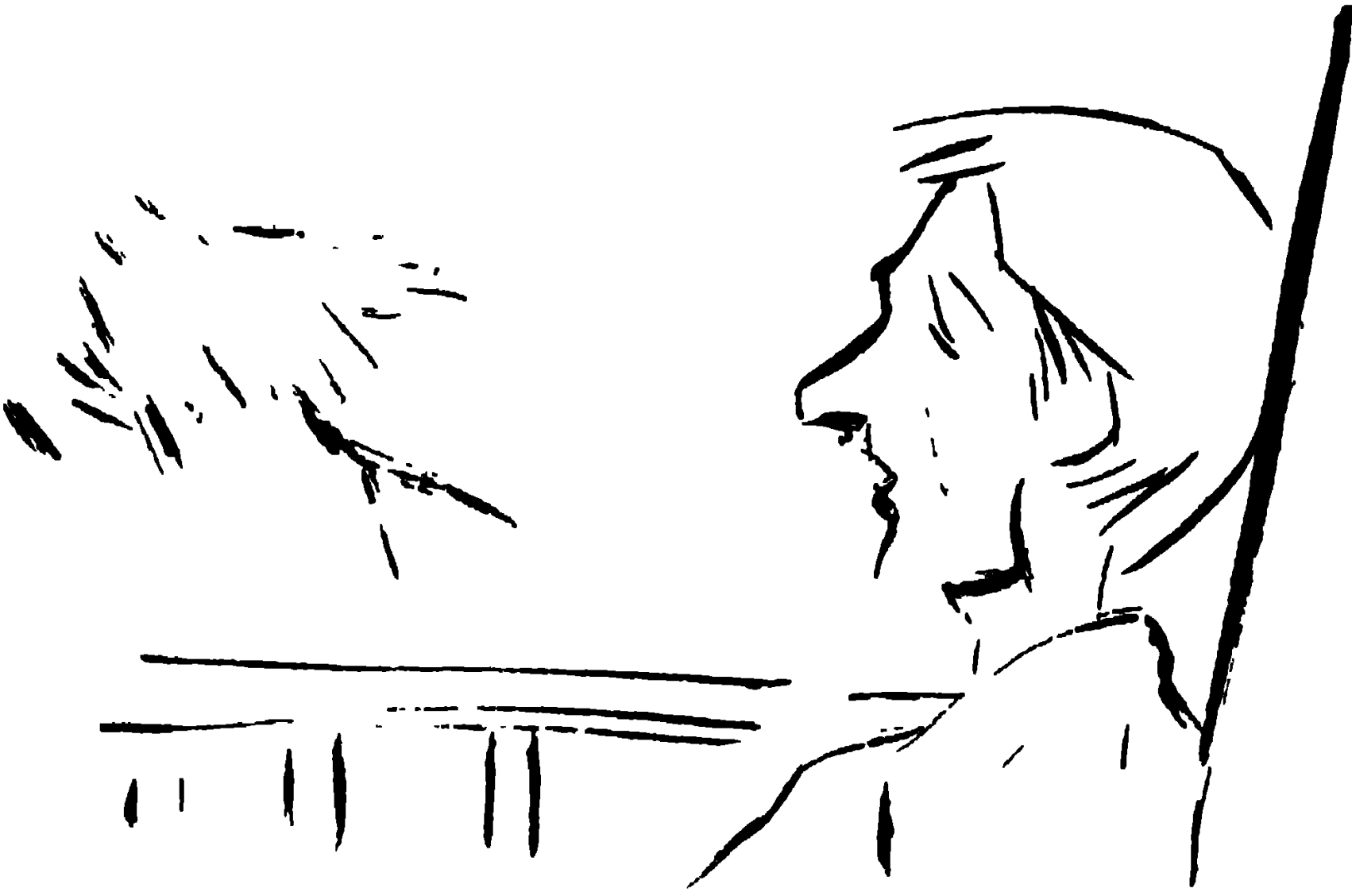
চোখ

বীরুবাবু সকালবেলায় দোতলার বারান্দায় দাঁতন করছিলেন, এমন সময়ে সেই বিরক্তিকর হরিধ্বনি। কেওড়াতলার কাছাকাছি বাড়ি নেবার ফলটা এই হয়েছে যে একটা দিন যায় না মড়া না দেখে। ইচ্ছে না করলেও চোখ পড়ল নিচের দিকে, কেমন যেন চমকে উঠলেন। মৃতদেহের তো চোখ সাধারণত বোজা থাকে, না বুজলে তুলসীপাতা চাপা দেওয়া থাকে। এই মুখটা—ঠিক যেন কোন জীবন্ত লোক খাটিয়ায় শুয়ে তাঁর দিকে চেয়ে হাসছে। রোগাটে ছুঁচোল মুখ, ফর্সাই বলা যায়, সরু কালো গোঁফ ঠোঁটের ওপরে। ওপরের ঠোঁটটা অদ্ভুতভাবে একটু কাঁটা— ফাঁক দিয়ে একটা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। তার চোখদুটি মেলা। একটা চোখ আরেকটার চেয়ে বড়, যেন ওপরের পাতাটা নেই— পাথরের চোখের মত— পুরো মণিটাই প্রায় দেখা যাচ্ছে। বীরুবাবুর বেজায় অস্বস্তি হল। ব্যাটারা আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে লাল আলোর জন্যে—বীরুবাবুর মোটে ইচ্ছে না করলেও, নড়তে পারলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন বারান্দায় সেঁটে, ওই জ্যান্ত মতন মরা মুখখানার দিকে চেয়ে। দেখতে-দেখতে কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হল মুখটা?

নিশ্চয় দেখেছেন। কোথায়? বাজারে কি? মাছওয়ালা কোনও। সবজিওয়ালা? ট্রামে কি? কন্ডাক্টর? কোথায়? শ্যালদা লাইনে ট্রেনের ফেরিওয়ালা নয় তো? নাঃ— এসব অদ্ভুত সম্ভব মনেই বা আসছে কেন তাঁর? মুখখানা খুব চেনা চেনা লাগছে— অথচ কিছুতেই ঠাহর করতে পারছেন না কী জন্য চেনা। ভাবতে ভাবতেই আলো বদলাল, হরিধ্বনি দিয়ে ওরা চলে গেল। খাটিয়ায় শুয়ে ওঁরই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দুলতে দুলতে চলে গেল লোকটা। চেরা-ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতটা যেন হাসছে।

বিশ্রী লাগছে সক্কালবেলাতে এই বিতিকিচ্ছিরি মড়ার মুখ দেখা। বীরুবাবু কলঘরে গেলেন মুখ ধুতে। চোখে বারবার জলছড়া দিয়ে যেন ওই বিস্বাদ অভিজ্ঞতাটাকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলেন। মড়ার মুখে কত প্রশান্তি থাকে। মড়ার মুখে এমন ফিচেল-ভাব তিনি জীবনে দেখেননি। চা, খবরের কাগজের ফাঁকে ফাঁকেও বিতৃষ্ণার অনুভূতিটা যেন

ফিরে আসতে লাগল। তিনি থলি হাতে বাজারে বেরুলেন।

চেনা মাছওয়ালা, চেনা আলুওয়ালা, চেনা ফলওয়ালা। বাজারে তাঁর সবই চেনা। তবও বীরুবাবু আজ প্রত্যেকের দিকে নতুন চোখে চাইতে লাগলেন---যেন কোথাও কিছু লুকিয়ে আছে। বীরুবাবু দুশ পার্শে বেছে নিলেন, পাঁচশ আলু, দেড়শ পেঁয়াজ, একশ ঢেঁড়শ, চারটে মুলো, শাক তিন আঁটি— হটাৎ দেখতে পেলেন। শাকউলি বুড়ির বাঁ চোখটার মণিতে যেন ঢাকনি নেই— ছুঁচল মতন মুখখানা— বীরুবাবুর হাত থেকে শাক পড়ে যাচ্ছিল, বুড়ি তাড়াতাড়ি তুলে দিল। আধুলি থেকে কুড়ি পয়সা ফিরিয়ে দিলে---অন্যদিকে চেয়ে অন্ধের মত কোনওমতে পয়সাটা নিয়েই বীরুবাবু চলে এলেন।

শসা এক জোড়া.— মাথা ঠাণ্ডা করে বীরুবাবু ভাবলেন, আজ বৃহস্পতিবার, ছ'টা কলা, দুটো কমলালেবু নিতে হবে। গিন্নির লক্ষ্মীপুজোর বাই আছে। সংসারে তো লক্ষ্মী উথলে উঠছে। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়! তবু লক্ষ্মীপুজোর ফলটি চাই। বাতাসা চাই। বীরুবাবুর ভুরুটা কুঁচকে উঠল। তিনি এসব পুজো-ফুজো-তে বিশ্বাস করেন না। তবু গিন্নিকে নিজের মনে থাকতে দেন। ছেলেপুলে হয়নি, —কিছু একটা নিয়ে থাকবে তো মানুষ। তাঁর না-হয় অফিস আছে। সন্ধেবেলা নগেনবাবুর বৈঠকখানায় তাসের আড্ডা আছে। গিন্নি বেচারির ওই সিনেমার কাগজ, কখনও একটা বাংলা ছবি, আর লক্ষ্মীপুজো, সত্যনারায়ণ-- এই নিয়েই তো জীবন। ভাবতে ভাবতে গিন্নির প্রতি করুণায় মনটা আবার নরম হয়ে এল বীরুবাবুর। আহা করুক একটু শখ-আহ্লাদ বলতে তো ওইটুকু। কলা কত করে? —লোকটা পিছন ফিরে টাঙাচ্ছিল কলার কাঁদি— বলল— কোন কলাটা? — বলতে বলতে এপাশ ফিরল। রোগাটে, ছুঁচল মুখ, ওপরে ঠোঁটটা চেরা, ফাঁক দিয়ে একটা হলদে দাঁত বেরিয়ে আছে— সরু গোঁফে ঢাকা পড়েনি। বীরুবাবুর গলার ভেতরে নিশ্বাস আটকে এল—তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন। গিন্নি, বৃহস্পতিবার, ফল, বাতাসা...ছিটকে সরে গেলেন ভিড়ের মধ্যে। কলাওয়ালা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বীরুবাবু আপ্রাণ চেষ্টা করলেন মনের লাগামটা কষে ধরতে।

বাজারের জনস্রোতে কারুর দিকে চাইতেই ওঁর কেমন ভয় করতে লাগল, যেন প্রত্যেকের মধ্যেই একটা চমক থাকতে পারে। কোন-দিকে না তাকিয়ে হাঁটতে গিয়ে কার বুঝি পা মাড়িয়ে দিলেন— উঃ, দেখে চলতে পারেন না? পায়ে কি খুর বাঁধিয়ে রেখেছেন দাদা? —বীরুবাবুর যেন জ্ঞান ফিরল— আহা, লাগল? বলতে বলতে তিনি পাশে চেয়ে দেখলেন লোকটি নিচু হয়ে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মুখ তুলে তাকাল— বাঁ চোখ ভাবলেশহীন, বিস্ফারিত, ডান চোখে বাজ্যের বিরক্তি, সরু গোঁফের নিচে চেরা-ঠোঁটের ফাঁকে হলদে দাঁত যন্ত্রণায় খিঁচিয়ে রয়েছে— প্রায় আর্তনাদ করে উঠে বীরুবাবু দ্রুত সরে গেলেন। বাজার করা মাথায় উঠল, বাড়ি পৌঁছুতে পারলে বাঁচেন। কেমন যেন দুর্বল লাগছে পা দুটো, মাথার ভিতরটা গুমগুম আওয়াজ হচ্ছে, ব্রীজের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি গেলে যেমন হয়, নিজের পায়ের ওপর যেন নিজের কন্ট্রোল নেই, বীরুবাবু ডাকলেন: এই রিকশা। রিকশাওয়ালা পাদানিতে বসে ঝিমুচ্ছিল,

ডাক শুনে জেগে উঠল। বিস্ফারিত বাম চোখে দৃষ্টি নেই— চেরা-ঠোঁটের ফাঁকে—বীরুবাবু আর তাকাতে পারলেন না, আপনি বুজে গেল চোখ— ছুটে গিয়ে পাশের ট্যাক্সিটার দরজা খুলে উঠে পড়লেন। আঃ! সীটে গা এলিয়ে দিয়ে কী আরাম।

সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত কাঁপুনি হচ্ছে যেন— এই মুহূর্তে এই বসবার জায়গাটা না পেলে উনি নিশ্চয় রাস্তায় পড়ে যেতেন। মোটা আওয়াজে সর্দারজী জিজ্ঞেস করল কিধর যানা? বীরুবাবু ক্লান্ত গলায় নির্দেশ দিলেন। এতই কাছে যে ড্রাইভার বিস্মিত হল। বাড়িতে এসে নেমে তিনি ড্রাইভারকে এক টাকা ষাট দিতে গেলেন, খুচরোই সমস্তটা। ড্রাইভার চোখ থেকে রোদ চশমাটা খুলে পয়সা গুনতে লাগল। গুনে নিয়ে বীরুবাবুর দিকে চেয়ে বললে, বাস! ঠিক হ্যায়। বীরুবাবু দেখলেন সর্দারজীর দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে বাঘের মত নিষ্পলক বাঁ চোখ যেন পাথরের চোখ, চামড়া ঢাকা নেই। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সিঁড়ির তলার পরিচিত স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকারে পৌঁছে তাঁর যেন বুকটা ফেটে যেতে লাগল। হাঁটুতে হাঁটুতে জড়িয়ে যাচ্ছে দেখে প্রথম ধাপটাতে বসে পড়লেন। বাইরে আওয়াজ পেলেন, স্টার্ট দিয়ে ট্যাক্সি চলে গেল। বীরুবাবুর যেন ধড়ে প্রাণ ফিরল— সঙ্গে সঙ্গে চোখ— দুটোও যেন ভিজে ভিজে হয়ে এল, সেই বুক-ফাটা চাপটা যেন চোখ থেকে বেরুবার পথ পাচ্ছে। রুমাল বার করে চোখমুখ মুছলেন বীরুবাবু। এবারে ওপরে গিয়ে ভাল করে এক কাপ চা খেতে হবে। কী আশ্চর্য বিভ্রম!

বিভ্রম ছাড়া এটা কিছুই নয়। বীরুবাবু ভাবলেন, সকালে উঠেই প্রায় আধো ঘুমের মধ্যে অমন বীভৎস মড়া দেখবার যা একখানা অভিজ্ঞতা চোখের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো— হয়েছে, আর কি যতসব অবচেতনের বজ্জাতি। যাকে বলে হ্যালুসিনেশন। এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যান্ত কালী দেখতেন, শ্রীচৈতন্য সমুদ্রে দেখলেন জগন্নাথ মূর্তি— আর বীরুবাবু চতুর্দিকে মড়া দেখছেন। তাঁরা ছিলেন গিয়ে পুণ্যবান ব্যক্তি— আর সরকারী কেরানির কপালে জ্যান্ত নরক ছাড়া কী-ই-বা জুটবে। বীরুবাবু ভাবলেন, খাওয়া-দাওয়াটায় যত্ন নিতে হবে এবার। বেশি করে প্রোটিন ও ভিটামিন খাওয়া উচিত। দুধ তো বহুদিন বন্ধ। মাংস-ডিমও বন্ধ। হবে না? পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শরীরে রাসায়নিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, তাই থেকেই এসব স্নায়বিক রোগের উৎপত্তি। নার্ভাস ডিসঅর্ডার ছাড়া কিছু নয়। গোড়াতেই এর উচ্ছেদ দরকার। উনি আজই ডাক্তারের কাছে যাবেন। ভিটামিন বড়ি-টড়ি একটা কিছু খেতে হবে আরকি। বয়স হচ্ছে। শরীরের বল, রস ফুরিয়ে আসছে। এখন বাইরে থেকে বলসঞ্চার করা দরকার। ফুড সাবস্টিটুাশন দরকার ওষুধ দিয়ে। ভাবতে ভাবতেই বীরুবাবুর পায়ে বল এল। তিনি সহজভাবেই উঠে দাঁড়ালেন। থলি হাতে উপরতলায় উঠে গিয়ে কড়া নাড়লেন সিঁড়ির মাথায় থেমে।

গিন্নি এসে দোর খুলে দিলেন—কিগো, আজ এত দেরি? আমার তো ভাবনাই হয়ে গিয়েছিল। যা দিনকাল! —বীরুবাবুর হাত থেকে থলিটা নিতে হাত বাড়ালেন গিন্নি।

—আর বল না! আজ এমন একটা অদ্ভুত— বলতে বলতে বীরুবাবু একমুহূর্ত থামলেন— ওকে এটা হঠাৎ বলা কি ঠিক হবে? এসব ব্যাপার মনের ভেতর ঢুকিয়ে না দেওয়াই ভাল— এমনিতেই যা ভীতু মানুষ— এসব আনক্যানি গল্প ওকে বলে কাজ নেই। অটোসাজেশন বলেও একটা জিনিস আছে। বীরুবাবু কথা ঘুরনো ঠিক করে নিয়ে থলিটা গিন্নির হাতে তুলে দিলেন। দিতে দিতে দেখলেন গিন্নির বাঁ চোখের মণিটায় আকুল বিস্ফারিত দৃষ্টিহীনতা, চেরা ওপরের ঠোঁটের ফোকরে একটি হলুদ দাঁত তাঁরই দিকে হাসছে। মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাল, সহসা পিছন দিকে হেলে পড়লেন। গিন্নির আর্তনাদের মধ্যে বীরুবাবুর দেহ সিঁড়ির ধাপে ধাপে গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচে। আরও নিচে।

উপসংহার: ডাক্তার এসে বলেছিলেন, স্ট্রোক। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু। কতশত স্ট্রোকের পিছনে যে কি গল্প থাকে, আমরা কি জানতে পারি? বীরুবাবুর গল্পটাই তো তিনি বলে যেতে পারলেন না।

খেসারত

'হাই! মা! মা রে! মা গ!'

মা চুপ করেই থাকে। সুফল যে বুকের ওপরে আছড়ে পড়ে এত ডাকছে কানে শুনতেই পায় না। ওপাশে শুয়ে আছে লক্ষ্মী। মনে হচ্ছে সারাটা মুখ যেন সিঁদুরে মাখামাখি (ঠিক যেমন ছিলেন বিহার দিনকে)। লক্ষ্মীর পাশেই হাঁ করে আছে বড়কা। সুফলের ঠাকুন্দা। এতদিনে গেল। (লিজের বউ খাইছোঁ, পুত খাইছোঁ, বুড়া ঢ্যার দ্যার করিছোঁ) ছেলের বউ নাতির বউ দুজনকে দু'বগলে নিয়ে। (সালো বড়কা মাঝি তীথির কোয়া ইবার সুমায় হৈল তুমার?) লক্ষ্মীর পেটের দিকে তাকায় সুফল। পেটটা অল্প উঁচু হয়েছিল। (গেল। উটোও গেল। সুফল ইবার যিথাক ইচ্ছা সিথাক যেইত পারবেক। সুফলের বাধাবাঁধন লাই)।

'হা রে কপাল। কেনে এইসেঁছেলম মত্তে পইড়োঁ গ। টুগদি সবুর সইলেক লাই—হাই মা! তুর তস সইলেক লাই!'

ওদের গাঁ থেকে শহর অনেক দূর। সেখানেও হাসপাতাল আছে বটে, কিন্তু সুফল দেখেনি। সুফলের হাসপাতাল দেখা এই প্রথম। যেমন কলকাতা শহর দেখাও এই প্রথম।

হাসপাতাল কী বিচিত্র ঠাঁই।

চতুর্দিকে কেবল মরা আর আধমরা মানুষ ভর্তি। আর সাদা জামা পরা জুতো পরা যমদূতের মতন সব মেয়ে—মরদ খটখট করে ঘুরছে। সবাইকে ধমকাচ্ছে। মাথায় সাদা ফেট্টি বাঁধা একটা মেয়ে—মানুষ এসে সুফলকে মায়ের বুক থেকে হটিয়ে দিল, আরেকটা মরদ এসে ফটাফট চাদর চাপা দিয়ে দিল তিনটে মানুষের ওপর। একেবারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে। (এত গরম। বাপরে। জানপরাণ যায়, গা'র ছালটো যেন ছেইড়োঁ, ইর ভিতরি চাদর চাপা?) একলা সুফলই রইল চাদরের বাইরে। সুফলের পরনে ফর্সা ধুতি। গায়ে ফর্সা গেঞ্জি। গলায় পেতলের মাদুলি। মাথায় ভিজে চুল পাট পাট করে আঁচড়ান ছিল একটু আগেও। (সুফল এখুন যিথাকে ইচ্ছা সিথাক যেইতোঁ

পারিস। ঘরকে যাবি? কার ঘরকে যাবি রে সুফল?) অমনি আরেকটা চাদরের তলায় ঢুকে পড়তে পারলেই সবচেয়ে ভাল হত সুফলের এখন।

'লক্ষ্মী রে! হাই রে লক্ষ্মী! মোখে ছেইড়্যো তু কুথাক চললি রে!' সুফল হঠাৎ শানবাঁধান মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে ঠাঁই ঠাঁই করে মাথা ঠুকতে আরম্ভ করে দেয়।

—'এই! ও কী হচ্ছে কী? মাথা ফেটে রক্তগঙ্গা হবি যে?' ডাক্তারবাবুটা এসে ধমক লাগায়। গেঞ্জির কোনা ধরে টেনে তোলে।

'বাবু! মোর সব যেছেঁ, সব চইল্যোঁ যেছেঁ গ'। সহ্য করতে লারছি।'

'সব গেছে মানে? কী গেছে তোর?'

'মা যেইছেঁ, বউটো যেইছেঁ, বউয়ের প্যাটের ছেইল্যাতে যেইছেঁ, বুড়া কত্তা যেইছেঁ— হারে মোর কপাল!' ঠাস ঠাস করে মাথায় থাপ্পড় মারে সুফল। —'হাই বাবু গ' বাবু। পুড়া ঘরকে যে জনমনিসি রইলেক নাই!' —সুর করে কাঁদতে থাকে সুফল। ছোকরা ডাক্তারবাবুটার মুখখানা কেমন যেন হয়ে যায়।

'দাঁড়া, দাঁড়া, চুপ কর। আগে আমায় বুঝতে দেয়। কে কে গেছে তোর বললি? মা? বউ?' বাবুটা কাগজ পেন্সিল বের করে।

মা যেছেঁ, বউটো যেছেঁ, বউয়ের প্যাটে ছেইল্যাটো যেছেঁ, বুড়োকত্তা যেছেঁ—আমি জেন্যোঁশুন্যোঁ কুখুনো তো পাপ করি নাই— হাই বাবু গ'—মোর ঘরকে আর কেউ নাই রে বাবু— কেউ কুখাকে নাই কে নে রে আমার।' হাউমাউ কাঁদতে থাকে সুফল।

—'নাম কী তোর?'

—'সুফল মাঝি! অ বাবু, মোর কী হবেক রে—'

—'চুপ করে— গাঁয়ের নাম কী তোর?'

—'গেরাম কুস্তঙ্গেরাম, থানা ইলামবাজার, জিলা বীরভূম—'

—'ওঠ, ওঠ— আয় আমার সঙ্গে—'

—'কুথাকে যেইত্যেঁ হবেক গ' বাবু? শ্মশান কে?'

—'সেসব এখন নয়। ঢের দেরি আছে শ্মশানের। চল তোর নাম ঠিকানা লিখিয়ে দিবি চল। শালা ড্রাইভারগুলোর ফাঁসি হওয়া উচিত। না আছে কন্ট্রোল, না হয় গাড়ির মেনটেনেন্স। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থেকেও রক্ষে নেই? ছি, ছি, ছি—'

তিনটে মড়ার মুখাগ্নি করা সোজা ব্যাপার নয়। মুখে আগুন মানে মায়া কাটানো। তা মায়াটা বেশ ভালভাবেই কেটে গেছে এবার সুফলের। কত্তবুড়ো। মা, লক্ষ্মী। বেরিয়েছিল মোট চারজনেই ঘর বন্ধ করে, ছাগল চরানোর ভারটা চাঁদু বধুনির ওপরে দিয়ে।

'মিটিন আছেক। কইলকাথার ময়দানকে বড়িয়া মিটিন। পার্টির দাদাবাবুরা গাড়িভাড়া দিয়্যোঁ লিয়েঁ যাবেক, ভাত দিবেক, লিখরচায় কইলকাথা দেইখ্যোঁ আসবি সব্বাই—গঙ্গাচ্ছান কইর‍্যোঁ আসবি সব্বাই—', সিদখুড়ো বলেছিল। তারই কথায়

এসেছে ওরা তেরজন, ময়দানে মিটিং করতে আর ঐ সঙ্গে লিখরচায় কলকাতা শহর দেখে যেতে। মা বললে,

'মুন বুলছেক ইবার না হলিঁ্য আর কুনুদিন হবেক লাই। মোর গঙ্গা দিকা হয় লাই রে সুফল। একটুস ডুব দিয়্যোঁ আসথম।'

লক্ষ্মী বললে,— 'মা যাবেক, তবে মোকেও লিয়্যোঁ যাবি কিন্তুক, হঁ। বুল্যোঁ দিলম। ইকা ইকাটি ঘরকে থাকব লাই।' তারপর আড়ালে আহ্লাদী গলায় বলেছিল।

'কইলকাথাক যেইয়্যোঁ চিড়েখানাটো দিখাবি, সুফল— বাঘ, সিঙ্গি, হাতি, বান্দর? ফুলটুসি সব দেইখ্যোঁ এসেছেন রে!'

'বেশ, বেশ। সব হব্যোঁ।' বড়কা মাঝি বলেছিল।

'পয়লা ইস্টিশানকে নেম্যোঁ গঙ্গাচ্ছানটো সেইর‍্যো লিব, তাপরে সিদা কালিঘাট। পুজাটা দিইয়্যোঁ, চিড়েখেনাক লিয়্যোঁ যাব তুদেরখে। তাপরে মিটিং। বাস। মিটিনাকে যেইলি তো পুরা শহরটো দেইখ্যোঁ লিলি। মইদান মানুম্যান্টো, ভিট্টরিয়া। আর ভীড় কী! বাপ গ!'

অমন জমজমাট প্রোগ্রামটার কেবল শুরুটুকুই হয়েছিল। শেষটা অন্যরকম চেহারা নিল। ভোরবেলা ট্রেন থেকে নেমে প্রত্যেকেই গঙ্গাস্নান গঙ্গাপুজো করেছে। এখন ট্রামে চড়বে বলে দাঁড়িয়েছিল সবাই হাওড়ার পুলের উপরে। কলকাতা এসেছে, ট্রামে চড়তে হবে না? প্রথমেই কালিঘাট। তারপরে চিড়িয়াখানা।

উঃ! কী শহর! গাড়িঘোড়ার দাপট কী। বড় শহর সিউরিও দেখেছে সুফল মাঝি। তার সঙ্গে তুলনাই হয় না।

'গাড়িগুলান সব ঝেনে উদ্ধশ্বাসে দাঁদুড়ে আসছেক—', ভয় পেয়ে লক্ষ্মী বলে উঠেছিল—

'উঃ। জানটো লিয়্যোঁ লিবেক নাকি? বাপ গ।'

তাই হয়েছে। ঠিক তাই হয়েছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়েছিল তেরজন গ্রামের মানুষ ভোরবেলা স্নান সেরে। ব্রেক নষ্ট সরকারী বাস পাগলের মত দুদ্দাড় করে ফুটপাতে উঠে এসেছে; সাতজনকে চাপা দিয়ে জানগুলো একেবারে নিয়েই নিয়েছে। তিনজন সুফলের ঘরের মানুষ। বাকি চারজন ডোমপাড়ার। আর তিনজন হাসপাতালে ভর্তি। বেঁচে গেছে সুফল, পঞ্চা, সিদখুড়ো। ওদের আর মিটিনে যাওয়া হয়নি। (সুদ্ধা মা গঙ্গা আর হাওড়ার পুলটো আর হাসপাতাল। বাস। আর কুনুটা দেখলাম লাই)! —'লক্ষ্মী রে! আই রে লক্ষ্মী! চিড়েখেনাক বিড়াতে যেইত্যোঁ বড্ড সাধ হইছিল রে তুর—।

—'আবার?' সাদা ফেট্টি বাঁধা ছুঁড়িটা এসে এক ঝাঁকি লাগায় সুফলের কাঁধ ধরে।

'থাকো থাকো ষাঁড়ের মতন চেঁচিয়ে ওঠ কেন? কাঁদতে হয় যাও বাইরে গিয়ে কাঁদ'—একটু থেমে বলে— 'কান্নাই বা কিসের এত? তিনজন তো মরেছে? পুরো তিনহাজার পাবে। আমি অত টাকা পেলে বর্তে যেতুম, বুঝলে?'

—'দেশে ফিরে আরেকটা বিয়ে সাদি করে ফেলিস' সাদা ফেট্টি বাঁধা অন্য ছুঁড়িটা

বলে। দুজনেই মুখ টিপে হাসে।

সুফল এদের কথার মানে বুঝতে পারে না। কী ভাষা বলছে এরা? এরা হাসছে কেমন করে? (ছামুতে ডাগর বঁউটো মইর্যোঁ পইড়্যোঁ আছেক, ইরা বুলে, গাঁকে যেইয়্যোঁ বিহাশাদি কর? বুলে, তিনটো মইরেছোঁ তিনহাজার হবেক? ইরা কি পাগল? ভূতপিরেত মানবেক লাই?)।

দলের পাণ্ডা রবীন পোদ্দার, প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। সেও পার্টির দাদাবাবু। সব ছুটোছুটি থানাপুলিস সে-ই করছে। মাস্টার ছিল তাই রক্ষে। কতকগুলো কাগজেই যে টিপসই করিয়ে নিল এরই মধ্যে সুফলকে দিয়ে। সিদুখুড়া সান্ত্বনা দিলে—

'টুকুস ভালো কথা, তুর মার জেবনের সুখসাধটো মিট্যা যেইছোঁ। গঙ্গাচ্ছান কইরে মইরেছোঁ, সিধা স্বগগকে পৌঁছাই যাবেক। হঁ। হইছে বটেক অপমিত্যু, কিন্তুক পুণ্যচ্ছানের ফল লাই? উরা কুখুনো ভূতিন-পেতিন হবেক লাই। এই বল্যেঁ দিলম তুখে।'

এই বিধানটা খুব মনের মতন হয়েছে সুফলের। এইটুকুই ভরসা। গঙ্গাচ্ছানটা টাটকা টাটকা করা আছে, মা-বউয়ের স্বর্গে যেতে দেরি হবে না। (আর যেমুন ঘাঘী মরদটো সাথে যেইছোঁ, বড়কা মাঝি। বুড়াকুত্তা পথকেই মরুক, উর ঠাণ্ডা মাথাটো হবেক লাই)।

বুড়াকত্তার পেট-কাপড়ে পঞ্চাশটা টাকা বাঁধা ছিল। (আইব্বাপ। বুড়াকত্তা, তুর প্যাটে ইথ টাকা?) মায়ের আঁচলেও ডবল গেরো দেওয়া দুটো টাকা ছিল কাঁকন-জোড়া। পুলিস সব খুলে এনে সুফলের হাতে তুলে দিয়েছে। কিছুই ছিল না কেবল লক্ষ্মীর ট্যাকে। গর্ভের সন্তানটুকু ছাড়া। তবে হাজার হোক নতুন বউ, নেই নেই করেও গা-ভর্তি গয়না তার। চকচকে কালো চামড়ার ওপর ঝকঝকে সাদা রুপো—বড্ড মানাত বউটাকে। লক্ষ্মীর হাতের জোড়া বালা, গলার গোলাপ ফুলহার, কানের মাকড়ি, খোঁপার ফুল, পায়ের মল, মায় আঙুলের আঙট পর্যন্ত সব খুলে খুলে গুনে পুলিসরা যখন সুফলের হাতে তুলে দিচ্ছে, সুফল আরেকবার চিৎকার করে উঠল—'লক্ষ্মী রে! আই রে লক্ষ্মী! তুর জেবনের সক্‌সাধ ত কিছুই মিটলেক লাই? তুর প্যাটের ছেঁইল্যার মুখানটুসও দেইখ্যো যেইত্যোঁ লারলি তু—', রবীন মাস্টার ধমক দিল, —'চুপ কর। এখন ভালো করে গুছিয়ে রাখ দিকিনি গয়নাগাঁটিগুলো, খবদ্দার বেচবি না এক্ষুনি!'

না, বেচবে কেন সুফল? এক্ষুনি তো হাতে বাহান্ন টাকা এসেছে সুফলের, বাহান্নখানা তাসের মতন। আরও যা আসবে শুনেছে তাতে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে সুফল মাঝির। নিজেকে পাপী-পাপী মতন লাগছে কেমন, কথাটা মনে পড়লেই। (কিন্তুক সুফল মাঝির ইথে দুষটো কুথাকে? পাপটো কুথাকে মোঁর?) রবীন পোদ্দার খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছে। (লিচ্চয় মিছা বুলেক লাই রবীন মাস্টার, সাঁচ্চা কথাই বুলছেক)। হিসেবপত্তর। বুড়ো ঠাকুর্দার জন্য এক হাজার, মায়ের জন্য এক হাজার, লক্ষ্মীর জন্য এক হাজার। মোট তিন হাজার টাকাই চোখে দ্যাখেনি যে-লোক, সেই পাচ্ছে তিন হাজার। অত টাকা দিয়ে সুফল করবেটা কী? তিনখানা জ্যান্ত মানুষ তো আর কিনতে পারবে না? তিন তো নয়, সাড়ে তিনখানা।

—'আর প্যাটের ছেইল্যাটো গেল ঝে? উটোর লেগে খেসারতি দিবেক লাই সরকার।'

—'বড্ড লোভ তো তোর?' ঘেন্নসেন্না সুরে ধমকে উঠেছিল রবীন পোদ্দার —'যে ছেলে জন্মায়নি তার জন্যেও খেসারতি চাই?'

'চাই লয়? জন্মায় লাই সিটো কি তার দুষ? তার মাখে মইরে দিছেঁ বইল্যেই লয়?'

'ফের তক্কো?' আবাক চোখে তাকিয়েছিল রবীন পোদ্দার।

'তোদের প্রাণে কি মায়ামমতা নেই রে? মা-বউ গেলে, বুড়ো ঠাকুদ্দা গেল, ঘর সংসার ফাঁকা ধু-ধু হয়ে গেল, আর তুই বলছিস টাকার হিসেব? ধন্যি জাত মাইরি তোরা। সত্যি।'

সুফলের হিসেব কষার সেই আরম্ভ। বাহান্নর আটটা টাকা বেরিয়ে গেছে শ্মশানেই। তিন তিনটে ঘরের জনের মুখে নুড়ো জ্বেলে দেওয়া কি সোজা কাজ? প্রস্তুতি চাই না তার জন্য?

—'যা যা, বাড়ি চলে যা, এখেনে থেকে আর কাজ নেই তোদের। পঞ্চা, সিদুখুড়ো, সামলেসুমলে সুফলকে দেশে নিয়ে যাও দেখি তোমরা— পরের ট্রেনেই যাও।' ধমকে উঠেছিল রবীন পোদ্দার— 'গুচ্ছের মদ গিলে শ্মশানেই মাতলামো শুরু করেছিস সুফল? লজ্জাও করে না তোদের? ছি ছি—'

—'সরকার খেসারতির ট্যাকাটো এখুন দিবেক লাই, মাস্টার? ট্যাকা লিয়েঁ ঘরকে যেথম বেটে।'

—'ফের টাকার কথা? বলিহারি যাই বাবা। সে টাকা পেতে পেতে এখন অনেক দিন। হাতে হাতে পাবি নাকি? দেবে ঠিক সময়মতন। সব খুইয়েও খেসারতির বেলা ঠিক হুঁশটি দেখি টনটনে—'

তা হুঁশ টনটনেই বলতে হবে বই কি সুফল মাঝির। ট্রেনে চড়ে বসেই বিড়বিড় করে হিসেব কষতে শুরু করেছে।

—'তিনটো মনিষ মইরেছোঁ, তিন হাজার। একটা মনিষ মইরলেঁ এক হাজার। একটা মনিষ জন্মায় লাই, তাই উটোর কুনু খেসারতি লাই। সুদ্ধা যি—মনিষগুলান মিছা মিছা জন্ম লিয়েঁ মিছামিছা মইরোঁ যেইছেঁক—', আঙুলের কড় গুণতে থাকে সুফল—'গোপলা মৈরেছে গেল সালকে রেলপুলিসের গুলি খেইয়্যাঁ, এক হাজার। লিতাই সিবার বানের জলকে ভেইসোঁ গেল, ভরপুয়াতি ছাগলীটো চালকে উঠাই লিজ্যে উঠতে লারলেক, অজয়ের ওঃ কী মরণ সোঁত— হা রে লিতাই। এক হাজার। এক এক দুই। দাদী যেইছোঁ কালেরা হইয়্যাঁ, এক হাজার। তিন হাজার। বাপ-জেঠা গেল একই দিনকে জমিনের দাঙ্গাক লাঠি খেইয়্যোঁ— বাপ চার। জেঠা পাঁচ। পাঁচ হাজার। পাঁচ তিনকে আট। আর বুনদুটো তিনমাস পয়লা কয়লাখাদকে জলডুবি হইয়োঁ মইরেছোঁ— শালো কান্টট্রারের লালখাতাকে উদের নাম লিখায় লাই— সরকার বুনদুটার লেগে একডুনু ট্যাকাকড়ি দিলেক লাই— আট দুই দশ। আর প্যাটের ছেইল্যাঁ

মিনিমাগুনা. উর বিনা খেসারতি লাই, সিটো জন্ম লিতেই লারলেক। ঠিক কথা। কি বুল খুড়ো, আমি কি কম বুড়লোক? আইব্বাপ। সিদা কাথা? দশ হাজার ট্যাকা পাইছিঁ বেটে, সরকার মোখে দশ হাজার ট্যাকা দিছ্যোঁক—বাপ এক। জেঠা দুই। দাদী তিন। গোপলা চার। লিতাই পাঁচ। দুটো বুন, শালফুল, নিমফুল। পাঁচ দুই সাত। বুডাকত্তার আট। মা লয়। লক্ষ্মী দশ। মোর ঘরকে কি কম লুক মেইরেছেঁ সরকার? খেসারতি দিবেক লাই? প্যাটের বিটাটো ফাউ। হুঁঃ—পুরো দশ হাজার। ট্যাকাটা হাতে পেইয়্যাঁ দেইখ্যোঁ খুড়া পরথমকেই লক্ষ্মীকে সঙ্গে কইর‍্যে ঘরকে তুলব আমি, আর শালো দীনু চৌধুরীর হাত মুচড়ায়্যাঁ জমিনটো কেইড়্যো লিব। মোর বাপজেঠা জান দিছ্যোঁ উয়ার লেগে, কুনুদিনকে দীনু চৌধুরীর জমিন লয় সিটো— হুঁ —' —চোখটা জ্বলে ওঠে সুফলের। সেদিকে তাকিয়ে ভয় পায় সিদু।

—'হায় হায় গ', সিদুখুড়ো ফিসফিসিয়ে পঞ্চাকে বলে—'শোকে—দুখে ছেইল্যাটার মাথা বিগড়ায়্যাঁ যেইছোঁ গ'— হাই ভগমান—'

—'কেনে? মাথা বিগড়াইছে বুল কেনে?' দাবড়ে ওঠে পঞ্চা। মদ সেও কম খায়নি। —'লেহ্য কথাই বুলছেক বেটে সুফল। পরপর ঘরটো খালি হইয়্যোঁ যৈছে নি উর? খেসারতি দিবেক লাই কেনে সরকার —মরে লাই? জুয়ান জুয়ান মেইয়্যাঁ মরদ মিছা মিছা মরে লাই উর ঘরকে? শালো কইলকাথাকে যেইয়্যোঁ মইরলে হাজার ট্যাকা আর গাওঘরকে মইরলে লবডংখ্য?' সিদুখুড়ো ভয় পেয়ে পাশের গাঁয়ের যাত্রীকে ডাকে— 'আই মাঝি, ইরা বুলে কি? ছেইল্যাগুলান খেইপ্যে যেছেঁ নিকি?'

মেঝেয় থুথু ফেলে মুখ ভেংচে মাঝবয়সী লোকটি বলে— 'তুমিও কি খেইপলে নিকি মাঝি? মদ খেইয়্যাঁ কি বুলতে কি বুলছেক, ধুস, উসব শুন কেনে?'
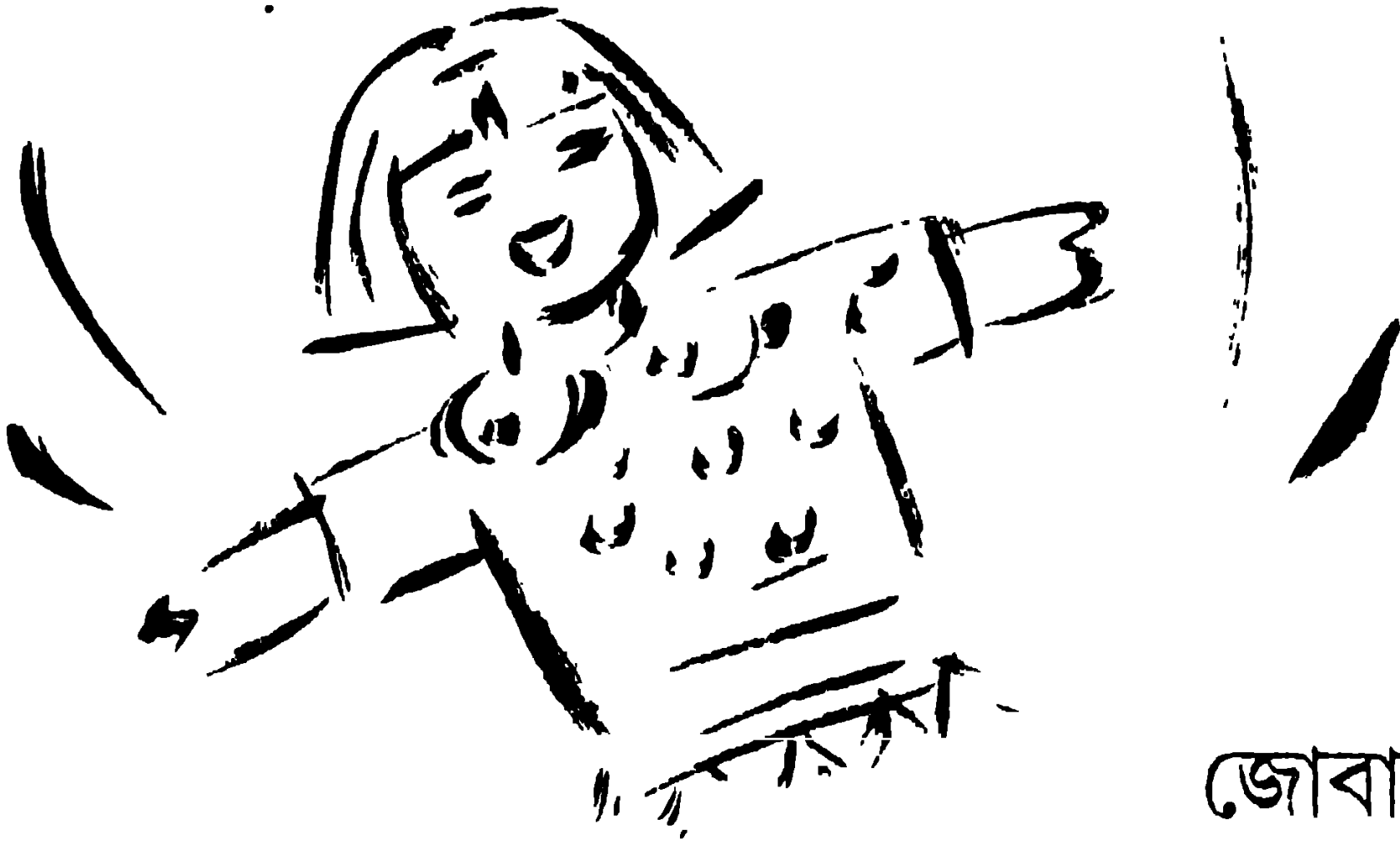
জোবান সুজাক

'বাপরে বাপ! আবার প্রেজেন্ট! নিজেকে ফিরিয়ে এনেছি এই যথেষ্ট'— দাদামণি চেয়ারে পিঠ এলিয়ে টেবিলে পা তুলে দিয়ে চুরুটে দেশলাইতে মন দেন। বৌদি ছাড়বার পাত্রী?

'ছি ছি ছি, লোকে বলবে কি? জাপানে ঘুরে এল বারোদিন— একটা মাত্তর জাপানী পুতুল ছাড়া কিছু আনলে না? নাইলন শাড়ি, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, ক্যালকুলেটার, ক্যাসেট রেকর্ডার, ক্যামেরা টিভি— লোকে কত কি আনে, নিদেনপক্ষে মুক্তোটুক্তো— কিছু না?'

'সব টাকা যে জোবানে চলে গেল।'

'তার মানে? জুয়ো খেলেছিলে নাকি?

'দুর। জুয়ো খেলব কেন? ট্রাডিশনের জন্যে মূল্য দিতে হবে না? ট্রাডিশনের মূল্য দিতে গিয়ে কেবল কি ধনেই মরেছি? প্রাণেও মরেছিলুম আরেকটু হলে।' চুরুট থেকে ধোঁয়া ছেড়ে বৌদির মুখখানা আবছা করে দেবার চেষ্টা করেন দাদামণি। কিন্তু বৌদির মুখ অত সহজে আবছা হবার নয়।

'প্রাণসংশয় হওয়া অতই সোজা? বললেই হল? ধন সংশয়টাই সহজ, আর তোমার সেটা চব্বিশ ঘন্টাই হচ্ছে।' গল্পের গন্ধ পেয়ে আমরা এখানে কথায় যোগ দিয়ে ফেললুম। —'সত্যি? বল, দাদামণি, বল না, কি হয়েছিল?'

'তোরাও যেমন! তোদের দাদামণি বলুক, আর তোরাই শোন। আমার ওসব ঢের শোনা আছে। যত গুলতাপ্পি বানাবে—'

—'না গো না, গুল নয়। তানাবেকে তো মনে আছে? সেই যে এসেছিল সেবারে, খৈতানের সঙ্গে?'

'সেই নাকচ্যাপ্টা জাপানীটা? যে আমাকে অত সুন্দর পাখাটা দিয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, সেই তানাবে। অত সুন্দর পাখা দিল, তবু তাকে নাকচ্যাপ্টা বলছ?'

'না তো কি শুকনাসা বলতে হবে?'

'সেই তানাবে ছিল সঙ্গে। গুল কিনা, তাকেই জিজ্ঞেস কর। আবার আসছে সে, জানুয়ারিতে।'

বৌদি এবারে একটু নরম হন।

'কি হয়েছিল কি, শুনি?' তাচ্ছিল্যভরে বললেও বোঝা যায় ভেতরে উদ্বেগ রয়েছে।

'কি হয়নি, তাই বরং জিজ্ঞেস কর। জোবান আর সুজিকি। জোবান আর সুজিকি আমাকে ধনেপ্রাণে শেষ করে দিচ্ছিল। আরেকটু হলেই। বড্ড বেঁচে গেছি। তোমারই ঠাকুরের দয়ায়। রোজ অত ফল-বাতাসা খাওয়ানর একটা প্রতিদান তো আছে?'

বৌদি এবার বেশ নরম। খাটের একপাশে বসে পড়েন। আমরা তো আগেই খাটে গুছিয়ে বসেছি। দাদামণি শুরু করেন।

'তোরা তো জানিস তোদের বৌদি কি কিপ্টে। ওর ছেলেবেলার সেই ক্যামেরাটা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল, ছবি তুলে আনতে। কেননা, ওটা দিয়ে ছবি তোলা খুব সোজা। প্রথমেই হল কি, সেইটে গেল হারিয়ে।'

'অ্যাঁ'— বৌদি চেঁচিয়ে ওঠেন— 'সেটা হারিয়ে এসেছ? আমার বাবা দিয়েছিলেন চোদ্দ বছরের জন্মদিনে—' কান্নায় গলা বুজে আসে বৌদির। আঁচল চোখে উঠে যায়। — দাদামণি ব্যাকুল— 'আহা শোনই না, এসে গেছে ক্যামেরা তোমার। হারিয়েছিল— পাওয়া গেছে। হয়েছে—?'

'তাই বল? এবার বল কি করে হারাল?' বৌদির চোখে জল, মুখে হাসি।

'তানাবেকে তো চেন। কিন্তু তোশিওকে চেন না। তোশিও-নো বিখ্যাত পণ্ডিত, সেও আসবে জানুয়ারির সেমিনারে। তখন দেখবে। তাদের দুজনের সঙ্গে যাচ্ছিলুম ইউয়াকি শহরে। পথে পড়ে কাজিওয়াতা। তোশিও-নোর ছেলেবেলার বাসা। সেখানে প্রচুর সামুরাই পরিবার বাস করে। মধ্যযুগীয় শহর। জাপানী ট্রাডিশনের খনি। তোশিও ভয়ানক ট্রাডিশন-পাগলা লোক, সেই আমার প্রধান গার্জেন ছিল ওখানে। সে আর তানাবে। ভাল ইংরেজি বলে, আমার দেখাশুনোর ভার তাদের ওপরেই ছিল। আমাদের সেমিনার চারদিনেই শেষ। তারপর টোকিও ছেড়ে চললুম উত্তর-পূর্ব জাপানের এই শহর ইউয়াকিতে। সেখানে একহপ্তার নেমন্তন্ন। কিন্তু তাদের কলেজ তখন বন্ধ। তাই তোশিও আর তানাবে ঠিক করেছিল আমাকে কদিন কেবল জাপান দেখাবে। জাপানের দীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করাবে।' — দাদামণি ধোঁয়া ছাড়লেন।

'প্রথমটা, কাজিওয়াতা। নেমে দেখি হাতে ক্যামেরা নেই। সীটে রেখে এসেছি। এদিকে ট্রেন তো সুপারসনিক গতিতে উধাও। স্টেশন মাস্টারের ঘরে গেলুম তানাবের সঙ্গে। সে বিশাল এক খাতা বের করে লিখতে লাগল— নাম? ঠিকানা? বয়স? পাসপোর্ট নম্বর?—'

'আমি তো হারাইনি, আমার ডিটেলে কি হবে? — নিয়ম। ক্যামেরার নাম? বয়স? কটা ফিল্ম এক্সপোজড হয়েছে?'

সর্বনাশ। কুড়িটা, না উনিশটা; কিছুতেই মনে পড়ে না। কিন্তু ওটা জরুরি। ক্যামেরার

বর্ণনা শুনে তানাবে বললে— 'ওটা বরং ফেলে দাও। ও দিয়ে কি হবে? কত ভাল ভাল ক্যামেরা বেরিয়েছে, কিনে দেব তোমায়।'

'ও বাবা! আমার বউয়ের ক্যামেরা—'

'বউকে তুমি ভয় পাও?' অবাক চোখে তাকিয়ে তানাবে বলল।

'তুমি পাও না?' — তানাবে উত্তর না দিয়ে বলে— 'এ-কথাটা তোশিও-নোর সামনে খবর্দার যেন বল না। তুমি কি জান ও কেন গাড়ি চালায় না?'

'কেন লাইসেন্স নেই বলে?'

'ডানহাত নাড়তে হবে বলে।'

'ডানহাত নাড়তে ওর অসুবিধা আছে?'

'নেই? ওরা খাস সামুরাই যে! ওর ঠাকুর্দা ঠাকুমা দাদামশাই দিদিমা চারজনেই সামুরাই বংশীয়। তাই।'

'তাই মানে?'

'সামুরাইদের ডানহাত চালান মানেই তো তরওয়াল চালান। এও জান না?'

'তাই তো। তা তুমি তো গাড়ি চালাও।'

'আমি চালাব না কেন? আমার তো কেবল দিদিমা সামুরাই বংশীয়। বাকি সবাই চাষী। আমি দুহাত নাড়তে পারব না কেন?'

সত্যিই তো। চমৎকার লজিক। — 'দুজনে তো একইসঙ্গে পড়াশুনো করেছ, একসঙ্গেই চাকরি করছ, অথচ তোমাদের মধ্যে এত তফাত।'

'তফাত থাকবে না? এটা তো ট্র্যাডিশানের কথা। ও সামুরাই। আমি কৃষক। এখন যদিও বেতন একই পাচ্ছি— তাতে ট্র্যাডিশন তো বদলায় না। ওটা হাজার বছরের ব্যাপার।' একটু থেমে তানাবে বলল— 'তোশিওর বউ টোকিওয় কেন থাকে, জান?'

'টোকিওতে থাকেন বুঝি? কেন?'

'কেননা তোশিও যখন ইউয়াকিতে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করে, ওর বউ বলেছিল— 'তার মানে, টোকিও ছেড়ে চলে যেতে হবে?' বাস সেই থেকে তোশিওর বউ টোকিওতে, আর তোশিও ইউয়াকিতে। বউ পায়ে ধরেছিল, তবুও তোশিও ওকে সঙ্গে নেয়নি। এত স্পর্ধা, স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ইচ্ছে প্রকাশ করে? সেই শেষ। দশ বছর তোশিও ইউয়াকিতে একা থাকে। বউ অনেকবার আসতে চেয়েছে— কিন্তু স্বামীর সেই এক কথা। 'থাকো তুমি তোমার টোকিওয়।' ওকে যেন তুমি বল না তোমার বউয়ের ক্যামেরার জন্যে তুমি এমন করছ।'

তোশিওর পাণ্ডিত্যের প্রতি আগেই আমার সম্ভ্রম ছিল, এখন তো আরও বেড়ে গেল সত্যি, পুরুষসিংহ একেই বলে। এমন না হলে স্বামী? শৌর্য, বীর্য আছে, হ্যাঁ। সামুরাইয়ের রক্তই বটে। ঝাড়া ৪৫ মিনিট ধরে ক্যামেরার আইডেনটিফিকেশনের ব্যবস্থা হল। ইউয়াকি স্টেশনে খবর দেওয়া হবে। সেখানে প্রমাণ দাখিল করলে ক্যামেরা মিলতে পারে।

কাজিওয়াতা শহরের লোকেরা খুবই দুঃখিত, সেখানে মার্কিনরা বোমা ফেলতে ভুলে গেছে বলে। বোমা না পড়ার দরুন, ওদের দারুণ ক্ষতি হয়ে গেছে। মহা মুশকিলে পড়েছে তারা— অন্য সব শহরের দিব্যি উন্নতি হচ্ছে, ওদের বেলায় কচু। না রিমডেলিং না রেনোভেশন, না রিকনসট্রাকশন, নট কিচ্ছু। কোনও রকমের ডিভেলপমেন্ট প্ল্যানিং নেই। ফলে সামুরাই ঐতিহ্য ঘুণপোকার মত কাজিওয়াতার ইটে-কাঠে জড়িয়ে আছে। ঐতিহ্যের হাত থেকে রেহাই নেই শহরবাসীর। — তোশিও অবশ্য এতে খুবই খুশি, তাকে তো আর এখানে থাকতে হয় না।—

তানাবের কথা থেকে যা বুঝলুম, তার সারমর্ম এই।

মুরাসাকি একবর্ণ ইংরিজি জানে না। সে হচ্ছে তোশিওর সম্পর্কে ভাই, তারাও ভগ্নাংশ-সামুরাই. কাজিওয়াতা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে সে-ই, তার গাড়িতে। দিনেব শেষে, মুরাসাকি জাপানীতে কিছু একটা বলল। যা শুনে তোশিও-তানাবে দ্বৈত কোরাসে গেয়ে উঠলো— 'জোবান?', এবং দুজনেরই মুখ স্বর্গীয় উদ্ভাসে আলোকিত হয়ে উঠল। তোশিও বলল— 'চল, চল, চাকলাবাকলাতি, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। মুরাসাকি আজ আমাদের একটা অসামান্য জিনিস দেখাবে। দারুণ ট্রাডিশনাল। জোবান!'

'সেটা আবার কি?

'স্পা!'

শহর থেকে বেশ দূরে। পাহাড়ের ঢালুতে, ছোট সাদা দোতলা বাড়ি। গাড়ি থামতেই, এক রুক্ষমূর্তি জাপানী কোত্থেকে উদয় হয়ে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

'ওকি? ওকি? গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে কেন?'

'ও ঠিক আছে। পার্কিং করছে।' তানাবে সান্ত্বনা দেয়, 'এটা একটা বড় হোটেল। চল ভিতরে যাই।'

দোতলা বাড়িতে ঢুকতেই দুটি সিল্কের কিমানোপরা সুন্দরী মেয়ে এসে একশবার কোমর ভাঁজ করে নত, নম্র, বিনয়ী ভাবে, বিনা অনুমতিতে আমাদের পা থেকে জুতো-মোজাগুলো কেড়ে নিয়ে অন্য একরকম মোজা আর ঘাসের চটি পরিয়ে দিয়ে চলে গেল। যাক— গাড়ি গেছে, এবার জুতোগুলোও গেল। কোথায় যে পার্কিং হতে চলে গেল কে জানে? এরা দেখছি একবার এলে আর ফেরবার পথ রাখে না। একশ কুড়ি টাকা দামের জুতোটি খুইয়ে, এই ঘাসের চটি পরে কলকাতায় ফিরলে, তোমাদের বৌদি আমাকে আর আস্ত রাখবে না। একেই তো ক্যামেরা গেছে। মনটা ভারী হয়ে রইল।

মেয়েদের সঙ্গে মুরাসাকির কথাবার্তা সব জাপানিতে হচ্ছে। তোশিও-তানাবে এসে বললে— 'চল, চল ঠিক হয়ে গেছে।' সঙ্গে একটি জাপানী মেয়ে এল পথ দেখাতে। আমরা গিয়ে লিফটে চড়লুম। লিফট উঠছে তো উঠছে। স্পষ্ট দেখেছি ছোট মতন সাদা মতন দোতলা বাড়িটায় ঢুকলুম, পাহাড়ের গায়ে— আর এই লিফট তো উঠল সোজা পাঁচতলা। আশ্চর্য কাণ্ড। নেমে একটা টানেলের ভেতর দিয়ে যেতে লাগলুম আমরা, আগে আগে কিমানোপরা মেয়েটি তুরতুর করে খরগোশের মত পায়ে হাঁটছে। টানেলে

বিজলিবাতি ফিট করা। টানেল দিয়ে বেরিয়ে আরেকটা লাউঞ্জ। আরেকটা লিফট। এবার এটাতে ঢুকলুম। এটা উঠল চোদ্দতলা। আমি প্রশ্ন করা ছেড়ে দিয়েছি। তানাবে নিজে নিজেই বললে— 'উনিশতলায় আমাদের ঘর। এটা একটা হোটেল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এদিকে ওদিকে বিল্ডিংগুলো, টানেল দিয়ে দিয়ে জোড়া। এক একটা বিল্ডিংয়ের এক একরকম হাইট। কোনটা দোতলা, কোনটা সাত, কোনটা চোদ্দ। বুঝেছ তো এবার?'

—'তা বুঝেছি। জাপানী ব্যাপার, সবই জলের মত সোজা।' ঘরে পৌঁছুলুম। জাপানী স্টাইলে ঘর। একদিকটা পুর মোটা মাদুরে মোড়া। জানলায় ভর্তি দেওয়াল, কাচের বদলে কাগজের সার্সি। অন্যদিকটা পাইন কাঠের প্যানেলিং। ঘরের মধ্যিখানে দারুণ একটা গালার কাজ করা ড্রাগন-ডাইনোসর-সাপ আঁকা অপূর্ব জলচৌকির মতন টেবিল। চমৎকার কাগজের লন্ঠন জ্বলছে।

'এইটেই তোমাদের ঘর।' দেখিয়ে দিয়ে, কোমর ভাঁজ করতে করতে পিছু হেঁটে সেই সুন্দরী বেয়ারা বেরিয়ে গেল। মুরাসকি-তোশিও-তানাবে গিয়ে ঝটপট ক'খানা রংচঙে কিমানো চড়িয়ে এল কোত্থেকে। এবার তারা বসে পড়ল টেবিল ঘিরে। আমিও কোটটি খুলে রেখে যেই [illegible] গিয়ে, তোশিও বলল— 'এভাবে বসা মানেই কিন্তু ট্রাডিশনের অপমান। যাও, আগে কিমানো পরে এস!' আমি যেই শার্টপ্যান্টের ওপরে কোটের মত কিমানোটি করে এসেছি, ঘরে যেন বোমা পড়ল। তানাবে বলল— 'শোন, চাকলাবাকলাতি (ওরা চক্রবর্তী ওইভাবেই বলে) কিমানোটা ওভারকোট নয়। অন্যান্য জামাকাপড় খুলে ওটাকে পরতে হয়।' আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে শার্টপ্যান্ট খুলে রেখে কিমানো পরে এলুম। তোশিও-তানাবে চোখা-চোখি করলে। দুজনেই মাথা নাড়লে। ভুরু কুচকে সরু চোখ প্রায় বুজে ফেলে বললে— 'কিমানোর নিচে কেবল ভগবানের তৈরি চামড়াটুকুই থাকবার কথা. তোমার কিমানোর নিচে ওসব কী?' —'কিছুই না। গেঞ্জিইজের— বলতে তানাবে বলে উঠল— 'ছি ছি ছি। কিমানোর নিচে গেঞ্জিসাইজের? এ যে ব্লাসফেমি। না না শিগগির যাও, খুলে এস। তোশিও ভীষণ আপসেট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। ওদের আবার সামুরাই-রক্ত, কথায় কথায় গরম হয়ে যায়। আমাদের মত চাষাভুষো তো নয়। মুরাসাকিও দুয়ের তিন ভাগ সামুরাই।'—

কি আর করা, ভগবানের চামড়ার ওপর কিমানো পরে, ওই জলচৌকির পাশে নতুন বৌয়ের মত আড়ষ্ট হয়ে গুটিশুটি কোনওরকমে এসে বসলুম। দেখি দরজা খুলে গেছে। একের পরে এক খাঁদা বোঁচা পরমাসুন্দরী মেয়ে স্বপ্নের মত কিমানো পরে, অতিসুন্দর সব পাত্র বয়ে বয়ে ঘরে ঢুকছে। চারজন মেয়ে এসে বসল। টেবিল ভরে গেল খাদ্যে। সঙ্গে বেঁটে কুঁজোতে ভর্তি গরম গরম [illegible]কে— মদ। খাবার-দাবারগুলো বেশিরভাগই কাঁচা। টেবিলে একটা উনুন মতনও রাখা হল। তাতে কাঁচা মাংস নেড়ে চেড়ে পাতে দেয়। আর কাঁচা ডিম সদ্য ভেঙে বাটিতে ঢেলে দিয়েছে, তাতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেতে হয়। সেটা সস। মেয়েগুলো মিষ্টি হাসে। আর কিচিরমিচির করে। আর

মাথাটি হেলিয়ে দুলিয়ে কেবলই কুচো-গেলাসে সাকে-মদ ঢেলে ঢেলে হাতে তুলে দেয়। আপত্তি করা ট্রাডিশন বিরুদ্ধ। হাঁটু মুড়ে বসে বসে দোজো-দোমো কিসব বলতে বলতে ওই মেয়েরা খুদে পেয়ালা কেবল ভরেই যাচ্ছে। আমরাও পেয়ালা খালি করেই যাচ্ছি। 'সাকে' খাবার আবার নিয়মকানুন আছে! কাপে ঢেলে তো দিব্যি আমার হাতে তুলে দিল। আমি যেই একচুমুক খেলুম, অমনি দেখি মেয়েটা আমার হাত থেকে খপ করে গেলাসটি কেড়ে নিয়েছে। নিয়ে নিজেই তাতে চুমুক দিচ্ছে। একি রে বাবা! কিছু বুঝবার আগেই আবার কাপটি আমার হাতে ফেরত চলে এসেছে। আমি একচুমুক দি, আর সেই মেয়ে একচুমুক দেয়। তারপর কাপটি ভরে দেয়। এরা হচ্ছে সাকে খাওয়ানর সাকী, পেয়ালা ভরে দেওয়াই এদের কাজ। খাচ্ছি তো খাচ্ছি, সাকে খেতে খেতে শরীর গরম, নেশা হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। আর কাঁচা আনাজ কাঁচা মাছ খেতে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি হচ্ছে না। এমন সময় দেখি তোশিও-নো তার ডান হাতটা উপর দিকে তুলে ফেলেছে। কি সর্বনাশ। কেলেঙ্কারি কিছু ঘটবে নিশ্চয় এবারে। আর বাঁ হাতটাকে বুক-পেটের মাঝামাঝি আড়াআড়ি ভাবে রেখেছে। বীরত্ব ফুটে বেরুচ্ছে ভঙ্গিতে। নিশ্বাস বন্ধ করে আছি।

দেখলুম কিছুই হল না। বেঁটে বেঁটে মিঠে মেয়েগুলো থালা বাটি তুলে নিয়ে পেছু হেঁটে হেঁটে গুটি গুটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তোশিও-নো হাতটি নামিয়ে নিয়েই আবার ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে ধরল। আমি ভাবলুম, এবার বোধহয় আমাদেরই গুটি গুটি পেছু হটে বেরিয়ে যেতে বলছে। কিন্তু, না। দেখি দরজা খুলে গেল। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে মেয়েগুলি খুরখুর তুরতুর করে আবার ঘরে ঢুকছে। চায়ের নিয়মকানুন আলাদা। অত দোজো-দোমো করে সেধে সেধে চেপেচুপে খাওয়ানো নেই, পেয়ালা কেড়ে নিয়ে তেড়ে এসে চুমুক দিয়ে দেওয়াও নেই। সাকের বেলায় যেমন ছিল। নির্ভয়েই চা-পান-পর্ব শেষ হল। তবে চা-টা জলপাই-সবুজ রঙের। আর বুনো কষা স্বাদের। খেয়ে ভুলেও মনে হয় না চা খেলুম। তায় দুধ চিনি কিছু নেই। চীনে চা'র মতো জুঁইফুল পর্যন্ত না। উপরন্তু সর্বক্ষণ উঁচু হয়ে হাঁটু ভাঁজ করে নিলডাউন ভঙ্গিতে বসে থাকা জাপানের সামুরাই ট্রাডিশন রাখতে কি আর বাঙালী কেরানি আমরা পারি? চা খাওয়া শেষ হতেই তোশিও-নো একেবারে সটান খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন— দুই পা ফাঁক করে দুই হাত আকাশে তুলে ইংরেজি 'এক্স' অক্ষরের মত চেহারা করে তিড়িক তিড়িক করে দুবার লাফালেন মেঝের ওপরে— ঘরে বেশ ভাইব্রেশন জাগল। মুখে ইংরেজিতে মিলিটারি সুরে অর্ডার করলেন— 'নাউ টু দ্য বাথ!' অমনি তানাবে এবং সেই শহরের নীরব অধ্যাপক মুরাসাকিও একবার ঠিক ঐভাবে নেচে উঠল—

'টু দ্য বাথ! টু দ্য বাথ!' যেন যুদ্ধে যাচ্ছে। আমিও দেখাদেখি লাফাব বলে যেই উঠতে গেছি, উঠব কি, মুখ থুবড়ে পড়লুম মেঝের ওপরে। অতক্ষণ উপুর হয়ে হাঁটু মুড়ে নিলডাউন হয়ে বসে থাকা। — দুটি পা জন্মের শোধ ঐ ভঙ্গিতেই রুদ্ধ হয়ে

গেছে। ভাঁজ খোলে কার সাধ্যি! তা তিনবারের বার যেই পা সোজা হল, অমনি তোশিও-র মত করে দুবার ধুপ ধাপ লাফিয়ে নিলুম। লাফটা অত্যাবশ্যক। বোঝাই গেল। পাগুলো সোজা করবার জন্যে। মেয়েরা সব দোর ঠেলে বেরিয়ে খুরখুর তুরতুর করে হেঁটে আগে আগে যেত লাগল, পিছু পিছু মার্চ করে চলছি আমরা। প্রথমে তোশিও-নো, তার পিছনে তানাবে, তার পিছনে আমি। আমার পিছনে মুরাসাকি। রহস্যময় কাঠের তৈরি টানেল, আধো-আলো থেকে আধো অন্ধকারে। এঁকে বেঁকে চলেছে তো চলেছেই পাহাড়ের বুকের মধ্যে। আমরাও মার্চ করতে করতে যাচ্ছি। একটা লিফটের কাছে এসে রাস্তাটা বৈঠকখানা হয়ে গিয়ে শেষ হল। লিফটে উঠে স্পষ্ট দেখলুম: বাইশতলার নিচে জি-ফ্লোর, তারও নিচে ও-ফ্লোর, সেই বোতাম টেপা হল। অথচ আসার সময় সাদা চোখে স্পষ্ট দেখেছি, চোদ্দতলা উঠলুম। নামছি চব্বিশতলা। এটা কেমন করে হচ্ছে?

সাকে-টা বড্ড বেশি হয়ে গেছে নাকি? খুদে খুদে পেয়ালা বলে টের পাওয়া যায় না তেজটা কি প্রচণ্ড। ও-ফ্লোরে নেমে দেখি সামনেই এক সুবিশাল জলকুণ্ড। উঁহু, সুইমিং পুল না, কুণ্ড! কুণ্ডটা ভাগ করা আছে, জলের নিচে চৌকো চৌকো দেওয়াল, তার ওপর দিয়ে জল চলাচল করছে। ওখানে পৌঁছে গিয়ে মেয়েরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। তোশিও-নো, তানাবে, মুবাসাকি খপাখপ তাদের কিমানো খুলে ফেলে ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরনে ভাগবতী চামড়া।

আমি আর কী করি? 'যা থাকে কপালে' বলে আমিও চোখ বন্ধ করে কিমানো খুলে সামনের কুণ্ডটায় ঝাঁপিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বার্ড স্যাংচুয়ারির মত কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেলে-তোশিও-নো ওদিক থেকে হেঁকে উঠলেন, 'ওখানে নয়, এদিকে এস। ওটা হল লেডিস কুণ্ড।' আমি তো পালাতে পথ পাই না। — তাড়াতাড়ি উঠে পাশের কুণ্ডে ঢুকে পড়ি। শিগগিরই দেখলাম লেডিসরাও এসে কিমানো খুলে ফেলে ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়ছেন কুণ্ডে। এত স্ত্রী-পুং কুণ্ড ভাগাভাগির উদ্দেশ্য আর যাই হক, স্নাতকদের লজ্জা নিবারণ নয়। কেননা মাটির ওপরে যা কিছু লিঙ্গ ভেদের বন্দোবস্ত তা কেবল মেঝের ওপর লাইন টেনে। শুধুই তাত্ত্বিক ভেদ, থিওরেটিক্যাল ডিসটিংশন। পর্দা বা দেয়ালের মত জাগতিক আড়াল-আবডালের বালাই নেই। দেয়াল যা কিছু জলের নিচে। আর জল তো নয়, অগ্নিকুণ্ড। গন্ধকের হলদে ধোঁয়ায় বাতাস আবছা, দৃষ্টি অস্পষ্ট. ওইটুকু আব্রু। চোখের দৃষ্টি কেবলই ঝাপসা হয়ে যায়। চতুর্দিকে হলদে হলদে গন্ধকচূর্ণ জমে আছে পাথরের ওপরে। আর গন্ধকবাষ্পের কড়া গন্ধে নাক ভরপুর। অথচ এতটুকু শ্বাসকষ্ট নেই। জল এত গরম, যে মনে হল একদম ঝলসে গেছি— এক লহমার মধ্যে সাকে খাওয়ার যা যা কিছু নেশা সব ছুটে গিয়ে হাড়ে মজ্জায় ঝনঝনে জ্ঞানগম্যি এসে গেল।

যখন তোশিও-নো জল ছেড়ে উঠল, পেছু পেছু আমরাও উঠলুম ডাঙায়। কেউ কারুর দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছি না, আড়ে আড়ে। প্রত্যেকেই দেখছি প্রত্যেকের চেহারা

ঠিক তেলে-ভাজা চিংড়ি মাছের মতন। লাল টকটক করছে। ভগবানের চামড়া। গন্ধকের ধোঁয়ায় অবশ্য সবাই কিছুটা আচ্ছন্ন। কিমানো নিতে গিয়ে দেখি কিমানো কখন হাওয়া হয়ে গেছে। অ্যাঁ! এবারে কি তবে বিনা কিমানোতেই ফিরে যেতে হবে? আমি তো বসে পড়েছি প্রায় মাটিতে— এমন সময়ে দেখি মস্ত সাদা একটা তোয়ালে ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ অন্তরীক্ষ থেকে। প্রত্যেককে একটা। তোয়ালে লুফে নিয়ে গা মুছে তোয়ালে জড়িয়ে গুটিগুটি এগোচ্ছি, তোশিও বলল—'ওকি! ওকি! তোয়ালে রেখে যাও।'

তোয়ালে রেখে? তানাবে, মুরাসাকি ঝড়াঝঝড় তোয়ালে মাটিতে ফেলে দিলে। অন্তরীক্ষ থেকে ফর্সা কাচা কিমোনো এসে গেল তাদের হাতে। বেঁটেখাট একরঙা কিমোনো— গতবারের মতন রংচঙে বড়সড় নয়। দেখাদেখি আমিও। তবু ভাল, যাহোক একটা জামা পরে যাওয়া হবে ঘরে, অন্তত। গেঞ্জি-ইজের প্রভৃতি তো অনেকক্ষণই হল বিস্মৃত দিনের উপকথায় পরিণত হয়েছে। তবু স্বীকার করতেই হবে, শরীর বেশ চনমনে মনে হয়েছে এই গন্ধকুণ্ডের জলস্পর্শে। পাতালের আগুন থেকে উঠে-আসা-জল— সেকি সোজা ব্যাপার?

আমরা পুনরায় মার্চ করতে করতে গিয়ে লিফটে চড়লুম। এবার উঠলুম উনিশতলা। নাঃ মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে যাবে এবারে। আমার অবস্থা দেখে তানাবের মায়া হল। ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিল। এদের আসলে অনেকগুলো লিফট আছে, একেকটা একেক রকম লেভলে যাতায়াত করে। প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন লিফটে চড়ছি বলে ভিন্ন ভিন্ন তলার হিসেব পাচ্ছি। পাহাড় কেটে কেটে ঘরবাড়ি তো একেক হাইটে এক এক তলা।

ঘরে এসে পৌঁছেই দেখি মাটিতে পাতা হয়ে গেছে চমৎকার বিছানা। ঠিক যেমন দেশের বাড়িতে বিছানা হয়। মেঝেয় একটি তোশক, তাতে সাদা ধবধবে চাদর মোড়া, দুটি বালিশ, তাতে সাদা ধবধবে ওয়াড় পরানো; একটি লেপ— তাতেও দুগ্ধ-ধবল ওয়াড়। বালিশের নিচে ফর্সা কিমানো ভাঁজ করা। দেখেই আরাম হল। পর পর চারখানা মাদুরে চারখানা বিছানা। শুয়ে পড়ব ভাবছি। কথাটা বলতেই তোশিও— 'শোবে মানে? স্নান করতে হবে না?'

—'আবার স্নান? এতক্ষণে তবে কি করলুম—'

—'ওটাতে ধুতে হবে না? গা-ময় গন্ধকচূর্ণ বসে গেলে ঘা হয়ে যাবে যে!' বলেই লেফট-রাইট করে তোশিও বাথরুমে চলল। তানাবে আমাকে বললে—'যাও, তুমিও যাও, টু অ্যাট এ টাইম।' — এ আবার কিরকম নিয়ম রে বাবা? একা একা কি বাথরুমে যাওয়াও বারণ? বাথরুমে ঢুকে দেখি আশ্চর্য ব্যবস্থা। পাশাপাশি দুটি বিশাল স্টিলের বালতি। অর্থাৎ বালতির মত আকৃতির টব। খালি। তার পাশে দুটি টেলিফোন। ঘরে ঢুকেই কিমানো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তোশিও-নো ফোন তুলে কিছু কথাবার্তা বলল। দেখলুম এ-ঘরে থরে থরে পরিষ্কার তোয়ালে সাজানো আছে। বাঃ। এবং কিছু কিমানোও। তোশিও দেখি টবের মধ্যে ঢুকে উবু হয়ে বসেছে। টবের কিনারা দিয়ে

মাথাটি উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে। অন্য টবে আমি বসলুম। হঠাৎ দেখি বালতি আপনা আপনি গরম জলে ভরে উঠছে। তলা থেকে জল উঠে গলা পর্যন্ত ভরেই থেমে গেল। আমাকে কোনও কল খুলতে হল না, মগটগের তো বালাই নেই। জলে কেমন-কেমন গন্ধ?

—'এটা যে ওই স্পা থেকে। কুণ্ডের জল কিনা।' তোশিও বলল। আমি তো থ।

—ঘরেই আসে? তবে কেন অত কষ্ট করে চব্বিশ তলা ঠেঙিয়ে পাতাল-প্রবেশ, এবং সর্বসমক্ষে কিমানো ত্যাগ? দিব্যি বন্ধ দরজার ভেতরে বালতি করে চলে আসছে যখন, প্রথমেই তো এখানে নেয়ে নিলে হত।

—'দুর, তা কখন হয়? ট্রাডিশন বলে একটা ব্যাপার আছে না? তোমার কিছু খেয়াল থাকে না, কুণ্ডস্নান একটা ট্রাডিশনাল কাস্টম? এখানে ওই জল পাইপে করে আনা হচ্ছে, তার কারণ ওই জল না হলে গা থেকে গন্ধকের গুঁড়ো উঠবে না।' — এক সময়ে ঐ জল আবার আপনা আপনি নেমে গেল, বালতিঁ খালি হয়ে গেল। যেন ম্যাজিক। কোথা দিয়ে যে আসছে, কোথা দিয়ে যে যাচ্ছে, কিছুই টের পাচ্ছি না। জলটা যেন জ্যান্ত।

—'এবার ফ্রেশ ওয়াটার।'

—'সাবান? সাবান আছে?'

—'সাবান ব্যবহার করা ট্রাডিশনে নেই।'

—'আই সী। ফ্রেশ ওয়াটার এলেন। ফ্রেশ ওয়াটার গেলেন। দিব্যি ঝরঝরে লাগছে। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ছি, তোশিও-নো ডান হাত নেড়ে ফেললেন। আমার বাঁ হাতটি ডান হাতে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে এক ঝাঁকুনিতে ফের বসিয়ে দিলেন বালতিতে। 'এইবারে যে জলটা আসবে সেটা হচ্ছে পিওর কপার মিশ্রিত। বিশুদ্ধ তাম্রলিপ্ত জলে স্নান করলে তবেই তো গন্ধক-কুণ্ডে স্নানের পূর্ণ উপকারটা পাবে?'

—জল আসতে শুরু করেছে। আপাদমস্তক কথাটার মানে বোঝা যাচ্ছে, পা থেকে জল উঠছে। আপাদস্কন্ধ উঠবে। —'গাউথামা বুদ্দার নির্দিষ্ট প্রণালীতে এই রিচুয়াল বাথটা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ তো তোমাদের দেশেরই, 'আ্যাব্যা-গ্যায়ানা' বাথ। তোমাদের মন্দিরে এসব ব্যবস্থা নেই?' মনের আনন্দে ডুবতে ডুবতে তোশিও বলল। ও হরি। এর নাম অবগাহন? গৌতম বুদ্ধের প্রণালী?

'আমাদের দেশে এসব যন্ত্রপাতি এখনও পৌঁছয়নি। ডিভেলপিং কান্ট্রি। এখনও বানাতে শিখিনি।

—'আড়াই হাজার বছরেও বানাতে শেখনি? তাজ্জব কথা!' থুপে থুপে গা মুছতে মুছতে তোশিও বলল। লজ্জায় চুপ করে যাই।

ঘরে ফিরেই চমৎকৃত। দেখি তানাবে-মুরাসাকি দুজনেই ঝাঁ চকচকে উলঙ্গ, তারাও পাশের বাথরুমে গিয়ে দ্বৈত-স্নান সেরে এসেছে। জোড়ায় জোড়ায় নাইতে হয় এখানে। আপাতত তারা গম্ভীর মুখে কিমানো ভাঁজ করছে। বালিশের নিচে যত্ন করে কিমানোটি

রেখে তারা মিষ্টি হেসে শুভরাত্রি বলে শুয়ে পড়ল। আমার আর লজ্জা করবে কি।

—'এ জন্মের মত আর হয়ে গেছে যা হবার।' এমন-কি লেডিস কুণ্ডে পর্যন্ত নেমে পড়েছি। আমি ফিসফিসিয়ে তোশিওকে বললাম—

—'এবার গেঞ্জি-টেঞ্জি ইজের-টিজেরগুলো পরে নিলে কি ট্রাডিশনের অবমাননা করা হবে?'

—'পরতে পার কিন্তু কেন পড়বে?' তারপর তানাবের দিকে লক্ষ্য করে বলল— 'ওরা চাষাভুষো মানুষ। লজ্জা শরমের বালাই নেই, কিমানো খুলে ফেলেছে। ছি ছি ছি!'

-'তুমি বুঝি কিমোনো পরেই ঘুমোও?'

—'দূর কিমানো পরে কেউ ঘুমোয়? আমি লেপের নিচে ঢুকে খুলে রাখব। সেটাই সভ্যতা।'

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি সবাই প্রস্তুত। জলচৌকিতে জাপানী ব্রেকফাস্ট চলে এল। কাঁচা মাছ, কাঁচা ডিম, গরম স্যুপ, গরম ভাত, পাঁপর ভাজার মতন কুড়মুড়ে সবুজ শ্যাওলা ভাজা। শসার আচার। খেয়ে দেয়ে রওনা দিলুম। জুতো জামা রাখা ছিল যেখানে, সেখানে যেতেই দৌড়ে ট্রেতে করে তত্ত্বের মতো সযত্নে সাজিয়ে বিল এল। তোশিও, তানাবে, আমি এবং মুরাসাকি, সকলে মিলে বিল নিয়ে কিঞ্চিত কাড়াকাড়ি চলল— শেষটায় মুরাসাকিই দিয়ে দিলে। কেননা সেইটেই নাকি ট্রাডিশন। ওটা ওরই শহর, আমরা ওর অতিথি। জাপানী ভাষায় বিলটা লেখা ছিল, তাই কাড়াকাড়ি করলেও বিলটা যে কত তার বিন্দু-বিসর্গও আমি বুঝতে পারিনি। ছবির মত সুন্দর বিল, হ্যাণ্ডমেড পেপারে তুলি দিয়ে আঁকা। যেন বাঁশের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার জন্য।

জোবান থেকে কাজিওয়াতা। সেখানে মুরাসাকিকে বিদায় দিয়ে আমরা ট্রেনে উঠলুম, ইউয়াকি। ইউয়াকি স্টেশনে নেমে তানাবে মনে করিয়ে দিল— 'হারানো ক্যামেরা পুনরুদ্ধার করবে না? বের কর তোমার কাগজপত্তর পাসপোর্ট কমপ্লেনের কপি।' এসব সময়ে তোশিও-নো অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। এবম্বিধ তুচ্ছ ব্যাপারে মন দেওয়া সামুরাইদের যোগ্য নয়। তানাবে বলল, — 'তুমি কাগজপত্র বের কর, আমি একটু মেনস রুম থেকে ঘুরে আসছি।'

—আমি স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকে 'গুড ইভনিং' বলতেই সে বলে উঠল, — 'কামেলা?' এবং ড্রয়ার খুলে তোদের বৌদির বক্স ক্যামেরাটি বের করে দিয়ে এক গাল হেসে বললে— 'তু ওলদ। নিউ বাই।' আমি তাড়াতাড়ি বললুম—'আইডেন্টিফিকেশন? পাসপোর্ট নম্বর? এক্সপোজার নম্বর? পেপার্স?' স্টেশন মাস্টার হেসেই কুল পায় না। গড়িয়ে গড়িয়ে হাসে। —'হোয়াত আইদেনতিফিকেশন? ইউ ইনদিয়ান। আই নো ইনদিয়ান লস্ত ওলদ কামেলা।' সত্যিই তো? আমার চামড়াই তো আমার আইডেনটিটি। এই সুদূর উত্তর-পূর্ব জাপানী মফস্বল শহরে আর কজন ভারতীয় এসে বক্স ক্যামেরা হারাচ্ছে? আর এর জন্য কি না এত ঝামেলা কাজিওয়াতাতে— ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট গেছে ফর্ম ভরতে। বেরিয়ে দেখি তোশিও আর তানাবে কি সব পরামর্শ করছে।

আমাকে বললে, 'ক্যামেরা পেয়েছ তো? চল, বাড়িতে গিয়ে সব কথা হবে।' কিসের পরামর্শ? গাড়িতে যেতে যেতেই প্রশ্ন করি। ব্যাপার কি? তানাবে বললে, 'মুরাসাকি যদিও বিলটা দিয়েছে, কিন্তু বিলটা হয়েছে বিরাট। ওটা কোনও একজনের স্কন্ধে ফেলে দেওয়া যায় না। এখন ওকে কিভাবে আমরা আমাদের অংশটা শোধ করতে পারি, ট্রাডিশন অনুযায়ী, তোশিওকে তাই জিজ্ঞাসা করছি। আমরা চাষাভুষা লোক—আমরা অত আদব কায়দা জানি না তো? তিনজনে মিলে এক লক্ষ কুড়ি হাজার ইয়েন পাঠালেই হিসেবটা এক হবে, এইটুকু বলতে পারি আর কি।' (অর্থাৎ চার হাজার টাকা।) তোশিও-নো গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন— 'চিঠি লিখতে হবে। লিখতে হবে— তোমার যত্ন-আত্তিতে এবং অতিথি সৎকারে আমরা তৃপ্ত। যারপরনাই খুশি হয়ে এই টাকাটা সেই বিমল আনন্দের প্রকাশস্বরূপ তোমাকে পাঠাচ্ছি। —ওনলি অ্যাজ এ টোকেন অব আওয়ার জেনুইন অ্যাপ্রিসিয়েশন'— অর্থাৎ বখশিশ? বন্ধুর আতিথ্যের শেয়ার দেওয়া মানে ট্রাডিশনের অবমাননা। কিন্তু বখশিশ? সামুরাইদের বার্থরাইট ওটা।

আবার চমৎকার হ্যাণ্ডমেড পেপারে ছবির মত অক্ষরে তুলির মত কলমে লেখা হল সেই কিম্ভুত চিঠি। এবার সই করার পালা। বলা বাহুল্য, প্রথমেই তোশিও। তারপরে আমি, যেহেতু আমি চক্রবর্তী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, যারা রাজ্য-শাসনও করত— সেহেতু সামুরাইয়ের পরেই জাতিগত ভাবে আমার স্থান উচ্চে। সবার শেষে তানাবে। (ব্যাটা চাষা)-'আমি কি বাংলাতেই সই করব?' তোশিও বললে, না। বাংলা কেন, কোন ভাষাতেই তুমি এ চিঠি সই করতে পার না। কেননা এটা জাপানী ভাষায় লেখা। এবং তুমি জাপানী পড়তে পার না। যে ভাষা তুমি পড়তে পার না, সে ভাষায় লেখা কোনও ডকুমেন্টেই আমরা তোমাকে দিয়ে স্বাক্ষর করাতে পারি না। সেটা বে-আইনী।' — তবে? এইমাত্র আমার অংশটা আমি শুধে দিয়েছি— যা কিছু বক্তৃতার দক্ষিণা স্বরূপ জুটেছিল, সবটা গেছে ট্রাডিশনের দয়ায়, জোবানের গন্ধকের বাষ্পে। এখন সইও করতে পারব না? — 'তাহলে আমি কি তাকে আলাদা ইংরেজিতে চিঠি দেব?' এবার তানাবে হাসল— 'ও কি ইংরেজি জানে?' 'তাই তো! তবে?'

— তবে আর কি? তোমার নামটা আমিই সই করে দিচ্ছি জাপানী ভাষাতে। তাহলে আর কোনও গণ্ডগোল হবে না।' গুরুগম্ভীর রায় দিলেন সামুরাই তোশিও-নো। আমার বদলে— তিনি সই করলে সেটা যদি বে-আইনী না হয় তাতে আমার আর বলবার কিছুই থাকে না।

হাসিমুখে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। কেবল আমার মুখের হাসিটি উবে গেল। — 'এত বেশি খরচ হলে আর কোনও ভাল জিনিসকেই কি ভাল লাগে?'— আশ্চর্য কথা—তানাবে-তোশিও দুজনেই আমার এ দুঃখটা কিন্তু দিব্যি বুঝতে পারলে। কি চাষা, কি সামুরাই বেশি খরচের দুঃখটা সবাই বোঝে। —'আমার গাড়িটার মতন হল আর কি।' তোশিও বলে।

—'গাড়ি? তোশিও-নো, তুমি গাড়ি চালাও না শুনেছিলুম যে?'

—'গাড়ি চালায় না ঠিকই। তা বলে গাড়ি থাকবে না কেন? কোনও ইউনিভার্সিটি প্রফেসারের গাড়ি নেই, এটা লজ্জার কথা!' তোশিওর হয়ে তানাবেই উত্তর দেয়। —'যেমন তেমন গাড়িও নয় তোশিও-নোর। স্পেশাল অর্ডার দেওয়া গাড়ি। দেখতে যাবে একদিন?'

—'বেশ তো। আজই চল না। গাড়িও দেখবে, চাও খাবে।' তোশিও নেমন্তন্ন করলে।

বিকেলে গেলুম। সত্যিই দারুণ গাড়ি। গ্যারাজ আলো করে আছে।

ভেতরে ছোট রেফ্রিজারেটর ফিট করা। তাতে বরফের ট্রেতে গোলগোল আঙুরের মত বরফ জমছে। ছোট্ট কাবার্ডে দামী স্কচ, গেলাস সাজান। গদির মত কার্পেট মোড়া গাড়ির ভেতরটা। সামনে ড্যাশবোর্ডে ছোট টেলিভিশনে রঙিন জাপানী নাটক হচ্ছে। পাশে একটা কুলুঙ্গিতে কার্পেটের সঙ্গে রং মেলান টেলিফোন। ঠিক খেলনার মতন। ছোট্ট।

—'ফোনটা সত্যিকারের?'

—'এখান থেকে বাড়িতে ফোন করতে পার। করবে? নিউইয়র্ক অসলো—সব পাওয়া যায়।'

আমি তো হ্যাঁ। এমন গাড়িখানা, অথচ তোশিও অফিসে আসে ট্রেনে, বাসে? ব্যাপার কি? ওই ব্যাপার। গাড়ি চালানর মত নীচকর্ম সামুরাই করে না। কিন্তু শোফার রাখার মত বেতনও বিশ্ববিদ্যালয় দেয় না। তার ওপর গাড়ির মেইনটেনেন্স খরচ আছে না? দু'দুবার পুরো কার্পেট, আপহোলষ্ট্রি, ফ্রিজ, টিভি, বদলাতে হয়েছে না?

—'কেন? আউট অব ডেট হয়ে যায় বুঝি?' আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

—'তা নয়। মানে বাড়িটা তো সমুদ্রের ধারে। দু'দুবারই টাইফুনে সমুদ্রে বান ডেকে, গ্যারাজসুদ্ধ গাড়ি জলের নিচে ডুবে গেছিল! তাই বদলাতে হয়েছে।'

—'এঞ্জিন আছে?' হঠাৎ কি মনে করে বলি।

—'নেই? বাঃ! তবে আর গাড়ি কেন? বাড়ি হয়ে যাবে তো! তানাবে, দেখিয়ে দাও তো স্টার্ট দিয়ে'— তোশিওর স্বরে আহত সম্মানের ছোঁয়া।

—'থাক, থাক। আর দেখাতে হবে না। এই গাড়িটা ব্যবহারে লাগে না এটা বড়ই দুঃখ কিন্তু?'

—'কে বললে কাজে লাগে না? এই তো কাজে লেগেছে।' হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে তোশিও বলে। 'দিব্যি ভাল একটুখানি জায়গা এয়ারকনডিশন করলেই চলে যায়, বেশ 'কোজি', এন্টারটেইন করার পক্ষে মন্দ কি?'

অর্থাৎ এটা ওর গাড়ি নয়, বাড়িই। ওর বৈঠকখানা আসলে। ভাল।

তানাবে বললে, 'জোবানে বড্ডই খরচ হয়ে গেছে। চাকলাবাকলাতির জন্যে আমাদের একবার সুজিকিতে যেতেই হবে। চল, কালই সুজিকি যাই।' আমি হাঁ হাঁ করে বাধা দিই— 'আর ভঁই কোথায় যাব না। খুব ভাল লাগছে জাপানে। কিন্তু হাতে টাকা

নেই। আরও তো তিন-চারদিন থাকতে হবে।'

—'টাকা লাগবে না। সুজিকি তো জাপানের মহারাজার অতিথিশালা। ৯০০ অব্দ থেকে এখানে মাত্র এক টাকা করে নামমাত্র সেলামী লাগে। খেতেও একটাকা। শুতেও এক টাকা। চল, চল, খুব সুন্দর জায়গা। ট্রাডিশনাল অতিথিশালা কাকে বলে দেখে আসবে।' শুনে খুব উৎসাহ পেলুম। শহরে থাকলেই বরং খেতে শুতে ঢের বেশি খরচ। তার চেয়ে ওখানেই দু-তিনদিন কাটিয়ে আসা ভাল। তানাবে বললে —'কাল লাঞ্চের পরই বেরিয়ে পড়ব।'

গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে একটি ছোট টিলার ওপারে বনের মধ্যে কাঠের বাড়ি। চমৎকার প্যাগোডার মত দেখতে। কাঠের থাম। দরজা। খিলেন। ঘরে বিরাট প্রদীপ জ্বলছে। — লালেতে কালতে সোনাতে কাঠের ওপর গালার কারুকার্য করা বারান্দা। অপরূপ বারান্দা। পুরোনো বলে পুরোনো? বলে দিতে হয় না যে ৯০০ অব্দের। বিদ্যুৎ নেই। সবকিছু সেই পুরোনো দিনের মতই। খুব সম্ভ্রান্ত ঘরদোর। খুব ট্রাডিশনাল। তোশিও তো মহা তৃপ্ত। — 'এখানকার খাদ্যও আধুনিক নয়। ৯০০ অব্দের মেনু অনুযায়ী রান্না হয় এখানে।' বাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে এক থুত্থুরে বুড়ো আর তার থুত্থুরী বুড়ি পাহারা দেয় বাড়িটার। বেলা চারটেয় পৌঁছেছি। বুড়ি রাগ করে বললে— 'এত বেলায় এলে, ডিনার দিতে দিতে রাত ৯টা হয়ে যাবে। তা যাক, এখন চা খাও।'

—'এরাও কি ৯০০ অব্দ থেকে আছে?'

—'তা বলতে পার এরা আছে নব্বুই বছর। কিন্তু এই কাঠুরের পরিবারই এই জায়গায় ট্রাডিশনাল খবরদারি করে আসছে সেই ৯০০ অব্দ থেকে। পূর্বপুরুষের অধিকারক্রমে এরা চাকরি করে যাচ্ছে।'

—'বুড়ো মারা গেলে কী হবে? ছেলেপুলে আছে?'

—'আছে। শহরে চাকরি করে। বুড়ো মরলে তাকে এই বনে এসে এই কাজ নিতে হবে। কিন্তু সে নিতে চায় না। তার বউও।' হঠাৎ তানাবে থেমে গেল। তোশিও সূত্রটা তুলে নেয়—

—'তার বউও ঠিক আমার বউয়ের মত খুব শহর ভালবাসে। কিন্তু ছেলেটা আমার মত নয়। তাই সেও শহরে থেকে গেছে বউয়ের কিমোনোর পিঠে ওবি হয়ে। যত মেনিমুখ ছেলে। হুঁ,' — নাক দিয়ে বিশ্রী শব্দ করে অবজ্ঞা প্রকাশ করা তোশিওর মুদ্রাদোষ।

—'মেয়েদের কথায় চলেছ কি প্রলয় অনিবার্য। মেয়েরা থাকবে মেয়েদের মত। এই যে তানাবে, বৌকে চাবি দিয়ে রাখে— ঠিক করে। ওরা চাষা— ওদের সব ব্যাপার সোজাসুজি। এটা কিন্তু খুব প্রশংসার।'

—'এই কাঠের বাড়িটার কড়ি-বরগাগুলো দেখেছ? এই যে দামী কাগজের লন্ঠন?

এই যে মাদুর?' — নির্বিকার গলায় ঠিক এই সময়ে তানাবে আমাকে রাজ-অতিথিশালার ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে থাকে। কড়িবরগা দেখব কি? তোশিওর কথা শুনে তো আমি হাঁ। শিষ্ট, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ঐ তানাবে, সে কিনা বৌকে চাবি দিয়ে রাখে? অথচ বেশ তো সুস্থ স্বাভাবিক দেখায় ওকে! বেচারী বউয়ের অপরাধ সে পরমা সুন্দরী।

আশ্চর্য দেশ বটে জাপান। ছোট শহরে ইউয়াকিতে এই চলেছে, অথচ টোকিওতে দেখে এলুম একটা রেস্তরাঁ হয়েছে গিনজাতে, টোকিওর চৌরঙ্গী, যেখানে স্বাধীন মেয়েরা এসে নিয়মিত সন্ধ্যাবেলা তাদের পুরুষসঙ্গী ভাড়া করে নিয়ে যায়। ওটাও যে দেশে চলছে তোশিও-তানাবের বউ শাসনে চাষী-সামুরাই ডিরেকট মেথডও সেখানেই চলছে। সত্যি, কি ভুলই যে করেছি জাপানী মেয়ে বিয়ে না করে। তোদের বউদি তো পারলে আমাকেই চাবি দিয়ে রাখে, নেহাত আপিস যেতেই হয় তাই!'

—'তা, আনলে না কেন একটা জাপানী বউ ধরে? তবু তো লোকে দেখত একটা কিছু আনলে। চাবি দেব না আর কিছু— যা গুণবান দাদামণিটি তোমাদের। এক্ষুনি আমি দাতব্য করে দিচ্ছি, দেখবি কেউ ওকে ভুলেও নেবে না। ঈঈশশ'— বৌদি ফোঁস করে উঠতেই দাদা বেগতিক বুঝে আবার গল্প ফেঁদে ফেলেন—

—'আমি স্তম্ভিত, ওদিকে তানাবে দিব্যি শান্ত মুখে বলে যাচ্ছে—'এই যে কাঠের জলচৌকিটা দেখছ, এটা তৈরি হয়েছে হিরোসাকিতে। বিখ্যাত মধ্যযুগীয় শিক্ষাকেন্দ্রে। অবশ্য আপাতত আপেল চাষের জন্যই বিখ্যাত।' —'সামুরাইদের আড্ডা বলেও প্রসিদ্ধ ছিল ওটা'— তোশিও যোগ করে দেয়। কি স্বাভাবিকভাবেই না ওরা বউ-ত্যাগ, বউ-বন্দীর প্রসঙ্গ আলোচনা করে।

বিচ্ছিরি সবুজ চা খেয়ে বারান্দায় এসে বসলুম। চারিদিকে জাপানী জঙ্গল, তাতে চমৎকার সব জাপানী পোকামাকড় ডাকছে, পটে আঁকা ধানক্ষেত, গ্রামে আর দূরে, প্রশান্ত মহাসমুদ্র দেখা যাচ্ছে। চোখ জুড়িয়ে যায়। ক্রমশ রাত হল। ৯টার সময় খাবার এসে পড়ল। খাবার মানে একটা ভাতের ফ্যানের মতন সুপ, ওরা বলল বাকহুইট হচ্ছে খুব শক্ত দানার একরকম শস্য, গমেরই জাতভাই, তবে মানুষে আজকাল ওটা বড় একটা খায় না। — 'মধ্যযুগের জাপানে খুব খেত। আজকাল কষ্ট করে যোগাড় করতে হয়।' —তোশিও জানালেন সগর্বে। 'সেদ্ধ হতে পাঁচ ঘন্টা লাগে।'

—'প্রেশারকুকার নেই?'

—চাবুক মারলে যেমন কুঁকড়ে ওঠে মানুষে, তেমনি কুঁকড়ে গিয়ে তোশিও-নো বললেন, 'চাকলাবাকলাতি। মাদার ইণ্ডিয়ারও তো গ্রেট ট্রাডিশন আছে? তবে তুমি কি করে বারবার ট্রাডিশনকে অবমাননা করছ? শুনছ এরা কত কষ্ট করে বাকহুইট যোগাড় করে...সেটা কি প্রেশার কুকারে রাঁধবে বলে? ওটা কি মধ্যযুগের ট্রাডিশনাল বাসন? এখানে রান্নাবান্না সব হয় ৯০০ অব্দের নিয়মে। মেনু, রেসিপি সবকিছু ৯০০ অব্দের। তুমি সম্রাট হিরোহিতোর অতিথি!'

—ঐ সুপ বোলের পাশে দুটি ছোট ছোট নীলরঙের ডিম। 'আমাদের বাড়িতে সেই যে কাকে একবার বাসা বেঁধেছিল, নীল নীল ডিম পেড়েছিল, মনে আছে? দেখতে অনেকটা সেইরকম।' দাদামণি থামলেন।

—'কিসের ডিম ছিল ঐগুলো? কাগের? এঃ, ছি ছি!' বৌদি মুখ বিকৃত করেন।

—'কোয়েলের— কোয়েলের ডিম, নিদেনপক্ষে পঁচাত্তর বছরের পুরনো। ওখানে পঁচাত্তর কেন, দেড়শ বছর পর্যন্ত পুরনো ডিম পাওয়া যায়।

সেই ডিম ভেঙে গরম সুপে ফেলে গুলে দিতে হয়। মানে যার নাম চীনে রেস্তরাঁয় এগড্রপ সুপ। সেই সুপই প্রধান খাদ্য। এছাড়া এই বাকহুইটের তৈরি এক রকমের কেক, অখাদ্য (না-নোন্তা, না-মিষ্টি), আর সবশেষে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিষ্টিভাতের ডেলা, জলজ উদ্ভিদের সবুজ ফিতে দিয়ে বাঁধা। এই খাদ্য, সঙ্গে সাকে আছে অবশ্য। বুড়ি এসে হাঁটু মুড়ে বসে দোজো-দোমো করে সাকে খাওয়াল, জোবানের সেই মেয়েদের মতন কায়দা করেই। যত্নের অভাব নেই।

খেয়ে দেয়ে পরিষ্কার করে পাতা বিছানায় শুতে যাচ্ছি— (এখানে বিছানা অন্যরকমের, বালিশ আর দুখানা কম্বল, এক টাকা ভাড়া)। বুড়ো এসে হাঁ হাঁ করে আটকালে, হাতে একটা মস্ত তোয়ালে ধরিয়ে দিলে। কি ব্যাপার? তোয়ালে পেতে শোব?

—'শোবে না— আগে স্নান করতে হবে'— তানাবে হাসতে হাসতে বলে— 'সম্রাট হিরোহিতোর নিয়ম। ৯০০ অব্দে উনি আইন করে গেছেন এখানে যে-পথিকরা আসবে, আগে স্নান, তবে তাদের শোওয়া। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই নিয়ম।'

'বেশ।' স্নানের ঘরে চললাম। মস্ত বড় ঘর। তাতে পাশাপাশি চারটে ডেকচি মাটিতে বসান, জল ফুটছে। পাশে ঠাণ্ডা জলের বালতি, মগ সব আছে। একসঙ্গেই তিনজনের স্নান শুরু হল। স্নান করতে করতে মনে হল— জলটা কিসে ফুটছে? নিচে তো কৈ কোনও উনুন দেখছি না? তোশিওকে জিজ্ঞেস করতে তিনি মৃদু . সে বললেন— 'এখানে উনুন লাগে না।' আরেকটু হেসে তানাবে বলল- 'উনুন নেই বলেই তো রান্না হতে অত দেরি হলো?—

...'আর সব রান্নাই কেবল সেদ্ধ? দেখলে না? এটাই ট্রাডিশন।'

এরা কি ধাঁধা বলছে? এদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? উনুন নেই বলেই তো রান্না হতে অত দেরি হলো?—

নাঃ, জাপানী ঐতিহ্য আমার বাঙাল ব্রেনের পক্ষে বেশী সূক্ষ্ম।

—'উনুন নেই তবে জল ফুটছে কেমন করে?' তোশিও-তানাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাস্য বিনিময় করে—

—'ওই তো মজা! ৯০০ বছরের ঐতিহ্য!'

গা মুছতে মুছতে আমি চতুর্দিকে তাকাতে থাকি, কোন পাইপ?

নাঃ। ব্যাপার কি? গরম জলের রহস্য কিনারা হল না। ঘরে এসে শুয়ে পড়ে,

তোশিও রয়ে সয়ে বলল— 'আসলে এটা একটা আগ্নেয়গিরির গায়ে কিনা। ওই জলের পাত্রগুলো যে-ফাটলের ওপর বসান, তাতেই জল আপনি ফোটে। রান্নাও হয় ফাটলের ওপর পাত্র বসিয়ে। ওপাশে বড় মুখটা আছে, কাল সকালে যাব দেখতে। সেটা এখন একটা হ্রদ। কত রকমের পাখি আসে। অস্ট্রেলিয়ান পাখি, মঙ্গোলিয়ান পাখি, কোরিয়ান— প্যাসিফিক আইল্যাণ্ডের পাখি, বিউটিফুল দৃশ্য।'

আর পাখি! আর বিউটি! আমার প্রাণপাখি তো উড়ে গেছে। ভলক্যানর ওপরে শুয়ে শুয়ে চোখে ঘুম আসে? কিন্তু আমার বন্ধুদের ভয়ডর নেই। তারা নিশ্চিন্ত। তোশিও-তানাবের প্রচণ্ড নাক ডাকছে। তোশিওর সামুরাই স্টাইলে 'ঢ্যারারাম ঢ্যারারাম ঢ্যাম'...তানাবের চাষাড়ে স্টাইলে...'সাঁই গুড় গুড় সুঁই'। কেবল আমারই চোখে ঘুমের বদলে সর্ষেফুল।

পর দিন সকালে ওরা লেক দেখতে গেল। আমিও গেলুম। শান্ত নীল জল ভরা চমৎকার হ্রদ। কিন্তু হ্রদে একটিও পাখি নেই। পাখি কেন নেই? তোশিও ভুরু কুঁচকে খুব ভাবিত হয়ে পড়ল। 'ছেলেবেলা থেকে এখানে আসছি...জীবনে কখন এই হ্রদের পাখিহীন চেহারা দেখিনি। আশ্চর্য ব্যাপার!'

'আজকাল ইকোলজিক্যাল চেঞ্জের ফলে নানারকম অদল-বদল হচ্ছে'— আমার সায়েন্টিফিক সান্ত্বনাবাক্য থামিয়ে দিয়ে তোশিও বলে ওঠে...'ট্রাডিশন ওসব আধুনিক ইকোলজির ধার ধারে না। বুঝলে?'

এবার সবিনয়ে তানাবে বলতে গেল—'কিন্তু পাখিরা কি সেটা জানে?—'

—'অবশ্যই জানে। তারা শত শত বছর ধরে আসছে এখানে। এটা তাদেরও ট্রাডিশন। আশ্চর্য! এটা কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগছে না।' আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে তোশিও। ইতিমধ্যে আমাকে কেউ এক লক্ষ ইয়েন ঘুষ দিলেও আমি যে আর আগ্নেয়গিরির মাথায় বিশ্রামশালার আতিথ্য উপভোগ করতে পারব না— তাতে ট্রাডিশন থাকুক আর চুলোয় যাক— এ ব্যাপারটা আমি তানাবেকে বেশ প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি। ফলত, লাঞ্চের আগেই আমরা— প্রাকৃতিক শোভা ছেড়ে, ঘিঞ্জি শহরে নেমে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। সুজিকি রইল দুশ মাইল দূরে।

সেই রাত্রে আমাদের ইউয়াকি শহরে পরপর দুবার ভূমিকম্প হল। কেউই অবশ্য প্রাণে মরেনি, তবে এবার বুঝলাম কেন জাপানে কাগজের জানলা হয়, কাঠের বাড়ি হয়। কিছু তেমন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হল না।

ইউয়াকি ছেড়ে যাবার পালা এবার। তোশিও-তানাবে সজল চক্ষে স্টেশনে এল বিদায় দিতে। বার দু-তিন কোমর ভাঁজ করে, সামুরাইয়ের পবিত্র ডান হাত এবং বাঁ হাত বাড়িয়ে তোশিও আমার দুই হাত ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল— হাত আমার পুণ্য হয়ে গেল। ওদিকে চাষী তানাবের বিনয়নম্র কোমর ভাঁজ করা আর থামে না। 'কলকাতায় দেখা হবে'— ট্রেন ছেড়ে দিল।

টোকিওতে এসে পরদিনই রেডিওতে বড় খবর—

'হাজার বছর পরে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি সুজিকি জেগে উঠেছে। আগুন, পাথর, লাভা, উদ্‌গীরণ করছে, লাভাস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিলার নিচেকার গ্রামের মানুষেরা সব প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে, ইউয়াকি শহর উদ্বাস্তুতে ভরে গেছে...

খুবই দুঃখের কথা সম্রাট হিরোহিতোর প্রতিষ্ঠিত নশ বছরের প্রাচীন রাজকীয় ধর্মশালাটি, ও তার বৃদ্ধ সংরক্ষক দম্পতি এই অগ্ন্যুদ্গারে ধ্বংস হয়ে গেছে।'

দাদামণি দম নিতে থামলেন। চুরুটের লম্বা সাদা ছাইটা ঝেড়ে দিয়ে, বৌদির দিকে সস্নেহ নয়নে চেয়ে বললেন— 'এর পরেও কি তুমি বলবে, প্রেজেন্ট কেন আনিনি? নিজেকে যে ফেরত এনেছি এটাই একটা উপহারস্বরূপ হল না? তোরাই বল?'

আমরা আর বলব কি, আমরা ভয়ে চুপ। এরকম একটা খবর যেন কাগজে পড়েছি বলেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, পড়েছি। নির্ঘাত।

বৌদির পিঠের চাবিটা ঝনাৎ করে উঠল। বৌদি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন— 'পারও বটে! যত বাজে কথা। আসুক তোশিও-তানাবে। আমি ওদের জিজ্ঞেস করব জোবানটা বেশি ভয়ের জায়গা না সুজিকি। আর বউ শাসন? তার ব্যবস্থাও ঠিক করব। আসুক না তোমার সামুরাইরা এবার কলকাতাতে।'
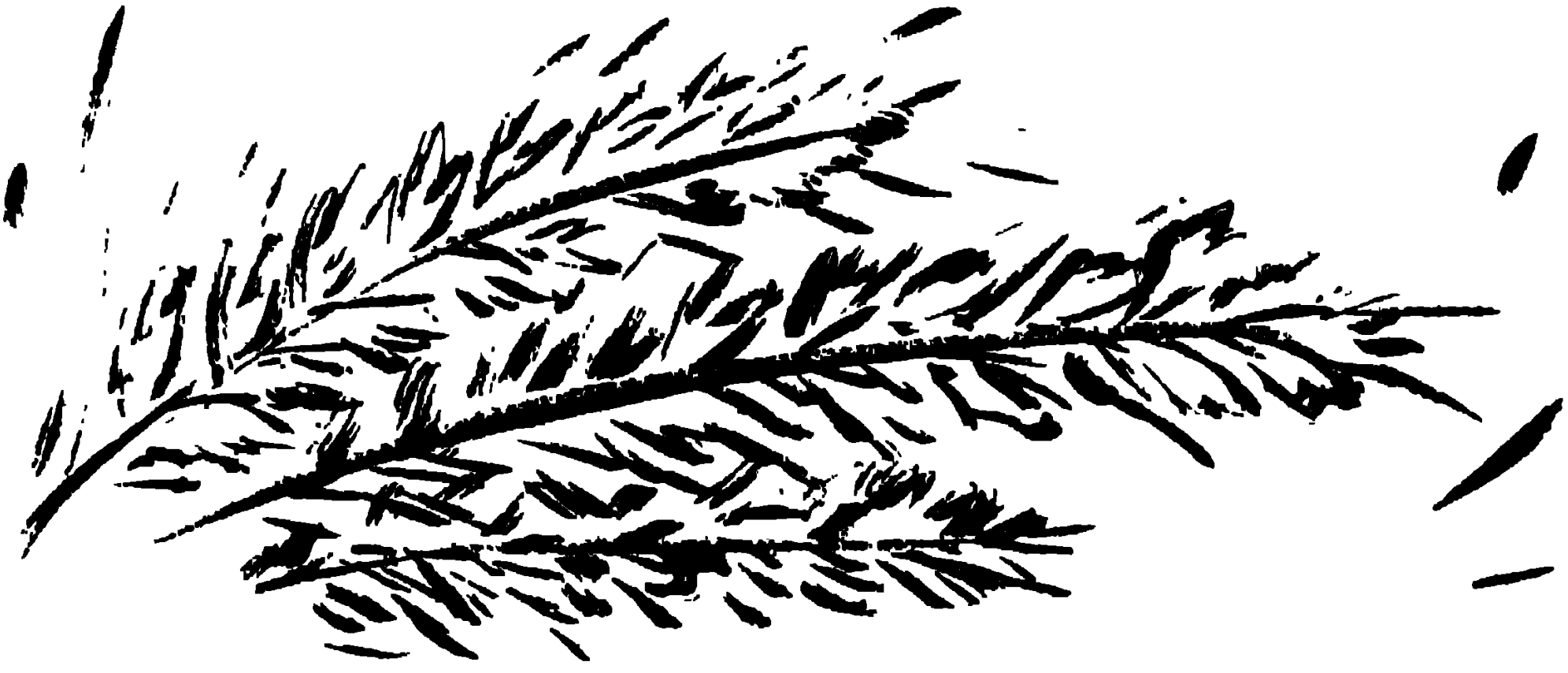
গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ

'সন্ধেবেলায় কে ডেকে নেয় তারে!'

আচ্ছা, তোর মনে আছে গীতু, সেই পাঠচক্রের সেশনটা? অশোকতরুর সেই মুখ নামিয়ে গান: 'ও আমার গোলাপবালা।' এখন তো অশোকতরু অন্য ঢঙে গান করেন। আর তোর মামাবাবুর বক্তৃতা হল সে-সেশনে, স্বপ্ন বিষয়ে সেই যেরে, যেখানে আমি আমার জলের স্বপ্নটার মানে জিগ্যেস করেছিলুম? উনিও খুলে বলবেন না, আমিও না জেনে ছাড়ব না। এখন তো মানেটা জানি, উঃ এত হাসি পায় সেদিনকার কথা ভাবলে! মামাবাবুকে কি মুশকিলেই ফেলেছিলাম। সত্যি, গীতু তোরা যে কি করে থাকিস গদাধরপুরে। ওখানে তো আর এরকম পাঠচক্র-টক্র হয় না। বক্তা পাবি কোথা, গাইয়েই বা কই? সভ্য-সমাজের বাইরে একটা কলেজ বসিয়েছে কি করতে কে জানে। ওখানে লাইফ বলতে তো কিছুই নেই। থিয়েটার তো নেইই, ভাল সিনেমাও নিশ্চয় যায় না, এগজিবিশন কি কনসার্টের তো প্রশ্নই ওঠে না, তেমন একটা রেস্তরা কিংবা দোকানপাট পর্যন্ত নেই। কি করে আছিস বলতো? কি নিয়ে থাকিস? প্রেম-ট্রেমও তো হয় না অমন মফস্বলের মধ্যে। সবাই নিশ্চয় চোখ পাকিয়ে আছে। একগাদা মেয়ে-মাস্টার মিলে হস্টেলে থাকা, দেখিস বাবু, সাবধান, শেষটা লেসবস বানিয়ে ফেলিস না গদাধরপুরটাকে। এত প্রায় জেলে থাকার মতনই কিনা। ফ্রিডম বলে নেই কিচ্ছু। আচ্ছা, কি করিস রে তোরা ছুটির দিনে? কিংবা সন্ধেবেলায়? নদীর ধারটা পুরনো হয় না? কাছাকাছি কোনো প্রপার শহর আছে? গাড়ি করে ঘুরে আসা যায়? গাড়িও নেই? কেন, কলেজের স্টাফ-কারে যাবি। তাও নেই? আশ্চর্য! যেমন জায়গা, তেমনি কলেজ! কি করতে যে আছিস ওই অজ পাড়াগাঁয়ে। কি করেই বা আছিস অই অজ গাঁয়ে, চিরকাল শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় বাস করে? বোরিং লাগে না। বিয়েটিয়ের তো নামও করিস না। লাগিয়ে দিই একটা সম্বন্ধ? আমার এক ভাশুর ফিরছেন বিদেশ থেকে, একটু বয়স্থা এডুকেটেড মেয়ে চান, নিজেও বহুকাল অ্যাকাডেমিক লাইনেই ছিলেন। তোর সঙ্গে বেশ মানাবে। না মশাই, অত মুচকি হাসির কিছুই নেই। বত্রিশ তো পার হলে, এরপর আর

কবে বিয়েটা করবে শুনি? চিরটাকাল কেবল গেঁয়ো গাধাগুলোকে পিটিয়ে গরু বানালেই চলবে? গদাধরপুরে মানুষ থাকে! ওটা কি এটা লাইফ হলো গীতু?

লাইফটা কি রকম বদলে গেল দ্যাখ। একসঙ্গে পড়তে পড়তে কত স্বপ্ন, কত প্ল্যান—, তারপরে আমি শ্বশুরবাড়ি, আর তুই গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ। কোথায় গেল লেখক হওয়া, কোথায় গেল নাটক করার স্বপ্ন। একদিক থেকে দেখলে অবশ্য তুই মন্দ নেই। বেশ ঝাড়া হাত পা। আমি? এটা ভাল থাকা হল? ঘরসংসার ছেলেপুলে নিয়ে ন্যাতা-জোবড়া হয়েই কাটল দশটা বছর। একদম গবেট হয়ে গেছি। কে বলবে একদিন ডিবেটিং চ্যাম্পিয়ান ছিলুম। এখন যা কিছু ডিবেট সব আয়া বাবুর্চির সঙ্গে। কর্তা? হুঁ, তা হলেই হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে কোথায়, যে ডিবেট করব? তিনি তো এই অফিস, এই ফ্যাক্টরি, এই ট্যুরে যাওয়া, অমুক পার্টিকে মিট করতে গ্র্যাণ্ড হোটেলে লাঞ্চ, তমুক পার্টিতে মিট করতে স্যাটারডে ক্লাবে ডিনার— এই কম্মই করে বেড়াচ্ছেন দশ বছর ননস্টপ। বউয়ের সঙ্গে বসে বসে ডিবেট করবার মতন তাঁর অত সময় নেই ভাই। দিনরাত ছোটাছুটি। একটু যদি বিশ্রাম পান, — তো সে ক্লাবে। বউয়ের আঁচল ধরা হলে কেউ জীবনে উন্নতি করে না, বুঝলে? কেন আমার জন্যে তো আয়া আছে ড্রাইভার আছে খানসামা আছে মালী বাবুর্চি ঠাকুর চাকরের ঘোর বৃন্দাবন একেবারে। আবার একটি কর্তাও চাই? সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না? একেই তো আমার বলে কত ফ্রিডম। যখন খুশি বেরোও, যেখানে খুশি যাও, যা খুশি কেনাকাটা কর, শ্বশুর শাশুড়ি— দেওর-ননদ কেউ ঘাড়ে নেই, যে-যার সে-তার। সবরকম সুযোগ সুবিধা রয়েছে, হাই সোসাইটির কনেকশনস রয়েছে, কত নেমন্তন্ন, কত পার্টি। আমার মুখে নালিশ শোভা পায় না ভাই। পায়? তুইই বল। ব্যাপারটা কি জানিস, ছোটবেলায় পড়েছিলি না, দোয়াত আছে, কালি নেই? আমার সংসারটা হচ্ছে ঠিক তাই। হাসছিস? ছাই বর্তে যেতে, তুমি আমার জীবন পেলে। জানিস না তাই বলছিস। সেই চিরাচরিত গল্প আর কি— এ সকল ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে বউদের হয় কোনো প্রেমিক যোগাড় করে পালিয়ে যাওয়া, নয়ত ভাগ্নে-টাগ্নে কিংবা ড্রাইভার-ট্রাইভারের সঙ্গে লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম করা। গল্পের বইতে তাই করে। যারা এসব কম্ম পারে না, তারা চার ইঞ্চি ঝুলের জামা পড়ে ফ্রেঞ্চ শিফন শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত তুলে লেসের রুমালে নাক চেপে হপ্তায় একদিন বন্যাত্রাণে কিংবা কুষ্ঠাশ্রমে বেড়াতে যায়, আর বাকি ছদিন ধরে তারই জন্যে দুবেলা মিটিংবাজী করে পার্ক হোটেলে। আর বাকিরা হয় দুপুরবেলা ক্লাবে গিয়ে অন্য গিন্নিদের সঙ্গে তাস খেলে আর জিন খায়, নয়ত আমার মতন খুঁজে খুঁজে পুরনো বন্ধুদের বের করে, ভুতিয়ে পাতিয়ে আড্ডা দিয়ে সময় ভরাতে চায়। আজকাল অবশ্য 'বুটীক' খোলার একটা রেওয়াজ হয়েছে, উপরি রোজগারও, সময়টাও কাটে।

— সময় যে আর ফুরোতে চায় না। বাচ্চারা তিনজনেই দার্জিলিঙের ইসকুলে আছে। এখানে কি রেগুলার পড়াশুনো হয়? আজ বনধ, কাল স্ট্রাইক। ওইখানে থাকলে ডিস্টার্বেন্স হবে না। তাছাড়া উনি বলেন হস্টেলে থাকলে নিজেরটা নিজে করতে

শিখবে। আমি যে এদিকে কি করি, গান? হ্যাঁ, আবার একটু আধটু ধরেছি ওটা— একটা স্পেশাল ক্লাসে জয়েন করেছি। নারে, পিয়ানোটা ছেড়েই দিয়েছি। ওটা তো কোনওদিনও তেমন ভাল লাগত না। কেবল চালিয়াতির জন্যে শেখা। ভালবেসে আর স্কুলে পিয়ানো নেয় কজন? তোর সেতারের কথাটা একদম আলাদা। সেতার হল তোর প্রাণ। তাও কি আর এতদিন থাকত, যদি বিয়ে-থা করে সংসার পেতে বসতিস? নেহাত বনে-বাদাড়ে পড়ে আছিস, আর একা-একাটি আছিস, তাই এখনও সেতারটা বজায় রাখতে পেরেছিস। ভাগ্যিস তোর রেডিও প্রোগ্রামগুলো থাকে, তাই তো তবু কলকাতায় আসিস। নইলে কে আর পারত বল গদাধরপুরে গিয়ে গিয়ে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ টিকিয়ে রাখতে? অমন একটা গডফরসেকন প্লেস! রেডিও? অ্যাবসার্ড কথা বলিস না। আমি গাইব কি? আমার গান কি লোকসমাজে বের করবার মতন? ওই সময় কাটাতে নিজের মনের যা একটু গুনগুন করা। তোমার সেতারের সঙ্গে তার তুলনা হয়? আমি তো ভাই কোনওদিনই অরিন্দমদের মতন গাইতে পারতুম না।

আচ্ছা, তোর অরিন্দমের কথা মনে পড়ে, গীতু? সত্যি কি গলাই ছিল ছেলেটার, না রে? এখন তো আর রেডিওতে প্রোগ্রাম করে না। অত বড় পোস্টে কাজ করছে, আই. টি. সিতে বুরোক্র্যাট হয়ে গেছে। পুরোপুরি বক্সওয়ালা বড়সাহেব। আমার কর্তা যেমন। অথচ দ্যাখ অরিন্দমের চেয়ে কত নিরেস গাইতেন উমাদি, অরিন্দম যখন এ-ক্লাস আর্টিস্ট, উমাদি তখন বি-তে। চর্চার গুণে সেই উমাদিরও এল. পি. বেরিয়ে গেল।

গানের লাইনটা যে ছেড়ে দিল অরিন্দম। জুনিয়র এক্সিকিউটিভ পরীক্ষায় অত ভাল রেজাল্ট করল কিনা। এখন তো সিনিয়র এক্সিকিউটিভ। ভাল চাকরিটা পেয়েই মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল ওর। হাসছিস তুই? ভাল চাকরি পেলে বুঝি লোকেদের ক্ষতি হয় না? খুব হয়। কত যে ক্ষতি হয়, তা যার ভাল চাকরি নেই, সে কখনও বুঝবে না। বেকারি যেমন, বড় চাকরিও তেমনি। কি করে যে মানুষকে নষ্ট করে ফ্যালে তা তো দেখতে পাও না। সে অন্যরকম সর্বনাশ। অরিন্দম যদি ওই চাকরিটা না পেত, আমি ঠিক জানি এখন মস্ত বড় গাইয়ে হত। কোনটা বেশি ভাল হত ভাব?

—গীতু, তোর মনে আছে, সেবার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে উমাদি আর অরিন্দমের গান— 'সোনার হরিণ চাই?' অপূর্ব হয়েছিল। না?

অরিন্দমের 'চিরসখা' তোর মনে পড়ে না, গীতু? উমাদির বোধহয় অরিন্দমের প্রতি একটা উইকনেস ছিল— উমাদির সেই 'বন্ধু রহো রহো সাথে' আমি কোনও দিনই ভুলব না। আমাদের সেই হেঁটে হেঁটে ফেরা, সায়েন্স কলেজ থেকে অরিন্দমকে তুলে নিয়ে সন্ধেবেলায়, বালিগঞ্জের ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে, পাঠচক্রের রিহার্সালের পরে? মনে পড়ে গীতু? কী করে হাঁটতুম রে অত? চৌরঙ্গীতে এসে, ট্রাম ধরে শ্যামবাজার। এখন তো একদম হাঁটতেই পারি না। তুই এখনও পারিস? তুই যে রোগা আছিস। তাই। আচ্ছা, আমরা দুজনেই অরিন্দমের গান অত ভালবাসতুম অথচ কোনও হিংসেহিংসি তো ছিল না? রেজাল্ট বেরুনোর পরে গঙ্গার ধারে সেই সন্ধেটা মনে পড়ে? অরিন্দমের

'আমার এ-পথ' গাওয়া, আর তোর-আমার কান্না? মনে পড়ে, তোর কি রাগ আমার ওপরে, অরিন্দমকে যখন আমি 'না' বললুম? আচ্ছা, তুই অত ক্ষেপে গেলি কেন বলতো? কী আশ্চর্য একটা বন্ধুতা হয়েছিল আমাদের তিনজনের। বেচারী উমাদি আমাদের তিনজনকেই হিংসে করতেন। উঃ। আবার সেই পুরনো প্রশ্ন? অন্তত দুশবার তো তোকে বলেছি কেন অরিন্দমকে 'না' বললুম। তোমার অত ইচ্ছে ছিল তো তুমি নিজেই কেন বিয়ে করলে না বাপু তাকে? বাঃ। আমাদের 'জুড়ি মিলেছিল' না ছাই। তোর ওটা ফিক্সেশন। এই দশ বছর বাদেও একই কথা বলবি? কেন ওকে বিয়ে করলুম না? — কেন আবার। আমার ব্যারিস্টার বাবাটি অমন কেরানী বাপের গাইয়ে-ছেলেকে পাত্র বলেই মানতেন না, — আমাদের সঙ্গে ওদের বাড়ির অবস্থা মিলত না। আমি একভাবে মানুষ. ওরা অন্যভাবে। তখনও তো আর ঐ পরীক্ষাটা দেয়নি ও। কি করে জানব বল যে দুটো বছর যেতে-না-যেতেই অরিন্দমের এতখানি অবস্থা পালটাবে? যখন ও চাকরিটা পেল, ততদিনে তো আমার বিয়ে হয়েই গেছে। অরিন্দম কিন্তু মাত্র গেল বছরে বিয়ে করল। দিল্লিতে। পাঞ্জাবি বউ। শুনেছি নাকি খুব সুন্দরী। তুই দেখেছিস? না, আমিও দেখিনি। অরিন্দমকেই দেখিনি। সেই আমার বিয়ের রাত্তিরেই শেষ সাক্ষাৎ। ও কখনও আমাদের বাড়িতে আসেনি। আমার কর্তাকে তো মিটই করেনি। করলে অবশ্য জমত ভাল। কথাটা কি জানিস? ও যদি গানই ছেড়ে দিল, তাহলে ওকে বিয়ে করলেই বা কি তফাতটা হত? এই একই হত। আমার কর্তারও যেমনি, অরিন্দমেরও নির্ঘাত তেমনি—অফিস, ফ্যাক্টরি, লাঞ্চ, ডিনার, ট্যুর প্রোগ্রাম, ক্লাব, ককটেল। দেখতিস ঠিক সেই একই লাইফ হত আমার। বরং কষ্ট আরেকটু বাড়ত। কেবলই মনে হত: গান ছিল, গান নেই। একটা বুরোক্র্যাটের সঙ্গে আরেকটার তফাত একখানা কাস্টম-মেড-মার্সিডিজ গাড়ির সঙ্গে আরকখানার যা— অর্থাৎ শূন্য, নিল।

— ধেৎ, সম্মান করব না কেন? নিজের স্বামী বলে কথা! সম্মান-টম্মান সবই করি. তবে কি জানিস, ওদের ওই জান-প্রাণ দিয়ে কেরিয়ার গড়াটাতে কেমন যেন ঘেন্না ধরে গেছে ভাই। ওদের এয়ারকনডিশনড অফিসের চেয়ার টেবিলগুলো যেমন ফ্যাশনেবল আর কমফরটেবল. ওদের লাইফগুলো তাই-— আর লোকগুলোও সব এক জাতের।

একটাকে চিনলেই সবগুলোকে চেনা হয়ে যায়। যাই তো ক্লাবে। সবক'টা এক! সব ছাঁচে-ডালা মানুষ রে। অরিন্দমের চাকরিটা তো ঐ ছাঁচের, সেও অমনিই হয়ে গেছে নিশ্চয়। এই আমার কর্তার মতই। গান-টান তো আর কোথাওই গাইতে শুনি না। ওর বউটার জীবনও আর দশ বছর বাদে ঠিক এই শ্রীমতীর মতই হবে. তাকেও কলেজ-ফ্রেনডদের খুঁজতে বেরুতে হবে দেখিস। হ্যাঁ, তা যা বলেছিস। যদি দশ বছর টেকে! আজকাল তো এইরকমই হাল হয়েছে। এদের সেই সোসাইটিটাই তেমনি। রুনুর লাইফটা কি হয়ে গেল দ্যাখ। সত্যি ভারি স্যাড। জয়ন্তী আবার বিয়ে করে ফেলেছে, এখন মিসেস মেহেরা হয়েছে। রুনুটা ওরকম পারবে বলে মনে হয় না। ও বি.এ পড়তে ভর্তি হয়েছে শুনলুম।

হ্যাঁরে গীতু, তোদের ওখানে ফিলসফিতে কোনও ভেকেন্সি নেই। আমি কিন্তু ইন্টারেস্টেড। বাচ্চাদের তো দার্জিলিঙে পাঠিয়েছি, এখন আমার কাছে আলিপুরও যা, গদাধরপুরও তাই। এটা কি একটা লাইফ হল? হয় ভীষণ হেকটিক, আর নয়ত বোরিং। বরং তোদের ওখানটাই বেশি রিফ্রেশিং হবে। আমার বায়োডাটা তো তুই জানিস গীতু। সত্যি একটু খোঁজ নিবি, গিয়েই? 'সিরিয়াসলি বলছি।' কি আশ্চর্য, হাসছিস? ওহ, কর্তার কথা ছাড়। তাঁর বেয়ারা বাবুর্চি সবাই আছে। আমি তো একটা ফাউ। কর্তা বোধ হয় টেরও পাবেন না মেমসাহেব কলকাত্তা মে, ইয়া গদাধরপুর মে! একমাত্র পার্টি দেবার সময় ছাড়া। বাজে কথা রাখ। আরেকটু কফি নে। এটা নতুন পারকোলেটর— ভাল কফি বানায়, না? ফ্রান্সের এক সাহেব দিয়েছেন কর্তাকে। শোন, সত্যি রে, ফিলসফিতে একটা চান্স হয় না তোদের গদাধরপুর উইমেন্স কলেজে? কি বললি? ওখানে বড় মশা? টিকতে পারব না? — তুইও আমাকে ঠাট্টা করছিস, গীতু?

প্রজেক্ট চর্মচটিকা

আর যাই করুন আপনারা, খবর্দার চামচিকে পুষবেন না। চামচিকেরা বড্ড দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া, বিশ্বাসঘাতক, অবিমৃষ্যকারী, নেমকহারাম, স্বার্থকেন্দ্রিক, কৃতঘ্ন এবং কুপোষ্য প্রাণী। একেই তো ইঁদুর না পাখি তার নেই ঠিক। দিব্যি চকচক করে মায়ের দুধ খায় আবার কুচকুচ করে ফলটল খায় দাঁত বসিয়ে। ওদিকে পালক-টালকহীন চামড়ার ন্যাড়া ডানা মেলে চটাং চটাং করে উড়ে বেড়ায় আমাদের মাথার ওপরে। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, কোনটারই জাতকুলের বিচার হয় না। চামচিকের চেয়ে তিমি মাছ পোষাও ঢের ভাল। এইজন্যেই তো তিমি সংরক্ষণের একটি সমিতি আছে পৃথিবীতে, কিন্তু চামচিকের জন্য নেই। এবং না থাকাটাই উচিত। মানুষের কত মমতা সুন্দরবনে 'প্রজেক্ট টাইগার' পর্যন্ত আছে, ব্যাঘ্র-সংরক্ষণ সমিতি। (অথচ বাঘেরা কেউ কেউ যখন 'প্রজেক্ট ম্যান' গড়ে তোলে...তাদের উদ্দেশ্য 'মনুষ্য সংরক্ষণ' হয় না)। মানুষের বুকে অশেষ মমতা।

একবার ওই মমতা পরবশ হয়েই আমাদের বাড়িতে 'প্রজেক্ট চর্মচটিকা' অর্থাৎ চামচিকে সংরক্ষণ সমিতি খোলা হয়েছিল। ('চর্মচটিকা' মানে কিন্তু 'চামড়ার চটি' নয়। কেন যে নয়, তা আমিও বুঝি না)। ওয়ানম্যান কমিশন। অর্থাৎ আমিই চেয়ারম্যান, আমিই মেম্বার, আমিই সেক্রেটারি। আজ আপনাদের কাছে সেই সমিতিরই কার্যনির্বাহের ধারাবিবরণী পেশ করছি। উদ্দেশ্য, জগৎবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া: চামচিকে হইতে সাবধান। মমতা করতে গেলেই ওরা আপনাকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করে ছেড়ে দেবে। ওঃ! কি বিপদেই ফেলেছিল আমাকে। যেমন বাড়িতে, তেমনি কলেজে...প্রাণ ওষ্ঠাগত করেছিল ওই চামচিকে। বেশ ক'বছর আগের কথা, কিন্তু এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

আমার দোষ, আমি মাঝে মাঝে এধারে ওধারে চামচিকে কুড়িয়ে পাই। ভদ্রলোকেরা পথেঘাটে কি কি জিনিস কুড়িয়ে পান? হয় বেশ গাব্দাগোব্দা বাঘসিংগির বাচ্চা, এলসা কি খৈরির মতন, নইলে রোগা মিষ্টি পাখির ছানা-টানা, কিংবা অসহায়া অবলা নারী, নিদেনপক্ষে মনিব্যাগট্যাগ। আর আমি কি কি কুড়িয়ে পাই? ...বাসা-ভাঙা কাগের ছানা,

খসে-পড়া চামচিকের বাচ্চা, গাড়ি চাপা-পড়া খোঁড়া বেড়াল, পিচুটি পড়া, লোম-ওঠা, টেকো কুকুরছানা। একবার অবিশ্যি ইয়া মোটা ল্যাজওলা একটা কাঠবিড়ালি ছানাও পেয়েছিলুম। সে মাত্র একটিবারই। কিন্তু চামচিকে? দু-দুবার। দু'জায়গায়। দু-দুটো ছানা-চামচিকে এত জায়গা থাকতে ঠিক আমারই পায়ের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধুলোয় লুটোপুটি খায় কেন? প্রথমটাকে পেলুম কলেজ যাবার পথে, বাস স্টপে বকুলতলায়। প্রথমে ভেবেছি ধুলো কাদামাখা একটা ছেঁড়া বেলুনের টুকরো বুঝি, বাতাসে নড়াচড়া করছে। হঠাৎ দেখি, না তো? এ তো বাতাসে নড়া নয়। এ অন্যরকম নড়াচড়া। তখন নিচু হয়ে বসে দেখি...ও মা! ইনি যে মিনি-চামচিকে। ইঞ্চি খানেকের মধ্যেই তার ছোট্ট ছোট্ট মুণ্ডু, ধড, ডানা, থাবা সব কিন্তু আছে, মায় নখ সুদ্ধু। আহাহা, তাকে কুড়িয়ে না নিয়ে পারে কেউ? বেচারা জ্যান্ত যে! এক্ষুনি পথের কুকুর-বেড়ালের ফুচকা-ভেলপুরিতে পরিণত হবে। কি করি? অগত্যা কলেজ যাওয়া স্থগিত রইল, জীবে দয়া করা নিশ্চয় বেশি জরুরি। রুমালে জড়িয়ে বেচারা চামচিকে শাবকটিকে সযত্নে বাড়িতে নিয়ে এলুম। পরদিন, বললে বিশ্বাস করবেন না, আমাদের হলদে ঘরের কোণে (আমাদের বাড়িতে ঘরগুলোর নাম রাখা হয়েছে মেঝের রং-এর নামে: হলুদ ঘর, লাল ঘর, সবুজ ঘর ইত্যাদি)। আলনার পাশে বাবার জুতোর মধ্যে রহস্যজনকভাবে দ্বিতীয় চর্মচটিকার আবির্ভাব ঘটল। দেখতে পেলুম কিন্তু আমিই আগে। বাবা জুতোয় পা-টি একবার ঢোকালে তাঁর এবং চামচিকে শিশুর কি যে দশা হত, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়। ঘরের ভেতরে যে কোত্থেকে চামচিকের ছানা এল, তা কেউ জানে না। ঘুলঘুলিতে তো চড়াই গিন্নির চাঁদের হাট। তাঁদের কিচিমিচটিতে সদাই ঘর মুখরিত। কিন্তু এটা কোত্থেকে এল? কে আনল?

গোলমালটা বাধল খাওয়ানো নিয়ে। এরা কি সোজা পুষ্যি, চর্মচটিকা বলে কথা। এ কি আপনার বাঘ সিংগি পেয়েছেন যে 'আঃ আঃ তুউউ'...করলেই ল্যাজ নাড়তে নাড়তে দৌড়ে আসবে, হাত থেকে দুধুভাতু খাবে? নো স্যার! এরা খাস ভ্যাম্পায়ারের ডিরেক্ট বংশধর, এদের পোষ মানাবে কার সাধ্যি? এত তো সার্কাস দ্যাখেন, চামচিকের সার্কাস কেউ দেখেছেন কখনও? হুঁ বাবা, সেটি পাবেন না। লায়নটেমার হয়, গোখরো সাপ পর্যন্ত দাঁত না ভেঙে খেলানো যায়, কিন্তু চামচিকে-টেমারের কথা কেউ শুনেছে? তিমি মাছ পোষা কি সোজা? চামচিকেও ঠিক তিমি মাছের মত। কেন? কেননা তিমিও ম্যামাল, চামচিকেও তাই। তিমিও অবসেশনগ্রস্ত ঘোর মানসিক রুগী, ভুল করে নিজেকে মাছ বলে ভাবে অথচ মোটেই মাছ নয় সে, তবু জোর করে জলে বাস করে, এবং সমুদ্রে সাঁতার কেটে বেড়ায়। চামচিকে বেচারিও অবসেশনগ্রস্ত প্রবল মানসিক রুগী, মনে মনে নিজেকে পাখি ভাবে, যদিও সে পাখি নয়, ডিম পাড়ে না, পালক পর্যন্ত নেই, তবুও জোর করে হাত দুটোকে ডানা বানিয়ে উড়ে বেড়াবেই। তিমি যেন হাফ-জলহস্তী হাফ-মাছ, চামচিকে যেন হাফ-পাখি হাফ-ইঁদুর। বককচ্ছপের মত, জীবজগতে এভলিউশনের মাঝ রাস্তায় ওরা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির করুণ শিকার। ইঁদুরও ওদের

আপনার ভাবে না, পাখিও না। ওদিকে তিমি আর চামচিকে যে স্বজাতি-স্বঘর সে কথাই বা ওদের কে বোঝাবে? ওদের নিজেদেরই জ্ঞাতগোত্র কিচ্ছু খেয়াল নেই। ম্যামাল হিসেবে দুজনেরই হওয়া উচিত স্থলচর প্রাণী, কিন্তু মনের ভুলে একজন জলচর আরেক জন খেচর হয়ে গেছে। হয়ে কিন্তু দিব্যি সুখেই আছে। এহেন বেয়াড়া জন্তু পোষা কি মুখের কথা? অবশ্য ক্যালিফোর্নিয়ার মেরিনল্যাণ্ডে দুটো পোষা ক্ষুদে জাতের মিনি-তিমি আছে, শুশুকদের সঙ্গে মিশে মিশে ওরাও আজকাল খেলা দেখায়। কিন্তু কোনও ওয়ানডারল্যাণ্ডেই চামচিকের খেলা দেখানো হয়নি। আমি সেই চামচিকে পুষতে গিয়েই অত কষ্ট পেলুম। হ্যাঁ, আপনারা আমাকে বলতে পারেন...'কেনই বা পুষতে গেলেন? কেউ কি আপনাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল, লক্ষ্মীটি, যাও তো একটু চামচিকে পোষো গে, নইলে কিন্তু মনে ভীষণ দুঃখ পাব? নাকি কেউ আপনাকে অভিশাপ দিয়েছিল— অনুতাপে দগ্ধ হবি, চামচিকে পুষে মরবি?' কেউ না। কেউ না। দায়টা সব আমারই। অমন কচি নধর কালো-কালো দুটি ডানাযুক্ত ইঁদুরছানা, ঠিক যেন রবারের তৈরি পুতুল, কুড়িয়ে পেলে আপনিও না পুষে পারতেন না। ওরা অত কালো কুচ্ছিত বলেই, যেন ওদের ওপর বড্ড মায়া পড়ে যায়। যেমন মায়া পড়েছিল আমার ওই কাগের ছানাগুলোর ওপরে। উঃ, কি কুচ্ছিত। কি কুচ্ছিত। সাধে কি ওদের বাবা-মা ওদের বাসা থেকে ফেলে দিয়েছিল?

মায়া মানেই পোষা। পোষা মানেই পরিশ্রম। উপরন্তু মায়ের বকুনি। যেমন ধরুন...প্রথম দিন প্রথম বাচ্চাটাকে আনার পরে। যেহেতু সে তখন একেবারেই কচি বাচ্চা, চুমুক দিয়ে খেতে জানে না...চুমুক দেবেই বা কিসে? সমগ্র জীবটিই তো আমাদের হাতের কড়ে আঙুলের সমান। অতএব মানুষ বাচ্চার বোতলে ওদের দুধ খাবার প্রশ্ন নেই। নিপলটাই ওর দেহের সমান বড়। তাই আমি একটা চায়ের প্লেটে অল্প দুধ ভাল করে ছেঁকে ঢেলে, নরম গোলাপী তুলোর সলতে পাকিয়ে সেই সরু সলতে ওই দুধে ভিজিয়ে নিয়েছি, তারপর ফর্সা রুমাল দিয়ে কুচকুচে এবং কিঁচকিঁচে চামচিকের বাচ্চাকে সাবধানে চেপে ধরে সেই দুধের সলতে তার ক্ষুদে মুখখানার চারপাশে একমনে বুলিয়ে যাচ্ছি ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছানর মত...কেননা শ্রীমুখখানি তাঁর এতই ক্ষুদ্র এবং এমন ঘোর কাল যে খাবার ফুটোটি অর্থাৎ হাঁ-টি যে কোন অঞ্চলে অবস্থিত তাই আবিষ্কার করতে পারিনি। এক সময়ে কাল আলপিনের মাথার মত দুটি চকচকে বিন্দু আমার নজরে এল। আন্দাজ করলুম ঐ দুটো হল চোখ। সেক্ষেত্রে হাঁ-টা হবে একটু নিচে, মাঝামাঝি। কিন্তু নাকের ফুটো কৈ? এই পরম দুর্ভাবনার মুহূর্তে যখন শত চেষ্টাতেও দুধের সলতে প্লাস চামচিকের হাঁ-য়ের সংযোগ ঘটাতে পারছি না...সেই দুঃসময়ে পান চিবুতে চিবুতে মা-জননীর অকুস্থলে আবির্ভাব।

— খুকু, ওখানে কি কচ্চিস রে? কলেজ যাসনি?

— না মা। এই চামচিকে...

— সে কিরে। কলেজ না গিয়ে চামচিকে নিয়ে খেলা করছিস?

— খেলা নয় মা, খাওয়াচ্ছি।

— এঃ হে, ম্যাগোঃ, ওই খাবার টেবিলেও চামচিকে তুলেছিস নাকি? ওটা না আমাদের খাবার জায়গা? থুকু।

— খাবারই তো খাচ্ছে।

— খাবারই তো খাচ্ছেন? ঐ বিশ্রী ময়লা রাস্তার চামচিকেটাকে নিয়ে একেবারে খাবার টেবিলে? ওরে, তোর কি ঘেন্নাপিত্তি নেই?

— এতে ঘেন্নার কি আছে মা? খাচ্ছে তো দুধ...

— আবার দুধ নষ্ট করা হচ্ছে?

— বা, দুধ না দিলে হয়? ও ও-তো ম্যামাল, আমাদেরই স্বজাতি...

— দূর দূর! আমার স্বজাতি কক্ষনও নয় চামচিকে! (মা ঝনঝনিয়ে দুহাত নাড়েন বিরক্তিতে চুড়ি বাজিয়ে) তোর স্বজাতি অবিশ্যি হতেই পারে। যেমন তোমার রুচি বুদ্ধি...

বেগতিক বুঝে আমি সুর পালটে ফেলি।

— দ্যাখ না চেয়ে মা, আহা বেচারি কত্তটুকুনি প্রা... খটোকও ফোটেনি বোধহয়। দুধের সলতেটা পর্যন্ত দেখতেই পাচ্ছে না...

চোখ কি তোমারই ফুটেছে মা? দুধের গেলাসটা কি তুমিই কখন দেখতে পাও? তাছাড়া দৃষ্টি থাকলে কি কেউ ঐরকম বিচ্ছিরি কুচ্ছিরি জিনিসটাকে ঘরে এনে তোলে? গুণনিধি। গুণনিধি...। শিগগির টেবিল ক্লথটা ডেটলে কেচে দাও, আর এই নোংরা জন্তুটাকে নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এস। ছি ছি ছি...

এবার আমার রাগ হয়ে যায়।

— কেন অমন ছি ছি করছ মা? নোংরা জন্তু মোটেও নয়...মন্দিরের ভেতরেই তো ওরা বাসা বেঁধে বাস করে। দেখলুম না আমরা? রামেশ্বর, মাদুরা, পুরী, ভুবনেশ্বর, সব জায়গায়। ঠাকুরের পাশেই থাকে ওরা। ওদের তো কেউ তাড়িয়ে দেয় না? অথচ তুমি কেন...

— তাই থাকুক না বাবা, ঠাকুরের পাশে, পুরী-টুরীতে গিয়ে, এটা তো দেবমন্দির নয় মা, এটা মানুষের বাড়ি।

— এ বাড়ি বুঝি মন্দিরের চেয়ে বেশি পবিত্র? কেন তবে লোকে মন্দিরে শুদ্ধ বস্ত্রে যায়, জুতো খুলে ঢোকে? সেখানেও যদি চামচিকে অ্যালাউড হতে পারে, তবে তুমি কেন...

— এটা তো মন্দিরের মত অতটা পবিত্র ঠাঁই নয় বাছা যে ঝুলটুল ঝাড়া হবে না, চামচিকেরা বাসা বেঁধে ঝুলে থাকবে ছাদের গা থেকে? এ হল গেরস্তের সংসার—

ঐ যে। ঐ যে। আরে আরে। মা। মা। ধরেছে। ধরেছে। সলতে ধরেছে। এই যে সলতে এঁটে গিয়েছে মুণ্ডুতে—উঃফ কি বুদ্ধিমান।

— ঈশ! বুদ্ধিমান না আর কিছু। বলতে বলতেই মা প্লেটটা লক্ষ করে প্রায় কেঁদে

ফেললেন—

খুকু! ওটা আমার চায়ের কাপের পিরিচটা বলে মনে হচ্ছে না? ওরে— শেষটায় চামচিকের এঁটো বাসনে তোরা চা খাওয়াবি আমাকে?

এই তো অবস্থা বাড়িতে। পরের দৃশ্য কলেজে। ইতিমধ্যে নাম্বার-টুও এসেছেন। আমার রাস্তা থেকে তুলে আনা পুষ্যিদের খবরদারি রাগারাগি করতে-টরতে হলেও মা-ই করেন। কিন্তু চামচিকেদের বেলায় মাকে রাজী করানো মহা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। না, 'ওই নোংরা, কাল কুচ্ছিত, আর 'হিংস্রমূর্তি' টা যে কোথায় তা মাকে কে বোঝাবে। বাবা অবিশ্যি বার দুই আমার পক্ষ নিয়ে— 'আহা মেয়েটা অত করে বলছে' বলে বাক্য শুরু করেছিলেন, ঠাণ্ডা গলায় মা দুবারই— 'তাহলে তুমিই খাওয়াও না'— বলায় আর তৃতীয়বার মুখ খোলেননি। আমিই 'একা কুম্ভ' হয়ে ওদের রক্ষাকার্যে নেমেছি।

ছোট একটা বিস্কুটের টিনে খবরের কাগজ বিছিয়ে ওদের বাসা করে দিয়েছি। নিশ্বাস নেবার জন্যে ঢাকনিতে পেরেক ঠুকে ঝাঝরা করে তৈরি হয়েছে ঘুলঘুলি। তেমন কিছু ঝামেলা নেই, কেবল খিদে পেলেই উদ্দাম কিঁচকিঁচ শব্দ জুড়ে সারা বাড়ি মাথায় করে। অতটুকু শরীরে এত জোর গলা। মা কেবলই বলেনন— 'অতিষ্ঠ করে মারলে এগুলো। দেব একদিন টিনসুদ্ধ ডাস্টবিনে ফেলে। বাড়ি তো নয়, এমনিতেই একটা চিড়িয়াখানা এটা। কুকুর-বেড়াল-কাঠবেড়ালী, পালে পালে খরগোশ, ঝাঁকে ঝাঁকে লাল মাছ, খাঁচা খাঁচা চিনিয়া মুনিয়া বদ্রীগড়...বাবারে, এততেও মেয়ের আশ মিটল না, আবার চামচিকেও জুটল? এমনিতেই লোকে বলে বাড়িতে চিড়িয়াখানার গন্ধ। নাঃ, বাড়িখানা আর মানুষ বসতের যুগ্যি রইল না। একমাত্র সন্তান যেন জগতে কারুর আর হয়নি— এ তো গান্ধারীর সংসার হয়ে দাঁড়িয়েছে'— এক-একদিন সত্যি সত্যি চামচিকেগুলো ভয়ানক বিরক্ত করে— জানি না ওদের কি যে হয়, বড্ড বেশী চিকচিক করে। সেদিন মার মাথা ধরেছিল খুব, চামচিকেরা চেঁচানয় তা আব বেড়ে গেল। মা রেগেমেগে বললেন— 'যাক খুকু আজ কলেজে বেরিয়ে, দিচ্ছি তোমাদের বিদায় করে। গুণনিধি।'

ওই 'গুণনিধি' ডাকেই আমার বুকের ভেতর রক্ত শুকিয়ে গেল। আমি জানি এবার কি হবে। অস্থির হয়ে উঠলে মা ঐভাবে গুনিয়াভাইকে (আমাদের ঠাকুর, প্লাস ঝি, প্লাস নায়েব, প্লাস গার্জেন, প্লাস দারোয়ান, প্লাস জন্তুদের জমাদার, প্লাস জন্তুদের জল্লাদ) ডাকে। তার পরেই গুনিয়া আমার আনা খোঁড়া বেড়াল, প্যারালাইজড কুকুর ইত্যাদিকে রিকশা করে বন্দেল রোডে জন্তুদের হাসপাতালের উঠোনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে। শেষটায় এমন হল যে গুনিয়াভাইকে হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে দেখলেই ওখানকার ডাক্তার নার্স কম্পাউন্ডার জমাদার সকলে মিলে পেন্সিল, পেপারওয়েট, টুথব্রাশ, ঝাঁটা, লাঠি, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ— যে যা হাতে পায় তাই নিয়েই রৈ রৈ করে তেড়ে আসে...'সর্বনাশ। আবার কিছু রুগী ছাড়তে এসেছে রে!' এই বলে। কিন্তু চামচিকেদের কপালে বন্দেল রোড নেই। ওরা, বেশ বোঝা গেল, ডাস্টবিনেই যাবে,

অর্থাৎ কুকুর বেড়ালের পেটে। তা তো হতে দেওয়া যায় না। অগত্যা চামচিকের টিনটা ঝোলা ব্যাগে ভরে বইখাতার সঙ্গে কলেজে নিয়ে যাওয়াই নিরাপদ মনে করলুম। আলাদা একটা সিগারেটের টিনে রইল দুধে ভেজান এক ডজন তুলোর সলতে। ক্লাসের ফাঁকে এক সময় খাইয়ে আনব।

আমি কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম কৃষ্ণের জীব হয়ে ওরা এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবে? মানুষ ছাড়া আর কোনও পোষা প্রাণী যে কৃতঘ্ন হতে পারে, তা কে জানত।

খুব মন দিয়ে আমরা তখন ইয়োরোপের রোমান্টিক কবিতা বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করছি, হেনকালে ক্লাসের মধ্যে মৃদু কিঁচকিঁচ শব্দ।

স্যর এদিকে তাকান ওদিকে তাকান, চোখ সরু করে ঘুলঘুলির দিকে তাকান, কোনও হদিশ পান না। এদিকে কিঁচকিঁচ শব্দ আর মৃদু থাকছে না। ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়ে উঠল। স্যর এবার শব্দভেদী দৃষ্টি আমার দিকেই নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অথচ আমি তো ভেন্ট্রিলোকুইস্ট নই, শব্দটার উৎস স্পষ্টতই আমি জানি না। স্যরের জোড়া ভুরু যতই প্রশ্নচিহ্নের আকৃতি নিতে থাকে...চশমার নিচে, গোঁফের তলায়, আমার বন্ধুদের চোখ আর ঠোঁটগুলো ততই চাপা হাসিতে চকচক করতে থাকে। তারা তো জানে এ শব্দ-শৃঙ্গার উৎস কোথায়। চিকচিক্কারে অস্থির হয়ে ঠিক করলুম ক্লাসের শান্তি বিধানের জন্য ওদের একটু দুধ খাওয়ান দরকার। নিশ্চয় তাতে চুপ করবে। ক্লাসকে বড্ড ডিসটার্ব করছে ওরা। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সেকেণ্ড বেঞ্চে বসে আছি, দরকারি কাজটা সেখানে গোপনে সেরে নেওয়া কিছুই না। খুবই সোজা। প্রণালীটা এইরকম—(১) ঝোলা ব্যাগ থেকে সিগারেটের টিন বের করে (২) তা থেকে দুধে ভেজান তুলো রের করে (৩) ঝোলা ব্যাগ থেকে চামচিকের টিন বের করে (৪) একটি ঢাকনি ফাঁক করে (৫) তার ভেতরে ওই দুধের সলতেটা গুঁজে দিতে হবে। এখন ওরা নিজেরাই দিব্যি খেতে শিখেছে তুলো চুষে চুষে। খাইয়ে দিতে হয় না।

প্রথম কর্মটি, অর্থাৎ ঝোলা ব্যাগ থেকে সিগারেটের টিন বের করা, নির্বিঘ্নেই সমাধা হল স্যরের চোখের অন্তরালে। এবারে যেই ঢাকনিটা খুলে তুলো বের করব, বিশ্বাসঘাতক ঢাকনি হাত ফসকে মেঝেয় পড়ে গেল ঝনঝন ঝনাৎ। তার পরমুহূর্তেই ট্যাং-ট্যাং-ট্যাং...ট্যাং করে মহা উল্লাসে কাঁসরঘন্টা বাজাতে বাজাতে চাকার মত গড়িয়ে চলল কোনাকুনি মেঝে পেরিয়ে সোজা স্যরের দিকেই। স্যরের টেবিলের নিচে দিয়ে গলে গিয়ে পিছনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। স্যর বই থেকে মুখ তুললেন। আমি বইতে মুখ নামালুম। কাতর। উদ্বিগ্ন।

— কি হল? কি পড়ল ওটা?

— কিছু না স্যর।

— কিছু না মানে? কি পড়ল শব্দ করে?

— ঢাকনিটা, স্যর।

— কিসের ঢাকনি?

— টিনের।

— সে তো শব্দেই মালুম হচ্ছে। টিনটা কিসের?

— সিগারেটের।

স্যারের ভুরু জট পাকিয়ে গেল।

ঘরে দু'মিনিট শোক পালনের স্তব্ধতা। তারপরেই স্যারের কণ্ঠস্বরটি একেবারে অচেনা এসে কানকে আঘাত করল—

— আই সি। ক্লাসের ভিতরেই আজকাল সিগারেটের টিন...

— আরে না না স্যার...ছি ছি ছি...য্যাঃ...তাই কখন হয়? সিগারেট কেন হতে যাবে, ওটা তো তুলোর টিন। বলে ফেলে নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু তুহিনশীতল একটি কণ্ঠ ভেসে আসে, হাড়ের ভেতরে কাঁপুনি জাগিয়ে দেয়—

— সিগারেট কেন হবে, তুলোর টিন? ডিড ইউ সে, তুলো?

— এ্যাঁ, হ্যাঁ, না স্যার, মানে, ঠিক তুলো নয়, আসলে ওটা হচ্ছে দুধের টিন।

যাক বাবা, সত্যি কথাটা জানিয়ে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু স্যার যেন হঠাৎ হিমশৈল হয়ে আর্কটিক ওশ্যানে ডুবে যান। কেবল চুড়োটুকুই ভেসে আছে, বাকিটুকু সমুদ্রের গভীরে। খুব শান্ত গলায় ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলেন—

সিগারেট মানে তুলো তার মানে দুধ? ক্লাসে ওটা দুধের টিন? টেল মি নবনীতা, হোয়াট ডু ইউ থিংক আই অ্যাম? অ্যান ইডিয়ট?

— ছি ছি ছি, এসব কি বলছেন স্যার? বিশ্বাস করুন দুধেরই তুলো। দুধের তুলো সিগারেটের টিনে। হেনকালে নেপথ্যে প্রবল-কিঁ-ই-ঈ-চ কিঁই-ঈ-চ। স্যার চমকে ওঠেন।

— অমিয়, বেশ কিছুক্ষণ এই শব্দটা পাচ্ছি। কিসের শব্দ ওটা বল তো?

আমিই তাড়াতাড়ি বলে উঠি— ও কিছু না স্যার।

— তুমি চুপ করবে কাইণ্ডলি? অমিয়, বল তো কিসের শব্দ ওটা?

অমিয় চুপ। সমস্ত ক্লাস নিস্পন্দ। কপাল থেকে ঘামের ফোঁটাটি টেবিলে ঝরে পড়লে, তারও প্রতিধ্বনি উঠবে। এমন সময়ে নিস্তব্ধতা চিরে খুব জোরে অধীর শব্দ হয়—

— কিঈ ঈচ, কিঁ-চ কিঁ-চ...

স্যার অস্থির হয়ে পড়েন— 'কিসের শব্দ? কিসের শব্দ ওটা?' — আমি আর থাকতে পারি না।

— এই ছানাতেই শব্দ করছে স্যার। এই যে এখানে আমার কৌটের মধ্যে। একটু দুধ দিলেই থেমে যেত স্যার।

— 'ছানার শব্দ? টিফিন কৌটোর মধ্যে ছানা অমন শব্দ করছে? দুধ দিলে সেটা থামত?'

স্যার খুব গম্ভীর হয়ে যান। — লুক হিয়ার ইয়ং লেডি, দিস ইজ অ্যান এডুকেশন্যাল

ইনসটিটিউশন। অ্যাণ্ড দেয়ার শুড বি আ লিমিট টু এভরিথিং।

মনে মনে যেন শুনতে পেলুম— 'এঁ! কি নাট্যশালা?' চোখের জল অতিকষ্টে আটতে রাখতে রাখতে আকুল কণ্ঠে ব্যাখ্যা করি— 'এ ছানা সে ছানা নয় স্যর। এ চামচিকের ছানা—'

— চামচিকে? এই সদ্য তৈরি নতুন বিলডিং-এ চামচিকের বাসা? কখন চামচিকে থাকতে পারে এখানে? এখনও চুনকাম শেষ হয়নি—

— আছে স্যর, আছে। (নেপথ্যে কিঁচকিঁচ)

— কে শব্দ করছ, হাত তোল। হাত তোল বলছি, তিন মিনিট সময় দিচ্ছি।

কোনও হাত উঠল না। কিন্তু স্যরের হঠাৎ চিৎকারে কিচকিচ আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল। — 'থ্রি মিনিট'স ওভার কি? কেউ হাত তুললে না কেন?'

— ওদের যে হাতই নেই স্যর। — আমি বলে ফেলি।

— উইল ইউ কিপ কোয়ায়েট? ফর হেভেন্স সেক।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল চিকচিক্কা। এবারে স্যর কান খাড়া করে শব্দ সন্ধান করেন।

-তোমরা কি বলতে চাও এ ঘরে সত্যি সত্যিই চামচিকে ঢুকেছে?

স্যরের ফর্সা মুখ রাগে লাল। কথা সরছে না। বয়সে বড়ো বলেই তরুণই এ ক্লাসের সর্দার পোড়ো। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে—

এবারের মত নবনীতাকে মাপ করে দিন স্যর, ছেলেমানুষ না বুঝে একটা দোষ করে ফেলেছে, আর করবে না। আস্তে করে স্যর বললেন, না বুঝে? না বুঝে নিজে আওয়াজ করে বলছে চামচিকের ছানা? না বুঝে ক্লাসের মধ্যে টিন পেটাচ্ছে?

এবার ক্লাসসুদ্ধ প্রতিবাদ করল, ও টিন বাজায়নি স্যর, ঢাকনিটা তো পড়ে গেল।

প্রণবেন্দু বললে, খাঁটি চামচিকের বাচ্চাই ডাকাডাকি করছে, ভাল করে শুনুন— নকল নয়।

— সত্যি সত্যি এখানে চামচিকে হয়েছে নাকি? স্যর এবার মনে হয় বিশ্বাস করলেন। সন্দেহ ভঞ্জন করতে ভবানীদাকে ডাকেন— ভবানীদা এ ডিপার্টমেন্টের বেয়ারা এবং গার্জেন।

— ভবানী, এই ক্লাসরুমে নাকি একটা চামচিকে ঢুকেছে?

— এট্টা না ছার, দুইডা। এক্কেরে দুগ্ধ পোইষ্যা। এই এত্তটুক্ দুইডা। সস্নেহ হেসে ভবানীদা আমার দিকে তাকায়, যেন আমিই এত্তটুকুনি দুগ্ধপোষ্য চামচিকে। স্যর অবাক হয়ে ভবানীদা যে ইংরিজি জানে না সেটা ভুলে যান—

— ইউ মীন টু সে দেয়ার ইজ আর ফ্লিটার মাউস...

ফ্লিট? ফ্লিট দিয়া কি অইব? ফ্লিট দিলে তো চামচিকা যায় না। আর এ দুইডা তো দিদিমণির ব্যাগেই আছে। ওনার পোইষ্য পুত্র।

তরুণ বলে— ফ্লিট নয়, ফ্লিটার মাউস। যাক বাবা, একটা নতুন নাম শেখা হল। চামচিকের ইংরিজি কি কেউ জানতে?

স্যারের গলার স্বর এখন বদলে গেছে। এমনিতেই স্যার রাগী নন, বেশ ভালমানুষই। তবে খামখেয়ালি।

— নবনীতা, তোমার কাছে চামচিকে আছে?

— আছে স্যার।

— সব সময় তুমি হ্যান্ডব্যাগে চামচিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াও?

— সব সময় না স্যার। আজই কেবল। মা কিনা বলছিলেন ওদের ফেলে দেবেন, সেই ভয়ে— আমার চোখের জল আর রাখা যাচ্ছে না, গলা বুজে গেল।

- ক্লাসের ছেলেরা তখন— 'কই? কই? দেখি কই চামচিকে? কোথায় চামচিকে? একটু দেখি স্যার? একবারটি দেখব স্যার?' ইত্যাদি বলে বেজায় হট্টগোল বাধিয়েছে। ততক্ষণে বারটা বেজে গেছে। স্যার অনুমতি দিলেন—

— ও কে লেট আস সি দেম। ভয়ে ভয়ে কম্পিত হস্তে ঝোলা থেকে বিস্কুটের কৌটো স্যারের টেবিলে রাখা হয়। এবার খোলা হবে। অল্প ফাঁক করতেই হঠাৎ জোরসে ডানা ঝটপটিয়ে তেড়ে বেরিয়ে এল ক্ষুধার্ত দুটো হতকুচ্ছিত ভূতের মত প্রাণী, বীভৎস আওয়াজ করতে করতে সারা টেবিলে হামা টেনে গড়িয়ে বেড়াতে লাগল কাল কাল ডানা ছড়িয়ে।

সেই ভয়াবহ দৃশ্যে ক্লাসসুদ্ধ আঁতকে উঠল, সমবেত নিশ্বাস টানার আঁক করে একটা কোরাস আর্তনাদ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্যারের চেয়ার ঠেলবার কাঁচ ক্যাচাৎ শব্দ হল— তিনি চেয়ারসুদ্ধ স্লিপ করে পিছিয়ে সড়াৎ করে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে ঠেকে গেলেন।

—গুড গ্রেশাস। হোয়াট আ সাইট। ফেলে দাও, এক্ষুনি ফেলে দাও। এই নাকি কোনও তরুণী মেয়ের হ্যান্ডব্যাগে রাখার জিনিস? অ্যাঁ?

ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে ক্লাসের মধ্যে, সবাই যে যার জায়গা ছেড়ে উঠে স্যারের টেবিলের চারিপাশে জড়ো হয়ে চামচিকের ছানা দেখছে, এমন সময়ে ঘন্টা পড়ে গেল। আমিও বাঁচলুম স্যারও বাঁচলেন। বেরুবার সময়ে তর্জনী তুলে আমাকে বলে গেলেন— আর কোনওদিন ওসব বিশ্রী জিনিস আনবে না। এক্ষুনি ফেলে দাও ওগুলো।

আমি ততক্ষণে আর চোখের জল চাপতে পারিনি। একঘর বন্ধুর সামনে হাপুস নয়নে ক্রন্দনে যত লজ্জা, তত অপমান— প্রেস্টিজ বলে কিছু রইল না। অতঃপর ঝোলাঝুলি কৌটোবাটা গুটিয়ে চক্ষু মুছে স্বগৃহে চম্পট, সেদিনের মত ক্লাসে ইস্তফা। প্রতিজ্ঞা করলুম, এই অকৃতজ্ঞ জন্তুদের আর কোনওদিন কোথাও সঙ্গে করে নিয়ে যাব না।

কলেজের করুণ কাণ্ডকারখানা শুনে মারও দয়া হল। মা ওদের খাবার দাবার দিতে রাজী হয়ে গেলেন। দিনে দিনে চিকা আর ফ্লিটার দিব্যি বেড়ে উঠল, বিস্কুটের টিনে আর আঁটে না, খাঁচায় ট্রান্সফার করা ঠিক হল। পাকা কলা, পাকা পেয়ারা এইসব খায় এখন। ভাবছি ওদের গলায় দুটো কলার পরান যায় কিনা, বেশ রংচঙে দেখে। সময়ে একদিন

কলেজ থেকে ফিরে দেখি, যেখানে ওদের বাক্সটা থাকত সেখানে পরিষ্কার কাগজ পাতা। ফাঁকা। কি হল? খাঁচায় চলে গেল নাকি? কে ঢোকাল?

জিগ্যেস করতেই মা হৈ হৈ করে উঠলেন।

—ওরে বাবারে, খুকু, তোর পুষ্যিরা আজ আমাকে অ্যাটাক করেছিল। যেই ঢাকনাটা খুলেছি খেতে দেব বলে, অমনি দুজনে ডানা ঝটপটিয়ে তেড়ে এল। আমি তো হাত থেকে টিন-ফিন ফেলে দিয়েছি ভয়ে, আর অমনি চটপট উড়ে পালিয়ে গেল দুটোতে। যতই যত্ন কর, চামচিকে বলে কথা। ওরা কখন পোষ কি মানে? দুঃখু করিস না তুই।

আমিও বুঝলাম, ম্যামাল হয়েও যে উড়ে বেড়ায়, যার ডানা আছে কিন্তু পালক নেই, সে কখন বিশ্বাসী হতে পারে? আর এমন কৃতঘ্ন প্রাণীকে সংরক্ষণ করেই বা কি লাভ? মাকে যে আঁচড়ে-কামড়ে দেয়নি সেই রক্ষে।

আমাদের বাড়িতে প্রজেক্ট চর্মচটিকার সেইদিনই মহাপরিনির্বাণ ঘটে গেল।

এর পরেও কি আপনারা কেউ চামচিকে পুষতে চাইবেন? ওরা সত্যি-সত্যিই মনুষ্যেতর, অর্থাৎ মানুষের চেয়েও ইতর প্রাণী। জগতে যা দুর্লভ।
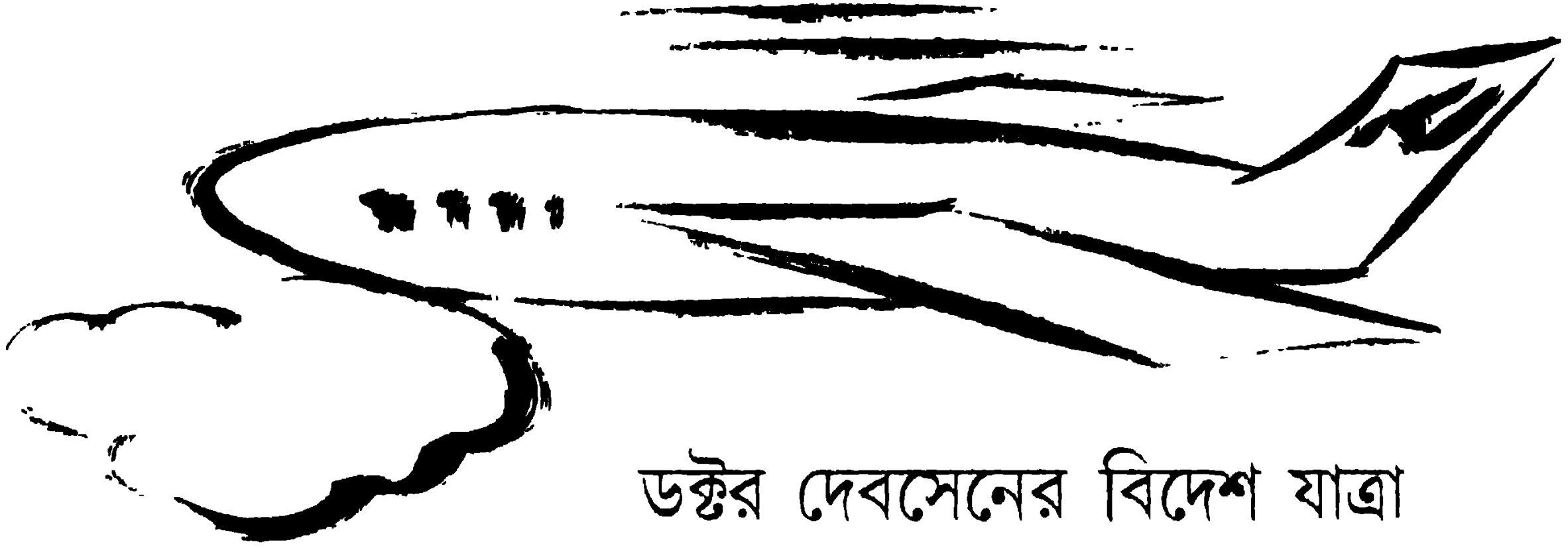
ডক্টর দেবসেনের বিদেশ যাত্রা

আচ্ছা, ছোট একটা প্রাণের কথা আমাকে গোপনে বলবেন? কাগজটা মেললে যেই চোখে পড়ে কেউ 'বিশেষ আমন্ত্রণে এতদিনের জন্য বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন', অমনি বুকের ভেতর একটা বিশ্রী জ্বালা ভাব হয় না? অন্তত যৎসামান্যও? এই সব বিশিষ্ট আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ছবিও ছাপা হয় মাঝে মাঝে। রাগী-রোগ-বদহজমি-গান্ধী টুপি কিংবা ট্যারা-টেকো-টাইবাঁধা হাসি হাসি— ইত্যাদি তলায় আবার ব্রাকেটে কখন কখন কীসব রহস্যময় নম্বরও লেখা থাকে A–1234 ইত্যাদি (লক্ষ্য করে দেখেছি সিরিয়াল নম্বরটা সর্বদাই 'A' —তে আটকে থাকে, কদাচ 'B' হয় না)। জগতের যাবতীয় হরিদাস পালেরাই এখন 'প্রসিদ্ধ ব্যক্তি', যদিও তাঁদের নাম তাঁদের পাশের বাড়ির লোকেদের পর্যন্ত জানা নেই। এঁরাই অনবরত 'বিশেষ আমন্ত্রণে বিদেশ যাত্রা' করেন। কী আর বলব লজ্জার কথা, এই শ্রীমতীও সেই অধম যাত্রীদের একজন। নাঃ, বিদেশ যাত্রার আর মান সম্মান রইল না।

শুনেছি নাকি আমন্ত্রণকর্তা যদি কেজিবি কিংবা সিয়া হন, তাহলে ভ্রমণটা নির্ঝঞ্ঝাটে সারা হয়। কিন্তু যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকে কনফারেন্স যায়-টায়? তাদের দুঃখু-কষ্টের বাপ-মা নেই। যেসব 'ঢাউস' ভ্রমণ কাহিনী আমরা পড়ি (চোদ্দ দিনে চব্বিশ ফর্মা) তাতে এসব অকাব্যিক দিকগুলো লিখে, জায়গা নষ্ট করা হয় না; সেখানে কেবলই জয়ধ্বজা আর পুষ্পবৃষ্টি। আর কোনও কোনও ক্ষেত্রে তো প্রতি পদক্ষেপেই অক্ষয় প্রেমের প্রস্ফুটন। দিব্য বিভায় উদ্দীপ্ত সেসব কাহিনী পড়ে আপনারাও হয়ত আমার মতোই মোহ-মাৎসর্য ইত্যাদি রিপুতাড়িত হয়ে বৃথা যন্ত্রণা ভোগ করেন। কেননা আসল খবরগুলো কেউ জানতেই পারে না। তাই ঠিক করেছি পিঁওর হরিদাস পালেদের বিদেশ যাত্রার একটা বাস্তব চিত্র আপনাদের কাছে পেশ করব। খাঁটি নির্ভেজাল সত্য তথ্য মশাই। ট্রুথ ইজ লাইভলিয়ার দ্যান ফিকশন। অনেকগুলো দরকার নেই, ডক্টর দেবসেনের যে-কোনও একটা ট্রিপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ একবার শুনলেই ওই বুক-জ্বালা-করা ব্যারামটা একেবারে সেরে যাবে। এ

বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এর পরে স্বস্তিপূর্ণ গৃহাবস্থানের সাত্ত্বিক আরাম উপলব্ধি করবেন দেহে মনে, কাগজের 'বিদেশ যাত্রা' সংবাদ আপনার শান্তিভঙ্গ করতে পারবে না, কথা দিচ্ছি।

১

শুরুটা ঠিক কিভাবে করব বুঝতে পারছি না। সেবারের ফ্রান্সে আর কানাডায় যাবার বেলাটায় বলি। বেশি বেশি ভ্রমণ, তাই বেশি বেশি দুর্ঘটনা। সালটা ১৯৭৩, কানাডায় কম্পারেটিভ লিটারেচার কনফারেন্স, প্যারিসে ওরিয়েন্টালিস্টস কংগ্রেস, আর লণ্ডনে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির একশ ষাট বছর পূর্তির সেমিনার। প্রথম দুটিতে ডক্টর দেবসেন আমন্ত্রিত বক্তা। হয়ে তৃতীয়টিতে শ্রোতা হবার নিমন্ত্রণ।

যাবার ঠিক পাঁচদিন আগে, যখন সব স্থির, ভিসা-টিসা হয়ে গেছে, পেপার-টেপার তৈরি, হঠাৎ পাসপোর্টটা হারিয়ে গেল।

ব্রিটিশ হাইকমিশনে একটা ফর্ম ভরতে দিয়েছে, কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে সবাই সেই ফর্ম ভরছি এক-একজন করে। হাতের পাসপোর্টটা আমার ঠিক পিছনের ভদ্রলোকের হাতে একবার ধরতে দিলুম ততক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখছি। এমন সময় কানে এল আমার নাম ডাকা হচ্ছে, অমনি আমি ফর্মটর্ম সুদ্ধ শাঁ করে Entrance লেখা দরজা দিয়ে সবেগে ঢুকে গেলুম। কাজ চুকে যেতে Exit লেখা দরজা দিয়ে বেরিয়ে, দে-দৌড় সোজা যাদবপুর। তক্ষুনি এম এ ফাইনাল ইয়ারের ক্লাস। পড়াতে পড়াতে আচমকা মনে পড়ল— 'আমার পাসপোর্ট?' ঘণ্টা পড়তে তখনও, তারপরও পুরো পনের মিনিট দেরি। সেই শেষ পনের মিনিট যেন দ্রৌপদীর শাড়ি হয়ে উঠল। অফুরন্ত কাল। শ্রীরাধিকা যেন কেঁদে বলে গেছেন একে ডেকে— হে পিরিয়ড, তুমি পোহায়ো না, হে ঘণ্টা, তুমি বাজিয়ো না। ঘণ্টা যখন শেষ অবধি বাজল, আমি ছুটে গেলুম ফোনের ঘরে। না ব্রিটিশ হাইকমিশনে আমার পাসপোর্ট জমা পড়েনি।

তার পরের দুদিন ধরে বিশুদ্ধ বকুনি। শুভার্থী আত্মীয়—স্বজন বললেন— 'ছি ছি ছি, জান না আজকাল স্মাগলিঙের জন্য কী রকম পাসপোর্ট চুরি যাচ্ছে? আর তুমি কিনা চোরের হাতে ওটা ধরিয়ে দিয়ে এলে?' —বন্ধুরা টিককিরি দিল— 'তুই তোর যোগ্য কর্মই করেছিস। তোর কাছে এর চেয়ে অন্য আর কী আশা করা যায় বল? টিকিটটাও কাউকে গছিয়ে আসিসনি তো, ভাল করে ভেবে দ্যাখ।' কেবল মা বললেন— 'যে যাই বলুক, ও হারাবে না। ঠিক পাবি। তুই বাক্স গুছো।' তিন দিনের দিন বি ও এ সি এয়ারলাইন্স থেকে ফোন এল, তাদের এক যাত্রী ওটি ওদের হাতে জমা দিয়ে বিলেত চলে গেছেন। যৎপরনাস্তি ধন্যবাদ দিয়ে পাসপোর্ট ফেরত আনতে গেলুম।

সেখানে গিয়েও বকুনি আর বকুনি। প্রত্যেক কর্মচারীই এসে কোনও-না-কোনও

অজুহাতে একবার করে আমাকে দেখে যাচ্ছেন; পাসপোর্ট-দাত্রী এমন কলির কর্ণকে কে না দেখতে চায়? সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই একটা করে 'ফ্রী ফ্রেণ্ডলি অ্যাডভাইস' দিতে ছাড়ছেন না, এমন কি চা দিতে এসে বেয়ারাটি পর্যন্ত বলে গেল— 'দিদিমণি, আপংকরু পাসঅ পরঅটঅ কিমিতি ভুলি গলা পরা?' চোরের ওপর লোকে যেমন হাতের সুখটা মিটিয়ে নেয়, পাসপোর্ট-খুইয়ের ওপর তেমনি জিবের ঝালটা ঝেড়ে নেয় সবাই। অন্তর্নিহিত ভাবখানা— এমন একটা গুড ফর নাথিং জরদ্গবকে পাসপোর্ট দেওয়াই বা হয় কেন, তারা বিদেশেই বা যায় কেন? জগতে এত শত স্মার্ট লোকেরা যেতে পারছে না যখন? একেই বলে অবিচার।

২

যাক, পাসপোর্ট তো পাওয়া গেল, নেক্সট হারাল আমার দ্বিতীয় পেপারটি। একটু আগেই টাইপিস্ট দিয়ে গেছেন। সারা বাড়ি তোলপাড়, খুঁজতে খুঁজতে আমার ক্লাস সিক্সের অঙ্কের খাতা পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু পেপার বেরুল না। তখন মা বললেন,— 'রাফ কপিটাই নিয়ে যা, ওখানেই টাইপ করিয়ে নিবি।' রওনা হচ্ছি, এমন সময়ে পিকোলো আমার মেয়ে, দুই হাতে একটি ছেঁড়া খাম উঁচু করে তুলে, 'দেব না, দেব না' বলতে বলতে ছুটে এল। 'স্প্যান'-এর ঐ ছেঁড়া খামে ভরেই আমার পেপারটি দিয়ে গেছেন টাইপিস্ট। বাজে কাগজ বলে বুঝতে পেরে বাড়ির কাজের লোকটি ওটাকে পুরনো কাগজের স্তূপে নিক্ষেপ করেছিল। যাক, সেকেণ্ড ক্রাইসিস ওভার। এবার দুর্গা দুর্গা বলে রওনা। সারা প্লেনে আকুলচিত্তে জপ করতে করতে চললুম হে মা সরস্বতী, কনফারেন্সের আগে যেন পেপারদুটো হারিয়ে না যায়। বিদেশে বড্ড বেইজ্জতি হবে মা।

৩

থার্ড এবং ফোর্থ ক্রাইসিস বম্বেতে। বম্বেতে আমার এক বন্ধু পতিসমেত আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে দেখা করতে এল। তাদের মহা অভিমান— 'এতদিন পরে দেখা, বম্বেতে কেন একটা দিন হল্ট করে গেলে না?' আমারও খুব আফসোস হতে লাগল। সত্যি। কেন যে সময় নিয়ে এলুম না! হাতে একটা দিন? এত ভালবেসে কেই—বা আমাকে ডাকবে? জীবনে তো আন্তরিকতার সুযোগ বেশি আসে না। যে করে হোক পরের বারে বম্বেতে থামতেই হবে। এদিকে প্লেন ছাড়বার সময় হয়ে এল তবু কেন যেতে ডাকছে না? খোঁজ করতে গিয়ে শুনি অদ্য যাত্রা নাস্তি। যান্ত্রিক গোলযোগ। কাল ভোর পাঁচটায় আসতে হবে। আমার এ খবর শুনে একটুও দুঃখ হল না— বরং আনন্দ হল। একগাল হেসে ছুটে এসে ওদের সুখবরটি দিলুম— 'যাক ভাই, তোমরা ভালবেসে যা ইচ্ছে করেছিলে তাই হল। চল, এবার তবে তোমাদের বাড়ি যাই। লাকিলি প্লেনটা খারাপ হয়ে গেছে।' —খবর শুনেই যেন

বন্ধুর মুখে দপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। জিভ থেকে সরস্বতীও বিদায় নিলেন। বিব্রত স্বরে বন্ধুর স্বামী তোতলাতে শুরু করলেন— 'না, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, যেতে চাও তো চল না, তাতে আর কি হয়েছে, তবে , ঐ আর কি...' —তার পরের কাহিনী ঠিক কিন্তু ভ্রমণ বইতে যেমনটি লেখা থাকে, তেমনটি হল না। যা হল তা বলবার নয়! (ভোলবারও নয়)!

৪

পরদিন ভোর পাঁচটায় এয়ারপোর্টে হাজিরা। বাকস জমা দিয়ে কাস্টমসে ঢুকেছি। দেশ ছাড়বার সময়ে সঙ্গের বিলিতি জিনিসের একটা এক্সপোর্ট ক্লিয়ারেন্স করিয়ে নিয়ে যেতে হয়। আমার হাতে ছিল একটা বিলিতি ঘড়ি। সেটার কাগজ সই করতে করতে ভদ্রলোক বললেন— 'আপনার হাতের ঐ আংটিটার জন্য ক্লিয়ারেন্স নিয়েছেন?' —আংটি? তাই তো। হাতে একটা আংটি আছে বটে! কিন্তু ওটা তো বিলিতি নয়, নতুনও নয়— বার বছর ধরে পরে রয়েছি। —এখন হঠাৎ আবার ক্লিয়ারেন্স কেন? ভদ্রলোক বললেন— 'না মশাই, ওটা হীরে, শেষে ফিরে এলে ডিউটি লেগে যেতে পারে।' —তারপর তর্জনী তুলে দেখালেন— 'গয়নার জন্য ঐ কাউন্টার।' ডিউটি লাগা, শব্দটাতেই একটা জাদুকরী ভীতি আছে। আমি চটপট ঐ কাউন্টারে চলে যাই। কিন্তু সেখানে দুর্ধর্ষ এক কিউ। দেখা গেল কুয়াইটের বাসিন্দাদের বউরা সকলেই সোনায় মোড়া স্বর্ণসীতা। সেই ঠাসা গয়নার মূল্যায়ন চলেছে। অফিসার ভদ্রলোক ঘেমে-নেয়ে উন্মত্তপ্রায়। একে একে আমার প্লেনের যাত্রীরা সবাই বেরিয়ে গেলেন— এদিকটা ফাঁকা হয়ে গেল। আংটির দায়ে ও ডিউটির ভয়ে আমি বন্দী— ভদ্রলোক আর তাকান না। অবশেষে মরিয়া হয়ে আমি যখন যারপরনাই কাতর, তিনি তখন নজর দিলেন।

—'কী চাই?'

—'এই আংটিটি যদি'— নেড়ে চেড়ে উলটে পালটে সার্টিফিকেট লিখে দিলেন, চোদ্দশ টাকা। চো-দ্দ-শ! মুহূর্তেই আমার চলন-বলন পালটে গেল। চোদ্দশ টাকার এককুচি পাথর আঙুলে থাকলে যেরকমটি শোভা পায় ঠিক তেমনি পদস্থ চরণে দরজা দিয়ে প্রায় ভেসে বেরোই। যাতে আমাকে যেই দেখবে সেই বুঝবে —হ্যাঁ, এ-মেয়ের একটা ব্যাপার আছে বটে। (পরে জেনেছি মাত্র চোদ্দশ টাকা একটা ভাল হীরের পক্ষে মোটে কোনও দামই নয়।)

লাউঞ্জ গড়ের মাঠের মত ফাঁকা দেখে বুকটা ধড়াস করে উঠল— সহযাত্রীরা কই? হঠাৎ শুনি দৈববাণীতে নিজের নাম ধ্বনিত হচ্ছে— ডক্টর দেবসেনকে এয়ার ইণ্ডিয়া ডাকছে। কাউন্টারে গিয়ে টুপি পরা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেটিকে যেই চোদ্দশর উপযুক্ত ধীর গম্ভীর স্বরমাহাত্ম্যে বলেছি, 'আমিই ডক্টর দেবসেন—' অমনি সে লাফিয়ে উঠে আমার কাঁধটা আচমকা খামচে ধরে বিনা সম্ভাষণে হিড়হিড় করে

হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল গেটের দিকে। এয়ার ইণ্ডিয়ার এই অসংযত আক্রমণে আমি ক্রমে হতচকিত, তথা হৃতবাক এবং কারাটে-কুংফু কিছুই না জানায় আত্মরক্ষায় অপারগ হয়ে কাতর। এইবারে এক জব্বর গুঁতো মেরে লোকটি আমাকে একটা ছোট সাদা জীপে তুলে দিল এবং নিজেই জীপটা বোঁ বোঁ করে চালিয়ে নিয়ে চলল এয়ারপোর্টের নির্জন মাঠ-ঘাটের মাঝখান দিয়ে। দূর দিগন্তে দাঁড়ান বোয়িংটার পেটের দরজা বন্ধ। গায়ে সিঁড়ি ঠেস দেওয়া নেই। কেবল সামনে পাইলটের মই ঝুলছে। সেই কন্দর্পকান্তি যমদূত আমাকে হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে এনে পৃষ্ঠদেশে বলদের পিঠে চাষা যেমন ঠেলা মারে তেমনি এক রামঠেলা লাগিয়ে ঐ মইতে উঠিয়ে দিয়ে গগনভেদী হাঁক পাড়ল, 'হিয়ার শী ই-জ।'

ওপরে উঠে দেখি জায়গাটা ককপিট। নানা সুইচবোর্ড, যন্ত্রপাতির পটভূমিতে সারি বেঁধে তিনজন কর্তাব্যক্তি সবিনয়ে দণ্ডায়মান —যেন আমাকেই গার্ড অব অনার দিচ্ছেন। দাঁতে দাঁত চেপে রহস্যময় হেসে ক্যাপ্টেন বললেন— 'ডক্টর দেবসেন, আই প্রিজিয়ুম?' এটা তো আফ্রিকার জঙ্গল নয়, আমিও লিভিংস্টোন সাহেব নই। তাই অবাক গদগদচিত্তে প্রশ্ন করি— 'হাউ ডিড য়ু নো?' একগাল তিক্ত মধুর হেসে কো-পাইলট উত্তর দেন— 'বিকজ উই আর নিয়ারলি টু মিনিটস ডিলেইড ফর ইয়ু ম্যাম! দ্যাটস হাউ!' সর্বংসহা ধরিত্রী এতে দ্বিধা হলেন না, বরং আকাশকেই দ্বিখণ্ডিত করে আমাদের জেট প্লেন উড়ে গেল।

৫

দুটি পেপারের কল্যাণে দুটি হপ্তা ফ্রী। প্যারিসে প্রথম হপ্তাটি এবং কানাডায় শেষ হপ্তা রাজকীয় কাটবে দুটি কনফারেন্সের কর্তৃপক্ষের আতিথ্যে। কিন্তু দুটির মাঝখানের যে তিনটি সপ্তাহ ফাঁকা পিরিয়ড আর লাস্ট পিরিয়ডে ক্লাস থাকলে, মাঝখানের নিরালম্ব ফ্রী পিরিয়ডগুলোর মতো, মহা ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছে। এই তিন হপ্তার খরচ চলবে কী উপায়ে? এক বন্ধু ইউনাইটেড নেশন্সে সদ্য কাজ পেয়ে মহৎ এবং উদার বোধ করছেন— তিনি একটি চেক লিখে দিলেন। এটি ভাঙিয়ে নিলেই মোটামুটি চলে যাবে। ইংলণ্ডের বন্ধুদের কাছে আর লস এঞ্জেলসে ছোট বোনের কাছে গিয়ে ভাগাভাগি করে সময়টা কাটাব। ওটুকু খরচ ওরাই চালাবে।

এদিকে প্যারিসে পৌঁছে 'শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে'— সরকারের দেওয়া আট ডলার পথেই শেষ। ওই চেকটি প্যারিসে কিছুতেই ভাঙান গেল না। ওটি ইউনাইটেড নেশন্সের বাড়ির যে ব্যাংকের চেক, কেবলই সেই ব্যাংকেই ভাঙান যাবে। প্যারিসের বন্ধুবর্গ বললেন— 'যাও, সোজা জেনিভা চলে যাও না। মাত্র পঞ্চাশ মিনিটের তো মামলা। ভাড়াও বেশি না।'

—সে কি? জেনিভা যাই কী করে? হাতে তো আছে শূন্য মানিব্যাগ আর দুখানি প্লেন টিকিট। প্যারিস-লণ্ডন, আর লণ্ডন-মন্ট্রিয়ল।

—'কেন, প্যারিস-লণ্ডনটাকেই প্যারিস-জেনিভা করে নেবে? তারপর টাকা পেলে জেনিভা-লণ্ডন টিকিটটা কিনে নেবে।' —তাই তো? এ তো খুবই সহজ ব্যাপার। যেমনি বুদ্ধি, তেমনি কাজ। চল জেনিভা। পরের প্লেনেই! পঞ্চাশ মিনিট বাদেই পঞ্চম এবং মোক্ষম ক্রাইসিসটি উৎপন্ন হল।

জেনিভায় সুরেন্দ্র-কৃষ্ণরা আছে, ভেবেছি নেমেই একটা ট্যাক্সি ধরে চলে যাব ওদের বাড়ি। কিন্তু বেরুতে গিয়েই মুশকিল বাধল।

—'ভিসা? আপনার ভিসা কই?'

—'আরে? মনে ছিল না তো?'

—'সে কি! ভিসা নেই? তা হলে তো বেরুতে পারবেন না এয়ারপোর্ট থেকে।!'

—'করে দিন না মঁসিয়, অনুগ্রপূর্বক, আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে একটা ট্রানজিট ভিসা?'

—'আগে আপনার টিকিট দেখান! এখান থেকে কোথায় যাচ্ছেন?'

—'লণ্ডন।'

—'কিন্তু জেনিভা-লণ্ডন টিকিট কই?'

—'এই দেখুন, এই চেকটা ভাঙাতে এখানে এসেছি, টাকা পেলে তবে তো টিকিট কিনব। এক্ষুনি পাব কোথায়?' ইমিগ্রেশন অফিসারের চোয়াল শক্ত হয়। —'ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার মানে যার হাতে অনওয়ার্ড রিজার্ভেশন আছে। এটা তো টার্মিনাল টিকিট। ভিসা আপনি পেতে পারেন না।'

—'টার্মিনাল মানে? এই দেখুন দেড়হপ্তা পূর্বেই আমার লণ্ডন-মন্ট্রিয়ল চাটার্ড ফ্লাইট রিজার্ভেশন রয়েছে। আমি কি থাকতে এসেছি?'

—'ওতে হবে না। জেনিভা-লণ্ডন টিকিট চাই।'

—'বলছি তো টাকা পেয়েই কিনব। কালই।'

—'তা হয় না। তুমি বাছা এক্ষুনি প্যারিসে ফিরে যাও, নইলে, মুশকিলে পড়বে

—'বাঃ! টাকা কই, যে প্যারিসে যাব? টাকা থাকলে তো লণ্ডনেই চলে যেতুম।'

—'আরে বাবা তুমি জেনিভায় কেন এসেছ তা কি আমরা জানি না, মা শেরি?'

—'কেন এসেছি বলুন তো?'

—'প্রত্যেক গ্রীষ্মেই তো তুমি এখানে আস, কলেজের ছুটি হলে রেস্তরাঁয় ঝি-গিরি করে উপরি দু পয়সা কামাতে। তোমাদের আমরা চিনি না? কিন্তু মাদমোয়াজেল— ভিসাটা যে—'

—এবার চোখে জল এসে গেছে— 'কী! আমি .....ঝি-গিরি করতে এসেছি? মোটেই না। ইনফ্যাক্ট.... আমি...... তো সরবনে কলেজ দ্য ফ্র্যান্স বক্তৃতা দিতে এসেছিলাম।' একথা বলার সময়ে আমার গলা এমনই কাঁদো-কাঁদো করুণ হয়ে কেঁপে-টেপে গেল, যে আমার নিজের কানেই কথাটা বিশ্বাস হল না।

—'বক্তৃতা?' ইমিগ্রেশন অফিসারেরা হো-হো করে হেসে ওঠেন। —'ওরে

—বক্তৃতা দিতে এসেছে রে! হাঃ হাঃ কোথায়? রেস্তরাঁয় রেস্তরাঁয় বক্তৃতা, নাকি চার্চে চার্চে?' —আমার গায়ে আগুন ধরে যায়—

—'ইয়ারকি রাখুন। আমি সত্যিই আপনাদের এই অসভ্য দেশে থাকতে আসিনি।'

এবার ওদের মুখ একটুখানি গম্ভীর হয়।

—'নাকি? বেশ। বেশ। চলুন, রাগারাগি করে কাজ নেই, আজ লক-আপেই শুয়ে থাকুন তাহলে। কাল সকালে দেখা যাবে বক্তৃতা-টক্তৃতার কী ব্যবস্থা করা যায়—', ইতিমধ্যে পাসপোর্টটা উলটে পালটে একজন পুলিস দেখে নিয়েছে যে আমি সত্যিই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করি। সে এসে সবিনয়ে বলল—

'সরি প্রফেসর, মাফ করুন, ওদের কথায় কিছু মনে করবেন না, ফরেন স্টুডেন্টরা সত্যিই এ-সময়ে আসে কিনা ছুটিতে কাজ খুঁজতে...., তাই .... ওরা ভেবেছে আপনিও হয়ত ফরেন স্টুডেন্ট— রাতটা অবশ্য লক-আপেই থাকতে হবে— কান্ট বি হেল্পড— একটু কষ্ট হলেও... আশা করি কালই সব ঠিক হয়ে যাবে—'

—'লক-আপ মানে? পুলিস লক-আপে? এই জেনিভাতে? কেন? আমার অপরাধটা কী?'

—'বিনা ভিসায় আপনি ট্রেসপাস করেছেন সুইটজারল্যাণ্ডে। এবং ইউ আর রিফিউজিং টু লিভ দ্য কান্ট্রি। ইল্লিগাল এন্ট্রির জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।' বারে মজা! কোথায় এলুম ব্যাংকে, টাকা ভাঙাতে, আর আইন ভাঙার দায়ে যাচ্ছি কিনা জেলে! না, এ হতেই পারে না।

—'আমি আমার বন্ধুদের ফোন করতে চাই। ইউনাইটেড নেশন্সে।'

—'কর না।'

—'পয়সা নেই।'

—'আমরা পয়সা দিতে পারব না।' হঠাৎ মনে পড়ল পুলিসে ধরলে সর্বদাই উকিলকে ফোন করার রাইট থাকে। কৃষ্ণাই তো ব্যারিস্টার। বাঃ!

—'আমি ল'ইয়ারকে ফোন করব।'

—'ল'ইয়ারকে?' অফিসারদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি হয়।

—'জেনিভায় তোমার ল'ইয়ার আছে?'

—'আছে বৈকি। এই নম্বর— ভেরসোয়া ৫৫-২৬-১৯; ডেকে দাও। কৃষ্ণা আহুজা প্যাটেল, বার অ্যাট ল'।' আমি গম্ভীর হই। গম্ভীর না হলে এরা মানবে না।

আমার ফোন পেয়ে প্রথমে কৃষ্ণা বেজায় খুশি। তারপরেই তো মাথায় হাত! —'আঃ— ওয়ানডারফুল— কোত্থেকে? কদ্দিন পরে এলে! অ্যাঁ! কী সর্বনাশ! পুলিস লক-আপে?' —হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল দুজনেই। —ইউনাইটেড নেশন্সের ডিপ্লম্যাটিক ছাড়পত্রের জোরে ইমিগ্রেশনের নিষিদ্ধ আঁচলের ভিতরে ঢুকে এসে ওরা

আমার সঙ্গে দেখা করল। প্রথমেই মাতৃভাষায় কৃষ্ণা কিছু ধারাল, বাছাই করা খাস পাঞ্জাবী গালাগালি ছাড়ল এক নিশ্বাসে, আগে থেকে ওদের খবর না দেবার জন্যে এবং বিনা ভিসায় ন্যালাক্ষ্যাপার মতন বিদেশে আসার জন্য। অথচ ভ্রমণ কাহিনীতে পড়েছি, বন্ধুদের আনন্দে বাক্যহারা হয়ে জড়িয়ে ধরবার কথা এসব ক্ষেত্রে। যদি ওরা এখন জেনিভায় না থাকত? কী হাল হত আমার? তারপরে নিজেরা জামিন দাঁড়িয়ে আমাকে আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। অবশ্যি পাসপোর্টটা কেবল জমা রইল ইমিগ্রেশন পুলিসের থানায়। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আরেক প্রস্থ বকুনি, ও প্রচণ্ড আদরযত্ন হল। ওদের বাড়ির নরম বিছানায় গরম আরামে শুয়ে শুয়ে রাত্রে ভাবলুম, আহা, পুলিস লক-আপটা কেমন জানা হল না। দিব্যি দেশে গিয়ে চাল মারা যেত।

৬

পরদিন ইউনাইটেড নেশন্সে চেক ভাঙাতে গিয়ে পুনরায় কেলেঙ্কারি। বিদেশে চেক ভাঙাতে হলে সর্বদাই সই প্রমাণ করতে পাসপোর্টের সঙ্গে মেলাতে লাগে। পাসপোর্ট জমা দিয়ে আসার সময় সেটা মনে ছিল না। ব্যাংক ম্যানেজার মশাই যেই শুনলেন আমার পাসপোর্ট পুলিস হেফাজতে, অমনি তাঁর হাসিমুখের ওপরে একটা বলী কিলবিলে দুশ্চিন্তার মুখোশ চড়ল, তিনি একটা বেল টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুজন সিক্রেট পুলিস মাটি ফুঁড়ে আমার দুপাশে উপস্থিত হলেন সবিনয়ে। কী মুশকিল। আবার পুলিশ? সুরেন্দ্র কই? এরা আমাকে ভেবেছে কী? জালিয়াত? জোচ্চোর? ওরে ও কৃষ্ণা!

পুলিসের কাছে আরেকবার নিজে জামিন দাঁড়িয়ে, শেষ পর্যন্ত আমার চেকটা সেদিনই সুরেন্দ্র ভাঙিয়ে দিলে, তবে অতি কষ্টে। আর কোনও পরিচয়পত্র আইডেন্টিফিকেশন আছে কিনা জিজ্ঞেস করতেই আমি জোরে জোরে মাথা নাড়ি। না, নেই, সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করে— 'কেন, তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স? সঙ্গে নেই?'

—'তাই তো! আছে, আছে। ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্সই সঙ্গে আছে।'

'ব্যস! ওতেই হবে! বাঁচা গেল।' সুরেন্দ্র হাঁপ ছাড়ে। 'ওতে ছবিও আছে, সইও আছে। আর, পাসপোর্টের ডিটেইলস ইমিগ্রেশনে ফোন করলেই চেক করে নিতে পারবেন আপনারা। তা ছাড়া আমি এখানে স্থায়ী চাকুরে, আমিও ওকে আইডেন্টিফাই করছি, জামিন হচ্ছি। এই মহিলা খাঁটি, জাল ব্যক্তি নন।'

নিশ্বাস ফেলে তক্ষুনি ছুটলুম জেনিভা-লণ্ডন টিকিট কিনতে, বাবা বাঃ— কী ফাঁড়া, কী ফাঁড়া! নিরীহ মাস্টার মানুষ বক্তৃতা করতে এসে শেষকালে বিদেশ বিভূঁয়ে থানা-পুলিস আর জেল-হাজত শুরু হলেই হয়েছিল আর কি। এক্ষুনি, পালাতে হবে এদেশ ছেড়ে, দুগগা, দুগগা! কী কপালই করেছি! মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের মাঝখানে জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ পেশ করতে এলুম, এসে কিনা কেবলই চুরি-জোচ্চুরি,

জাল-জালিয়াতের দায়ে ধরা পড়ছি। আমার এই ছিঁচকে টাইপ চেহারাটাই হয়েছে যত পাণ্ডিত্যের পরিপন্থী। আর জীবনে আসছিনে বাবা রিদেশ বিভূঁয়ে বক্তৃতা দিতে। যে যতই ডাকুক! হ্যাঁ!

৭

কিন্তু পালাব বললেই কী পালান যায়? বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা বিশেষ আমন্ত্রণে বিদেশ যাত্রার বরমাল্যটি। পরবর্তী বজ্রটি নিপাতিত হল কানাডার বিমানবন্দর মনট্রিয়লে পা দিয়ে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ওখানে নেমেই আমার প্লেন বদল করার কথা। যাব সোজা যুক্তরাষ্ট্রে লস এঞ্জেলেসে। সেখানে সাতদিন ছোট বোনের কাছে কাটিয়ে, আবার মনট্রিয়লে আসবো সভা-টভা করতে। কিন্তু ঘটনা অন্যতর হল।

জেনিভায় পেয়েছি ভিসা না করার কুফল, আর এ যাত্রায় জুটল উলটো বিপত্তি, সাত—তাড়াতাড়ি ভিসা করানর কুফল। ভিসা পাবার ত্রিশ দিনের মধ্যেই ঢুকে পড়তে হয় মার্কিন রাজ্যে। আমার এসে পৌঁছতে পৌঁছতে ঠিক বত্রিশ দিন হয়ে গেছে। আব রক্ষে নেই। জগতের সব দেশেই তো এ-ব্যাপারে 'শিবঠাকুরের আপন দেশ!' কি উন্নত, কি অনুন্নত, একুশে আইনের অভাব নেই কুত্রাপি।

আমেরিকার প্লেনে আমাকে উঠতেই দিল না। ইমিগ্রেশনে আটকে দিল। হা ঈশ্বর। আবার ভিসাবিহীন? এখানে তো সুরেন্দ্ররা নেই! ডক্টর দেবসেনের সব স্মার্টনেস মুহূর্তে উপে যায়।— 'এবার কি লক-আপে যেতে হবে তাহলে?' আমার বিনীত প্রশ্নে ভয়ানক অবাক হয়ে যান তরুণ ইমিগ্রেশন অফিসার।

—'লক—আপে? সে কি কথা? কিসের জন্যে?'

—'ভিসার যে মেয়াদ— মানে ট্রেসপাসিং হয়নি?'

'দূর, ওই মার্কিন ভিসা তো কালই করিয়ে নেবেন। দু'মিনিট লাগবে।'

খসখস করে একটা ঠিকানা, একটা নাম ও ফোন নম্বর লিখে আমার হাতে দেন— 'সকালেই চলে যাবেন। আর এখানে ট্রেসপাসিং মানে? কানাডায় তো আপনার ঢুকতে বাধা নেই। বেআইনটা কোথায়?'

'ওঃ! তাই তো, এটা তো, এটা তো কানাডা! ঘুরতে ঘুরতে কি মাথার ঠিক আছে ভাই?' বোকা হাসি হেসে হাঁপ ছেড়ে অগত্যা রাত্রিবেলা চলে গেলুম সেই একটি মাত্র জানা ঠিকানায়, যেখানে কনফারেন্সের সময়ে এসে আমাদের থাকার কথা আট-দিন বাদেই। এছাড়া কিছু মাথায় এল না। ঠিকানাটা ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের। সুপারিনটেনডেনট আণ্ডারওয়ার পরে বেরিয়ে এলেন, হাতে আবার এক টিন কোকাকোলা। পরিচয় দিতেই দৃশ্যত তাঁর মাথায় যেন বজ্রপাত হল।

'সে কী? কম্পারেটিভ লিটরেচার কনফারেন্স? তার তো এখনও আটদিন দেরি

আছে। ম্যাডাম, আপনি কি এখন থেকেই....? মানে এমনিতে এটা তো ছেলেদের হস্টেল? তাই....।'

হায়! এই কী কানাডার 'বিশিষ্ট' অতিথিকে বরণ করার উপযুক্ত বাক্য? যার মানে যাই হোক, অবস্থাটা বুঝিয়ে বলতেই ঠাঁই পাওয়া গেল। কিন্তু 'বিশিষ্ট ভ্রমণকারী' পর্যায়ের কার্যক্রম অনুযায়ী নয়, আমার তো সন্দেহ, আশ্রয়টা মিলেছিল 'সহায়হীনা নারী' পর্যায়ের কার্যক্রমেই। নারী-মুক্তি আন্দোলন তখনও এতটা চালু হয়নি। তাই। হলে কী হত, বলা যায় না।

খুকুকে ট্রাংককল করে খবর দিতেই একচোট বকুনি খেলুম— 'দিদিভাই, তোমার আক্কেলটা কবে হবে? অতদিন আগে থেকে ভিসা করিয়ে রাখে কেউ? কী করে যে এতদূর এসে পৌঁছোলে!' তাও তো খুকু কিছুই জানে না। পাসপোর্টের কথাটা, পেপারের কথাটা। বম্বের পাইলটদের কথাটা, জেনিভা এয়ারপোর্টের পুলিস, ব্যাংককের সিক্রেট পুলিস— কোনও কথাই তো খুকুকে বলিনি।

৮

পরদিন সেই হোস্টেল সুপারিনটেনডেনট ছেলেটারই সহায়তায় ভিসা-টিসা সব হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা লস এঞ্জেলেসের দিকে রওনা দিলুম। আমি নামতেই খুকু আর রুঙ্কু দৌড়ে এল— 'বাববা রে। চব্বিশ....ঘণ্টা লেট? কই, তোমার বাক্স-প্যাঁটরা কই?'

—'তাই তো? আমার স্যুটকেস?' ওটা তো কালই চলে এসেছে, প্লেন থেকে প্লেনে সোজাসুজি, বিনা ভিসাতেই। ব্যাগেজ অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখি বাকস আসেনি।

—'সে কী? এল না কেন?' ব্যাগেজ সুন্দরী বললেন— 'রাত ঢের হল। আজ বাড়ি যান। কাল এসে জেনে যাবেন বরং কেন আসেনি।'

—'বাঃ! আজ বাড়ি যান' মানে? কাপড় বদলাতে হবে না? কী পরে শোব? দাঁত মাজব কী দিয়ে? কোথায় গেল আমার স্যুটকেস?'

'সেজন্যে এই ওভারনাইট কমপেনসেশান নিয়ে যান, দশ ডলার। কাল খবর নেবেন কী হল বাক্সের।'

—'কী কইলেন? কত কইলেন?'

রুংকু হঠাৎ বাঙাল ভাষায় তীব্র ঝাপটে ওঠে। ব্যস্ত হয়ে মার্কিন মেম বলে ওঠেন— 'বেশ তো, দশে না পোষালে পঁচিশই নিন? ওটাই ম্যাকসিমাম।' বলে একটা ছাপা কাগজ টেবিলের এপাশে ঠেলে দিলেন। তাতে লেখা আছে— 'ওভার নাইট কমপেনসেশান হিসেবে যাত্রীর পাওনা একসেট রাত্রিবাস; একসেট অন্তর্বাস; দুটো (বড় ও ছোট) তোয়ালে; একটা শার্ট; একসেট দাড়ি কামানর সরঞ্জাম; চিরুনি; চুলের বুরুশ; মাজন; দাঁতের বুরুশ; সাবান; পাউডার; একটা রুমাল; একটি টাই;

একজোড়া মোজা; যাত্রীর উক্ত বাবদে মোট পঁচিশ ডলার পর্যন্ত প্রাপ্য।' খুকু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে— 'তালিকাটি কি 'পাইওনিয়ার'-দের জন্যে তৈরি হয়েছিল? যখন প্রথম রেলটেল বসছিল?'

—'তার মানে?' সুন্দরীর ভুরু জট পাকিয়ে যায়।

—'মানে এই যুগে ওই টাকাতে ঠিক—'

ব্যাগেজ ক্লার্ক হেসে ফেলে বলেন— 'আমারও নিরুপায়, নিয়ম, নিয়মই, রাত্রিবাস আর মাজন বুরুশটা তো কিনতে পারবেন? নিয়ে নিন টাকাটা, কোম্পানি যখন দিচ্ছে।'

অগত্যা বাকসের বদলে পঁচিশ ডলার নিয়েই ঘরে যাই।

৯

পরদিন ক্লোদস-ক্রাইসিস। খুকু বা রুঙ্কুর কোনও জামাটামাই আমার হয় না। কী পরি? কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমাকে নিয়ে ওরা মুশকিলে পড়ে যায়। আমার ভারি দক্ষিণী সিল্ক লস এঞ্জেলেসের ওই ভ্যাপসা বিদঘুটে গরমে পরে থাকা অসম্ভব। (স্ট্রোক হয়ে যাবে)! আমার কাছে টাকাকড়িও যৎসামান্য। খুকু-রিঙ্কু দুজনেই ছাত্রী, দু-জনের অবস্থাই 'টেনে-টুনে'। খুকু বললে— কুছ পরোয়া নেই। চল 'ফাইভ ডলার স্টোর্সে', সেটা স্যালভেশন আর্মির দোকান। ওদের সব ভিক্ষালব্ধ জিনিসপত্র ওখানে সস্তায় বিক্রি হয়। ছ্যে-ছ্যে-আনা, যা-লেবে-তো-ছ্যে আনা। অর্থাৎ পাঁচ পাঁচ ডলার। একটা ধোলাই-ঝোলাই শার্ট আর একটা ঢলঢলে বিপুল কোমর-ওয়ালা লিভাইস (ব্লু জীনস) কেনা হল। কিন্তু বেল্ট? সেও পাঁচ? না বাবা, বেলটে কাজ নেই। যাকগে খুকু, ঘরে পাড়টাড়ও নেই রে?'

—'কী যে বল দিদি, এখানে পাড় থাকবে কী করে? সুতী কাপড় কেউ পরে?'

পাড় না থাকে দড়িটড়ি একটা যোগাড় করে নেব এখন, বলতে না বলতেই দেখি ফুটপাতে কেউ একটা কাগজের প্যাকিং খুলে ফেলে দিয়েছে, তার পাশেই একটি চমৎকার মোটাসোটা নাইলনের লাক লাইন দড়ি! বা, বা, ভগবানের কী সুব্যবস্থা। 'এই তো! পেয়েছি, পেয়েছি!' —চীৎকার করে উঠলেন ডক্টর দেবসেন, আর্কিমিডিসের মত মহোল্লাসে। তারপরেই ফুটপাতে ডাইভ দিয়ে পড়ে আবর্জনার পাশ থেকে ছোঁ মেরে দড়িটা তুলে নিলেন। তারপর থেকে পোশাক নিয়ে ভাবতে হল না বাকি ছ-দিন। কোমরে দড়ি থাকলে পাছে জেল-পালান কয়েদী ভাবে, তাই শার্টটা কেবল ওপরে ঝুলিয়ে রাখা হল।

১০

স্যুটকেস উদ্ধারই লস এঞ্জেলেসে আমার প্রধান প্রোগ্রাম হয়ে দাঁড়াল। হয়ত আরও টুরিস্ট স্পট ছিল শহরটিতে। আমি কেবল দেখলুম এয়ারপোর্টের ব্যাগেজ

অফিসটাই। তারা অবশ্য আমার একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র আনতে যথাসাধ্য চেষ্টা করল, বহু বিচিত্র বাক্স-সমাচার সাপ্লাই দিয়ে।

প্রথম দিন লজ্জিত মুখে বলল, অত্যন্ত দুঃখিত, খবরটা এখনও পাইনি।

দ্বিতীয় দিন কড়া মেজাজে বলল, তোমার ব্যাগ তো লণ্ডনই ছাড়েনি এখনও, আমরা দেব কোত্থেকে?

তৃতীয় দিন পিঠ চাপড়ে বলল, ব্যাগ মন্ট্রিয়লে এসে পৌঁছেছে। আর তোমার ভাবনা নেই। এইবার এসে পড়বে।

চতুর্থ দিনে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, একদিন ডিলেইড হয়ে গিয়েছে, আনঅ্যাকম্পানিড তো, ওরকম হয়ে যায়। কালকেই আসবে। ডোন্ট ইউ ওয়ারি।

পঞ্চম দিনে সকালেই একটা ফোন এল— 'ডক্টর দেবসেন?' ভদ্র, বিনীত, কবোষ্ণ পুং কণ্ঠ— 'এয়ারপোর্ট থেকে বলছি। আপনার ঐ স্যুটকেসটার খবর পেলেন কিছু?'

'আপনারা পেয়েছেন?'

—'হ্যাঁ, ধন্যবাদ, আজই আসবে মন্ট্রিয়ল!'

—'মন্ট্রিয়ল থেকে? ও! আচ্ছা, একটা কথা ছিল— ওটা যে মন্ট্রিয়লেই আছে আপনি এ খবরটা পেলেন কোথায়?'

—'কেন? কাল আপনারাই তো বললেন—'

—'আমরা? মানে আমি? না-না, আমি নিশ্চয়ই বলিনি। আমাকেই তো আপনি এইমাত্র বললেন! আমার কাছে খবর তো অন্যরকম ছিল।'

—'সে কী? অন্য খবরটা আবার কী রকম?'

—'আপনার বাক্স ভুল করে টরন্টোতে নেমে গেছে!'

—'স্যুটকেস আবার ভুল করে নেমে যাবে কী? স্যুটকেসের কি ভুল করার ক্ষমতা আছে? ভুল তো কেবল মানুষই করে— শেক্সপীয়র বলেছেন।'

—'দেখুন ডক্টর, শেক্সপীয়র অনেক পুরন লোক, উনি যাই বলুন, কান দেবেন না। এখনকার দিনকালে সব পাল্টে গেছে। উনি এয়ারলাইন্সের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। স্যুটকেসের এরকম ভুলভ্রান্তি হামেশাই হয়ে থাকে। এই সেদিনই একটা স্যুটকেস— তার জাপান থেকে ব্রাজিল যাবার কথা, টোকিও-টু-রিও, চলে এল নর্থ আমেরিকা, লস এঞ্জেলেস। এরকম ভুল খুবই স্বাভাবিক।'

—'তা সুটকেস নিতে কি আমাকে টরন্টো যেতে হবে?'

—'ছি ছি, সে কি কথা। আমরা তো আপনাদের সেবাতেই সদা-সর্বদা! যাত্রীদের ঝামেলা বাধান আমাদের পলিসি বিরুদ্ধ। আপনার বাক্স এসে যাবে। কাল-পরশু নাগাদ একটা ফোন করে দেখবেন।'

—'কালই আমি মন্ট্রিয়ল ফিরে যাচ্ছি। আমার পরশু থেকে কনফারেন্স শুরু। পরনে একটা ভদ্রস্থ পোশাক নেই আমার। আপনাদের যাত্রীসেবার ফলে।'

—'কেন, এখন কী পরে রয়েছেন?'

'দশ টাকা দামের দু-খানা স্যালভেনশন আর্মির ভিক্ষে পাওয়া শার্টপ্যান্ট। এটা পরে আন্তর্জাতিক সভায় পেপার দেওয়া যায় কি?'

—'সে তো বটেই! সে তো বটেই! নিশ্চয়ই না! ছি ছি, কী কাণ্ড। কিনে ফেলুন!'

—'আপনারা তার টাকা দিলেন কই? আমাদের হাতে ফরেন এক্সচেঞ্জই নেই!'

—'ছি ছি, অতি বাজে সরকার তো আপনাদের? কিপ্টে, অবিমৃষ্যকারী, দেশবাসীর কথা চিন্তা করে না!'

—'অকারণে আমাদের সরকারকে গাল দিয়ে নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকবার চেষ্টা করবেন না— বুঝলেন?'

—'অকর্মণ্যতা? দেখুন, আমরা সদাসর্বদাই যাত্রীদের সেবায় নিযুক্ত! নতুবা আপনাকে ফোন করছি কেন? বলুন, এই ফোনটা কে করেছে, আপনি না আমি?

—'তা তো বটেই। স্যুটকেসটা কে হারিয়েছে? আমি? না আপনি? উল্টোপাল্টা খবরগুলোই বা কে সাপ্লাই দিচ্ছে? আমি? না—'

—'দেখুন, লেটস বি ফ্রেণ্ডস। রাগারাগি বড়ই অস্বাস্থ্যকর। আপনিই তো বললেন শেক্সপীয়র বলেছেন ভুল মানুষ মাত্রই করে। আমরাও তো মানুষ, তাই না? উমম?' কবোষ্ণ কণ্ঠটি প্রগাঢ় রকম মানুষী হয়ে উঠছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি বলি:

—'ঠিক আছে, যাবার আগে কাল একবার খোঁজ করব নিশ্চয়ই। নইলে বাক্সটা আসবামাত্রই মন্ট্রিয়লে পাঠিয়ে দেবেন— সেই ইনস্ট্রাকশনই লিখে রাখুন।'

—'কালই আপনার হাতে বাক্স তুলে দেবার মহৎ সৌভাগ্য হবে আমাদের, —কথা দিচ্ছি আপনাকে। দেখে নেবেন আপনি।'

পরদিন সারা সকাল ধরে এয়ারপোর্টে তোলপাড় করে ফেলে অনেক খুঁজে পেতে নানা অফিসে ঠোক্কর খেতে খেতে শেষে ধু-ধু তেপান্তরের মধ্যস্থিত এক ব্যারাকঘরের গুমোট মালগুদোমে পৌঁছুই।

—'আপনারা কেউ ফোন করেছিলেন আমাকে?'

উত্তর না দিয়ে কর্মরত তিনমূর্তি চোখ তুলে কেবল আমাদের আপাদমস্তক নীরবে পর্যবেক্ষণ করেন। সেই নিরীক্ষার নিচে আমার শার্টের তলা থেকে লাক লাইন দড়িটা বাইরে ঝুলছে বুঝতে পেরে, চট করে আমি ওটা কোমরে গুঁজে নিই। এসবে আবার ইম্প্রেশন খারাপ হয়ে যায় কিনা! যথাসাধ্য গম্ভীরভাবে তাই এবারে উচ্চারণ করি—

—'আমিই ডক্টর দেবসেন।'

—'সুখী হলাম। তা কী করতে পারি আমরা আপনার জন্য'— নিরাসক্ত উত্তর আসে।

—'আমার সুটকেসটা কী কালকে টরন্টো থেকে এখানে এসেছে?'

তিনমূর্তি একসঙ্গে মাথা নেড়ে জানালেন— 'সুটকেস? কোনও সুটকেস আসেনি।' সত্যিই, ঘরভর্তি দেখা যাচ্ছে কেবল প্যাকিং বাক্স।

হঠাৎ তর্জনী উঁচিয়ে রুংকু চেঁচিয়ে ওঠে— 'দিদিভাই, ওটা নয় তো?'

দেখি ঘরের এক কোণে, বড় বড় প্যাকিং বাক্সের মাঝখানে, চেড়ীবেষ্টিত সীতার মতো ধূলিমলিন, অযত্নলাঞ্ছিত, স্বজনবিহীন, একটি নীলাভ নাইলনের সুটকেস অসহায় পড়ে আছে। 'ওই তো, ওই তো আমার সুটকেস!' সিকি মুহূর্তেই প্যাকিং বাক্সগুলির ওপর এক লম্ফে উঠে পড়ে, পড়ি-মরি করে সেগুলি মাড়িয়ে দুড়দাড় দৌড়ে পদভরে ধরণী কম্পিত করে, আকুলভাবে আপন বাক্সের সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়েন ডক্টর শ্রীমতী দেবসেন।

ভাবখানা— 'অনেক সাধায়ে অনেক কাঁদায়ে দরশ মিলালি মোরে, বঁধূ আর না ছাড়িব তোরে।' তাঁর মুখে হারামাণিক পাওয়ার দিব্যবিভা, সর্ব অঙ্গে দুর্গম গিরি কান্তার মরু লঙ্ঘনের বিমল জ্যোতি। আর গুদামঘরে প্রবল ধুলো উড়তে থাকে তাঁর আকস্মিক দাপাদাপির ফলে। প্রস্তরীভূত তিনমূর্তির একজন স্তব্ধতা থেকে কষ্টেসৃষ্টে নিজেদের উদ্ধার করে বলেন—

'কী আশ্চর্য, আপনি তো বললেন, টরন্টো থেকে আপনার সুটকেস গতকাল আসার কথা। ওটা তো গত এক সপ্তাহ ধরেই এখানে মন্ট্রিয়ল থেকে এসে অবধি আনক্লেইমড পড়ে রয়েছে।'

শুনেও মনে আরাম হল। আঃ! যেন মাতৃভূমিতে আছি। এই নাকি মার্কিন এফিসিয়েন্সি, যা প্রবাদে পরিণত? এ তো ঠিক আমার দেশের মতোই! মালের টিকিট নম্বর, ভাঙাচোরা, টোল-তোবড়ানো সব লক্ষণ মিলে গেল। এবার কাস্টমস চেকিং হবে। বিপুল হাতব্যাগটা হাতড়ে কোথাও চাবি মিলল না। হাতব্যাগটা মেঝেয় উপুড় করে ঢেলে ফেলি। দেশ-বিদেশের খুচরো পয়সা, গলা-পচা লজেঞ্চুস, প্লেনে চুরি করা খুদে সাবান, অ্যানাসিন বড়ি, হাঁপানির বড়ি, ধুলো ধুলো এলাচ-সুপুরি লিপস্টিক, চুলের কাঁটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। চাবির চিহ্ন নেই। খুকু-রিংকুর চাবিগুলো সব একে একে ট্রাই করি। লাগে না। এবার কাস্টমসের তিনমূর্তি আসরে নামলেন। প্রথমে একগুচ্ছ পরচাবি নিয়ে। কিন্তু এইসা শক্তপোক্ত বৃটিশ গা-চাবি, মার্কিন পরচাবির কোনটাতেই স্যুটকেস খুলল না। তারপর ওঁরা একটা চুলের ক্লিপ চাইলেন, এবং পটাং।!

তারপর সাহ্লাদে শাড়ি-ব্লাউজ-শালের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়েন কর্তব্যপরায়ণ তিন সাহেব। এক সময়ে কোণ থেকে কী যেন বেরিয়ে পড়ল। দুটো ছোট প্যাকেট, শাড়ির ভাঁজে ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আবহাওয়া পাল্টে যায়। হলদে সিলোফেনে মোড়া দুটো চার বাই তিন বাই দুই ইঞ্চি প্যাকেট, ভেতরে ঘন-কালচে ব্রাউন বস্তু— বেশ ভারি। ঘরে যেন এইমাত্র কারো মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে। ছুঁচ পড়লেও শব্দ হবে। ব্যাপারটা

কী?

বাণ্ডিল যিনি বের করলেন, তিনি ঝড়ের আগের আকাশ-নিবাতনিষ্কম্প, মোটা সঙ্গীকে নির্বাক ইশারা, মোটা সঙ্গী এগিয়ে এসে প্যাকেট নিরীক্ষণ করেন। তিনি প্রবলতর গাম্ভীর্যে নিটোল হয়ে কালো সঙ্গীকে ইশারা করলেন। কালো সঙ্গী এসে এক নজরে জিনিসটি লক্ষ করেই নিশ্চিত, 'দ্যাটস ইট!' ভয়াবহ নৈঃশব্দ্য। হাতঘড়ির টিকটিক শব্দ যেন মাইক্রোফোনে বাজছে, আমাদের দিকে তাকালেন তিনজন বিচারক, নেত্রপাতে মৃত্যুদণ্ড।

আস্তে আস্তে কথা বলেন বড়কর্তা— 'এইবার বুঝে গেছি সুটকেস কেন আনঅ্যাকম্প্যানিড আসে। কেন আনক্লেইমড হয়ে মাল ট্রেন-গুদোমে পড়ে থাকে। কেন চাবি থাকে না কাছে। কেন এমন আলুথালু ভাব, মন্ট্রিয়ল না বলে টরন্টো বলা হয় কেন? সাতদিন আগে না বলে বলা কেন হয় কাল, এইবার সব বুঝে গেছি!'

ভাল কথা, কিন্তু আমি তো বুঝিনি। এ আবার কীরকম কথাবার্তা! এবারে মোটাকর্তা প্রশ্ন শুরু করেন (একেই বোধকরি 'জেরা' বলে)।

—'এটা কার মাল?'

—'আমার।'

—'পাসপোর্ট কই?'

—'এই যে।' নিয়ে খুব ভাল করে দ্যাখেন তিনজনে, উল্টে-পাল্টে। তারপর বুক পকেটে রাখেন একজন। (কেনরে বাবা)?

—'এ বস্তুদুটোও তোমার?'

—'নিশ্চয়ই—'

—'দেখি', সবগুলোই হাতিয়ে নিয়ে পকেটে পুরে ফেলেন মোটাকর্তা। বড়কর্তা তর্জনী নির্দেশে প্যাকেটদুটি দেখান।

—'সুইটস'।

তিনজনে চোখাচোখি হয়। কালোকর্তা বলেন— 'ওদের খবর দিই?'

মোটাকর্তা বলেন— 'নিশ্চয়ই।'

বড়কর্তা বলেন— 'শিট?'

মোটা বলেন— 'শিওর। শিট।'

কালো বলেন— 'ইয়াঃ, শিট।'

আশ্চর্য অসভ্য তো! তিন-তিনটে মেয়ের সামনে অকারণে মুখ খারাপ করা! কী শিট শিট করছে! আমার কথাটা বিশ্বাস হল না? বুলশিট? গুল? 'বিশেষ আমন্ত্রণে' এসেছি বাবু পরের দেশে; সেধে সেধে নয়; তার মানে কি পদে পদে এমনি অপমান?

রাগে ঝনঝন করে বলি— 'অফকোর্স নট, সব সত্যি কথা. ওটা মিষ্টান্ন।'

আবার চোখাচোখি। স্বর্গীয় মোলায়েম হাসা তিনটি মুখেই বিছিয়ে যায় নিঃশব্দে। তাতে হাড়ের মধ্যে হিম হিম ভাব হয়। সিনেমায় ভিলেনরা যেভাবে হাসে আর কি। আমার রাগ বেড়ে যায়।

—'নাও বন্ধ কর আমার বাকস, ঢের হয়েছে। আমার প্লেনের সময় হয়ে যাচ্ছে।'

—'এখন তো যাওয়া হবে না। আগে অন্য ডিপার্টমেন্টের লোকেরা আসুক। তোমাদের দেখাশুনো তারাই করবে। বাকস-টাকস আজ ছাড়ছি না। পাসপোর্টও রইল।'

এই সময়ে খুকু হঠাৎ যেন স্বপ্নোত্থিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'নো, নো, নো গুড গ্রেশাস! ইটস নট শিট। ইটস নট শিট। ইটস..... ইটস, ও দিদি, আমসত্ত্বের ইংরিজিটা..... শিগগিরি....ওরা এগুলকে গাঁজাটাজা চরস-টরস ভেবেছে। 'শিট' হলো মারিহুয়ানার স্ল্যাং— এই বোকাগুলো ভেবেছে তুমি বুঝি....'—হইহই করে হেসে উঠছি আমরা তিনজনে, ও হরি! তাই বল! এইজন্যে এত শিট—শিটুলি। তিনজনের এইজন্যে ওই গোমড়া আনন আর ঢোয়াড়ে বচন? হায় রে! এই তোমাদের কাস্টমসের ট্রেনিং?

এও ছিল 'বিশিষ্ট অতিথি'র কপালে? ঝি-গিরির দায় থেকে শুরু করে শেষটায় গাঁজা চুরির দায়েও পড়লুম? হায়, নারকটিক্স স্মাগলিং। ঈদৃশ সসম্ভ্রম গূঢ়কর্ম কী আমাদিগের ন্যায় অগ্রপশ্চাৎ অবিবেচনাকারী ভেতো মাস্টারের ক্ষুদ্রবক্ষের পাটায় সম্ভব? তোরা কী লোকও চিনিসনে বাছারা? গাঁজা না হয় নাই চিনলি। ওসব জিনিস যে একটুখানি পুড়িয়ে ছাই করে নাকে শুঁকে দেখতে হয় সেও জানিসনে? গন্ধেই তো টের পাবি কী বস্তু। ওদের ইনএফিসিয়েন্সিতে মুগ্ধ, দয়ার্দ্র, বিগলিত করুণা, জাহ্নবী যমুনা হয়ে বলি: 'দিস ইজ নট ইওর স্টাফ, প্লীজ রিল্যাক্স, জাস্ট স্মেল ইট—'

একটি প্যাকেট ওদের হাতে তুলে দিই। কালোকর্তা শোঁকেন। ভুরু কুঁচকে যেন ধাঁধায় পড়ে যান, বলেন— 'স্মেলস ফ্রুটি!' মোটাকর্তা শোঁকেন-গম্ভীর হয়ে বলেন, 'পারফিউমড।' বড়কর্তা শোঁকেন, বজ্রগম্ভীরে বলেন— 'ইয়াঃ! পারফিউমড।'

আমি রাগ করে প্যাকেটটা কেড়ে নিই, 'দুর-ছাই, পারফিউমড হবে কেন, ম্যাংগো। ইটস রিয়াল ম্যাংগো। ম্যাংগো ক্যানডি' —বলতে বলতে পাতলা কাগজ ছিঁড়ে একপরত আমসত্ত্ব তুলে নিই এবং কামড় বসাই— 'লুক, ইটস এভিডেন্টলি এডিবল।' আমসত্ত্বের সুরভিত বিচলিত বোধ করে, 'ছি! দিদি! কি রকম স্বার্থপরতা হচ্ছে ওটা?' বলতে বলতে খুকু আমার মুখ থেকে চট করে বাকিটা আমসত্ত্ব কেড়ে নেয় এবং 'অ্যাণ্ড ইন ফ্যাক্ট ইটস মোস্ট ডিলি-শস!' বলে চোখ বুজে মুখে পুরে ফেলে। রিংকুটা ঠাণ্ডা মানুষ। ও অন্য প্যাকেটটা তুলে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খুলে একটি পরত বের করে ধীরে সুস্থে চোষে, তারপর আরেকটাও বের করে।

মোটাকর্তাকে বলে—'উড ইয়ু লাইক সাম?' মোটা তাকায় বড়র দিকে, বড় তাকায় কালো দিকে। কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পরে কালোকর্তা মনে বল পায়। হাত বাড়িয়ে আমসত্ত্ব নেয়। 'থ্যাংক্স' বলতেও ভোলে না। তারপর কেমিস্ট্রি প্র্যাটিক্যালের সল্ট টেস্টিংয়ের মত সন্তর্পণে একটুখানি জিভে ঠেকায়। প্রতীক্ষায় ঘরের বাতাস এত অধৈর্য, যেন নিশ্বাস ফেললেও টং করে শব্দ হবে।

তারপরেই দৃশ্যপটের ঐন্দ্রজালিক পরিবর্তন। মুখে শৈশবের স্বর্গীয় হাসি, চোখে প্রথম প্রেমের উজ্জ্বলতা, সর্ব অবয়বে টেনশন মুক্তির তরল আরাম নিয়ে গুদোম ফাটিয়ে হেসে ওঠেন কালোকর্তা। সঙ্গে সঙ্গেই বাকি দুজনে হাত বাড়িয়ে খাবলে-খুবলে এক এক টুকরো আমসত্ত্ব খামচে ছিঁড়ে নেন এবং মুখে পুরে ফেলেন। প্রথম প্যাকেটটা ওদের মোক্ষম থাবায় চলে যায়। অন্যটা আমি চট করে ব্যাগে ভরে ফেলি। কোণে ঠেলে নিয়ে গেলে খরগোশেও কামড়ে দেয়। তাই, রিংকু হঠাৎ —'খুকুরে —হ্যাংলা ব্যাটার আমাদের আমসত্ত্ব যে রাখলে না'— বলতে বলতে সাহেবের থাবা থেকে এক ঝটকায় অন্য প্যাকেটটা ছিনিয়ে নেয়। তক্ষুণি খুকু বলে ওঠে— 'দেখুন, আপনাদের মহামান্য নারকটিকস স্কোয়াডকে কিন্তু আমাদের এই অমূল্য ম্যাংগো ক্যানডি খাওয়াতে পারব না। পাসপোর্ট-টাসপোর্টগুলো এবার বরং দিয়ে দিন. দিদির ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে।' সলজ্জভাবে আমসত্ত্ব চাটতে চাটতে ওদিকে তিন কর্তা আড়ে আড়ে তাকান, ঠারে ঠারে হাসেন। বিনয়ে দু'ভাঁজ হয়ে পড়ে, বড়কর্তা বলেন-- 'উই আর রিয়্যালি সরি। ইট ওয়াজ আ জেনুয়াইন মিসটেক!' ঝাঁকুনির চোটে আমার হাত প্রায় গুঁড়িয়ে যায়!

পরিশিষ্ট: এইবারে টের পেলেন তো হরিদাস পালেদের বিদেশ যাত্রা কেমন ধরনের হয়? প্রাণের আরাম? আত্মার শান্তি?

ভার্জিনিয়ার ফরেস্ট রেনজার রয় সলিভ্যান ছ-ছ'বার বজ্রাহত হয়েও বহাল তবিয়তে বেঁচে থেকে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেছেন বলে পড়েছি। আর এই বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ বিদেশে যেতে গিয়ে শতবার বজ্রাহত হয়েও বহাল তবিয়তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এবং তারপরেই বরমাল্য ও করতালির অমর কাহিনীটি লেখা হয়ে যায়। এই যেমন ডক্টর দেবসেনেরটা এইমাত্র পড়লেন। যাত্রায় যত দুর্যোগই আসুক না কেন, এমনকি ভ্রমণটাও যদি ফসকে যায়, আপনার কপালে কাহিনীটি তাই বলে ফসকাবে না! হ্যাঁ! সেটি পাবেন।

[কিন্তু যে যাই বলুন দুর্ঘটনায় বাস্তবের কাছে কল্পনা দাঁড়াতে পারে না। এখানে বর্ণিত প্রত্যেকটি ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য. প্রতি ক্ষেত্রেই বহু সাক্ষী বর্তমান আছেন. যদিও, তাঁরা না-থাকলেই বেশি ভাল হত!]

অলৌকিক রত্নভস্ম এবং নন্দকাকু

হাঁপানির কল্যাণে আমার জগৎজোড়া হিতার্থী। আমার ঘরভরা শিশি-বোতল, খল-নুড়ি ছুঁচ-সিরিঞ্জ, যোগ-বিয়োগ, অম্বু-জম্বু শেকড়-বাকড় মাদুলি-কবচ, তৈল-ঘৃত, ধাতু-পাথর, বড়ি-গুলি, ধুলো-গুঁড়ো, তুক-তাক। নেই কী? চর্ব্য-চষ্য-লেহ্য-পেয়-ধার্য-ঘ্রেয়-ভিদ্য-ছিদ্য-মালিশ্য সর্বস্ব! এবং অধিকাংশই বিনামূল্যে প্রাপ্ত, ফ্রী সাপ্লাই। কে বলে তোমারে রুগী, অবান্ধব, একা? শুভার্থী ফিরিছে সদা তোমার পিছনে। সেই যে বীরবল বলেছেন না আমরা প্রত্যেকেই খানিকটা ডাক্তারি আর খানিকটা আইন জানি— এই মন্তব্যটির প্রথমার্ধ যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি তা আমি জেনে গেছি। মর্মে মর্মে।

হাঁপানির অব্যর্থ দাওয়াই দেয় না কে? জিতন, আমাদের ধোপা, ফি-হপ্তায় আমাকে বলে যায়— 'দিদি, এইসা চলনে সে তো মর যাও গে! হমারা বাত তো শুন। পানকা পত্তি লে-কে ভৈঁসাঘিউ ঔর গোলমির্চ গরম করকে উস পত্তিমে ডালকে সিনাপর মালিশ কর লো, হর-রাতকো, সোনেকো টাইমমে' —খুশিলাল, পাড়ার রিকশাওলা, আমি চড়লেই বলবে— 'দিদিমুণিকো ইতনা খাঁসি। বহোৎ পরেশানি কো বাত। এক কাম করো, হর রোজ সুবা-সাম লৌসন খায়া করো, কাচ্চা লৌসন, একদম ঠিকঠাক হো যায়গা।' বাসে—ট্রামে আমার হাড় কাঁপান হেঁপো কাশির ধাক্কায় অস্থির হয়ে সহযাত্রী-যাত্রিণীরা আমাকে অবিলম্বেই চিত্রকূট হায়দ্রাবাদে, কি পাহাড়পুরে, নিদেনপক্ষে মধ্যমগ্রামে পাঠিয়ে দিতে চান। সর্বত্রই হাঁপানির 'অব্যর্থ' ওষুধ পাওয়া যায়। সেসব 'সেবন' করাও খুবই সহজ। কোথাও চাঁদের আলোতে পায়েস রান্না করে খেতে হবে, কোথাও কাঁচা পুঁটিমাছ (নাকি চারা পোনা?) জ্যান্ত কপ করে গিলে ফেলতে হবে (হাঁপানির ওষুধটা সেই মাছই খাবে, আমি না)। কোথাও আস্ত চাঁপাকলা না চিবিয়ে খেয়ে নিতে হবে, তারপর থেকে কদলী সম্পর্কিত যাবতীয় দ্রব্য ভক্ষণ ও স্পর্শন নিষিদ্ধ। (অর্থাৎ কাকিমার কুকিং ক্লাসে শেখা বানানা ফ্রিটার্স এবং কাঁচাকলার কোপ্তা, মামণির মোচাঘণ্ট, পিসিমার থোড়

ছেঁচকি, কেরালার বানানা চিপস এসব তো ঘুচবেই, নেমন্তন্ন খাওয়াও চুলোয় গেল, কলাপাতার ছোঁওয়া খাওয়া বারণ— তাহলে ইলিশ মাছের পাতুরিটাই বা কিসে হবে? দূর, অমন সর্বনেশে ওষুধ কেউ খায়?) এতৎসত্ত্বেও আমি যথাসাধ্য প্রত্যেকের এনে দেওয়া ওষুধপত্তর, জড়িবুটি, মাদুলি, কবচ —সবকিছুই দু'চারদিন সশ্রদ্ধায় মাথায় করে পালন করি। (নইলে তো আমি নেকহারাম নরাধম—। অন্যের নিঃস্বার্থ কষ্ট স্বীকারের মূল্য দিই না— সেক্ষেত্রে আমার মতো লোকের হাঁপানির যাতনা ভোগ করাটাই উচিত)। আমি যথাসাধ্য বিশ্বাস ও মনোযোগের সঙ্গে ট্রায়াল দিই কিন্তু কোথা দিয়ে যেন, কেমন করে যেন, কখন যেন— সব ভুল-ভাল হয়ে যায়। মাদুলিটা পরেই ভুল করে কারুর জন্য শোকে অধীর হয়ে শ্মশানে ছুটে যাই। (মাদুলির, আঁতুড়ে আর শ্মশানে যাওয়া সর্বদা বারণ)। ওষুধের কলাটা খেয়েই ভুল করে লোভে পড়ে বানান মিল্ক শেক খেয়ে ফেলি, এইসব গড়বড় হয়ে যায় আমার। এগুলো মোটেই ইচ্ছাকৃত নয়। আলস্য আর অন্যমনস্কতার একটা ডেডলি কম্বিনেশন। আসলে নিয়ম মানা আমার স্বভাবে নেই। আমি বড্ড উড়নচণ্ডে, এলোমেলো।

নন্দকাকুর কিন্তু কিচ্ছুটি ভুল হয় না। তিনি নিবিষ্ট মনে, হুবহু, আগাপাছতলা 'লাগাতার' নিয়ম মেনে, একের পরে এক নিত্য নতুন হাঁপানির 'অব্যর্থ' বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্ট করেই চলেন। অ্যালো, বায়ো, হোমিও, আয়ুর্বেদীয়, চৈনিক, যৌগিক স-ব। কাকা-ভাইঝি একসূত্রে বাঁধা আছি, প্রথমত, ফুসফুসে, সে সূত্রটা হাঁপানির। দ্বিতীয় সূত্র হৃদয়ের, অর্থাৎ কাকিমা। আমরা দুজনেই কাকিমার রীতিমত প্রিয়পাত্র। (এবং সেটাও সোজা ব্যাপার নয়।)

নন্দকাকুর একসপেরিমেন্টাল অ্যাজমো-লজিতে আমার আপত্তি ছিল না যদি না তিনি সেগুলো তাঁর আদরের 'খুকু'র ওপরেও চালু করতে চাইতেন। আরে, সবার সব উপদেশই নন্দকাকুর কাছে দৈববার্তা, সারমন অন দ্য মাউন্ট। তাঁর তুলনায় আমি একটা হতভাগ্য, অবিশ্বাসী, পাপীয়সী— কেননা আমার ভগবান হাঁপানির দাওয়াই দেন না— তিনি ব্যস্ত জন্ম-মৃত্যু, বন্ধন-মুক্তি, এই সমস্ত দেওয়া থোওয়ায়। নন্দকাকু চান বিশ্বের হাঁপানি রুগীদের একটা ইউনিয়ন বানাতে। নিদেনপক্ষে একটা বেরাদরি— ব্রাদারহুড —যেখানে 'সংবাদ বিচিত্রা' বুলেটিন বেরুবে, ঔষুধ-চিকিৎসার দিশি-বিলিতি আধুনিকতম খবর সব বদলা-বদলি হবে। 'জগতের যত হাঁপানি রুগী এক হও; তোমাদের হারাবার কিছু নেই, হাঁপটি ভিন্ন।' নন্দকাকুর মধ্যে সর্বদা একটা মিশনারি স্পিরিট কাজ করে। আর হাতের কাছে অভাগা আমি কেবল আমিই। উনি যদিও ভবানীপুরে, আমি বালিগঞ্জে। তা সত্ত্বেও।

নন্দকাকুর বাড়িতে নিয়মিত কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়। আজ শুনছি সব রান্না হচ্ছে কাঠকয়লায়, একমাত্র কাঠের আগুন চলবে। কালকেই শুনছি ও-বাড়িতে কাঠের গুঁড়ো জ্বালিয়ে ধুনো দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ। আজ শুনছি রাত্রের খাওয়া আটটার সময়

সারতে হবে, পাংচুয়ালি— কাল শুনছি রাত্রের খাওয়া সূর্যাস্তের পূর্বেই শেষ করা দরকার। কাকিমা স্বয়ং দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, তাই পাগল হন না। কেবলই রোগা হন। এমন সময় নন্দকাকু একদিন লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। সোজা তিনতলায়। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে।

—'বৌদি, খুকুকে এবার সারিয়ে দেবই। আসল লোক পেয়েছি।'

—'আগে তো নিজেকে সারাও।' মার নির্বিকার উত্তর।

—'আমি তো আজকাল সেরেই গেছি। এই দেখুন।' বলেই নন্দকাকু জোড়া পায়ে লাফ দিয়ে পৌষমেলায় কেনা মোড়াটার ওপর টক করে উঠে পড়লেন। মোড়াটা থরথরিয়ে কাঁপল। নন্দকাকুও। কাশির ঝোঁকে।

'আহা! আহা! পড়ে যাবে যে ঠাকুরপো!'

—'মোটেই পড়ব না। এই দেখুন!' নন্দকাকু মেঝেয় আরেক লাফ দেন। এবারে মায়ের শুকোতে দেওয়া কুলের আচারের বারকোষের ওপরে। তারপরে ঠাকুরপো—বৌদিদি সংবাদটা কেমন জমল, সেটা উহ্যই থাকুক। আমি অকুস্থল থেকে কেটে পড়লুম সেই ফাঁকে।

ক পর্ব : ভেষজ-চিকিৎসা

কিন্তু কাটাতে পারলুম না। নন্দকাকু নাছোড়। কেননা ইনি নাকি অব্যর্থ কবিরাজ। নাম হেমচন্দ্র সেন। চেম্বার চৌরঙ্গি পাড়ায়, মিশন রো একসটেনশনে। যেতেই হল শেষ পর্যন্ত। অবশ্য তখন আমি ফের হাইনেক জামা পরছি। (অর্থাৎ জামার তলায় সেজমার এনে দেওয়া হরিদ্বারের সাধুর অব্যর্থ মাদুলি বাঁধা)। আমার সঙ্গে গার্জেন হয়ে গেল শিবু, আমাদের পড়শী, এবং আমার ছাত্র। শিবুর ধারণা, দিদির সর্বদা একজন অ্যাডভাইসার সঙ্গে থাকা প্রয়োজন।

কবিরাজের চেম্বারে ঢুকতেই হাতে স্লিপ ধরিয়ে দিলে উর্দিপরা হিন্দুস্তানী দরোয়ান। ধবধবে সাদা দেওয়াল, তকতকে কাঠের মেঝে, একঘর হেঁপো-বেতো অপেক্ষমাণ রুগী। সবশেষে আমার নাম ডাকতেই পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ি। সামনেই বেদীর ওপরে এক সহাস্য নরকঙ্কাল নিঃশব্দে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। দু পা পেছিয়ে আসতেই চোখে পড়ল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পেছনে একটি রক্তমাংসের (টাই বাঁধা) সহাস্য তরুণ। দেওয়ালময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভ্যন্তরীণ ভয়াল গোপন দৃশ্যপট-শিরা-ধমনী, পেশী-অন্ত্র, হৃদয়-ফুসফুস ইত্যাদি। সভয়ে বলি— 'আপনিই কবরেজমশাই?' 'আজ্ঞে না, আমি ডাক্তার বোস, কবরেজমশায়ের অ্যাসিস্টান্ট।' মৃদু হাস্য করে তিনি দেওয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। আমিও তাকাই। একটা দলিল বাঁধানো রয়েছে, বিলেতের রয়্যাল কলেজ অফ সার্জিয়ন্সের ফেলো এই শম্ভুচরণ বোস। ভয়ে বুক চুপসে যায়। হাঁপানি বৃদ্ধি পায়। এই যদি হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট, খোদ কবরেজ তাহলে কোন স্ট্যাটাসের হবেন? নন্দকাকু কিচ্ছুই বলে দেননি, একদম

আনপ্রিপেয়ার্ড চলে এসেছি। কে জানে কত ফী? আজকাল তো কবরেজদেরও চৌষট্টি, একশো—আটাশ শুনতে পাই। ডাক্তার বোস কিন্তু চমৎকার মানুষ। খুব মন দিয়ে কেস—হিস্ট্রি শুনলেন, পাতার পর পাতা নোট নিলেন। তারপর তোয়ালে পাতা সরু গদি মোড়া বেঞ্চিতে আমাকে পেড়ে ফেলে, 'পরীক্ষা' শুরু করলেন। অর্থাৎ হাঁটুতে হাতুড়ি ঠুকে, পেটে গোঁত্তা মেরে, পিঠে থাবড়া কষিয়ে, চোখ খুঁচিয়ে, কান মুচড়ে, জিভ টেনে, হাতফাত দড়িদড়া দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলে সে এক নিদারুণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলল, যার ফলে আমার অন্তত দেড় বছর আয়ু কমে গেল। কাগজ টেনে খরখর করে রক্ত-কফ ইত্যাদি ইত্যাদি পরীক্ষা, বক্ষপঞ্জরের এক্স-রে ফটো প্রভৃতির সরলবর্গীয় ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দিলেন তিনি। তারপর চোখ বুজেই বললেন —'আঃ এবারে এক কাপ চা হোক, কী বলিস?' বলেই চোখ খুলে উত্তরের আশায় কঙ্কালটির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আমরাও আবাক হয়ে প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশায় কঙ্কালমুখি, স্তব্ধ! কলকাতায় সব্বারই ভয়েস আছে। এও কিছু বলবে নাকি? .... কোণের টুলে বসা নীরব. অনড় বেয়ারাটি কেবল উঠে বেরিয়ে গেল এবং একটু বাদে ফিরল দু-হাতে চার গেলাস চা নিয়ে। আমাকে, শিবুকে, ডাক্তার বোসকে দিয়ে, নিজেও একটা গেলাস নিয়ে চুপচাপ টুলে গিয়ে বসল। ডাক্তার বোসের এই 'ডেমোক্র্যাটিক হিউম্যান অ্যাপ্রোচ টু টী' আমার খুবই ভাল লাগল। এ-ছাড়া চা পেয়ে আমি নিজেও কৃতার্থ। আলুলায়িত। কদাচ কোনও ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে এমনধারা আতিথ্য পাইনি। সেটা বলেও ফেললুম। ডাক্তার বোস কেবল সহজ হেসে বললেন— 'আসলে আপনাকে দিয়েই শেষ কিনা, তাই। আটটা বেজে গেছে তো।'

—'তার মানে? কবরেজমশাই আসবেন না আজ?'

—'আসবেন না মানে? তিনি তো পাঁচটায় এসেছেন।'

কোণের টুল থেকে মধ্যবয়স্ক বেয়ারাটি (যার পরনের ময়লা খাকী পেন্টুলুনের নিচেটা দড়ি দিয়ে টাইট করে জড়িয়ে পায়ের সঙ্গে বাঁধা. গায়ে হাতা গোটান খদ্দরের শার্টের ওপরে মিলিটারি সবুজ হাতকাটা সোয়েটার, নাকের ফুটোয় একগুচ্ছ চুলের নীচে আশুতোষী গোঁফ, পায়ে ধুলি-ধূসর ঘোড়তোলা বুটজুতো—) চায়ের গেলাস থেকে চোখ তুলে মৃদু হাস্যে কহিলা গম্ভীরে—

—'আমিই হেমচন্দ্র। নমস্কার!'

—'অর্থাৎ—'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

নেহাত বেয়ারা মনে করে এই লোকটিকে এতক্ষণ দেখেও দেখিনি। খুবই সম্ভ্রান্ত উচ্চারণ. রং. তামাটে মেরে গেছে. বেশ সুপুরুষ। রাণী ভিক্টোরিয়া যেমন পুরুষ ভৃত্যদের সম্মুখেই পোশাক বদল করতেন. কেননা— 'ওদের আবার নারী-পুরুষ কিসের?' আমাদের প্রত্যেকেরই বোধহয় ভেতরে ভেতরে তেমনি খানিকটা মহারানী

ভিক্টোরিয়ার দোষ আছে। নইলে এঁকে দেখিনি কেন এতক্ষণ? এইবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠি, খানিকটা গরম চা চল্‌কে সিলকের শাড়িতে পড়ে, গেলাসসুদ্ধ হাত জোড় করে কাতরে উঠি— 'সে কি! কবরেজমশাই? আপনিই? অথচ মোটে চিনতে পারিনি, ছি ছি!' অভয় হাস্যে হেমচন্দ্র বললেন— 'তাতে কি হয়েছে। এরকমই তো হয়ে থাকে। কেউই চিনতে পারে না। আমি অবশ্য খুব মন দিয়ে আগাগোড়া কেস-হিস্ট্রিটা শুনেছি। আপনার ডায়াস্টোলিক প্রেশারটাই যা কিঞ্চিৎ বেশি। তবে সেজন্য ভাবনা নেই। কমিয়ে দেব। আমার মায়ের কাছে চলে আসুন, মা ওষুধ দিয়ে দেবে। দারুণ, অব্যর্থ ওষুধ মায়ের।'

—'আপনার মাও বুঝি কবরেজি করেন?' —শিবু এবারে মুখ খুলল। 'অবিশ্যি কবরেজি তো ফ্যামিলি ট্রেড। আপনার বোধহয় বাবা নেই?' সব কথায় কথা বলা চাই শিবুর। এবারে ডাক্তার-কবিরাজ দুজনেই অট্টহাস্য করে ওঠেন। আমি শিবুকে চোখ পাকাই। কবরেজ বলেন— 'নাঃ, বাবাটি থেকেও নেই। আসুন না আগামী শনিবার সকালে, মাকে স্বচক্ষে দেখে যাবেন। স্নানটা করেই আসবেন। খালি পেটে আসা বাঞ্ছনীয়। ওষুধ নেবেন তো।'

এবার ডাক্তারবাবু আমার হাতে একটা কার্ড গুঁজে দেন, তাতে একপিঠে লেখা কবিরাজ হেমচন্দ্রের নাম, এই চেম্বারের ঠিকানা, ফোন নম্বর, আর উল্টোপিঠে লেখা ৪২।১০৩বি, ধনপতি পতিতুণ্ডু বাই লেনের ঠিকানা। একটা ছোট্ট নকশাও আঁকা আছে তাতে। যা বুঝলুম, গঙ্গার ওপরেই বাড়ি। ওয়াটগঞ্জের বাজারের দিকে।

'ভাঙাচোরা ইঁট বের করা একটা কালীমন্দির আছে, সেইখানেই আমি থাকি। হেম-কবরেজ বললেই রাস্তার লোকেরা বাড়ি চিনিয়ে দেবে।' এবারে উঠতে হয়। ভিজিটের প্রসঙ্গ তুলতেই কবরেজ জিভ কেটে বললেন— 'ছি, আমি ভিজিট নিই না। শুধু ওষুধের দামটা দেবেন, যখন ওষুধ পাবেন।'

—'আর ডাক্তার বোস?' শিবু আশায় উজ্জ্বল চক্ষে বলে ফ্যালে —'উনিও বুঝি ভিজিট নেন না?'

অমায়িক হেসে ডাক্তার বোস বললেন— 'চেম্বারে কুড়ি, বাড়িতে গেলে চল্লিশ। কিন্তু হেমের রুগীদের জন্য কেবল ষোল। এ তো চিকিৎসা ঠিক নয়, চেকআপ মাত্র। চিকিৎসা করবে হেম!'

নন্দকাকু ফোন করে ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন শনিবার ভোর পাঁচটায়, যাতে চান-টান করে ভোর ভোর যেতে পারি। কিন্তু কাকু সঙ্গে যেতে পাচ্ছেন না, অগত্যা শিবুকেই ধরতে হল। ও-সব পাড়াতে একা একা না যাওয়াই নাকি ভাল। পাড়াটা সুবিধের নয়, বন্দরের কাছাকাছি। গিয়ে দেখি রাস্তায় এই সাত সকালেই ফুলুরি-জিলিপি বিক্রি হচ্ছে, মাছি ভনভন করছে জিলিপির থালার ওপর। বিক্রি হচ্ছে অবাঙালি সব ভুজিয়া, রেউড়ি, চা। গলির গলি তস্য গলি হচ্ছে ধনপতি পতিতুণ্ডু বাই লেন।

ভাগ্য শিবু সঙ্গে ছিল। পথের প্রত্যেকটি মানুষই নয়নভরে আমাকে তাকিয়ে দেখছে —'দ্যাখ দ্যাখ মেয়েছেলেতে টেকশি চালায়।' —এই মন্তব্যও কানে এসেছে। আঁকাবাঁকা গলিটার দু-ধারে দরজার সামনে নানা বয়সের, নানা গড়নের, নানান রূপসজ্জার মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁতন করছে, চা খাচ্ছে, আর গল্প করছে। বেশ একটা রিল্যাকসড সকাল। কারুর কোনও তাড়া নেই। এ পাড়াতে কেউ আপিস যায় বলে মনে হল না। মেয়েগুলির পরনে কত যে বিচিত্র সাজপোশাক, ছিটের কাপড়ের ম্যাকসি, নাভি বের করা প্যান্ট-স্যুট, সাটিনের সালওয়ার কামিজ— চুলে জরির ফিতে, মুখে রং, রোলেক্সের শাড়ির ছড়াছড়ি। খুবই দরিদ্র দেহোপজীবিনীদের পাড়া এটা—নেপালী, বাঙালি, হিন্দুস্তানী নানা জাতি, নানা ধর্ম, হিন্দু-মুসলমান মিশ্রিত এলাকা বলেই মনে হল। দেখেশুনে আমি একটু ঘাবড়ে গেলুম— প্রথমত, গলিটি অস্বাভাবিক সরু —একটা গাড়িও যাওয়া বেশ কষ্টের। দ্বিতীয়ত, সারি সারি মেয়েরা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, মেয়ে-দেখতে আসার মতন করে। শুধু দশর্নই নয়, আমাকে পরস্পরের কাছে প্রদর্শনও করছে এবং যে হাসাহাসিটা চলছে— সেও আমাকে নিয়েই, সন্দেহ নেই। তারা বলছে— 'দ্যাখ, মজাটা দেখে যা, ব্যাটাছেলেটা দিবি: বঙসে আছে, আর মেয়্যাছেল্যেটা গাড়ি হাঁকাচ্ছে। বাবুটা দেখি মেয়্যা-ডেরাইভার রেখ্যেছে।' শিবু তো লজ্জায় লাল, আমি বলে তার পরম শ্রদ্ধেয় দিদি, গুরুজন, তথা মাস্টারমশাই। বাঁদরের মতো লাল মুখে শিবু বল— 'ওসব কথায় যেন কান দেবেন না দিদি, যতসব বাজে বাজে মেয়েদের আজেবাজে কথা, ওদিকে তাকাবেনই না আপনি!'

কিন্তু না তাকিয়ে উপায় নেই যে আমার। গলি-রাস্তাটা একেই সরু, কাশীর গলির মতো, তারই মধ্যে গয়লা গরু-মহিষ এনে দুধ দুইছে, খাটিয়া পেতে লোকজনেরা শুয়ে-বসে চা-জিলিপি খাচ্ছে, শূয়োরের পাল ঘোঁৎঘোঁৎ করে চরে বেড়াচ্ছে, কিছু হাঁস-মুরগীও ঘোরাঘুরি ওড়াউড়ি করছে, ঠেলাগাড়ি কাৎ করা রয়েছে, খালি রিকশা ডাণ্ডা বের করে সিট উলটে পড়ে রয়েছে। তারই মধ্যে করপোরেশনের মেথর তার দু'চাকার ঠেলাগাড়ি নিয়ে ভ্রাম্যমান। আমাকে ঘণ্টায় দুই মাইল স্পিডে, খাটিয়া সরিয়ে, ঠেলা হটিয়ে, মেথরের গাড়ি বাঁচিয়ে, গরু-মহিষ কুকুর-শুয়োর তাড়িয়ে, হাঁস-মুরগীদের ভাগিয়ে, চা-ওলা দুধ-ওলা, জিলিপি-ওয়ালাদের কাছে করজোড়ে মার্জনা ভিক্ষা করে পথ করে নিয়ে এগুতে হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, হেম-কবরেজকে দেখছি সবাই চেনে। সবাই দেখিয়ে দিচ্ছে— 'আরেকটু এগিয়ে যান, কালীমন্দিরের গায়েই বাসা।' কিন্তু কালীমন্দিরের দেখা নেই। ইতিমধ্যে গাড়ির পেছু পেছু গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা এবং শত শত নেড়ি কুকুর সশব্দে ধাওয়া করছে। ভোরের পাখির কুজনের সঙ্গে তাদের কলরব, গাড়ির হর্ন, শিবুর ক্ষণে মিনতি, এবং ক্ষণে হুঙ্কার— মিলেমিশে অপূর্ব এক শব্দব্রহ্মের সৃষ্টি হয়েছে।

এমতাবস্থায় কালীমন্দির এসে গেল। রাস্তাও সেইখানেই শেষ। গঙ্গার গায়েই

ভাঙা-চোরা, চ্যাপ্টা-ইট বের করা, খুবই পুরনো। একটা ক্ষুদ্র মন্দির। তার চতুর্দিকে শুধু কাঁটাগাছ, আগাছা, আকন্দের ঝোপ। অনেকগুলো ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠলে তবে চাতাল মতন, এবং মন্দিরের প্রবেশপথ। গর্ভগৃহ অত্যন্ত অন্ধকার, তার অভ্যন্তর অদৃশ্য। কোনও দরজা নেই। ভিতরে আলোর চিহ্ন নেই। প্রতিমাও নেই বলেই সন্দেহ হয়। কেবল দুটি সবুজ বিন্দু জ্বলছে— পশুর চোখ। কোন পশু বোঝা যায় না— মন্দিরের দেওয়াল থেকেই বটবৃক্ষ বেরিয়ে উঁচু হয়ে উঠে মন্দিরকেই ছায়াবৃত করছে। আমি সিঁড়ির ওদিকে যাবার উপক্রম করতেই সাবধানী শিবু বলে— 'যাবেন না দিদি, সাপ-খোপ থাকতে পারে।' —আমি কল্পনাও করতে পারি না এর ভিতরে হেম-কবিরাজ কী উপায়ে বসবাস করতে পারেন। এ কী সম্ভব? এমন সময়ে মন্দিরের পিছন থেকে স্বয়ং কবরেজমশাই উদয় হলেন— 'এই যে। আসুন আসুন।' একগাল হেসে আমাদের তিনি অভ্যর্থনা করে মন্দিরের প্রায় গায়ে লাগা যে পাকা ঘরটিতে নিয়ে গেলেন, তার দোর-জানলা সবই পাল্লা রহিত। টিনের চাল আছে, দাওয়ায় একটি বেঞ্চি পাতা। তার ওপরে একটি নধর কালো ছাগল শুয়ে আছে, বেঞ্চিরই খুঁটিতে বাঁধা। মেঝেময় ছাগলনাদি। স্বাগত জানিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকতে ইঙ্গিত করলেন তিনি। শিবু আগে, না আমি আগে ইতস্তত করছি, (কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান) শেষে। শিবুই শিভালরি দেখিয়ে ঢুকে পড়ল, (যা থাকে কপালে) শহীদদের স্পিরিট নিয়ে। পিছনে পিছনে গম্ভীরভাবে আমি।

ঢুকেই চক্ষু বহরমপুরের ছানাবড়া। এটা কি কোনও মানুষের বাসস্থান? মেঝে ভর্তি ধুলো, বালি, শুকনো পাতা, ঘাস, খড়, কাঠের গুঁড়ো। ঘরে আর কোনও আসবাব নেই, শুধু একটি বেঁটে কাচের আলমারি, ঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা, আর দেয়াল না-ঘেঁষে পাতা একটা কাঠের সরু তক্তাপোশ। দেয়ালে ইলেকট্রিক কানেকশন থেকে ছেঁড়া তার ঝুলছে। (লীলা মজুমদারের পিসি দেখলে বলতেন ইলেট্রিসিটি 'লিক' করেছে!) বালব নেই। তক্তাপোশে আজকের স্টেটসম্যান খোলা এবং একপাশে একটি পেতলের বালতি ও প্লাস্টিকের মগ, অন্য পাশে একটি ময়লা কম্বল ভাঁজ করে রাখা এবং একটি লণ্ঠন। খাটে ঠেস দেওয়া একটি কর্মভারাক্রান্ত সাইকেল। ধীরে সুস্থে কাচের আলমারি খুলে প্রথমে লণ্ঠনটি তুলে রাখলেন কবিরেজমশাই। তখন দেখলাম আলমারিতে একটি কুঁজো, একটি কাচের গেলাস, সাবানের কেস, মাজন-ব্রাস-চিরুনি ইত্যাদি। এবং কিছু পুরনো খবরের কাগজ। এবারে বালতি এবং মগও কাচের আলমারির নিচের তাকে তুলে রাখলেন কবরেজমশাই। সাইকেলটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরের বাইরে রেখে এলেন। আমরা দাঁড়িয়েই আছি। এবার কম্বলটির ভাঁজ খুলে তক্তাপোশে বিছিয়ে দিয়ে কবিরাজ বললেন— 'বসে পড়ুন বসে পড়ুন!' —যেন ডানলপিলোর গদি, কি কিংখাবের আসন পেতে দিলেন। আমি ধপাস করে বসে পড়ি, বাব্বা, এতক্ষণ যা মেহনত গেছে বাড়ি বের করতো! কিন্তু শিবু বসল না। শিবুর চোখেমুখে একটা স্পষ্ট,

উদ্‌ভ্রান্ত অবিশ্বাস।

ঘরে ঢোকার সময়ে অতটা খেয়াল করিনি। এবারে পুরনো দিনের বাংলা নাটকে, রোমান্স, কিংবা রহস্যোপন্যাসের নায়ক-নায়িকা মুখের স্টকবাক্যটি আমার বুকের মধ্যে উচ্চারণ করলেন আমার আত্মারাম—

—'আমি কোথায়?' ঘরের কোণে কোণে যে বটানিকসের বটের ঝুরির মত ঝুল, আর মাকড়সার জাল ঝুলছে শুধু তাই নয়, প্রচুর মাকড়সাও ঝুলন্ত। তারা কেউ ধ্যানস্থ, কেউ বুননরত, কেউ শিকারব্যস্ত, আমাদের সাড়া পেয়ে কেউ কেউ সরসর করে সরেও যাচ্ছে সসম্ভ্রমে।

ঘরে কদাচিৎ একটা মাকড়সা হলেই ভয়ে হুলুস্থূলু বাধাই, আর এখানে? এ তো দেখছি মাকড়সাদেরই বাড়িতে একটা উটকো মানুষ। চতুর্দিকে পানের পিকের ছোপ— তার মধ্যে একটা দারুণ এলিগ্যান্ট বিলিতি এয়ারলাইন্সের ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। অর্ধভুক্ত সিগারেট, বিড়ির টুকরোর সঙ্গে গাঁজার কলকেও মেঝেময় ছিটান। আর শিবু শিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে আর দেখছে। হিপ্নোটাইজড। একদিকের দেয়াল বেশ খানিকটা ভেঙে গিয়ে ছাদের কাছ থেকে পরটার মত গড়নের একটা ফোকর তৈরি হয়েছে। সেখানে থাক থাক ভাঙা ইটের ওপর বসে এক বিজ্ঞ কাক ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ করছিল। অথবা গৃহস্থ মাকড়সাদের। সেখানে নীল আকাশের দারুণ ব্যাকগ্রাউণ্ডে পেয়ারা গাছের সাদা ডাল, সবুজ কচিপাতা উঁকি মারছে, হাত বাড়ালেই পেয়ারা। ভুল করেও যেন দেয়ালে হেলান না-দিয়ে ফেলি— তাই 'কাঠ' হয়ে বসে আছি। শিবু দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সন্তর্পণে বসেই পড়ে। তারপরেই তার দৃষ্টি ঘরের একটি কোণের দিকে আটকে যায়। শিবুর চমৎকৃত চোখ অনুসরণ করে আমারও চক্ষুস্থির। আরে? ঘরের ঐ কোণে যে বিশেষ জরুরি কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে। অতীব করিতকর্মা শত শত ইঁদুর মেঝের একটা ফুটো দিয়ে উঠে এসে দৌড়ে সারি বেঁধে সারাটা মেঝে পার হয়ে ঘরের অন্য এক কোণের ফুটোয় আত্মগোপন করছে। ব্যাপারটা সামান্য নয়। গুরুতরই। এরা নেংটি নয়, বেশ স্বাস্থ্যবান, দীঘল; ধেড়ে কিংবা মেঠো। কামড়ে দিলে রক্ষে নেই। ওদের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে হেম-কবিরাজ বললেন— 'ওরা অতি নিরীহ, ওপাশের কাঠের গোলায় ওদের বাসা।' বলে প্রতিবেশীসুলভ সৌজন্যে হাসলেন। কিন্তু আমি যা বুঝলুম, কাঠের গোলাতে ওরা হয়ত এককালে থাকত, কিন্তু এখন আর থাকে না। দেখা যাচ্ছে এটাই ওদের পার্মানেন্ট বাসা। নাকি র‍্যাশনের দোকান? নাকি সিনেমার কিউ? কিন্তু এখানে র‍্যাশনই বা কোথায়? খাদ্যদ্রব্য তো কিছু দেখছি না, কাপড়-চোপড়ও নেই। একদিকের দেয়ালে একটা কুলুঙ্গিমত, তাতে একটা ছেঁড়া শার্ট পর্দার মতো করে ঝোলান, দুই হাতার মধ্য দিয়ে দড়ি টানা। অনেকটা ক্রুশবিদ্ধ যীশু বা কাকতাড়ুয়ার মতো। কিন্তু কলারের পিছন দিয়ে ধোঁয়া ভেসে আসছে। এতক্ষণে টের পেলুম ঘরে একটা হালকা সুগন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। ধূপের?

এক মিনিট অন্যমনস্ক হয়েছি কি হইনি, 'বাপরে মারে' বলে চেঁচিয়ে পা'দুখানা তক্তাপোশে তুলে ফেলি, খরখরিয়ে আমার বাঁ পা বেয়ে একটা পথভোলা (অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষী?) আরশোলা উঠছিল।

'ও কিছু না'— হেম-কবিরাজ হেসে বলেন— 'ওরা তো হার্মলেস।' ঘরময় আরও প্রচুর ছোট-বড়-মেজ 'হার্মলেস' রাজত্ব করছে, দেখা গেল এবারে।

তক্তার তলায় একবার উঁকি দিয়ে নিয়ে শিবু বলল— 'পা-টা গুটিয়েই বসে থাকুন দিদি।' ঠোঁটে অদৃশ্যপ্রায় হাসির সংকেত। তাইতেই আমার বুক প্রায় শুকিয়ে গেল। সামনের দেওয়ালেই প্রায় ডায়নোসরের মত বিপুলকায় এক টিকটিকি হঠাৎ খপাৎ করে একটা আরশোলা ধরে ফেলল। দেয়াল ভাঙা ফোকর দিয়ে ফরফর করে উড়তে উড়তে দুটো যুদ্ধবাজ অথবা প্রেমিক কাক পরস্পরকে তাড়া করে ঘরে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেল। শিবুর মুখে ডানার হাল্কা ঝাপ্টা মেরে। আমি আঁতকে উঠে দেয়ালে সেঁটে যেতে-যেতেই সন্ত্রস্ত শিবুই খেয়াল করিয়ে দেয় —'উঁহু! উঁহু! ওখানে মাকড়সা, দিদি।'

হেম-কবিরাজ আমাদের কাণ্ড দেখে হেসে উঠলেন— সেই হাস্যে কয়েকটা আরশোলা হার্মলেসলি এধার ওধার উড়ে গেল। কবিরাজ বলেন— 'ওগুলো সবই নির্বিষ!' গায়ে যে কোনও মুহূর্তে মাকড়সা, আরশোলা, কাক, ইঁদুর, টিকটিকি— যে কেউ এসে পড়তে পারে। ওরে বাবা রে! এ কোথায় এসে পড়েছি রে!

মুখে বোধ হয় মনের অবস্থা কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছিল। কবিরাজ বললেন —'চা চলবে?'

মুহূর্তেই বুকে বল পেলুম —'হ্যাঁ।'

—'লছমী।' কবাটহীন দোর দিয়ে মুখ গলিয়ে ডাক দিলেন কবিরাজ মশাই। অমনি এক থুরথুরে বুড়োর উদয় হল, মাথায়, ধবধবে চুল, পরচুলোর মত ঘন, টিকিও আছে, পরনে খাট ধুতি, খয়েরি আলোয়ান, হাতে লাঠি। চোখে ভীষণ পুরু লেন্সের নিকেল ফ্রেমের চশমা।

—'জী সরকার। ফরমাইয়ে।' —মুখে দাঁতের বালাই নেই।

—'চা হবে? তিনটে।'

—'জী হজৌর।' বলেই সে আলোয়ানের ভেতর থেকে শীর্ণ হাত বের করে, পাতে। কবরেজমশাই কিছু খুচরো ঢেলে দেন। বুড়ো বেরিয়ে যায়।

শিবুর সব কথায় কথা বলা চাই।

—'চা পাতা কিনতে গেল বুঝি? জলটা চাপিয়ে গেল না?'

—'তৈরি চা-ই কিনে আনতে গেল।'

—'অঃ তাই তো? আপনার রান্নাঘর কোথায়?'

—'রান্নাঘর দিয়ে কী হবে, আমার মা তো কেবল ফল খায়। আমিও তাই ফলটল খাই। আর একবেলা ওই লছমীর সঙ্গে খেয়ে নি।'

—'কী খান?'

—'কেন, লছমীরা যা খায়। কখন চাপাটি, কখন ছাতু। ভালই খায় ওরা। হেলথ ফুড। আমার মাও মাছ মাংস খায় না তো, আমিও তাই খাই না।' হঠাৎ যেন জেগে উঠে শিবু প্রশ্ন করে—

—'আচ্ছা, আপনার মা রান্না করেন না?'

হো হো করে হেসে উঠে হেম-কবিরাজ বলেন— 'আমার মা না রাঁধলে আপনাদের অন্ন জুটছে কেমন করে?'

এবারে শিবু টের পায় এ-ভাষা অন্য ভাষা। এ-মা রামকৃষ্ণের মা, রামপ্রসাদের মা! শিবুর বাক্য হরে যায়। আমি বলি—

—'কই, দেখি কোথায় আপনার মা?'

—'ঐ তো।' কুলুঙ্গির গায়ে ঝুলন্ত সেই ক্রুশবিদ্ধ শার্টটা দেখিয়ে দেন হেম কবিরাজ।

আমরা স্তব্ধ।

তারপর উঠে গিয়ে শার্টটা পর্দার মতো তুলে ধরতেই দেখতে পেলাম অত্যন্ত সুশ্রী ছোট কালীমূর্তি। সর্বাঙ্গে ফুলের গহনা। কবরেজ বলেন— 'জিবটা সোনার।'

— এসব ফুলের গহনা কে গাঁথে?'

'লছমীর বউ। ওদেরই ঘর এটা। আমাকে থাকতে দিয়েছে। মাকে তো মন্দিরে রাখা যাচ্ছিল না। কোথায়ই বা যাই মাকে নিয়ে? তিনশ বছরের পুরনো ঘর এখানে মায়ের। লছমীরও কি কম মায়া? ওরাও তো বংশানুক্রমে মায়ের সেবক।'

—'মানে? ও পুরুত নাকি?'

—'ঠিক সেভাবে নয়, মানে বাগানটা ওরাই দেখত। আগে ছিল লেঠেল, এখন হয়েছে মালী। এসব সম্পত্তি দেবোত্তর করে গেছেন ঠাকুরদা ঐসব বাড়িও আমাদেরই ছিল—' তর্জনী নির্দেশে বাগানের কিছু একতলা দোতলা পাকা বাড়িঘর দেখান তিনি। 'ওগুলোও দেবোত্তর। যেমন এই মালীর ঘরটা পর্যন্ত। অথচ দেখলেনই তো মন্দিরের কী দশা।'

'শরিকরা কেউ সারায় না?' শিবু খপ করে বলে— 'আপনারা বুঝি জমিদার ছিলেন?'

অট্টহেসে হেমচন্দ্র বলেন— 'এখন হয়েছি কবিরাজ। লেঠেল থেকে ওদের মালী হবার মতন! —ঐসব বস্তিগুলো অবশ্য এখনও আমার কাকাদেরই সম্পত্তি।'

আমি আর পারি না। বলেই ফেলি :

—'দুর্দশা মানে? আমি তো সন্নিসি মানুষ, মায়েতে-ছেলেতে দিব্যি আছি। একে আপনি দুর্দশা বলেন?'

কবরেজমশাই আঘাত পেয়েছেন মনে হচ্ছে। শিবু অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে দেখে আমি ঝটপট কথা পালটাই— 'মানে ঘর-দোরে তো ঝাঁটপাট পড়ে না দেখছি,

তাই—'

—'কে দেবে? লছমী তো ওই বৃদ্ধ, স্বচক্ষেই দেখলেন, আর ওর বউয়ের তো কোমর থেকে পক্ষঘাত।'

—'এতসব পোকামাকড়ের মধ্যে বাস করা—'

—'মন্দ কী? ভালই তো। একটা ঘরে যতগুলি প্রাণীর আশ্রয় হয়। এসেছে, আসুক না। থাকে, থাকুক না। আমার তো ক্ষতি করে না।'

—'যদি করে?'

—'কী আর করবে? করুক না।'

আমার এর পরে আর কিছু বলার থাকে না। শিবু তবুও বলে—

—'যদি সাপখোপ আসতো?'

—আসেই তো। বর্ষাকালে একজোড়া সাপও থাকে এঘরে!' তারপরে গর্বোজ্জ্বল নয়নে বলেন— 'আমাকে ওরা একটুও ভয় পায় না!'

এর পরে শিবুরও কিছু বলার থাকে না। চা এসে পড়েছে। বড় বড কাচের গেলাসে! চা ভালই! খেতে খেতে আমি বলি—

—'আলমারিটা তো প্রায় খালিই দেখছি। কুঁজো, বালতি, খবরের কাগজ এ-সবের জন্য তো আলমারি লাগে না। ওটা রাখা কেন?'

—'তাছাড়া ওটা ঘরের ঠিক মধ্যিখানেই বা কেন? দেয়াল ঘেঁষে কেন নয়?' বলে শিবু!

'দুটো পার্পাস সার্ভ করছে কিনা। এক— দেয়াল বেয়ে জল পড়ে বলে কিছুই দেয়াল ঘেঁষে রাখা যায় না। তক্তাপোশটাই দেখুন না। দ্বিতীয়— দরজায় কবাট তো নেই— এটা এমন অ্যাঙ্গেলে রেখেছি যে, আমি পুজো করলে বা ঘুমুলে পথ থেকে দেখা যায় না।'

বলে বিজয়গর্বে হাসেন হেমচন্দ্র। চা শেষ করতেই গেলাসগুলো নিয়ে কবরেজ মশাই পিছনের দরজা দিয়ে বেরোন। আমিও কৌতূহলী হয়ে পেছু পেছু যাই। বাগান। টগর, গাঁদা, জবা, সন্ধ্যামালতী, লেবুগাছ, পেয়ারা গাছ। একটা বেলগাছ। এলোমেলো ঘাস-ঝোপ। আর দুটো ঘর, তালা মারা। একটা খোলা।

—'লছমীদের ঘরসংসার। এই আউটহাউসটা ওদেরই। আমার কোনও লিগাল রাইট নেই। ওদেরই দিয়ে গেছেন ঠাকুরদাদা। ওরা দয়া করে আমাকে রেখেছে।'

—'আপনাকে কোনও বাড়ি-টাড়ি দিয়ে যাননি?' শিবু প্রশ্ন করে।

—'নাঃ, বাবা খুব চালু লোক ছিলেন। ছেলেকে নয়, বউকে সম্পত্তির জীবনস্বত্ব দিয়ে গেছেন।'

—'বউ? আপনার বউ আছেন?' —মৃদু মৃদু হেসে নিরুত্তর থাকলেন কবিরাজ হেমচন্দ্র শিবুর ব্যাকুলতার পরিবর্তে। তারপর উঠে গেলেন পর্দাশার্টের পিছনে রাখা মা কালীর সামনে। ওখানটা দেখি, লম্বাটে নিচু ছাদের সুড়ঙ্গটাই, কুলুঙ্গি ঠিক নয়।

মানুষ ঢুকতে পারে, হামাগুড়ি মেরে চলতেও পারে ভেতরে। ঠাকুরের পিছনে অনেক তাক। তাক ভর্তি কাচের বৈয়ামে শেকড়-বাকড় রাখা। মস্ত মস্ত কয়েকটা খলনুড়ি। পেতলের হামানদিস্তে একটা। ঐখানেই তাহলে কবরেজের কারখানা! মস্ত পেতলের পিলসুজে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলছে। আলোয় আলো করে রেখেছে ভেতরটা। ঝুলটুল কিছু নেই। মেঝেও পরিষ্কার ঝকঝকে তকতক করছে। হেমচন্দ্র যেন মনের ভাষা পড়তে পারেন। বললেন—

—'মায়ের থানটুকুনি রোজ দুবেলা নিজের হাতে ঝাড়পোঁছ করি, নিকিয়ে রাখি। ওষুধও ওখানেই তৈরি করি কিনা। হাইজিনিক কনডিশন থাকাটা বাঞ্ছনীয়।'

—'আরে ঠাকুরের ঐ সোনার জিব, এত ওষুধপত্র সমস্তই দিনরাত খোলা পড়ে থাকে? এমনি অরক্ষিত, আনপ্রোটেক্টেড? চোরে চুরি করে নেবে না?' শিবু অবাক বিস্ময়ে বলে —'দোর জানলা কিছুই তো নেই এ-ঘরের।'

—'চুরি?' অনেক ওপরতলা থেকে হাস্য করেন কবিরাজ মশাই।— 'চোরের প্রাণের ভয় নেই? মা আমার সদাজাগ্রত— ওঁর জিব চুরি করতে গেলে চোরের নিজের জিভটা খসে পড়বে না?' আরেকটু হাসলেন— 'আর ওষুধ? নিলেই বা কী? কাজে তো লাগাতে কেউ পারবে না। কে বুঝবে কোনটা কিসের ওষুধ? লেবেলিং আছে কোথাও? আমি চোখে চিনি স-ব। আর জানে মা। মাকে পেরিয়ে চুরি করতে যবে, কোন্ ডাকাতের এত সাহস?'

শিবু এবার টপিক বদলায়।

—'আলমারিতে তো যত আজেবাজে জিনিস দেখছি। তা আপনার দরকারি জিনিসপত্তর থাকে কোথায়?'

—'দরকারি মানে?'

—'মানে, জামাকাপড়, টাকাকড়ি, বইটই—'

—'জিনিসপত্র আমার যা দেখছেন, তা ছাড়া আর কিছু নেই! টাকা সবই পকেটে, আর জামাকাপড় সবই গায়ে। আরেক প্রস্থ থাকে ধোপার বাড়িতে। সেটা এনে এটা দিয়ে দেব। সন্নিসি মানুষের আর কী চাই? বলুন?'

—'আপনি শোন কোথায়?' আমার প্রশ্ন।

—'কেন, এই তক্তায় শুই!'

—'বালিশ-বিছানা কই?'

—'লাগে না।'

—'মশারিও না?' বড় বড় ফড়িংয়ের মতো সাইজের মশা এই দিনের বেলাতেই ঘড়ে উড়ছে। —'নাঃ। মশারা আমায় পছন্দ করে না।'

—'শীত করে না আপনার?' —গঙ্গার কনকনে বাতাস এই ঘরের ভেতর দিয়ে হামেশাই শটকাট করে বাগানে যাচ্ছে। আমারই শালটা ভাল করে জড়িয়ে বসতে হচ্ছে।

—'এই তো কম্বলই রয়েছে। যাতে আপনাদের এখন বসিয়েছি। এটা গায়ে দিই।'

—'এইতেই শীত আটকায় আপনার?'

এবারে দুহাতের মুঠোয় গাঁজার ছিলিম ধরার মুদ্রা বানিয়ে হেমচন্দ্র মিটির মিটির হাসেন।

—'বাকিটা এইতে আটকে যায়! সে আপনি বুঝবেন না।'

হেনকালে ঘরে এক ব্যক্তির আর্বিভাব ঘটল। পরনে টকটকে লাল সিল্কের লুঙ্গি আর ঘিয়ে রং টেরিলিনের হাওয়াই শার্ট। পায়ে খড়ম। কপালে সিঁদুরটিপ। মুখময় অল্পঅল্প দাড়ি গোঁফ। ঢুকেই বললেন— 'জয় হোক।' বেশ ভুঁড়ি আছে।

কবরেজ মশাই এঁকে দেখামাত্র দৌড়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। সেই অপরূপ দৃশ্যে আমার অঙ্গ শিহরিত হল। এই ধূলিমলিন, পতঙ্গবহুল, অমার্জিত মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে কেউ? তারপর ছুটে এসে আমাকে অধীর আকুলতায় বললেন,

—'আপনাদের কী অসীম সৌভাগ্য। আমার গুরুদেবের দর্শন পেলেন। আমার সব শিক্ষাদীক্ষা এঁরই কাছে। ইনি অত্যন্ত উচ্চস্তরের তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। আমার মত ভেষজ চিকিৎসা অবশ্য গুরুদেব আর করেন না। উনি এখন স্রেফ রত্ন চিকিৎসায় আছেন। রত্ন চিকিৎসার স্টেজে আমি এখনও পৌঁছুতে পারিনি, তবে গুরুর ইচ্ছেয় আর মায়ের আশীর্বাদ আশা করি একদিন—'

—'অবশ্যই! অবশ্যই!' বললেন গুরুদেব।

হেমচন্দ্র— 'সবই তোমার ইচ্ছা, প্রভু!' বলে কাতরে উঠলেন। তারপরেই আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিসফিসিয়ে বললেন— 'চোখের দৃষ্টিটা নজর করেছেন একবার? ওঃ কী দৃষ্টি! ওইতেই টের পাওয়া যায় কোন লেভেলের সাধনা ওনার।' আমি অতি অভাগা, খুব কষে নজর করেও দৃষ্টিতে কোনও লেভেলের সাধনারই আন্দাজ পেলুম না। চোখ দুটো একটু লাল লাল লাগল। ঘরে একটা মোদো গন্ধও পাচ্ছিলুম। টেরিলিন শার্টের খোলা বোতামের ফাঁকে রুদ্রাক্ষের মালা দেখা যাচ্ছিল, তার নধর ভুঁড়িটির কিয়দংশ, সেই ভুঁড়িতে ক্ষীরননীর ইশারা আছে— কিন্তু তান্ত্রিক তেজ, তপস্যা, বা কঠোরতা কোনওটারই চিহ্ন নেই।

গুরুদেব বসলেন না। ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গেলেন হেম কবিরাজকে ঘরের বাইরে, আমাদের দিকে ফিরেও চাইলেন না, বাইরে থেকেই তিনি বিদায় নিলেন।

হেম কবিরাজ ঘরে ঢুকে এসে বললেন,

—'বিলায়েতের বাজনা আপনাদের কেমন লাগে?' এই প্রশ্নের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না। উত্তর দিতে পারলুম না। কবিরাজই বললেন—

—'বিলায়েৎ বাজাচ্ছে পরশু আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে, আপনাদের পাড়াতেই, কেয়াতলাতে— চেনেন নাকি, ঝুনঝুনদাস বেগারওয়ালাকে? ওদের ওখানেই। গুরুদেব তাই খবর দিয়ে গেলেন। আপনারাও নিশ্চয় যেতে পারেন ইচ্ছে

করলে —ফ্রী, বাই ইনভিটেশন ওনলি। লিমিটেড গেস্টস।'

—এই ভাঙা টিনের ঘরে, ইঁদুরের কিউ, আরশোলার রেস, কাকের প্রেমযুদ্ধ, টিকটিকি এবং মাকড়সার দ্বৈত বোঝাপড়ার মধ্যে হঠাৎ বিলায়েৎ এবং ঝুনঝুনদাস, প্লাস এই তান্ত্রিক গুরুদেব— সব মিলেমিশে আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। আমার ভয়ানক তেষ্টা পেল।

—'একটু জল খাব।'

—'নিশ্চয়ই!' কবরেজমশাই কাচের আলমারি খুলে তাক থেকে কুঁজো গেলাস নিয়ে জল ঢালতে লাগলেন— একটা কাগজ উড়ে পড়ল মাটিতে। তাকিয়ে দেখি, ওমা, এ যে মার্কিনী খাম। বিলায়েতের বাজনার চেয়েও তাজ্জবকি বাত। আমাকে জল দিয়ে চিঠিটা তুলে রাখতে রাখতে আবার যেন থটরীডিং করে কবরেজমশাই বললেন—

—'আমার স্ত্রীর চিঠি। ওরা থাকে শিকাগোয়।'

শিবুর চোয়ালটা ঝুলে পড়েছে, মুখটা অবশ্য ফাঁক হয়ে দাঁত ও জিভ দেখা যাচ্ছে, চোখের দৃষ্টি বর্ণনাতীত। কবরেজ আবার বললেন—

—'নাঃ, মেম নয়। বাঙালী বউ। বাবার পছন্দ করে আনা। বউয়ের কিন্তু আমাকে পছন্দ হয়নি। মেয়েটাকে নিয়ে শিকাগোয় চলে গেছে।'

—'কিন্তু শিকাগোয় কেন? উনি কী করেন সেখানে?'

—'কী আবার করবেন? এখানে থাকলে যা করতেন, তাই! রান্নাবান্না ঘরকন্না। এসব কথা বলবার সময়ে হেমচন্দ্রের মুখের পেশী বদল হচ্ছিল না, বরং আমরাই ক্ষণে ক্ষণে চমক লেগে মুখের আকৃতি বদল করে ফেলছিলাম।

হঠাৎ কবিরাজের মুখে সম্পূর্ণ ভাব পরিবর্তন ঘটল— খুব কোমল আর গর্বিত হয়ে উঠল মুখের রেখাগুলো—

—'আবার মেয়েটা এবার কলেজে ঢুকবে। হাইস্কুল পাস করে গেল।' একটু থেমে, —'দশ বছর দেখি না মেয়েটাকে।' তাঁর চোখ দুটো হঠাৎ যেন পাড়ি দিল সুদূর অতলান্তিকের ওপারে, যেখানে স্কুলের টুপির নিচে কালো চুলের থোকা ছড়িয়ে, হিমেল বিদেশী বাতাসে গলার রঙিন কম্ফর্টার উড়িয়ে, বুটজুতো আর ওভারকোট পরে একটি বাঙালী কিশোরী স্কুলে যাচ্ছে বরফ ভেঙে ভেঙে। একা।

আমরা চুপ করেই রইলাম। কিন্তু অরসিক শিবুটা এক সময় বলে বসল—

—'ওষুধটা তাহলে আজ দিচ্ছেন না? দিদি বেকার-বেকারই চান করে এত বেলা পর্যন্ত খালি পেটে—'

হেমচন্দ্র যেন ঘুম ভেঙে উঠলেন। ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গেই— 'সে কি? কেন দেব না? ওষুধ তৈরি করে রেখেছি না?' বলেই কাচের আলমারি খুলে খবরের কাগজের ডাঁইয়ের নিচে থেকে একটা মোড়ক বের করে কপালে ঠেকিয়ে 'মা, মাগো!' বলে আমাকে দিলেন। —'কালো সুতোয় বেঁধে আজই পরে

ফেলুন, যেন ঠিক বুকের ওপরে পড়ে। তিন হপ্তা যত্নে রাখবেন। কোনও নিয়ম নেই অবিশ্যি।' তারপর ওখান থেকেই, যেন ম্যাজিক করে, এক শিশি অ্যান্টিব্যাকট্রিনের মত সবজে পদার্থ বের করে নিয়ে বললেন— 'প্রত্যহ দু বেলা দুদাগ বুকে-পিঠে মালিশ সকালে-সন্ধ্যায়।'

আলমারি বন্ধ করতে করতে— 'শেকড়, পঁচিশ। তেল, কুড়ি। পঁয়তাল্লিশ। তবে এখন নয়। এক হপ্তা পরে। আগে ফল হোক। ফল না পেলে টাকা নিই না', বলেই একগাল হাসলেন।

শিবুও হাসল একগাল। ওর চোখে মুখে মুগ্ধতা— এ কি মায়া, না মতিভ্রম? ফল না পেলে টাকা নেয় না এ কেমন ডাক্তার? ডাক্তার না দেবতা?

আর আমি? —'কোনও এক বিপন্ন বিস্ময়' তখন আমার 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' খেলা করছে। কারণ ঐ কালো সুতো। আমার যে মাদুলি-তাবিজ পরতে-টরতে বড্ড লজ্জা করে। এসেছিলুম ওষুধ খেতে, এটা তো আয়ুর্বেদিক ওষধি, এ তো 'সেব্য' হবার কথা। যাকগে সেসব। অপ্রিয় প্রসঙ্গ! শেকড় পরা না পরা পরের কথা, আপাতত কৌতূহলটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আমি বললুম—

—'আপনার স্ত্রী-কন্যার কোনও ছবি নেই?'

—'ছবি?' হেসে ওঠেন কবিরাজ মশাই, দার্শনিক কণ্ঠে বললেন— 'ছবি দিয়ে কী হবে? মানুষগুলোও যখন আছে, জীবন্ত। যেখানেই থাকুক, আছে তো।'

আমি চুপ করে যাই। দশ বছরে সেই মেয়ে কত বড়ো হয়ে গিয়েছে। সে কি আর সে-মেয়ে আছে?

এমন সময় শিবুটা বলে বসল—

'আচ্ছা, ওই যে আপনার গুরুদেব এসেছিলেন, উনি অমন অদ্ভুত পোশাক পরেন কেন?'

—'শার্ট তো? শার্ট উনি এতদিন পরতেন না। চাদরই জড়াতেন। ইদানীং ওঁর এক শিষ্য হংকং-এ চাকরি পেয়ে অনেকগুলো শার্ট দিয়েছে, না পরলে দুঃখ পাবে তাই পরছেন। কিন্তু ওতে কিছু এসে যায় না। এও বাহ্য। ওঁর দিব্যজ্যোতি এতে বিঘ্নিত হয় কি?'

—'আমি তো শার্টের কথা বলিনি! লাল সিল্কের অমন কটকটে লুঙ্গি পরে উনি'—

শিবুকে থামিয়ে দিয়ে হাঁ হাঁ করে ওঠেন কবরেজমশাই—

—'লুঙ্গি কোথায়? ওটা তো পট্টবস্ত্র। কী আশ্চর্য! তন্ত্র-সাধনায় পট্টবস্ত্র পরিধেয়, তাও জানেন না?'

আমি খুব লজ্জা পেয়ে যাই। পাটের ধুতি? মানে চেলি? শিবু স্টুপিড তাকে সিল্কের লুঙ্গি বলল! ছি ছি। শিবু কিন্তু অদম্য, —সে বলল, 'আপনিও তো তান্ত্রিক। তবে আপনি কেন প্যান্ট-শার্ট পরে আছেন, পট্টবস্ত্র পরিধান না করে?'

আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে যাই। আর কখন যদি শিবুকে সঙ্গে এনেছি! কী যা-তা বলে যে!

'অমৃতং বালভাষিতম' গোছের ক্ষমার হাসি হেসে হেম-কবরেজ বলেন— 'আমার কথা আলাদা। আমি আর তান্ত্রিক হলুম কোথায়? ওঁরা হলেন সিদ্ধপুরুষ।'

পাছে শিবু আর তর্ক করে, আমি উঠে দাঁড়াই। খিদেও পেয়েছে জবর। বেলা বাড়ছে। আরশোলা এবং ইঁদুর বাঁচিয়ে অতি সাহসী ও সাবধানী পা ফেলে কোনওরকমে নোংরা ঘিঞ্জি গলিটায় বেরিয়ে এসে আরামের নিশ্বাস ফেলি আমি। আঃ। কী চমৎকার! কী পরিচ্ছন্ন দিগ্বিদিক!

তারপরেই দেখি, কেলেঙ্কারি। আমার হীন, ক্ষুদ্র গাড়ির পিঠে ঘষছেন এক বিপুলকায় বৃষভ। সেই অতিকায় ঘর্ষণে গাড়িটা থরথর করে কাঁপছে, ভূমিকম্পের মত। আর গাড়ির ঠিক পশ্চাতে, ছায়াময় তলদেশে এক স্নেহময়ী শূকরজননী চার-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে— সর্বাঙ্গে পাঁচটি-ছটি শুয়ার-কা-বাচ্চা দুধ খাচ্ছে। আহা, কী উন্নয়নশীল দৃশ্য। আহার, বাসস্থান, কী না আছে এদের। দো-ইয়া-তিন-বাস দরকার নেই। মাতৃতান্ত্রিক সুখী পরিবার। গাড়ির বনেটে, এবং ছাদে বৃহৎ সংখ্যক মনুষ্যশিশু নৃত্যগীতাদির দ্বারা সম্ভবত ঐ সুখী পরিবারের মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত। অথবা শ্রদ্ধেয় বৃষভের।

পাশের ভাঙা মন্দিরের বাইরে রোদ্দুর এসে পড়েছে। কিন্তু অভ্যন্তর অন্ধকার। শিবু হঠাৎ সেইখানে গিয়ে হাততালি বাজিয়ে 'হেট হেট' করতেই বিনীত ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল একটি রোগা ঘেয়ো কুকুর। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি রোঁয়াওঠা কুচোকাচা কুকুরছানাও। সস্নেহে ওদের দিকে তাকিয়ে হেম-কবিরাজ বললেন— 'ক্ষেমঙ্করী। ওখানেই ওর আতুড়ঘর করে দিয়েছি। ওর জন্ম হয়েছিল অবশ্য আমার ঘরেই। ওর মায়ের নাম ছিল কনকলতা।' ক্ষেমঙ্করী হেম-কবরেজের পায়ে গা ঘষতে লাগল। সেদিকে নজর না দিয়ে কবরেজমশায় তখন ষাঁড়টির লেজ ধরে মোচড় দিচ্ছেন এবং ভয়ঙ্কর শব্দে 'হ্যাট হ্যাট' করছেন। ষাঁড় নড়ছে না। ততক্ষণে বস্তির বাচ্চারা আপনিই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ষাঁড় এবং শুয়োর তাড়াবার পূর্ণকর্মে লেগে গিয়েছে। ষাঁড় এবং শুয়োর ফ্যামিলি না সরালে গাড়ি চলবে না। ষাঁড়ের নামটি শোনা গেল না, কিন্তু শূকরীটির নাম আছে-যে-সে নাম নয়, আনারকলি। এবং সে রাষ্ট্রভাষাভাষী। বাংলায় কথা বললে চলবে না, কোর্ট ল্যাংগুয়েজ চাই। বাচ্চারা বলতে লাগল--- 'হট যা, হট যা, হেই আনারকলি! হেট হেট, উঠ যা। আনারকলি, উঠ যা চলি যা'— ইত্যাদি। সবই আনারকলি শুনতে পেল, কেননা উত্তরে সে কান দুটি নাড়ল, কিন্তু কর্ণপাত করল না। গা এলিয়ে চোখ মেলে শুয়েই রইল, জুলজুলিয়ে চেয়ে। ধর্মের ষাঁড়ও বিন্দুমাত্র . না ঘাবড়ে উল্টে এমনই এক শিং নাড়া দিল যে হেম-কবিরাজও কয়েক পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। দেখেশুনে এবারে শিবু বলল--- 'দিদি, গাড়িতে ঢুকে পড়ে বরং স্টার্ট লাগিয়ে দিন। নইলে এ-ব্যাটারা

সহজে নড়বে না। একেবারে এম এল এ হস্টেলের জমিদারি পেয়ে গিয়েছে।' শিবুর উপদেশ অনুযায়ী গাড়িতে উঠে স্টার্ট লাগাই এবং হর্ন বাজাই। সঙ্গে সঙ্গে এক বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা হয়। পতাকার মত লেজ উঁচিয়ে, চার পা শূন্যে তুলে ষাঁড়বাবাজি হঠাৎ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকেন। পথের ভিড় মুহূর্তে ফাঁকা। —রাস্তার ধারের মেয়েরা এখন অনেকেই চান করে ভিজে গামছা গায়ে জড়িয়ে ফিরছে— তারা আর্তনাদ ও ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। এই আকস্মিক উপদ্রবে আনারকলিও উঠে পড়ে (অথবা গাড়ির একসহস্ত পাইপের গরম ধোঁয়ার ধাক্কা তাকে উৎপাটিত করে), বাচ্চাদের নিয়ে সে মা-গঙ্গার পবিত্র নিরাপদ কাদায় নেমে যায় ধীরে সুস্থে। হেম-কবিরাজ সগর্বে বলেন— 'ওরা সবাই খুবই বাধ্য প্রকৃতির, এই বস্তিরই তো জানোয়ার ওরা।'

এবার বেড়ুন।

গাড়ির পিছনের বাধা নাড়ান গেছে, কিন্তু সামনে একটি উঁচু পাচিল। তাতে একলক্ষ ঘুঁটে। পাঁচিলের পাশ দিয়ে একটি সরু ইটবাঁধান গলিপথ। অবশ্যই পায়ে চলার। সেটির দিকে তর্জনী নির্দেশ করে কবরেজমশাই নিতান্ত আন্তরিকভাবে বললেন—

—'ওই রাস্তাটা দিয়ে বেরিয়ে যান, শর্টকার্ট হবে, সোজা বড় রাস্তায় পড়ে যাবেন।'

স্তম্ভিত শিবু বলে— 'সে কি! ওইটুকুনি গলিতে গাড়ি ঢুকবে কেন?' রীতিমত অফেনডেড গলায় কবরেজমশাই দুহাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে বলেন—

—'কেন, আমার গাড়ি তো ঢোকে? ঐ পথেই তো আমি রোজ চেম্বারে যাই?'

—'কী গাড়ি মশাই আপনার?' বলে শিবু উত্তরের অপেক্ষায় থাকে। আমার চোখের সামনেই ঘরের দাওয়ায় দেয়ালে ঠেস দেওয়া সাইকেল। কবিরাজ চোখ দিয়ে সেদিকে দেখিয়ে দিয়ে মিটির মিটির হাসেন। শিবু হাসে না। ব্যাজার মুখে বলে— 'ওঃ। সাইকেল।' তারপর বলে—

'ব্যাক ছাড়া উপায় নেই দিদি, পুরোটা রাস্তাই ব্যাক করে বেরুতে হবে। শালা, এ গলির যা ফর্ম।'

তারপর শিবু, কবরেজ, এবং গণ্ডা পাঁচেক বাচ্চা সশব্দে রাস্তা ক্লিয়ার করতে করতে চলে, পিছনে পিছনে আমি অতি সাবধানে ব্যাক করতে করতে আসি, খাটিয়া, ঠেলা, রিকশা ইত্যাদি দেখে শুনে (ধাক্কা লাগলেই তো গেছি)। আমার সামনে সামনে গণ্ডা কয়েক কুকুর ঘেউঘেউ করতে করতে মহা উল্লাসে দৌড়য়। এ গলিতে আমার ইম্পর্টেন্স প্রচণ্ড। এ যেন স্বয়ং গবর্নরের গাড়ি-সামনে-পেছনে এডিসির মোটর-বাইক, মাইক-ওলা পুলিশের গাড়ি ইত্যাদি। হেম-কবিরাজ হঠাৎ জানলার কাছে এসে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বলেন— 'মোটর তো আসে না এখানে বড় একটা। বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে ঐ গলি দিয়ে হেঁটেই আসে সবাই

শর্টকাট— গাড়ি দেখে তাই বস্তির লোকেরা খুব খুশি হয়েছে আর কি!'

খুশির প্রমাণস্বরূপ কয়েকটা মন্তব্য কানে এল— 'এটা আবার কেমনি টেকশি রে? সামুনে দিয়ে যায় না, কেবলই পিছনবাগে যায়?' উত্তর—

—'আরে, ফ্যালাইয়া থো। অরে দুইষ্যা কী হইব? হৈল গিয়া মাইয়া লোগটার দোষ— আগাইতে তো আর শিখে নাই, ক্যাবল পিছাইতেই শিখছে', শুনতে শুনতে মাথার মধ্যে একটা দিব্য দরজা খুলে গেল। কবিরাজী মানে 'ক্যাবল' পিছাইতেই শিখছি না তো? ফেলেই দেব নাকি শেকড়টা?

খ-পর্ব : রত্ন-চিকিৎসা

ফেলা হল না। নন্দকাকু ফেলতে দিলেন না। চলল আমার তেল মালিশ আর গলাবন্ধ হাইকলার জামাপরা। (আমার ধারণা যারাই হাইনেক ব্লাউজ পরে, তাদেরই গলায় কালো সুতোয় বাঁধা শেকড়-বাকড় থাকে)। কিন্তু হাঁপানি কমল কিনা বোঝা গেল না এক হপ্তায়, তাই টাকাও নিলেন না হেম-কবরেজ। চলুক আর দু হপ্তা। তারপরে নেওয়া যাবে। আরো দু হপ্তা কাবার হবার আগেই নন্দকাকু হায় হায় করে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে এসে হাজির। হেম-কবিরাজ হাওয়া হয়ে গেছেন। পড়ে রয়েছে তাঁর ঘরভর্তি আশ্রিত প্রাণীরা, সাইকেলটা লছমী তুলে রেখেছে নিজের ঘরে, ডাক্তার বোসের চেম্বারে কেবলই কবিরাজি রুগীদের ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। কিছুই নিয়ে যাননি সঙ্গে, মা-কালীটিকে ছাড়া। কালীকে নিয়ে কবিরাজ ফেরার।

—'গেল কোথায় মানুষটা?'

—'আর বল কেন', নন্দকাকু নাক কুঁচকে বলেন, 'ওসব কবরেজি-ফোবরেজি ওর নাকি সবই ফোরটোয়েন্টি, আসলে শেকড়-বাকড় যোগাত ঐ বস্তিরই এক নেপালী বুড়ি। কবরেজ আসলে সে-ই। বুড়ি অকস্মাৎ পটল তুলেছে। তার মেয়েটা অন্যরকম ব্যবসা করে, গাছগাছালি চেনে না। বুড়ি নাকি নেপাল থেকেই ওষুধের সাপ্লাই নিয়ে আসত। হেমচন্দর তাই নেপাল ছুটছেন। বুড়ির এক বোন আছে সেখানে, সেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা জানে। তারই খোঁজে গেছে।' এইসব তথ্য নন্দকাকু পেয়েছেন লছমীর কাছে, লছমীর বউ নাকি আছাড়ি-পিছাড়ি কাঁদছে। ঐ হেম-কবরেজই খেতে পরতে দিত বুড়োবুড়িকে।

—'অতঃপর?'

—'অতঃপর কুছ পরোয়া নেই', নন্দকাকু ঘোষণা করেন।

—'আমি তো যাচ্ছি নকুড়েশ্বরের কাছে। ভেষজ চিকিৎসা আর নয়, এবারে রত্ন-চিকিৎসা। অব্যর্থ ফল হয়। নকুড়বাবু অমন সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড কবরেজ নন, খুব পড়াশুনো করেছেন। মস্ত তান্ত্রিক। হেমচন্দ্রের গুরুদেব।'

—'হেম-কবরেজের গুরুদেব? ফর্সা-লম্বা, ভুঁড়িওলা-অল্পস্বল্প গোঁফ দাড়ি, লাল লুঙ্গি, সরি, পট্টবস্ত্র, কপালে সিঁদুর? সেই কি?' বর্ণনা শুনেই নন্দকাকু সম্মোহিত। হুবহু, এই তো তবে চিনিস দেখছি। চল, ওঁর কাছে নিয়ে যাই তোকে। ওই আসল

লোক। সিদ্ধপুরুষ। সত্যিই সাধনা করেছেন। অলৌকিক রত্ন-চিকিৎসা কি সোজা ব্যাপার? এতে রোগ সারবেই। না সেরে যাবে কোথায়?'

কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী হলুম না। রত্ন-চিকিৎসা নামটাই আমার মনে ধরল না, পকেটেও ধরবে বলে মনে হল না। তাছাড়া ওই লোকটাকে দেখে আমার 'কাপুরুষ—মহাপুরুষ' ছবির মহাপুরুষকে মনে পড়ে গিয়েছিল। আমি বাবা কাপুরুষ আছি। ওর মধ্যে যেতে চাই না। তাও আবার অলৌকিক!

সাহসী নন্দকাকু কিন্তু যেতেই থাকলেন, ফলও হয়ত পেতে লাগলেন। আমি পুনরায় অ্যালোপ্যাথিতে ফিরে গেছি শুনে মর্মাহত হয়ে অভিমানে নন্দকাকু এ বাড়িতে আসাই ছেড়ে দিলেন। তখন মা এক রববার সকালে আমাকে ভবানীপুরে পাঠালেন নন্দকাকুর মান ভাঙাতে।

নন্দকাকু বাড়ি নেই। কাকিমা আমাকে দেখেই নায়েগ্রার মতো অঝোর ধারে ভেঙে পড়লেন— 'এসেছিস খুকু? দেখে যা স্বচক্ষে তোর কাকার কাণ্ড। আমার জীবন শেষ করে দিলে।'

—'কে শেষ করলে? কাকু?'

—'কাকু, আর কাকুর ঐ ডাকাত, ঐ চোট্টা তান্ত্রিকটা। সে তোর কাকুকে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে।'

—'সে কি গো?' আমার আর বাক্য-স্ফূর্তি হয় না।

—'ছাইভস্ম পুরে পুরে কী সব পুরিয়া বানিয়ে দেয়, আর দুশ— পাঁচশ এই রেটে টাকা নেয়। টাকা নেয়, আর বলে কিনা— আমি বিনামূল্যেই রত্ন-চিকিৎসা করি। আপনি যা দিচ্ছেন তা শুধু রত্নের মূল্য-ওগুলো তো জহুরীর কাছে কিনতে হবে। ভেবে দ্যাখ জোচ্চুরিটা কেমন!'

'রত্নগুলো কোথায়? কোমরে পরেন না হাতে? তুমি যাচিয়ে নাও তো স্যাকরার কাছে?'

—'হায় ভগবান। তবে আর বলছি কী?' কপাল চাপড়ান কাকিমা।— 'রত্নগুলোই তো খায়।'

'খায় মানে? পাথর আবার খাবে কি?' আমি থ।

—'খায় মানে পুড়িয়ে খায়। পুড়িয়ে ছাই করে খায় তো। আহা, কত রত্নই যে ক'মাসে খেয়ে ফেললে তোর কাকা। আজ সেগুলো সব থাকলে আমার একটা সুন্দর জড়োয়ার সেট হয়ে যেত। কাকিমার গলা কান্না-কান্না হয়ে বুজে আসে।

—'সেও কি সম্ভব? পাথর কি পোড়ে?'

—'পোড়ে না? খুব পোড়ে। 'রত্নভস্ম' কথাটা শুনিসনি? 'স্বর্ণভস্ম', 'মুক্তাভস্ম', এইসব শব্দ শুনিসনি জীবনে?'

—'তা শুনেছি বটে। কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ কি প্রেশাস স্টোনস-মানে মণিমুক্তো, হীরে জহরত পুড়িয়ে খেতে পারে কখন?'

—'পারে না? খুব পারে। ওরে, হাঁপানির কষ্টের জন্যে মানুষ সব পারে। এই একটি কথায় কাকিমা আমাকে চুপ করিয়ে দেন।— 'কী খাচ্ছেন তবে তোর কাকা নিত্যি মধুর সঙ্গে বেটে বেটে, গেল ক'মাস?' কাকিমা বলেন— 'বাড়িতে দুধ-ঘি ঢোকে না, মাছ-মাংসও প্রায় বন্ধই, নিজেদের জন্য গুড় চা, আর কত বলব? টাকাকড়ি সব যাচ্ছে ওই রত্নচিকিচ্ছেয়। এর চেয়ে গাঁজা-ভাং কি মদ-টদ খেলেও ঢের ভাল হত। মণিমুক্তোর চেয়ে ঢের সস্তা পড়ত। ওরে, নেশার মতন করে হীরে জহরৎ খাওয়া কি আমাদের পোষায়? একি বেগুনপোড়া?'

'নেশা শব্দটা টং করে ঘন্টা বাজিয়ে দেয় মাথার মধ্যে আমার। কে জানে কী দিচ্ছে রত্নভস্মের নাম করে? সত্যি সত্যি রত্ন পোড়াতে ওর বয়ে গেছে। সত্যিকার চুনিপান্না হাতে পেলে কেউ পোড়াতে পারে নাকি? কখখনো না। অন্য কিছুর ছাই দেয় নিশ্চয়ই— কাঠ-কয়লা, কি ঘুঁটের। কিংবা তার চেয়েও দামী কিছুর, যাতে রুগীর নেশা ধরে যাবে। যাতে কবরেজি ছাড়তে না পারে।'

—'কে জানে কী জিনিস গেলাচ্ছে কাকুকে— 'রত্নভস্ম' বলে? হাশিশ? মারিজুয়ানা? আফিং? কোকেন? নিদেনপক্ষে তুমি যাব বললে সেই গাঁজা? ভাঙ? কি চরস? —যাতে নেশা ধরে যায় তেমনই কিছু খাওয়াচ্ছে মনে হয়।'

বলতে না বলতেই ডুকরে কেঁদে ওঠেন কাকিমা। —'ওরে! খুকুরে। ওসব তুই কী সর্বনেশে কথা বলছিস রে? ওরে! ওরা যে সব পারে, ওই হতচ্ছাড়া ডাকাত, চোট্টা হীরে— খেকো খুনে তান্ত্রিকরা!' তারপরেই খাড়া হয়ে বসেন— গলার স্বর পাল্টে যায়। এবারে গঠনমূলক চিন্তা। ক্লিয়ার কনস্ট্রাকটিভ অ্যাপ্রোচ। —'এই মুহূর্তে বন্ধ করতে হবে। এক্ষুনি। আজই। গাড়ি এনেছিস তো সঙ্গে? চল—যাচ্ছি আমি—'

রণং দেহি মূর্তিতে কাকিমা শাড়ি বদলাতে যান। যেন অর্জুন যুদ্ধে নামার আগে অস্ত্রসজ্জা করছেন। মুখ অবিশ্যি বন্ধ হয় না। আর নানা মূল্যবান ইনফর্মেশন বেরিয়ে আসতে থাকে। অনর্গল। —'ছোড়দাকেও জপিয়েছে তোর কাকা। নকুড়েশ্বর তো বুক-পেট দুটোরই ট্রিটমেন্ট করবার জন্যে হামলে পড়েছিল, কিন্তু আমার ছোড়দাটি তো আবার অন্যরকম লোক, সে বেঁকে বসল। 'আমার হার্টটি আমি কার্ডিওলজিস্ট ডাক্তার সুধীর সেনকে দান করেছি, ওটা ওঁর প্রাইভেট প্রপার্টি, ওদিকে খবর্দার নজর দেবেন না, আমার পেটটাকে বরং আপনি নিন।' শুধু পেট দেখতেই তান্ত্রিকটা মাসে একশ তিরিশ টাকা করে নিচ্ছিল, হপ্তায় হপ্তায় একপুরিয়া মাত্র ওষুধের জন্যে। কী যেন নাম 'কাঞ্চনভস্ম' নাকি। হঠাৎ কী যে খেয়াল হল ছোড়দার, ল্যাবরেটরিতে ছাইটা পরীক্ষা করিয়ে আনল। কী পাওয়া গেল বল তো? কাঞ্চন—টাঞ্চন কিছুই নয় কেবল হত্তুকি আমলকি বয়ড়ার গুঁড়ো। সেই দেখেই পরশুদিন ছোড়দা পিয়নকে দিয়ে চিরকুট পাঠিয়েছে—'এর হাতে ঐ ত্রিফলা-চূর্ণ ওরফে কাঞ্চনভস্মটি (অর্থাৎ আমার উপার্জিত কাঞ্চনের ভবৎকৃত ভস্ম) দিবেন।' সেই পড়ে নাকি কবরেজের হাত-ফাত কাঁপতে লেগেছে। ব্যাটার জোচ্চুরি ধরা পড়ে

গেছে তো? পুরিয়া এনে দিং পিয়নকে বলেছে 'টাকা পয়সা নিয়েছেন কিছু?' পিয়নও তেমনি ওস্তাদ। বলেছে, কই নাত? শুনে কাতর হয়ে নাকি কবরেজ বলেছে, 'তবু কালীর জন্যে যাহোক কিছু?' পিয়ন তখন পকেট থেকে ঠিক পাঁচ সিকে পয়সা বের করে দিয়েছে মায়া করে। তাই নিয়েছে। তবেই ভেবে দ্যাখ—'

—'নন্দকাকু কি তারপরও গেছেন?'

—'তবে আর শুনলে কী? পরশুদিনই এই কাণ্ড, তবুও উনি আজকে গেছেন।'

—'খুবই অদ্ভুত। সত্যি। নিশ্চয় রত্নভস্ম বলে কোনও নেশার জিনিস খাওয়াচ্ছে'— বলতে বলতে আমরা রাস্তায় নেমে পড়ি।

নকুড়েশ্বরের বাড়ি কাকিমা ভালই চেনেন দেখা গেল। বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা আছে,

– 'চাঁদসীর ক্ষত-চিকিৎসালয়।' আমি তো অবাক। কাকিমা ব্যাখ্যা করেন—

—'এটা ওর নয়, ওর বাপের ব্যবসা। দোরের পাশের ঐ ছোট সাইনবোর্ডটা ওর।' সেখানে ঝকঝকে পেতলের ফলকে লেখা—

'তান্ত্রিক রত্ন-চিকিৎসক, পণ্ডিত নকুড়েশ্বর কাব্যতীর্থ, বি-এ বি-এল জ্যোতিষার্ণব।' এর কোন ডিগ্রিটা যে সরাসরি রত্ন-চিকিৎসাব সঙ্গে জড়িত, সেটা বুঝতে পারলুম না। ভেতরে ঢুকেই দেখি মারোয়াড়ি গদির মত ফরাস বিছিয়ে সামনে ডেস্ক নিয়ে এক শক্তসমর্থ টাক মাথা বৃদ্ধ ফতুয়া ধুতি নিকেলের চশমা পরে বসে আছেন। সামনে খেরোর মলাট জাবনা খাতা কলম। পিছনে দেয়ালে তাক ভর্তি চীনেমাটির বইয়াম। তাতে বিবিধ লেবেল। কাকিমা বললেন— 'ওরে বাবা।' ভদ্রলোক হাসি মুখে আমাদের নমস্কার করে বললেন— 'এই যে মিসেস চৌধুরী, আসুন। আপনার কত্তাও আছেন এখানে নকুড়ের ঘরে।' এই সকালেই বেশ কজন রুগী এসে বসে .আছে এই ক্ষত-চিকিৎসকের সামনে। কাকিমা প্রতিনমস্কারপূর্বক, একটুও না হেসে গম্ভীর গলায় বললেন— 'ডাক্তারবাবু, আপনার গুণধর ছেলেটি আমাকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে।' আমার মাথায় লজ্জায় বজ্রপাত হল। কিন্তু ক্ষত-ডাক্তারবাবু বেশ স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দেন—

—'শুধু কি আপনাকেই? আমাকে সর্বস্বান্ত করছে না? ও-ছেলে সব্বাইকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে।' দু'হাত উল্টে তিনি বললেন— 'ছিল, ছিল এক—বকমের পাগল, তন্ত্রমন্ত্র পুজো-আচ্চা নিয়ে, এখন হয়েছে আরেক রকম। কিছুতেই তো সে পারিবারিক ব্যবসাতে ঢুকল না। আমরা জ্যোতিষীও নই, তন্ত্রমন্ত্রও জানি না, বংশানুক্রমে চাঁদসীর ক্ষত-চিকিৎসা করে আসছি। হেন ক্ষত নেই যা আমার বাবার হাতে সারত না। আমার হাত অতটা পরিষ্কাব না হলেও এই তো এই পায়ে—ক্যান্সার রুগীকে সুস্থ রেখেছি তিন বছর—' (সামনে আঙুল বাড়িয়ে যাকে দেখালেন তাঁকে রুগী বলেই মনে হল না)।

—'ছেলে প্রথমে বললে উকিল হব। তা গোঁ আছে— হলও উকিল। কিন্তু

তারপরে বললে সংস্কৃত পড়ব, হল কাব্যতীর্থ। সেই থেকে চলল জ্যোতিষচর্চা, তারপরে, হল তন্ত্রসাধনা— (আমাদের এই শ্মশান ধারে ঘর হয়েই ওই যন্ত্রন্নাটা হয়েছে।)— এখন তো আবার নতুন নেশায় ধরেছে'—

ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে ক্রমেই বিমর্ষতর হয়ে যেতে লাগলেন— 'ওর মা গেল বছর স্বগগে গেছে, বেঁচে গেছে! ছেলেকে ইদিকে শনির দশায় পেয়েছে— শনির দশায়। ওই যে, শনি'— চোখের ইশারায় দরজা দেখিয়ে দেন তিনি।

ফর্সা, ঢ্যাঙা, রোগা টিংটিঙে (বহুরূপীর 'রক্তকরবীর' সর্দারের মতো চেহারার), একমাথা উস্কখুস্ক রুক্ষ পাকা চুল, গায়ে আধময়লা লক্ষ্নৌর বাঁদিক খোলা পাঞ্জাবি আর ফর্সা চুড়িদার পাজামা—পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে বয়স— এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকছেন। তাঁর মুখে কালোয়াতী গানের গুনগুন, আর এই সাতসকালেই মদের গন্ধ ভুরভুর। চোখে উদাস দৃষ্টি, অন্যমনস্ক।

ঢুকেই তিনি জড়ান গলায় হাঁক পাড়েন—

—'নকুড়! নকুড়! নকুড়বাবু কি উঠেছেন?' তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে স্মার্টলি যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর পরনে বেগুনি রঙের ঘন্টা পেন্টুলুন আর ভুঁড়িচাপা হলুদ গেঞ্জি। তাঁর বাঁ কোণের পকেটে একটি ঘন নীল উটপাখি ঠ্যাং উঁচিয়ে, পাখা মেলে স্তব্ধ হয়ে আছে। অল্পস্বল্প গোঁফদাড়ি, দিব্যি ভুঁড়ি, কপালে সিঁদুর।

—'আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য! এস. কে. যে। এত সকালে?' আহ্লাদে গলায় অভ্যর্থনা জানান নকুড়েশ্বর, সিঁদুর লেপা কপাল থেকে চুলের গুচ্ছ দেবানন্দের কায়দায় এক ঝাপ্টায় সরিয়ে। আমাদের অবিশ্যি দেখতে পেলেন না। কিন্তু এহ বাহ্য। সিদ্ধপুরুষ। বাবা ব্যক্তিটি ছাড়বার পাত্র নন কিন্তু।

—'আগে এঁদের দিকে নজর দাও বাবা নকুড়। এঁরাই আগে এয়েচেন।'

নকুড়েশ্বর অগত্যা আমাদের দেখেন। দেখে ম্রিয়মাণ হয়ে যান। 'আসুন আসুন, মিসেস চৌধুরী।' —উত্তরে কাকিমা কটমটিয়ে তাকান মা্।

পর্দা সরিয়ে ঢুকে দেখি দিব্যি সোফাটোফা পাতা আধুনিক বসার ঘর। এককোণে একটা বেঁটে লোহার সিন্দুক বড় বেখাপ্পা দেখাচ্ছে। অন্যদিকে, এক বুকর‍্যাক ভর্তি আইনের বই, আরেকটি র‍্যাকে ন্যাকড়া জড়ান পুঁথিপত্র কিছু। কালী-টালী ইংরিজি বাংলার যাবতীয় চিত্রল সিনেমা পত্রিকা ছড়ান, এবং একটি সোফাতে স্পষ্টতই বিচলিত নন্দকাকু। কেননা, নন্দকাকুর ঠিক সামনেই, টেবিলের ওপরে সুতো বাঁধা একতাড়া পাঁচ টাকার নোট। ঢুকেই কাকিমার প্রখর দৃষ্টি সেইদিকে। নন্দকাকুর কাতর দৃষ্টি এবং আমার বিহ্বল দৃষ্টি সেইখানেই নিবদ্ধ; এবং নবাগত অতিথির উদাস দৃষ্টিও। কেবল নকুড়েশ্বরই ভিন্ন। তিনি উচ্ছ্বসিত,

—'তারপর? এস. কে. যে আজ সকালবেলাতেই?' তেপান্তর মাঠ পার হয়ে আসা ঝোড়ো বাতাসের বুক কাঁপান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ঘরটি দিশি মদের গন্ধে পরিপূর্ণ করে এস. কে বলেন,

—'দিস ইজ দি এনড। ইয়ে জিন্দগী হ্যায় বেওয়াফা— রাজুকে পুরিয়ে এলুম। মানে, রাজনলিনীকে। অর্থাৎ আমার জীবনটাই চিতায় জ্বেলে দিয়ে এলুম। বরবাদীয়োঁকো আজীব রাস্তা হ্যায়! ইয়েস—আজকে আমার জীবনটা দুমড়ে মুচড়ে শেষ হয়ে গেল, নকুড়।'

কাগজে পড়ে এসেছি, প্রতিভাময়ী বর্ষীয়সী চিত্রতারকা রাজনলিনী দেবীর মৃত্যুসংবাদ। বয়স হলেও কর্মক্ষম ছিলেন চিত্রজীবনে। ঘরে মৌনতা বিরাজ করে। দু মিনিট হবার আগেই এস. কে. আবার কথা বলেন—

—'জানই তো, রাজুই ছিল আমার সব। মানে, —রাজুর সঙ্গে আমার— সে তো আজকের কথা নয়, সেই নাইন্টিন থার্টি থেকে। বাংলা ছবির তখন গর্ভযন্ত্রণা চলেছে মেয়ে পাওয়াই ভার, লাইনের মেয়ে ছাড়া। সেই সময়ে রাজুকে আমিই আবিষ্কার করি। মাই ঔন ফাইনড। ওর মতো পবিত্র উদাস সরল শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ—' ওঁর চোখে নাকে জলধারা উথলে পড়ে (আমি মনে মনে শুনতে পাই: দানশীলা, তেজস্বিনী দয়াবতী) —নকুড়েশ্বর প্যান্টের পকেট হাতড়ে তাড়াতাড়ি নীল সিল্কের ইস্ত্রি করা রুমাল এগিয়ে দেন— দামী বিলিতি সেন্টের অভিজাত গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে বাংলা মদের দিব্য সৌরভ চাপা পড়ে না। এস. কে. দয়া করে নকুড়েশ্বরের রুমালে ফোঁৎ ফোঁৎ নাক ঝাড়লেন।

ইতিমধ্যে কাকা-কাকিমা মুখোমুখি। 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি' নন্দকাকু যেন সন্ত্রস্ত হরিণী। আর কাকিমা? খাস রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। —সে কী দৃষ্টি। আমি বেচারী ফেউয়ের ভূমিকায়। নকুড়েশ্বর এতক্ষণে সংবিৎ পেয়ে বললেন,

—'ইনিই বিখ্যাত ডিরেক্টর এস. কে. দত্তচৌধুরী, সাত্ত্বিকের সব ছবিগুলি যিনি ডিরেক্ট করেছেন। নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

—'মানে?' নন্দকাকু প্রায় শিবুর মতোই আনাড়ি বাক্য বলে ফেলেন।

—'সাত্ত্বিকবাবু তো নিজেই তাঁর ফিল্মগুলি ডিরেক্ট করতেন।' নকুড়েশ্বর এবার মৃদু মৃদু হাস্য করেন। সবজান্তার হাসি।

—'লোকে তাই ভাবে। আসল ঘটনা অন্য। আসল ঘটনা এই এস. কে.—র কাছে শুনুন। ইনিই ছিলেন সাত্ত্বিকের অল-ইন-অল।' এস. কে. সলাজ নয়নে তাকান, —অতটা বাড়িও না নকুড়, আমি ছিলুম সাতুর ডান হাত। এবং ডান হাত কী করত, বাঁ হাত তা টের পেত না, একেবারে সেই প্রিভিউয়ের দিনের আগে।'

এবারে আমিও আপত্তি না করে পারি না।

—'কিন্তু সাত্ত্বিকবাবু তো মোটামুটি একগুঁয়ে লোক ছিলেন। মানে ওঁর ব্যাপার তো সবই খোলাখুলি, সবাই সব জানে, উনি যে অন্যের কর্তাত্তি একদমই সইতেন না ছবির ব্যাপারে, সে কথা তো বিশ্বসুদ্ধ সকলেই জানি—', উদার হাস্যে দক্ষিণ হস্তটি বরাভয় মুদ্রায় উঁচু করে আমাকে থামিয়ে দিয়ে এস. কে বলেন:

—'থাক, থাক, আজ সাতু যখন নেই তখন ওসব কথা আর বলে কী হবে।

এসব প্রাইভেট ফ্যাক্ট তোমার পাবলিক নলেজ করাই উচিত নয় নকুড়।'

—'মিস্টার চৌধুরী খুবই সদাশয় ব্যক্তি'— নকুড়েশ্বর বলেন।

—'ও তাহলে তোমার নিজের খবরটা ওঁদের দিয়েছ?' রাজনলিনীর শোক ভুলে রীতিমত উৎসাহের সঙ্গেই প্রশ্নটি করেন ভদ্রলোক। এবং এই ব্যক্তি গত সংবাদ-সংক্রান্ত প্রশ্নে স্পষ্টতই লজ্জা পেয়ে যান সিদ্ধপুরুষ মহাতান্ত্রিক নকুড়েশ্বর। কেমন নম্র-নম্র মুখ করে বলেন,

—'না! ও আর দেবার মতন খবর কি আর?'

—'দেবার মতন খবর নয়? বল কি?' টেবিলে রাখা নোটের তাড়ার দিকে চেয়ে চেয়ে এস. কে বলেন,

—'মিউজিক আর ডি বর্মণ। সেটা খবর নয়? অ্যাঁ?'

—'মানে?' নন্দকাকু ঠিক বুঝতে পারেন না।

—'নকুড় তো ফিলিম করছে। ফ্যান্টাস্টিক স্ক্রিপ্ট বানিয়েছে। আর. ডি. বর্মণ তো খুশি হয়ে রাজি!'

এবারে কাকিমা জাগ্রত হন। ফিল্মের ব্যাপারে কাকিমার বেশ ইন্টারেস্ট আছে—

—'ডিরেক্টর নিশ্চয়ই আপনি?' এস কে সায় দিয়ে মাথা হেলান।

—'আর হিরো-হিরোইন কারা?' কাকিমার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

—'বল? নকুড়, বলে দাও? বলে দাও না কাকে তোমার হিরোইন করছ!' এস কে যতই উৎসাহ দেন, শ্রীমান নকুড়েশ্বর যেন ততই লজ্জায় কুঁকড়ে যান।

—'বল না, বল? লজ্জার কী? এ তো গর্বের কথা-বল, ওঁদের বলে দাও, নকুড়,' —লজ্জায় লালচে হয়ে নকুড়বাবু বলেই ফেলেন— 'শর্মিলা!' বাকিটা এস. কে. বলে দেন— 'শর্মিলা কিনা বাংলা ছবিতে নামতে খুব ভালবাসে। তাই।'

—'গল্প কার?' কাকিমা যেন ইন্টারভিউ নিচ্ছেন।

—'গল্প নকুড়ের নিজেরই লেখা, স্ক্রিপ্টও তারই। অসামান্য সেই স্ক্রিপ্ট, মানে, না মড়লে বিশ্বাস হবে না। এত এক্সাইটিং— নকুড়েশ্বরই লাইফস্টোরি বলতে পারেন, কিন্তু ওঃ! রাজুটাই যে চলে গেল! ওকেই তো ঠিক করেছিলুম মায়ের পার্টে। ওঃ রাজু। মাই সুইট চাইল্ড। মাই ডার্লিং রাজনলিনী!' হঠাৎ পুনর্বার শোকটা উথলে উঠল এস কে-র। আমরা ছবিটবিতে রাজনলিনী দেবীকে ষাটের উপরেই দেখছি তাই যৌবনের এই আবেগের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। নকুড়েশ্বরও অতিরিক্ত বিব্রত হয়ে পড়েন— 'থাক থাক, ওকথা আর' —তিনি অপরাধীর মতো চোর চোর মুখে বলেন, যেন এই মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। কথা ঘোরাতে চান কাকিমাও, তাই প্রশ্ন করলেন —

—'আর হিরো? হিরো কে? ধর্মেন্দর নাকি? সেও তো শুনেছি বাংলা বইয়ে নামতে চায়'— কাকিমা নানান ফিল্ম পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা। এবারে নকুড়েশ্বর গোলাপ-ফুলটির মতো লাজ-রঙা হয়ে ওঠেন। এবং তদৃষ্টে অকস্মাৎ শোকার্তের

ভূমিকা থেকে ইয়ারের ভূমিকায় চলে যান শ্রীযুক্ত এস. কে। একটি চক্ষু টিপে গেয়ে ওঠেন 'ƨ আমার গোপন কথা, ƨুনে যাও ও ƨো খি' —তারপর হঠাৎ শোক এবং ইয়ার্কি উভয় রোল পরিত্যাগপূর্বক খুব সীরিয়াস হয়ে গিয়ে গম্ভীর গলায় বলেন— 'হিরো নকুড়েশ্বর হিমসেলফ। দেখুন, লাইফ-স্টোরির ফিল্মে কিন্তু সেটাই বেস্ট। সাতুকে দিয়েও তো আগে তাই করিয়েছিলুম, শেষ বইটাতে মনে নেই? সাত্ত্বিকের লাইফ স্টোরি যেটা? জাঁ ককতো তো বার বার তাই-ই করেছেন। এমন কী ত্রুফোও। 'ডে ফর নাইটে?' তবে নকুড়ের নামটা বদলে দিতে হবে। ভাবছি ধীমান নামটি কেমন।'

—'বেশ নাম। চমৎকার নাম'— বলতে বলতে হঠাৎ ঝুঁকে কাকিমা টেবিল থেকে খপাৎ করে নোটের বাণ্ডিলটা তুলে নেন— নন্দকাকুর দিকে তাকিয়ে বলেন— 'এটা তো পশ্চিমের দোকানঘরগুলোর ভাড়াটা? তাই না? আজই দোসরা।' ভীত নন্দকাকু স্বীকারোক্তিতে মাথা নাড়েন। কাকিমা উঠে দাঁড়ান। ব্যাগ খুলে টাকাটা প্রথমে ভরেন। নেক্সট মুভ হিসেবে পানের ডিবে বের করে মুখে বেশ খানিক পানজর্দা ঠাসেন, যাতে মনের বল বৃদ্ধি পায়। তারপর মুখটা উঁচু করে (যাতে পানের রস না গড়িয়ে পড়ে) সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেন—

—'খাওয়াচ্ছেন তো টিকের ছাই আর হত্তুকির গুঁড়ো, ইদিকে হাজার দুয়েক অলরেডি গচ্চা গেছে। আজ আমি না এসে পড়লে আরও পাঁচশ যেত। হুঁঃ। বাবুর ফিলিম করা হচ্ছে। ধীমান। ঐ ফিলিমের প্রযোজক কি আমরাই? বলি, টাকাটা যোগাচ্ছে কে? এই হতভাগা রুগীগুলো। না?' এবার নিচে নামল, এবং আঙুলটি এস. কে-র দিকে উদ্যত হল— 'ওই জুটেছেন আসল ফোর-টোয়েন্টি। যেই সাত্ত্বিকবাবু মারা গেছেন, অমনি তাঁর নামে যা-নয় তাই বলা? আবার রাজনলিনী দেবীর নামেও মরণের সঙ্গে সঙ্গেই কেচ্ছা করা হচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী মরলে এ কী বলবে কে জানে। একখুনি পুলিস ডাকা উচিত।' তারপর স্বর পালটে—

—'আর বাছা নকুড়েশ্বর, তোমাকেও বলি। বুড়ো বাপের কথা-টথা একটু শুনলেও তো পার। চাঁদসীর চিকিচ্ছে না করতে চাও, কোর্টেও তো বেরুলে পারতে? এ ব্যাটা বুড়ো জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে যে তুমিও গেলে, আমরাও গেলুম, বাপ। এটা কেলোর কীত্তি হচ্ছে। হ্যাঁ, সে ছিল বরং পাগলা হেম-কবরেজ।' কাকিমার কণ্ঠে হঠাৎ গরম গরম মায়া ঝরে পড়ে—

—'ঘাস পাতা দিত বটে, কিন্তু পয়সারও খাঁই ছিল না মোটে। সে তবু একরকম। পাগলটা নাকি ওষুধ খুঁজতে খুঁজতে একেবারে নেপালে চলে গেচে।'

এবারে পরম বিস্ময়ে নকুড়েশ্বরের মুখ খুলে যায়—

—'নেপাল? হেম তো নেপালে যায়নি।'

—'তবে? লছমী যে বললে—', নন্দকাকুকে থামিয়ে দিয়ে নকুড়েশ্বর তাড়াতাড়ি

বলতে থাকেন,

—'হেম তো গেছে তার শালার বাড়ি, ইউ এস এ তো। শিকাগোয় হেমের শালা রেস্টুরেন্ট খুলেছে, হেমের বউ সেখানে রান্না করে। বউ লিখেছে ওদেশে হিন্দুধর্মের খব বাড়বাড়ন্ত, যোগ-যাগ তন্ত্র-মন্ত্র খুব চলছে, মায় ঝাড়ফুঁক পর্যন্ত। হেম তাই শিকাগোয় গেছে একটা কালীমন্দির খুলতে। ওখানে বাঙালীও ঢের, কালীবাড়ি একটা দিব্যি জমে যাবে।'

এক মুষ্টিতে নন্দকাকু, অন্য মুষ্টিতে আমি, বগলে ব্যাগ, কাকিমা দরজায় দিকে ফরোয়ার্ড মার্চ করতে করতে পর্দার সামনে এসে অ্যাবাউট টার্ন করে ঘুরে দাঁড়ান। এস. কে. নীরব, উদাস চোখে টেবিলে নোটের তাড়ার শূন্য স্থানটির দিকে চেয়ে বসে আছেন। নকুড় উঠে দাঁড়িয়েছে উত্তেজনায়। কাকিমা নকুড়েশ্বরের দিকে চেয়ে একটি যথার্থই মিলিয়ন ডলার অ্যাডভাইস ঝাড়লেন—

—'দ্যাখ বাছা নকুড়েশ্বর— তুমিও আমেরিকাতেই চলে যাও না কেন? হলিউডে ছবি করবে, দেবানন্দ শশী কাপুরের মতন নাম করবে, আর হীরে-জহরত পুড়িয়ে খাবার ব্যবসাটাও ও-দেশেই জমবে ভাল। ওটা বোধহয় সায়েব ব্যাটারা খেতে শেখেনি এখনও।'

অপারেশন ম্যাটারহর্ন

তোমরা নিশ্চয়ই সেই জাপানী মহিলার নাম শুনেছ, শ্রীমতী তাবেই, যিনি এই বিশ্ব নারীবর্ষে এভারেস্ট শিখর জয় করলেন। কিন্তু তোমরা কি জান, একবার দু'জন ভারতীয় ছাত্রী দুরারোহ ম্যাটারহর্ন শিখর বিজয়ে বেরিয়েছিল? ম্যাটারহর্ন আল্পসের একটি শৃঙ্গ। যেমনি উঁচু তেমনি খাড়াই— বিশেষত তার দক্ষিণমুখ পর্বতারোহীদের পক্ষে বশ মানানো প্রায় অসাধ্য। বছর তের চোদ আগের কথা— দুটি ভারতীয় মেয়ে ঠিক করল তারা ম্যাটারহর্নের দক্ষিণমুখ জয় করবে। তারা কোনওদিন মাউন্টেনিয়ারিং শেখেনি বটে, কিন্তু তাদের সাহস ছিল খুব। কেম্ব্রিজে পড়তে গিয়েছিল দুজনে ভারতবর্ষের দুই কোণ থেকে। গিয়ে ভাব হয়ে গেছে। যেমনি মনে হওয়া অমনি ইস্টারের ছুটিতে পিঠে হ্যাভারস্যাক ফেলে, হাতে স্লিপিং ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল তারা দুজনে— লক্ষ্য ম্যাটারহর্ন। সম্বল কষ্টেসৃষ্টে জমানো কয়েকটি পাউণ্ড, কিছু দেশের ডালমুট, কিছু ডিম, চীজ, রুটি, জেলি, এক শিশি ইনস্ট্যান্ট কফি। এছাড়া ম্যাপ, কমপাস, হুইসিল আর টর্চ তো আছেই। কিছু চুইংগামও।

ম্যাটারহর্নে চড়তে গেলে যেতে হয় ৎসেরমাট নামে একটা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামে। ৎসেরমাট-এ যেতে গেলে প্রথমে যাওয়া দরকার জেনিভা শহরে, ট্রেন ধরতে। রেণুকা আর নবনীতা তো খুব কষ্টেসৃষ্টে একটা ট্রেনে করে প্রথমে গেল লণ্ডন, তারপর লণ্ডন থেকে আরেক ট্রেনে ডোভার, তারপর জাহাজে চড়ে ডোভার থেকে ক্যালে (সেটা ফ্রান্সে), ফের ট্রেনে চড়ে ক্যালে থেকে লিয়ঁ— আবার ট্রেন বদলে লিয়ঁ থেকে জেনিভা (সেটা সুইটজারল্যাণ্ডে)। রেলগাড়ি বদল করে জেনিভা থেকে ৎসেরমাট চলল। পথে অনেকবার চীজ কিনল, রুটি কিনল, কলা কিনল। রেণুকা আবার মাছ-মাংস খায় না। সে তামিলনাড়ুর মেয়ে। অন্যজন বাঙালি।

জেনিভার ট্রেনটা সোজা ৎসেরমাট পাহাড়ে ওঠে না কিন্তু। পথে আবার একটা ছোট স্টেশনে এসে ফুরনিক্যুলার ট্রেনে চাপতে হয়। সেই শুঁয়োপোকার মতো খুদে খুদে ট্রেনগুলো পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ। তার চাকার গায়ে দাঁত-দাঁত কাটা শেকল পরান,

আবার রেললাইনেও দাঁত-দাঁত খাঁজকাটা, ট্রেন শেকল আর দাঁত দিয়ে সেই লাইন কামড়ে কামড়ে খাড়া হয়ে পাহাড়ে ওঠে, খসে-টসে পড়ে যায় না। পথে প্রথমে গ্রাম ছিল, ক্ষেতখামার— আপেলবাগান ছিল, গরু-ভেড়া চরছিল, গয়লানীরা বেড়াচ্ছিল দৃশ্য—টৃশ্য স্বাভাবিক ছিল। তারপর ক্রমশ কমতে লাগল ঘরবাড়ি, মানুষবসতির চিহ্ন। কেবল বাড়তে লাগল ঝর্না, আর ঝাউবন। আর বরফ। ট্রেনের গতি কমে এল। মাঝে মাঝে টানেলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে— অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে, ছাদ থেকে জলের ফোঁটা পড়ছে,— মাঝে মাঝে গ্লেশিয়ার পার হচ্ছে। মস্ত মস্ত ঠাসা বরফের নদীর নাম গ্লেসিয়ার— বহু শত সহস্র বছর ধরে এইসব বরফ জমেছে— এরা নদী, কারণ খুব আস্তে হলেও, এদের গতি আছে। বছরে যদি দুই কি তিন ইঞ্চি এগোয়, সেটা তাদের পক্ষে উদ্দাম গতিবেগ। মাঝে মাঝেই গাঢ় শ্যাওলার চাদর ঢাকা, মাঝে মাঝে গভীর, চওড়া খাঁজ, খোঁদল ফাটল। কোথাও বা গর্ত। বরফের নদীর রং ঠিক সাদা নয়, কেমন যেন স্বপ্নের মতো সবজে, নীল-মতন। হঠাৎ হঠাৎ অনেক সময়ে এইসব গ্লেশিয়ারের অংশ ধসে পড়ে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেয়। 'তুষার ধস' এই ভয়ঙ্কর শব্দটি আল্পসের এইসব পাবর্ত্য গ্রামে প্রবল ভীতিকর, অলুক্ষনে। ৎসেরমাটে সবাই 'স্কী' করতে যায় বোঝা যাচ্ছে, নয়ত পাহাড়ে চড়তে। এছাড়া আর কেনই বা যাবে? এই ছোট্ট ট্রেনের ভেতরে দেয়ালে লম্বা লম্বা তাক তৈরি করা আছে। তাতে স্কী রাখা। আমরা দুজন স্কী করতে জানি না। পোশাক দেখলে অবশ্য বোঝবার উপায় নেই— এত যত্ন করে স্কী-পোশাক নকল করেছি। যত বরফ বাড়তে লাগল, তত আমার মনে হতে লাগল, ম্যাটারহর্নের দক্ষিণমুখ আমরা ম্যানেজ করতে পারব কি? 'ভাই রেণুকা, ওটা এবার ছেড়েই দে বরং। যাই, গিয়ে দেখে-টেখে আসি। বড়ো বড়ো পর্বতারোহীরাই যা পারেন না, আমরা কি তা পারি? পাহাড়ে চড়ার আইনকানুনগুলোও তো ঠিক শেখা হয়নি আমাদের। তার চেয়ে বরং বাঁদিক থেকেই এবারের অভিযানটা চালান যাক— যে-দিকটাতে স্বাভাবিক খাঁজ কেটে রেখেছেন ভগবান। ঈশ্বরের যদি ইচ্ছে হত দক্ষিণ দিক দিয়ে লোকেরা ওঠে তাহলে কি উনি এদিকেই খাঁজ কাটতেন না? কী হবে ভাই শুধু শুধু প্রকৃতির বিরুদ্ধতা করে?' —তোমরা মনে রেখ যে, তখনও ভারতবর্ষের মেয়েদের পর্বতারোহণের চল ছিল না। তাছাড়া আমরা দুজন পার্বতী নই কোনওরকমেই। দুজনেরই সমতলে জন্ম, সমতলেই মানুষ হয়েছি। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের আশা এবং উৎসাহ পর্বতপ্রমাণ আকাশচুম্বী।

ছোট্ট স্টেশন ৎসেরমাট-এ নামলুম মাত্র কজন যাত্রী। শুধু আমরাই ভারতীয়। নামতেই দেখি ক্রাচ-বগলে কয়েকজন লোক গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। হাড় কাঁপান শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে গান গাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ক্রাচ কেন? একসঙ্গে এতগুলো খোঁড়া লোক? স্টেশনের সামনেই দেখি এক রাজসূয় কাণ্ড— কী সুন্দর একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে, কী তার রং, কী তার ঢং। অপু-দুর্গার রেল দেখতে ছোটার মতন, অগ্র-পশ্চাৎ বিস্মৃত হয়ে ম্যাটারহর্ন অভিযাত্রী-যুগল ঘোড়ার গাড়িটার

পেছন পেছন ছুটলাম। যেন কোমরে ঘুনসি-বাঁধা আদুড়-গা অপগণ্ড; কৌতূহলে এতই ডগমগ আমরা। না জানি কারা চড়েন এই গাড়িতে? এ দৃশ্য তো সুলভ নয় পশ্চিমী শহরে— একটা বরফমোড়া স্বপ্নরাজ্যে এটা বরং মানিয়ে গেছে। রথ থামল 'পোস্ট অফিস' লেখা একটা দরজার সামনে। ভেতর থেকে কোন রাজা-রাজকন্যে বেরুবেন, দেখব বলে আকুল নয়নে দাঁড়িয়ে আছি— প্রথমে নামল ক্র্যাচ। তারপর মানুষ। আরো ক্র্যাচ আরো মানুষ। নারী, পুরুষ, শিশু। সবার বগলেই ক্র্যাচ— ছোট্ট ক্র্যাচ, বড় ক্র্যাচ, বেঁটে ক্র্যাচ, লম্বা ক্র্যাচ। ইত্যাদি।

ব্যাপারটা কী? এত ক্র্যাচওলা লোক কেন— একি কেবল খোঁড়াদের দেশ? এই ম্যাটারহর্ন? রেণুকা কেমিস্ট্রিতে ফার্স্টক্লাস। খুব বুদ্ধি তার। সে বলল, 'নিশ্চয় হট স্প্রিং-টিং আছে। রাজগীরের মতো।' —ও হরি, তাই বল! আমি এবার নিশ্চিন্ত হলাম। রাজগীরে যেমন লাঠি হাতে পঙ্গু লোকের ছড়াছড়ি, এও তেমনি। সুইটজারল্যাণ্ডের রাজগৃহ এটা। বরফ-নদীর নীচে হট স্প্রিং। ঈশ্বরের কী আশ্চর্য লীলা। প্রকৃতির কী অপ্রাকৃত ইন্দ্রজাল? আহা, এ গাড়িটা তাহলে খোঁড়াদের গাড়ি? কৌতূহল মিটল। —এবার গেলুম মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে।

ইয়ুথ হস্টেলে জায়গা নেই। একটাও হোটেল আমাদের বসবাসের যোগ্য নয়, কারণ সেখানে আধ-বেলা ঠাঁই নেবার মতনও রেস্ত আমাদের নেই। একটা পাঁসিয়নেটে গেলুম। এক গৃহস্থ মহিলা বাড়িতে ঘর ভাড়া দেন। এদেশে এটাই রীতি। তিনিও বললেন, জায়গা নেই। শুধু ছাদের ঘরটায় জায়গা আছে— কিন্তু খাট মাত্র একটা। আমরা যত বলি খাট-বিছানা চাই না, আমরা মেঝেতে দিব্যি স্লিপিং ব্যাগ পেতে শোব— মহিলা বলেন, 'ওসব চলবে না, খাটে শোয়া চাই। একজন মাত্র থাক, অন্যজন অন্যত্র পথ দেখো।' —তাই কি হয়? আমরা শেষে বললুম, 'দুজনেই ঐ ঘরে শোব।' উনি বললেন, 'তাহলে আমাকে পুলিসে ধরবে।' আমরা বললাম, 'একজনের ভাড়া নিন তাহলে। দুজনের নেবেন না। আপনি কাউকে ফ্রী থাকতে দিলে পুলিসের কী?' —আমাদের নাছোড়বান্দামি এবং আহ্লাদপনা দেখে শেষটা তিতিবিরক্ত হয়ে মহিলা বললেন, 'যাও— যা খুশি করগে যাও, দুজনে মিলে এক বিছানায় ঠাসাঠাসি করে মর, আমি জানি না।' —আনন্দের চোটে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করল, কিন্তু দুধ-ঘি-সর খেয়ে সুইস মহিলার বপু এমনই বিপুল হয়, যে সাহস হল না। মহা আনন্দে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমরা ঘুপচি ঘরে উঠলাম। চিলেকোঠা— নানা দিক থেকে ছাদটা ঢালু হয়ে এসে দেয়ালে মিশেছে। ঘরে আলো জ্বলছিল না। প্রথমেই ঘুরে ঘুরে আবছা অন্ধকারে আলোর সুইচ খুঁজতে লাগলাম। এক একবার রেণুকার মাথায় ঠোক্কর লাগে, আর 'আহা! আহা!' বলতে বলতেই ঠাস করে আমারও মুণ্ডু ছাদে ঠুকে যায়— এমনিভাবে সুইচ খোঁজা চলল। দরজার বাঁয়ে, দরজার ডাইনে, খাটের এপাশে, খাটের ওপাশে, নাঃ নেই। সুইচ কোত্থাও নেই। তবু ভাল যে টর্চ আছে সঙ্গে। ক্লান্ত হয়ে খাটে বসলাম। সিংগল খাট। নরম তুলতুলে তোষকের ওপর দুধের ফেনার মতো চাদর

টানটান পাতা। একটাই মাত্র কম্বল, ভাঁজ করা আছে। বিছানায় বিলেতের ধরনে চাদর গোঁজা নয়। রেণুকা দেখল, দরজায় ছিটকিনি— অর্থাৎ তালা নেই। হোয়াট? নো লক, নো লাইট? রেণুকার মুখ শুকিয়ে গেল। 'তুইও যেমন! আমাদের আছেটা কী, যে চোরে নেবে? লক দিয়ে কী হবে?' —রেণুকা খুব চটে গেল। —'আছেটা কী? কেন, তুমি রামায়ন পড়নি? সীতা হরণের কথা জান না? ছেলেধরার কাহিনী শোননি কখনও?' বাঃ। —যত বলি, 'ওরে রেণুকা, তুইও সীতা নোস, আমিও সীতা নই, তাছাড়া সে রামও নেই, রাবণও নেই,' —কে শোনে কার কথা। 'দ্যাখ রেণুকা, এতেই ভয়? ভুললে চলবে না, আমরা ম্যাটারহর্নের দক্ষিণাপথ অভিযাত্রী।' রেণুকা ধমক দিয়ে উঠল— 'পাহাড়ের বিপদ আলাদা। তা বলে ঘরের বিপদে ভয় করবে না?' রেণুকার মাউন্টেনিয়ারিং-এর মুডটা নষ্ট হয়নি দেখে সান্ত্বনা পেলুম।

এদিকে পেট চোঁ চোঁ করছে। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কিছু ডিমসেদ্ধ রুটি জ্যাম খেয়ে বেশ খানিকটা জল খেলুম। কলে গরমজল ছিল না যে কফি গুলব। থাক, জলটা হয়ত আদিতে হট স্প্রিংয়ের, কে জানে? নিশ্চয় খেলে শরীর ভাল হবে। —কী ঠাণ্ডা জল রে বাবা। ঘরটাও ঠাণ্ডা, হিটেড নয়। একটা হিটার আছে, পয়সা ফেললে জ্বলা উচিত, যেমন জ্বলে ইংলণ্ডের ভাড়াবাড়িতে। কিন্তু পয়সা ফেলব কোথায়? এই চিলেকুঠুরিতে সস্তার সত্যিই তিন অবস্থা— হিটার আছে কিন্তু পয়সা ফেলার ব্যবস্থা নেই, অমনিও জ্বলছে না। এটা ওটা টিপেটুপে দেখলুম, নাঃ, হিটার নট জ্বলন নট কিচ্ছু। সুইচ নেই। —একেই পথশ্রমে শরীর অতিরিক্ত ক্লান্ত, তায় ঘর কনকনে ঠাণ্ডা, শুতে পারলে বাঁচি— কিন্তু রেণুকা অরক্ষিত কক্ষে কিছুতেই ঘুমোবে না। সে ঘরের একটিমাত্র চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল— দরজা বন্ধ না হলে শোবে না। এ তো কলকাতা থেকে পুরী যাওয়া নয়, এ হচ্ছে ম্যাটারহর্ন অভিযান। সঙ্গে তো দেশের মত বেডিং-ট্র্যাঙ্ক-বালতি-লণ্ঠন কিছুই নেই, যা দিয়ে দরজায় ঠেকা দেবে। শেষে টেবিলটাই টেনে এনে দোরে ঠেস দিয়ে, তার ওপরে চেয়ারটাকে তোলা হল। নিচু সিলিংয়ের প্রায় ঠেকে যাচ্ছে। দেখে মনে হয় শুধু ছাদ থেকে দড়িটা বেঁধে ঝুলে পড়লেই হল, যেন ফাঁসি যাবার সব বন্দোবস্ত পাকা। রেণুকা এবার শুতে রাজি হলো। কিন্তু এখন সমস্যা কে খাটে, কে মাটিতে? কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান? এ বলে তুই খাটে শো! ও বলে তুই খাটে শো। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল দুজনেই খাটে শোব। কম্বলখানি টেনে নিয়ে কোটটোট মোজাটোজা সুদ্ধ দুজনে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লুম। বুট দুটো খুলে রাখলুম দোরগোড়াতে। শুয়ে পায়ে স্লিপিং ব্যাগ দুখানি চাপা দিলুম— দিয়ে শুরু হলো ঠক-ঠকানি। রেণুকার সীতাহরণের ভয় কাটছে না, আমার নিমোনিয়ার ভয় ঢুকেছে। ঘুম হল তা সত্ত্বেও। সকালবেলার আলোয় যেই জানলার চৌকো কাঁচগুলো জলরং হয়ে ফুটে উঠতে শুরু করল, আমি উঠে পড়লুম। উঠতে গিয়ে মুখে কি একটা নোংরা সুতোর মতন ঠেকল। টেনে ছিঁড়ে ফেলতে গেছি যেই, অমনি টুক করে জোর আলো জ্বলে উঠল ঘরে। ওটাই সুইচ। সিলিং থেকে ঝুলছে।

রেণুকাও উঠে বসল। দেখা গেল দরজায় টেবিল, টেবিলের ওপর চেয়ার, তার ওপরে দুটো হ্যাভারস্যাক, তার নীচে দু-জোড়া বুটজুতো। আমাদের গায়ের ওপরে দুটো কোট, দুখানা স্লিপিং ব্যাগ। ঘরের দৃশ্য মোটামুটি এই। আর হিটারের পাশেও সিলিং থেকে ঝুলন্ত একটা ময়লা সুতো। সেটা টানবামাত্র হিটার গরম হতে শুরু করল। ঘরেই বেসিন। মুখ ধুয়ে বাসি রুটি চীজ কলা ডিমসেদ্ধ নিয়ে বসা হল। ফরাসী রুটি বাসি হলেই ভয়ানক শক্ত হয়ে যায়। ভাঙা যায় না পর্যন্ত। ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে নরম করে তাই খানিকটা খেলুম দুজনে...উপায় কী। পয়সা কম খিদে বেশি। খেয়ে-দেয়ে ছেঁড়া কাগজ, রুটির গুঁড়ো, ডিমের খোলা, কলার খোসা, সবই সযত্নে পকেটে পুরে ফেলা হল। কারণ খেতে-খেতেই নজরে পড়েছে দরজায় গায়ে একটা নোটিশ টাঙান...ঘরের মধ্যে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। এখন কোণের টুকরিতে আবর্জনা ফেললেই ঝি এসে খপ করে ধরে ফেলবে। ধরলে নিশ্চয় জরিমানা হবে। জরিমানা হলে ম্যাটারহর্নে ওঠা হবে না। তাই প্রমাণ লোপের প্রচেষ্টায় লেগে গেলাম দুজনে। ভয়ে ভয়ে নিচে গেছি...কী জানি দেখে যদি বুঝতে পারে যে আমরা ঘরে খেয়েছি? মাত্র একটা পাতলা কম্বল দিয়েছে, আর ছিটকিনি দেয়নি কোন...এসব অভিযোগ করার মতন মনের জোর আর বাকি ছিল না...নিজেরাই যেহেতু নিয়ম ভেঙেছি। আইন অমান্য করে নিজেরাই চোর হয়ে গেছি। রেণুকার মুখটা যদিও বেশ অপরাধী-অপরাধী দেখাচ্ছিল, তবুও দরজায় ছিটকিনি নেই কেন— এই মর্মে সে মৃদু অনুযোগ তুলতে গেল। অমনি মহিলা সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। আর যায় কোথায়? তক্ষুনি আমাদের রাগ হয়ে গেল। পকেটের কলার খোসা-টোসার কথা ভুলে গিয়ে আমরা রেগে বললুম, চাই না থাকতে, একখান মোটে পাতলা কম্বল, দোরে তালা নেই, তার আবার মেজাজ কত। শুনে মহিলা রাগ করলেন না, অবাক হয়ে গেলেন। 'কম্বলটা তো অতিরিক্ত, ওটা একটা তো কী, অত মোটা লেপটা রয়েছে না?'

'লেপ? কোথায় লেপ?

'কেন? বিছানায়?'

'কৈ কৈ, ছিল না তো? লেপ-টেপ কিছু ছিল না।'

'কিচ্ছু ছিল না? দেখাচ্ছি ছিল কিনা।' বলেই মহিলা থপ থপ করে বাড়ি কাঁপিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। পিছন পিছন আমরাও। এসে দেখি উনি বড়ো বালিশটা তুলে তার তলা থেকে যেন ম্যাজিকে, দু ভাঁজ করা লম্বা চওড়া, বিশেষরূপে স্থূলবপু একটা পালকের লেপ টেনে বের করলেন। সেটা বিছানা জুড়েই পাতা ছিল। ধবধবে ওয়াড় পরানো সেই নরম লেপের ওপরেই আমরা সারা রাত্রি চেপে শুয়ে থেকে শীতে কেঁপেছি। ইংলণ্ডে বিছানা করার ঢংটা অন্যরকম বলে ব্যাপারটা মোটে ধরতেই পারিনি অন্ধকারের মধ্যে। লেপকে লেপ বলে চিনিনি...তোষক ভেবেছি। মহিলা জীবনে এমনধারা উজবুক গাঁইয়া দেখেননি আমাদের মত। ...তিনি হেসে আর বাঁচেন না।

এবার রওনা, ম্যাটারহর্নের উদ্দেশ্যে। ম্যাটারহর্নে চড়ব বলে আমরা দুজনে প্রথমে

গেলাম মুদির দোকানে। তাজা নরম রুটি কিনব, কলা কিনব...কিছু কার্বোহাইড্রেট ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য চাই। গায়ে বল না সংগ্রহ করে উঠব কী করে ম্যাটারহর্নের দক্ষিণাপথ বেয়ে? দুখানা চকলেটও নিতে হবে। পর্বতারোহণে সব সময় চকলেট খেতে হয়, বইয়ে পড়েছি। চকলেট এনার্জি দেয়। চারিদিকে তুষার-রাজ্য, মাঝে মধ্যে দু একজন ক্রাচবিহীন মানুষজন দেখলেই আমরা উৎসাহিত হচ্ছি...'দ্যাখ দ্যাখ, এর কিন্তু ক্রাচ নেই। আমাদের মতোই।' শীত প্রচণ্ড কিন্তু আমাদের কষ্ট হচ্ছে না। আপাদমস্তক পশমে ঢাকা...পায়ে পেল্লায় স্নো-বুট, হাতে ইয়া ইয়া চামড়ার দস্তানা, গায়ে স্কী-জ্যাকেট, পরনে স্কী-প্যান্টস, মাথায় গরম ফেট্টি বাঁধা, গলায় কাশ্মীরী স্কার্ফ। ধড়াচুড়োর কোনও অভাব নেই। আমি কেবলই খুব মনযোগ দিয়ে রেণুকাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছি... আর ভাবছি, আমাকেও অমন স্কী-বিবিটি দেখাচ্ছে নিশ্চয়। একই তো পোশাক দুজনের। সাদা তুষারে রোদ পড়লে চোখ ঝলসে যায়, তাই সানগ্লাস পরা নিয়ম। রেণুকার চোখে বিলিতি কালো চশমা... আমার যেহেতু একটা চশমা আছে, তার ওপরে দু গুণ এঁটেছি ধর্মতলার সানগ্লাস। তাতে স্মার্টনেস দু গুণ হয়। আত্মবিশ্বাসে টৈ-টুম্বুর আমরা আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ম্যাটরহর্নের দিকে এগোচ্ছি। পা টিপে, কারণ বরফ খুবলে পথ যদিও কেটেছে, সে-পথ খুবই পিছল। দুজনকেই দিব্যি খোকা-মেম খোকা-মেম লাগছে, একমাত্র রসভঙ্গ করছে মাথার ফেট্টির নিচে থেকে ঝুলন্ত দুটো কালো বিনুনি। লেজের মত দোদুল্যমান সেই বেণীর ডগায় দুলছে আমাদের এতোল-বেতোল দুটি পাতি-খুকুর প্রাণ! সোঁদা গন্ধওলা দিশি-দেহাতি মন। আঃ, বেণীদুটো যদি না থাকত, কিংবা বগলে যদি ক্র্যাচ থাকত তাহলেই কেউ বলতে পারত না আমরা বিদেশী। বরফ ভেঙে হাঁটা বড়োই কষ্টকর কর্ম। ফুটপাতের দু পাশে কোমর অবধি উঁচু বরফের পাঁচিল, মাঝখানটা কুপিয়ে পরিষ্কার করা। কিন্তু অত্যন্ত পিচ্ছিল। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া নেই, ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে, রোদ নেই। মন-খারাপ-করা মন-খারাপ-করা একটা আলো। তা হোকগে। আমরা বেরিয়েছি যে উদ্দেশ্যে তা থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না। ম্যাটারহর্ন অভিযানের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। এবার ভাল সঙ্গী জুটলেই হল। [illegible] উঠে পড়ব।

...কিন্তু ভাই রেণুকা, এই রাস্তাই যদি এত কঠিন, এত পিছল হয়, তাহলে ম্যাটারহর্নের গা বেয়ে কি আমরা উঠতে পারব? আমরা তো কিং-কং নই। টারজানও নই। পর্বতারোহণের বুট জুতোই আলাদা, তার নিচে কাঁটা মারা থাকে। আমাদের সে-সব নেই। পড়ে যাব যে ভাই। হ্যাঁ ভাই রেণুকা, এবারে ম্যাটারহর্নটা বাদ দিলে কেমন হয়? ডান-বাঁ দু দিকটাই তো বরফ দিয়ে ঢাকা। এ-জুতোয় কি হবে? ধুৎ তেরি। ভীরু বাঙালি কোথাকার। শুরুতেই কু গাওয়া? ...রেণুকা ধমক দিতেই রাগ হয়ে গেল। ভীতু বলা? বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি। সেই আমাদের ভীতু বলা? ...[illegible] হ্যায়। চালাও পানসি...ম্যাটারহর্ন! মনে মনে রাগলেও মুখে কিছু বলতে পারলুম না, কারণ আগেই চোখে জল এসে গেছে। রাগলে এই দুর্দশা হয় আমার। সুবিধা এই যে, রেণুকারও তাই হয়। মনে মনে আবৃত্তি

করে নিলুম...দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে...লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। পা যেন কিছুতেই পিছলে না যায়। ...অবশেষে পৌঁছে গেলুম সেই জায়গায়...যেখানে সকলেই বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ কিনা ম্যাটারহর্নের পাদদেশে। অহো, কী দুঃসহ স্পর্ধা! ঠিক যেমনটি দেখেছি ছবিতে...তেমনি সিধে, খাড়া উদ্ধত, স্পর্ধিত গিরি-শৃঙ্গ ম্যাটারহর্ন একটু ত্যাড়াব্যাঁকা এক বিপুল শিবলিঙ্গের মতন সাদা বরফে প্রোথিত হয়ে আছে...ধূসর আকাশ ফুঁড়ে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলুম। তারপর খোঁজ নিয়ে জানলুম, আজ অভিযাত্রী দল যাবে না। আজ নাকি ব্যাড ওয়েদার, তাই শখের অভিযাত্রীদের আজ যাত্রা নাস্তি।

আহ! শুনে যেন বুক থেকে একটা ম্যাটরহর্ন পাহাড় নেমে গেল। ভাই রেণুকা, আজ তাহলে একটু দেখি-টেখি, বেড়াই-টেড়াই? কাল চড়ব, কেমন? কাল যখন রোদ্দুর উঠবে, হয়ত একটু বরফও গলবে, তখন উঠব, সেই বেশ হবে। ...এত দূর পথশ্রমের ক্লান্তি আজও কাটেনি। এই ভাল হল। আমরা কখন যে পথ ছেড়ে প্রশস্ত বরফের মাঠে নেমে পড়েছি তা টেরও পাইনি। এই মাঠে শিক্ষানবিশি চলছে —স্কী-ইং এবং স্কেটিং ছাত্রদের। বরফের মধ্যে কয়েকটি তাঁবুও খাটান রয়েছে। এদের কী সহ্যশক্তি রে বাবা।

রং-বেরঙের পোশাকে স্কার্ফ উড়িয়ে চঞ্চল চপল গতিতে নেচে বেড়াচ্ছে অজস্র মানুষ-নারী, পুরুষ, শিশু। কেউ স্কীতে, কেউ স্কেটে। স্কেটিং-এর জন্য একটু শক্ত বরফ চাই, স্কীর জন্য চাই অনেকটা জায়গা, গ্লেসিয়ারই ভাল। মোহিত হয়ে আমরা এগোচ্ছি, এখানে ক্রাচ-ওলা কেউ নেই— আমাদের পা হাঁটু অবধি তুষারে ডুবে যাচ্ছে, একটা একটা করে টেনে বের করছি, ফের পদপাত করছি, ফের পদোদ্ধার করছি, বেশ অভ্যাস হয়ে এসেছে— যেন আজন্ম এভাবেই চলা-ফেরা করেছি গড়িয়াহাটে, কলেজ স্ট্রিটে। রেণুকার মোহিত দৃষ্টি কালো চশমা ভেদ করেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুজনেরই নাক বেয়ে, চশমা বেয়ে, চিবুক বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টির জল গড়াচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম রেণুকাটা সত্যি বড্ড কালো। এই সাদা তুষারের রাজ্যে সাদা চামড়ার লোকগুলির মধ্যে রেণুকাকে যেন তাল-ভঙ্গকারী লাগছে। এক সেকেণ্ড মাত্র। তার পরেই মনে পড়ল রেণুকাও নিশ্চয় আমাকে দেখে ঠিক ভাবছে, এঃ, নবনীতাটা বড্ডই কালো দেখছি। তার মানে যতই স্কী-বিবিটি সাজি না কেন আমরা, রেণুকার মধ্যে ঢেউ তুলেছে যে অগাধ রসম-সম্বর, আর আমার ভেতরে যে গজগজ করছে ঠনঠনের ঝোল-ভাত, সেটা বাইরে থেকেও বেশ দেখা যাচ্ছে। আমরা যে আলাদা, আমরা যে ভিন-দেশী সেটা কাউকে বলে দিতে হবে না, সেটা আমাদের গায়েই লেখা আছে। ভেবে একটু মুখ গোমড়া হলো-ভাবলুম: কালো জগৎ আলো। কেষ্ট কালো, কালী কালো, আমি-রেণুকাই বা কালো হব না কেন? শক-হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন— সে দেশে একটু ঘনত্ব থাকবে না? এই তো ভাল— এমনি ট্যান চামড়া পাবার জন্যেই তো এই সাদা চামড়ারা মরে যাচ্ছে— আর এছাড়া রেণুকার মুখখানি খুবই মিষ্টি। বলা অবশ্য উচিত নয়, আমি ভাবলুম, কিন্তু আমার মুখটাও তো খুব তেমন কিছু বিচ্ছিরি নয়— এইসব ভাবতে

ভাবতে মনটা যেই প্রফুল্ল হয়ে উঠছে...অমনি কানে এল মার্কিন আওয়াজ— 'হাই। তোমরা বুঝি পাকিস্তানি?'

'পাকিস্তানী হতে যাব কেন?' রেণুকা এক ধমক দেয়।

'সরি।' সড়াৎ করে স্কী চালিয়ে আধ মাইলটাক নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল ছেলেটি। আমি বললুম,

'অমন করে না বললেই হত। ওরা কিছু জানে না।'

'পাকিস্তান কি আগে হয়েছিল, না ভারতবর্ষটা আগে? —আগেই বলবে, পাকিস্তানী? কেন, আগে ভারতীয়টা মনে আসে না?'

'তবে কি তোমরা ভারতীয়?' চমকে উঠে দেখি স্কী চালিয়ে সে আবার ফিরে এসেছে।

'হ্যাঁ। তুমি বুঝি মার্কিনি?'

'হ্যাঁ। পশ্চিম জার্মানি থেকে বেড়াতে এসেছি। ছুটিতে।'

'তুমি কি হট স্প্রিং-এর জন্য এসেছ?' রেণুকা প্রশ্ন করে।

'হট স্প্রিং? এখানে হট স্প্রিং আছে নাকি, এই বরফের মধ্যে?'

'কী জানি? সেইরকমই তো মনে হচ্ছে।'

'আমি তো কখনও শুনিনি?' মার্কিন ছেলেটি বলে।

আমি তাড়াতাড়ি অন্য কথাটাও জিজ্ঞেস করি।

'তবে কি কোনও আশ্রম-টাশ্রম আছে? সাধু-সন্তের মন্দির? ভেল্কি-মিরাকল জাতীয় কিছু? আছে নাকি?'

আরো আশ্চর্য হয়ে গেল মার্কিন ছেলেটি।

'ভেলকি? সাধু-সন্তের মন্দির? তোমরা কি তীর্থযাত্রী?'

'আমরা বলে তীর্থের দেশ ভারতবর্ষ থেকে এসেছি, আমাদের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, বিলেতে আসব তীর্থ করতে।' গঞ্জনা দিয়ে ওঠে রেণুকা।

'সরি, আমরা জানি, সব ভারতীয়ই হিন্দু কিন্তু—'

মার্কিন ছেলেকে এক থাবায় নামিয়ে দিয়ে আমি বলি— 'কে বলেছে সব ভারতীয়ই হিন্দু? জান সেটা সেকুলার স্টেট? সেখানে সর্বধর্ম সমন্বয় ঘটেছে— হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীশ্চান-পার্সি-জুইশ সব আছে।'

'জুইশও?' অবাক হয়ে বলে ছেলেটি, 'আমিও জুইশ।'

'কিন্তু এখানে তীর্থস্থান আছে কিনা বললে না তো?' রেণুকা ভবি ভোলেনি, 'কিংবা হটস্প্রিং?'

'আমি তো কই কখন শুনিনি তীর্থ আছে বলে। কিন্তু কেন? তোমরা কি ভূতত্ত্বের ছাত্র— নাকি সমাজতত্ত্বের? একবার বলছ হট স্প্রিং চাই, একবার বলছ তীর্থস্থান চাই। লোকে তো এখানে ধর্মকর্ম করতে আসে না, আসে খেলাধুলো করতে। স্কী করতেই আসে। তোমরা কেন এসেছ?'

'আমরা এসেছি ম্যাটারহর্নে চড়ব বলে। কিন্তু এখানে এত বাতের রুগী কেন? এত

পঙ্গু, বেতো রুগীর ভিড় দেখেই ভাবলুম হট স্প্রিং আছে, নয়তো কোনও মিরাকল।'

'বেতো রুগী কোথায় পেলে এত?'

'কেন, পথে-ঘাটে, সর্বত্রই তো। সবার বগলেই তো দেখি ক্র্যাচ।' এবারে হাসির তোড়ে বরফ ফাটিয়ে দিলে মার্কিন ছেলেটি। 'বাত-বেতো? পঙ্গু?' তার হাসি থামে না, এরা তো সবাই স্পোর্টসম্যান— কেউ স্কী করতে গিয়ে পা ভেঙেছে, কেউবা পিছলে পড়ে। আছাড় না— খেয়ে কেউ স্কী করতে শেখে কখনও? বেতো হবে কেন, এরা খেলোয়াড়! এরা মাউন্টেনিয়ার! বেতো। হা হা হা! ওঃ— তাই বলছো হট স্প্রিং? হাউ অ্যাবসার্ড! মিরাকল! হাই ক্রেজী।' হো-হো হাসিতে আমাদের কলিজা ফাটিয়ে দিয়ে তিনি সড়াৎ করে স্কী চালিয়ে অন্তর্হিত হলেন। দূরে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল তাঁর নীল জ্যাকেট। হাসিটা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আমাদের কানে—এবং প্রাণে। এই বরফেও বুঝতে পারছিলুম আমাদের কান-ফান গরম হয়ে উঠেছে— রাগ, লজ্জা দুয়ে মিলে একটা বিশ্রী অনুভূতি। তায় পাগুলো সব দেবে দেবে যাচ্ছে নরম বরফে, টেনে হিঁচড়ে তুলে তুলে আমরা বিনা বাক্যবয়ে সদর রাস্তার দিকে ফিরতে লাগলুম। কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছি না।

রাস্তার ওপর পৌঁছে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। আরামসে স্বাভাবিক নিয়মে যেই দু পা হেঁটেছি, 'যাক বাবা বাঁচা গেল' ভেবেছি, অমনি ঘটল সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা। সড়সড় সড়াৎ। বিনা-স্কীতে, বিনা-স্কেটে, আমি দিব্যি স্পিডের মাথায় আচমকা পাহাড়ী পথের ঢালু রাস্তায় অপসৃত হলাম। যেন স্পেস ক্যাপসুলের মধ্যে ইজিচেয়ারে বসে আছি-এমনি গা-এলান ভঙ্গিতে, উপবিষ্ট শরীরে অনায়াসে পা দিয়ে শুকনো ডালপালার বেড়া ভেঙে একজনদের বাড়ির পিছনের উঠোনে ঢুকে যাচ্ছি দুর্নিবার গতিতে। দ্যাখ-না-দ্যাখ তাদের মুরগীর খাঁচার অভ্যন্তরে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছি। বিদ্যুৎ-চমকের মত প্রথমেই মনে হল— রেণুকাকে সাবধান করা দরকার। —হুইসিল? ভাবামাত্র পিঠের ওপর আচম্বিতে জোড়া বুটের জোর ধাক্কা! —'বাবা গো। গেলাম।' সমস্বরে বললুম রেণুকা এবং আমি। 'সো সরি!' আবার ডুয়েটে বলা। ইতিমধ্যে অভিমন্যুর মত অবস্থা হয়েছে আমাদের। স্বাস্থ্য-উজ্জ্বল, পরাক্রান্ত এবং যুদ্ধবাজ মোরগকুল তথা রণচণ্ডী মুরগীসকল আমার সসৈন্য আক্রমণ করেছে। তারা তেড়ে এসে 'ট্রেসপাসারদিগকে' যত্রতত্র প্রবল শক্তি সহকারে ঠুকরে দিচ্ছে— এবং ভীম বিক্রমে কক-কক-কক-কক আওয়াজে ভয়াল রণহুঙ্কার দিচ্ছে। মুরগীকে রাম-পাখি কেন বলা হয় সেদিন বুঝেছিলুম। যে-কোনও রাক্ষসসেনাকে তারা অবলীলায় হারিয়ে দিতে পারবে। দূর থেকে দেবতারা যেমন রামকে উৎসাহ দিতেন— এখানেও তেমনি খাঁচার বাইরে থেকে মুরগীদের শৌর্য, বীর্য, একাগ্রতা এবং ঐক্যবদ্ধতাকে উৎসাহিত করেছিল একটি উতলা ব্যাঘ্রের মত কুকুর। এই সমবেত তাণ্ডবের মধ্যে সতত ঠোক্করমান মুরগী ও মোরগ-সংযোগে আমরা দুজন দুঃসাহসিক পর্বত অভিযাত্রী— খাঁচার মধ্যে পা ছড়িয়ে হতভম্ব বসে আছি। চশমা ছিটকে পড়েছে বটে, কিন্তু ধর্মতলার সানগ্লাস ভাঙেনি। স্তম্ভিত রেণুকার মাথায় কিছু তুষার, কিছু উড়ো পালক। দেখে বুঝলুম আমারও দৃশ্য নিশ্চয়ই তথৈবচ। চারপাশের

দিকে চেয়ে ব্যথা বিস্ময় ভুলে আমরা হড়বড়িয়ে হেসে ফেললুম।

হাসব না? এরকম দৃশ্য তো খুব চেনা আমাদের। ঠিক এইটে না হোক, এমন ধরনের কাণ্ডকারখানা তো লরেল-হার্ডিতে কতই দেখেছি! তফাত এই যে, ঘটনাটা সত্যি আর পাত্রপাত্রী আমরা নিজেরা! ব্যাকগ্রাউণ্ডে অচঞ্চল মহিমায় ম্যাটারহর্ন— আর ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকে গৃহপালিত পশুপক্ষীর মিলিত কুজন-গর্জন। কোনওরকমে সেই প্রবল পরাক্রমে পক্ষীসেনার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিলুম সেদিন। ভেঙে-যাওয়া বেড়াটি গলেই পালিয়ে এলুম গৃহস্থের আঙিনা থেকে, রণমূর্তি মুরগীদের দিকে বিষদৃষ্টি হানতে হানতে। কেবলই চোরাচাউনিতে দেখছিলুম এদের চিল্লা-চিল্লিতে গৃহকর্তা আবির্ভূত হলেন কিনা— নাঃ, কেউ দেখেনি। সরু পিচ্ছিল পাহাড়ি পথের ঢালু বেয়ে দেখা গেল অনেকটা যেন স্কী-চিহ্নের মতই আমার ও রেণুকার সুদীর্ঘ পতন-চিহ্ন সদ্যটানা গতিময় রেখা হয়ে ফুটে আছে। দাগখানা দেখেই যেন কোমরটা ফের কনকন করতে লাগল।

আমরা দুই বন্ধু এবার পরস্পরকে ক্রাচ করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছল বরফে পা গেঁথে পা গেঁথে অগ্রসর হলুম।

'কালই আমরা জেনিভায় ফিরে যাব, কী বলিস? এ জায়গাটা তো দেখা হল।'

রেণুকা চুপ। 'লেগেছে বেশি? মা থাকলে দু'ফোঁটা আর্নিকা খাইয়ে দিতেন। চল, দুকাপ হট চকলেট খেয়ে নিই।'

রেণুকা চুপ। চোখে জল।

'তখনি বলেছিলুম, প্রকৃতির বিরুদ্ধতা করা উচিত নয়। করার ইচ্ছেটাও করা উচিত নয়। দেখলি তো?'

'আমাদের ম্যাটারহর্ন চড়া হল না।'

খোঁড়াতে খোড়াতেই ফুঁপিয়ে উঠল রেণুকা— 'এত কষ্ট করে এসে, কেবল মুরগীর খাঁচাতে ঢোকা হল!'

'দুঃখ করিস না রেণুকা— ম্যাটারহর্ন কি যার-তার কপালে থাকে?'

একটা কাফে-তে ঢুকে হট চকলেট খেতে খেতে আমরা ভাবলুম, আজ রাত্রেই জেনিভায় রওনা হব। বিদায় ম্যাটারহর্ন, বিদায় মুরগী-সকল।

হট চকলেট খেয়ে উঠে রাস্তায় বেরিয়েই মনে হল, আকাশে বাতাসে যেন একটা আশ্চর্য তফাত। রোদ কি উঠেছে? না তো? বৃষ্টিটা কি ধরল? তাও না। তবে? বেশ ব্যথা করছে কোমরটা— দুজনেই ক্রাচ ধরে আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে হাঁটছি আর ভাবছি ব্যাপার কী? একটা নতুন আভা যেন ফুটে উঠেছে পথে-ঘাটে লোকজনের চোখে-মুখে। এই আভাটা আগে তো ছিল না? কী হয়েছে বল তো? রেণুকা, দেখেছিস, লোকেরা আমাদের দিকে একটা কেমন-চোখে তাকাচ্ছে?

রেণুকা এতক্ষণে পুরনো আধো-আধো গলায় কথা বলল। রেণুকা বলল, 'ওরা কিনা বুঝেছে আমরাও ওদের মতই স্পোর্টসম্যান— ম্যাটারহর্নে চড়তে গিয়ে আহত হয়েছি! তাই সম্ভ্রম করছে। এতক্ষণ বোধহয় ভেবেছিল কোনও উজবুক ট্যুরিস্ট-ফুরিস্ট হবে!'

চাঁদ গড়ার কারিগর

'কলকাতায়? তা খুব বেশিদিন না। এই মাস পাঁচ ছয় হবে। বাপ রে বাপ, কলকাতায় এসে যেন বেঁচেছি। আর কিছুদিন দিল্লিতে থাকতে হলে আমি যেতাম পাগল হয়ে আর জনাথান বোধহয় মরেই যেত—', একটি তসরের পাঞ্জাবী পরা নাদুশনুদুশ সাহেবের কনুই থেকে ঝুলতে ঝুলতেই গৃহকর্তা দত্তমশাইয়ের দেশলাই থেকে সার্কাসের কায়দায় ঠোঁটের সিগারেটটা ধরিয়ে নেয় মেয়েটি। তারই ফাঁকে বসে ঝর্নার মত আলাপ। উন্নত পেটটি সগৌরবে আসন্ন শুভদিনের ঘোষণা করছে।

—'আজ চাণক্যপুরী কাল জোড়বাগ পরশু মহরানীবাগ— ওফ, পার্টি যেন বন্যা ডেকে যাচ্ছে বছর-ভোর। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে সর্বত্র একই মুখ একই আলোচনা, আর মুখ তো নয় মুখোশ, আলোচনা মানে পরচর্চা, একটা প্লাস্টিকের পৃথিবী।' ধোঁয়া ছেড়ে মেয়েটা বলে— 'আমি ইরিনা ওয়েন। কল মি রিনা। ফ্রম কেরালা, অ্যান্ড ওয়াশিংটন। অ্যান্ড য়ু?' এবার দত্তমশাই পরিচয় করিয়ে দেন—

—'স্যার— দিস ইজ নবনীতা, আ বেঙ্গলি পোয়েট।'

—'নব-নী-তা? জান তো, সাউথে নবনীতম মানে কী? ফ্রেশ ক্রীম। কবিত্বের সঙ্গে বেশ মেলে—', বলেই হাসতে থাকে ইরিনা। কথায় কথায় হাসি ওর।

—'নর্থেও নবীনতম মানে ফ্রেশ ক্রীম। তবে আমার সঙ্গে মেলে না। আমার নাম ব্রাউন ব্রেড কিংবা ওয়াইলড রাইস হলে বেটার হত।' খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ইরিনা। 'এই তো, এই তো কবির মতন কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। শুনলে জনাথানের খুব ভাল লাগবে। জনাথান?' —নাদুশনুদুশ সাহেবটি তখন নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পানীয়ের টেবিলের দিকে চলে গেছে। আমি কথা ঘোরাতে বলি 'পার্টির নামে আমারও প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। ঠিকই বলেছ, একই অবান্তর মুখের মিছিল, একই অবান্তর হাসি, অবান্তর বাক্য, তুচ্ছতা, ক্লান্তি, বিষাদ, কলকাতাও তাইই ইরিনা।'

—' না না না, কলকাতা মোটেই তা নয়, আমায় জনাথান বলেছে। কলকাতা অন্য ব্যাপার। ইট ইজ আ লিভিং সিটি। এখানকার পার্টিতে কত ধরনের মানুষ মিট করছি

আমরা, লেখক, নাট্যকার, শিল্পী, অভিনেতা, শিক্ষাবিদ— এই আজকের পার্টিতেই দ্যাখ না, কত লেখক, গাইয়ে, অধ্যাপক। দিল্লির ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিগুলো সব অন্যরকম, একমাত্রিক। ঠিক ওয়াশিংটনের মতো। নেহাৎ দেহাতী বলে প্রথম প্রথম আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল ঠিকই। মনে হল এই তো স্বর্গ, এত হালকা জীবন, রং রস রূপ গন্ধ— কতরকম সাজপোশাক— ভাল ভাল মদ— ভাল ভাল খাবার-নেশার মতো ফুরফুরে কথাবার্তা— দিব্যি চলছিল— হঠাৎ একদিন ক্লান্তি এল। সীসের মতো ভারি হয়ে উঠল, দুর্বহ হয়ে উঠল এই অর্থহীন পার্টি জীবন। ভাগ্যিস ঠিক তখনই জনাথান কলকাতায় বদলিটার ব্যবস্থা করে নিল।' বলেই একগাল যুঁইফুলের মতো হাসি হেসে দিল মেয়েটা। ঘন নীল কর্ডুরয়ের প্যান্টের ওপরে ম্যাচ করা লক্ষ্মৌ কুর্তা, সব চুল টেনেটুনে পিছনে উঁচু করে ঘোড়ার ল্যাজ-স্টাইলে বাঁধা। দীর্ঘ, রুক্ষ, ঘন কালো চুল। বিশাল খোঁপা হত, বাঁধলে। যেমন চুল তেমনি চেহারা। স্বাস্থ্যবতী একটা চকচকে বাদামী ঘোড়ার মতোই জোয়ান তরতেজী কালো শরীর; বড় বড় চঞ্চল চোখদুটি কৌতুকে ঝকঝক করছে, বেশ একটা মিষ্টি মিষ্টি ভাব আছে মুখময়। খুব ছটফটে আর তেমনি মিশুক— এমন একটা মায়া আছে ওর মধ্যে, যে সারাক্ষণ চোখে টেনে রাখে এত লোকের মধ্যেও। তসরের পাঞ্জাবী গায়ে নাদুশনুদুশ সাহেবকে ওর পাশে বড্ডই শান্তশিষ্ট দেখাচ্ছে। দু'হাতে ভরা গেলাস হাতে ফিরে আসছেন ভদ্রলোক— 'অ্যানড হিয়ার কামস মিস্টার জনাথান ওয়েন— গ্যেস হু?'

—'হার হাইনেসের চির বিশ্বস্ত ভৃত্য, আবার কে?' হঠাৎ কোমর থেকে নিচু হয়ে বাও করে নাটকীয়ভাবে একটি গেলাশ ইরিনার দিকে বাড়িয়ে দেন ভদ্রলোক, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এক গাল হাসেন। হাসবামাত্র তার সারা মুখে ঝলমল করে ওঠে উষ্ণতা— আর আমার বুকের মধ্যে আরেকবার খুশির ঘন্টা পড়ে— এই তো, আরেকটা আমাদের নিজের লোক! —ইরিনা আমাকে দেখিয়ে বলে:

—'মীট নবনীতা, আ বেঙ্গলী পোয়েট।'

—'আ পোয়েট? উ-হ্...' সাহেবের চোখেমুখে যে স্বর্গীয় আহ্লাদের উদ্ভাস ফুটল তা যদি কৃত্রিম না হয় তবে নিশ্চয় যথেষ্ট গর্ব হওয়ার কথা আমার।

—'আ পোয়েট।' সাহেব যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। 'হাউ মার্ভেলাস! দিস ইজ হোয়াই আই লাভ ক্যালকাটা। উই নেভার মেট আ পোয়েট ইন ডেলহি। ডিড উই, ডার্লিং?' ডার্লিংয়ের বদলে আমিই উত্তর দিয়ে ফেলি।

—'সে কি কথা। দিল্লি তো কবিতে ভর্তি। হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী, ইন্দো-অ্যাংলিয়ান, বাংলা, ইউ নেম ইট অ্যানড ডেহলী হ্যাজ ইট।'

—'হতে পারে, বাট দে হিড দেমসেলভস ফ্রম মি। অথচ কলকাতায় এসে অলরেডি কতজন সাহিত্যিককে মিট করেছি। ডেফিনিটলি ক্যালকাটা ইজ আ ডিফারেন্ট স্টোরি অলটুগেদার— ইট হ্যাজ মোর মীনিং ফর আস— তাই না রিনা?'

—'আমি তো ঠিক তাই বলছিলুম নবনীতাকে।'

—'এক্সকিউজ মি লেডিস, তোমাদের সঙ্গে আমি গল্প করতে চাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে সত্যিই আর থাকতে পারছি না আমি, দম আটকে আসছে সিগারেটের ধোঁয়ায়— একটু বারান্দায় চল না, সবাই মিলে ফ্রেশ এয়ারে বসি?'

আমারও মাথাটা ধরে যাচ্ছে গরমে, —'চল বাইরেই যাই ইরিনা—' বাইরে এসে আমরা একটা গোল টেবিলের ধারে বসি। 'ঠাণ্ডা রাত বয়ে যাচ্ছে এখানে।' ছাইদানটা টেনে নিয়ে ইরিনা বলে—

—'কলকাতায় এসে জনাথান হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। আমার অবশ্য প্রথমটা একটু নোংরা ময়লা ভাঙাচোরা এরকম লাগছিল— কিন্তু এখন বুঝে গেছি কলকাতা ওকে কী দিয়ে কেন এমন করে মাতিয়ে রেখেছে। ইটস দ্য পিপল।'

—'শুধু তাই নয়— আর আছে রিনা। ইট হ্যাজ ক্যারেকটার। এত করে রিনাকে বলি, চল, রিনা লেটস গো ফর আ ওয়াক ইন দিস ম্যাজিক সিটি— তা যাবে না। কিছুতেই গাড়ি ছাড়া এক পা নড়বে না।'

—'তো কী করব? জীবনে গাড়ি চড়িনি তো আগে? এখন শোফ্যর ড্রিভন সি. সি লেখা গাড়িতে বসে মেমসাহেব হয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াই— এ সুখ ছেড়ে কোন দুঃখে গোবর, ডিজেলের কাদা, ফলের খোসা, আর ইউরিনের পুকুরের মধ্যে পা দিয়ে হাঁটতে যাব বল? উনি হাঁটার জন্য পাগলা। ড্রাইভারের সঙ্গে তো ওঁর ঝগড়াই হয়ে গেল এই নিয়ে।'

—'ড্রাইভারের দোষটা ছিল—'

—'মোটেই না। সে তার ডিউটি করবে না?'—

—'ব্যাপারটা কী?'

—'কিছুই না।' জনাথান উত্তর দেয়— 'আমি হেঁটে অফিসে যাব, ড্রাইভার কিছুতেই অ্যালাউ করবে না। আমি তার বস, না সে আমার বস? কে কার কথা শুনবে? ছোকরা প্রবল গোঁয়ার—'

'আর তুমি বুঝি গোঁয়ার নও? শোন নবনীতা, অফিস শুরু ন'টায়। কাছেই আমাদের কোয়ার্টার। দু'মিনিটের পথ, হাঁটলে সাত-আট মিনিট, ড্রাইভার ন'টা বাজতে পাঁচে আসত। উনি হেঁটে যাবেন বলে নটা বাজতে দশে বেরুতে লাগলেন যাতে ড্রাইভার পৌঁছবার আগেই পালাতে পারেন।'

—'ড্রাইভারও তেমনি। সে পৌনে ন'টায় এসে ঠিক আমাকে ধরল। আমি আর কী করি? অগত্যা ন'টা বাজতে কুড়িতে বেরুলুম। ড্রাইভার তখন সাড়ে আটটায় এসে হাজির।'

—'ড্রাইভার সাড়ে আটটায় আসতে লাগল, উনি তার পরদিন সোয়া আটটায় বেরুলেন। পরদিন ড্রাইভার আটটায় এল এবং ভয়ানক ঝগড়াও করল। সে অনেক দূরে থাকে, আন্দুল না কোথায় যেন। সেখান থেকে তিন মাইল হেঁটে তাকে ট্রেন ধরতে হয়। শীতকালে অত ভোরে আসতে তার খুব কষ্ট। কিন্তু যেহেতু সাহেবকে অফিসে নিয়ে

যাওয়াই তার কাজ, সেটার জন্যে সে মাইনে পাচ্ছে, সেটা না করলেও তো তার মন ওঠে না।' —আমি তো শুনে অবাক।

—'শুধু পাঁচ-সাত মিনিটের হাঁটা নিয়েই এত কাণ্ড? দিলেই তো হয় হাঁটতে। গাড়ি করে অন্যত্র যাতায়াত করবেন, যখন দূরপাল্লায় কাজ থাকবে।'

—'তাও সে যাবে না। সেন্ট্রাল অফিস, ব্রাঞ্চ অফিস, সর্বত্রই হেঁটে হেঁটে যাবে, রোদ নেই জল নেই। আর বলবে, 'পায়ে হেঁটে না বেড়ালে একটা জায়গার সঙ্গে চেনাশুনোই হয় না।' —আমিও ইরিনাকে বললুম—

—'তুমি রাগ করলে কি হবে,— উচিত কথাই তো বলেছেন জনাথান। হাঁটার মতো কিছু নেই। হুশ করে গাড়ি করে উড়ে বেরিয়ে চলে গেলে, আসল শহরের সবই তো থেকে যাবে অধরা।' এবার জনাথান নিজের পক্ষ সমর্থন করতে এগোয়—

—'আমার সত্যি বড্ড ভাল লাগে এই কলকাতার পথঘাট দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে। কত আশ্চর্য সব গলিঘুঁজি, কত আশ্চর্য সব বিশাল বিশাল পুরনো বাড়ি— কত যে অভাবনীয় সব গন্ধ—'

—'সি এম ডি এ-র এবং মেট্রো রেলের অত্যাচারে চতুর্দিকে তো গর্ত— হাঁটেন কী করে?'

—'সাবধানে হাঁটতে হবে বইকি। একটা দারুণ সম্মোহনী মায়া আছে এই শহরের। আমি তো হেঁটে যাই একটা বিচিত্র মিশ্র সুগন্ধের মিছিলের মধ্য দিয়ে। আমি খুব ফরচুনেট যে কলকাতা দেখলাম।'

—'জনাথান বলে,' ইরিনা যোগ দেয়— 'পাশ্চাত্য সভ্যতার বাইরে একটা বর্ণহীন অ্যান্টিসেপটিক কেমিক্যাল গন্ধ আছে, কেমন একটা ধাতব স্বাদ লেগে আছে ওখানকার বাতাসে। আর কলকাতা? এখানে এখনও আছে প্রকৃতির গন্ধ, বেঁচে থাকার গন্ধ, জ্যান্ত জীবন্ত সব গন্ধ— কখন গরমাগরম পকৌড়া ভাজার গন্ধ নাকে আসবে, কিম্বা জিলিপি রসে ফেলছে কোনও দোকানে— জিবে জল আসবেই—'

—'কোথাও বা পাকা আনারস কাটা হচ্ছে, ফলের সুগন্ধে বাতাস ম-ম, কোথাও বা একটা আমের কি পেয়ারার ঝুড়ি নামাচ্ছে, আঃ কী সুরভী— কখনও কারুর রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নাসারন্ধ্রে এক ঝলক অজানা কোনও ভারতীয় রান্নার তেল বা ঝাল-মশলার গন্ধ ঢুকে যায়— জিবে জল এসে যায় আমার।' জনাথান বলে, —'তোমার মনে হয় না, নবনীতা? গন্ধের যেন উৎসব।'

—'শুধু কি খাদ্য? কখনও বা ফুলের দোকান পার হচ্ছ, তাজা টাটকা ফুলের তীব্র সৌরভে গলি ভরা, কখনও হয়ত বইপাড়া দিয়ে যাচ্ছ, টাটকা আঠার গন্ধ, নতুন বইয়ের গন্ধ, তাজা কাগজের গন্ধ— কখনও কাপড়ের পাড়ায়, কাপড়ের গাঁঠরি নামাচ্ছে, ওঃ, নতুন কাপড়ের গ— ওঃ, ইনক্রেডিবল সিটি। কেউ তার জানলা দরজায় খসখস টাঙিয়ে তাতে জলঝড়া দিচ্ছে, তার সুবাস, কখনও মন্দির পার হয়ে যাচ্ছ, হঠাৎ নাকে আসবে ধূপধুনোর মিষ্টি পবিত্র গন্ধ, চন্দন সুরভি-শঙ্খঘন্টার শব্দ— শব্দই তো

কত ধরনের— উঃ। রাতে একরকম, দিনে একরকম, ট্রামের একরকম, বাসের একরকম, রিকশার একরকম,' —এবার হাসতে হাসতে ইরিনা যোগ করতে থাকে।

—'ট্রাক লরির এক রকম, প্রাইভেট গাড়ির এক রকম, ট্যাক্সির আরেক রকম'—

জনাথান আবার খেই ধরে নেয়, 'এরই মধ্যে কোকিল কুহু কুহু করছে, গরু মহিষ হাম্বা হাম্বা করছে, কুকুরের ভৌ ভৌ, বেড়ালের ম্যাঁও, কাকের কা-কা, চড়াইপাখির কিচির-মিচির', ইরিনাও ছাড়বার পাত্রী নয়—

—'কলতলায় মানুষ ঝগড়া করছে, এ-বাড়িতে হোলনাইট বাচ্চা কাঁদছে, ও-বাড়িতে হোল-ডে গিন্নি চ্যাঁচাচ্ছে'— জনাথানও ছাড়ে না—

—'ওখানে ক্লাসিকাল গানে কলা সাধতে বসেছে কেউ, এখানে ইংরিজি গান বাজিয়ে হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছে ফেরিওয়ালা— মোটমাট ভীষনভাবে বাঁচা হচ্ছে চারিদিকে— ফিরিওয়ালাদের ফিরি করার জিনিসই বা কতরকমের? কত বিচিত্র? কী ভাল লাগে আমার।'

—'হ্যাঁ, শুধুই তাই? আর ভিকিরির বৈচিত্র্য ভাল লাগে না? ভিকিরিদের হাঁকডাক? গানবাজনা? আর রহস্যময় শব্দ? পথে কলার খোসা? গোবর? আর থুতু? বস্তির ছেলেদের প্রাতঃকৃত্য? আর ঢাকনি-খোলা ম্যানহোলের সারপ্রাইজ? সাফ না করা রাশিকৃত জঞ্জালের স্তূপ? তার সুগন্ধ?—'

—'সেও আছে, সেও আছে সেও তো থাকবেই। খেয়াল করে হাঁটতে হবে, আর ইয়ু'ল এনড আপ ইন ট্রাবল, নইলে অন্যগুলো চোখে পড়বে কেন— আফটার অল কতদূর যে গরীব দেশটা। ভাবতে গেলে মাথাই খারাপ হয়ে যায়।— আবার এখানেই ধনীর ঐশ্বর্য প্রদর্শনের সীমা নেই। এত রুচির আর হৃদয়ের অভাবও চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কী নিষ্ঠুর আড়ম্বর!'

—'তুমি কি কবিতা লেখ জনাথান?'

—'কবিতা? নাঃ, আমি কিছুই লিখি না। রিনাও ঠিক এই প্রশ্নই করেছিল আমাকে— কাঠমাণ্ডুতে। আশ্চর্য, তোমরা ভারতীয় মেয়েরা। কবিতা না লিখলে কি সেনসিটিভ হওয়া যায় না?'

—'তা না, সেনসিটিভ হলে অনেকসময় কবিতা না লিখে পারা যায় না এইটুকু আর কি। কাঠমাণ্ডুতে এই প্রশ্নই করেছিল রিনা? কেন, হঠাৎ কাঠমাণ্ডুতে কেন? এত জায়গা থাকতে? কী কবিত্বটা করেছিলে সেখানে?'

—'কাঠমাণ্ডুতেই তো আসল জায়গা। ইট ইজ হোয়্যার ইট অল হ্যাপেনড।' উজ্জ্বল রহস্যময় চোখে ইরিনার দিকে তাকায় জনাথান। সেই দৃষ্টিপাতে একটু যেন বিচলিতই হয় ইরিনা— ব্যাস্ত হয়ে বলে—

—'এই রেঃ, সর্বনাশ করেছে। জনাথান তার প্রিয় বিষয়টি এনে ফেলেছে। আর রক্ষে নেই। এখন শোন কাঠমাণ্ডুতে কী হয়েছিল?'

—'কেন? কী হয়েছিল সেখানে? আমি তো শুনতেই চাই। যদি না তোমাদের

কোনও প্রাইভেট ব্যাপার হয়।'

—'খুবই প্রাইভেট ব্যাপার। অত্যন্ত প্রাইভেট। কিন্তু জনাথান খুব ভালবেসে এটা সবাইকে বলে দিতে।'

—'একা আমারই ফেবারিট টপিক বুঝি? তোমার নয়? বেশ। তবে থাক। আমি বলব না।' জনাথানের গলা ভারী হয়ে বুজে আসে। আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

—'বলি ব্যাপারটা কী? আমি তো শুনতেই চাইছি— যেই বলুক না কেন? যদি অতিরিক্ত কৌতূহল প্রকাশ করা হয়ে না যায়, —তবে, বলে ফেল',— 'বলই না—' হাসতে হাসতে ইরিনা বলে স্বামীকে। 'বলে ফেল', কিন্তু জনাথান থেমেই থাকে।

'গল্পটা কী-কী হয়েছিল কাঠমাণ্ডুতে?' আমি অধীর হয়ে পড়ছি।

—'না, থাক। বলব না। রিনা হাসছে।'

স্পষ্টই অভিমান ফুটে জনাথানের চোখেমুখে অথচ ইংরেজিতে নাকি অভিমানের প্রতিশব্দ নেই। কেন নেই?

মানভঞ্জনের প্রতিশব্দ নেই। তাই হয় তো ইরিনার মানভঞ্জনের প্রণালীটা বেশ ওরিজিনাল মনে হলো : 'না বললে তো রয়েই গেল। বেশ, আমিই বলে দিচ্ছি। হল তো? দুটো গল্প কিন্তু এক নয়। আমার গল্পটা আর জনাথানের গল্পটা একদম আলাদা, কেবল শেষটুকুতে মিল আছে। দুটো দুরকমের গল্প।'

—ব্যাগ খুলে লম্বা বিলিতি সিগারেট আর লাইটার বের করে ইরিনা আমাকে অফার করে। —'খাবে না? কেন? গুড গার্ল বুঝি? আমি বাপু খাব। আগে ছিলাম দিশি মেম, খেতাম শস্তা সিগারেট। এখন হয়েছি আসলি মেম, খাই দামি সিগারেট।'

—'কিন্তু দুটোই ইকোয়ালি ইনজুরিয়াস টু ইওর হেলথ রিনা, বিশেষত এখন।' জনাথান মিনতির সুরে বলে। জনাথান ধূমপান করে না।

—'কম-কম করেই খাচ্ছি বাপু, তবে একদম বন্ধ করতে বোল না।' স্বামীকে উলটে মিনতি জানিয়ে ইরিনা আমাকে বলে—'এই বিলিতি সিগারেটের ব্যাপারটা যে কী মোহময়, তা জনাথানকে বোঝান যাবে না। চিরকাল মিশনারীদের ঘরে মানুষ হয় নান, নয়ত নার্স, নয়ত প্রাইমারি স্কুল টীচার হব-চিরদিন খেটে যাব। নিম্নমধ্যবিত্তই থেকে যাব, নেহাৎ হরস্কোপের জোর না থাকলে স্বামী-সংসারও হবার কথা নয়— সেই আমি কিনা বিদেশী ডিপ্লোম্যাট স্বামী যোগাড় করে হরবখত বিলিতি সিগারেট খাচ্ছি। এ সৌভাগ্যের কাহিনী যে সিনডারেলার গল্পকেও হার মানায়, সেটা ওকে কে বোঝাবে?'

—'আই ডোন্ট এগ্রি।' জনাথান বলে— 'তুমি কেন সিনডারেলা হবে? আমি কি প্রিন্স? বাবা ছিলেন সেন্ট লুইস শহরের কসাই— মা দক্ষিণের চীনেবাদাম খেতের চাষীর মেয়ে— নেহাৎ ইউনিভারসিটিতে গিয়েছিলুম তাই আমারও আজ এইখানে আসা—'

—'জনথানের গল্পটা একদম আলাদা, নবনীতা। তুমি আমরাটাই শোন তাহলে।' গেলাসে চুমুক দিয়ে ইরিনা বলে— 'নার্স ছিলুম, কাঠমাণ্ডুর মিশনারী হাসপাতালে, আর

জনাথান, ওখানেই কাজ করছিল একটা সমাজসেবী সংস্থায়। —প্রায়ই দুঃস্থ রুগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসত, সেই সূত্রেই চেনাশুনো। কী জনাথান? বাকিটা তুমি বলবে?'—

জনাথান চশমার ফাঁক দিয়ে দুষ্টু চোখে তাকিয়ে হাসে।— 'নো ডার্লিং। ক্যারি অন। আমারটা বড় বেশি রোমান্টিক। তোমারটাই ভাল। ওতে আমাকে বেশ ভিলেনের মতো দেখায়। আমি বরং ততক্ষণে খালি গেলাসগুলো আর একবার ভরে আনি গে'। কে কী খাচ্ছিলে?' —গেলাস কুড়িয়ে নিয়ে জনাথান চলে যায়। ইরিনা সেদিকে তাকিয়ে বলে—

—'এখন তো পারফেক্ট জেন্টেলম্যান। কিন্তু জনাথান সাহেব তখন একেবারেই পাগলা ছিল। কে ভেবেছিল ও হবে ডিপ্লোম্যাট?'

—'পাগলা মানে?'

—'মানে? এই ধর...আচ্ছা দাঁড়াও, উদাহরণ দিচ্ছি কয়েকটা— কত আর বলব? পাগলামির তো গোনাগুনতি নেই। এই আমাদের কোর্টশিপটাই ধর না।' সিগারেটের ছাই ঝেড়ে গলাটিও ঝেড়ে নিয়ে গুছিয়ে বসে ইরিনা।

—'প্রথমে একদিন নেমন্তন্ন করল, চায়ে। আমি তো আহ্লাদে ডগমগ। হায় হায়— এত ভাগ্যও আমার হয়েছে? সাদা চামড়ার সাহেব আমাকে ডেট করতে চেয়েছে? আমার বেস্ট ড্রেসটা পরে নিলুম (যেটার দাম ছিল তিরিশ টাকা)। যথাসাধ্য সেজেগুজে তো বেরুলুম। বুক ধুকপুক করছে। না জানি কোন ফার্স্ট ক্লাস রেঁস্তরায়, কোন ফাইভস্টার হোটেলে চা খাওয়াবে? নাকি নিজের আস্তানাতেই নিয়ে যাবে? প্রথম শক, বাইরে বেরিয়ে দেখি, গাড়িটাড়ি নেই। কাঠমাণ্ডুতে তুমি গেছ তো? যাওনি? তাহলে বলে রাখি শোন—. কাঠমাণ্ডুর পথঘাট কেবল বিদেশী গাড়িতে গাড়িতে ছাওয়া। হিপিদের পর্যন্ত প্রায়ই বাসের মতন একরকমের গাড়ি থাকে-আর ভদ্র সাহেব মেম কেউই নেই, যার গাড়ি নেই। বেরিয়েই জনাথান হাঁটতে শুরু করলে। পথে কত রিকশা, কত ট্যাকসি দেখা গেল, ভ্রুক্ষেপও করলে না। হাঁটছি তো হাঁটছিই, অবিশ্যি জনাথান নানারকম গল্প করছিল— শুনতে শুনতে হাঁটার কষ্টটা গায়ে লাগছিল না। ঘন্টাখানেক জোর কদমে চড়াই উৎরাই ভাঙবার পরে— আমরা একটা গলিতে এলাম। না, রানীপোখারি, কি মহারাজগঞ্জ নয়, বা— দরবার স্কোয়ারও নয়— একদম বাজে পাড়া ফ্লীক স্ট্রিটের গা থেকে বেরুন গরীব সরুমতন গলি। সেখানে একটা ক্ষুদে বিশ্রী ঝোপড়িতে শতচ্ছিন্ন চটের পর্দা তুলে তো তিনি ঢুকে পড়লেন। আমাকেও সযত্নে ঢোকালেন। ভেতরে কিছু বেঞ্চি আর টুল পাতা। মহা সমাদরে সেইখানে বসালেন। অন্ধকূপ মতন ঘরের বাতাসে মাছি ভনভন করছে, টেবিল তো মাছিতে থিকথিক কালো। আমার গা গুলিয়ে উঠতে লাগল। কান্না পেতে লাগল। এত মাছি আমি কোথাও দেখিনি, কাঠমাণ্ডুতেও নয়, কেরালাতেও না। আমি কেবল দুহাত নেড়ে মাছিই তাড়াতে থাকলুম— কথাবার্তা কখন যেন বন্ধ হয়ে গেল। সমানে মুখের সামনে হাত নাড়ছি।

নইলে চোখের পাতা পর্যন্ত খুলে রাখা কঠিন। হঠাৎ শুনি গদ্গদ গলায় সাহেব বলছে— 'তুমি বুঝি নাচ জান? কী সুন্দর তোমার হাত নাড়ার ভঙ্গি। কী এলিগ্যান্ট, কী এক্সপ্রেসিভ। জাস্ট লাইক দ্য ভারতনাট্যম মুদ্রা-জ। কমিউনিকেশন বাই জেশ্চারস।' আমি শুনে চটেমটে বললুম— 'তোমার মুণ্ডু, বুদ্ধু সাহেব। এ হচ্ছে সাবহিউম্যান মুদ্রা, কেননা জেশ্চারের দ্বারা আপতত আমি শুধু কমিউনিকেট করতে চাইছি মাছিদের সঙ্গেই— এবং সে কর্মেও খুব একটা সাফল্য লাভ হচ্ছে না।' তখন এই বোকা বলে কি জান?

—'ওঃ! আর ইউ বাই এনি চান্স আনকম্ফর্টেবল হিয়ার?' এও আবার বলতে হবে? এই ঝোপড়ির মধ্যে কম্ফর্টের যা সব বন্দোবস্ত তাতে মাছিরা আর জনাথান ছাড়া আর কারুকেই কম্ফর্টেবল হবার উপায় নেই। হায় রে পাগল। কী আর বলব! সায়েব তখন নিজেই বলল— 'হ্যাঁ মাছিটা অবশ্য এখানে একটু বেশিই, কেন যে এরা ফ্লীট স্প্রে করে না, জানি না। স্প্রেটা আমি এর পরের দিন নিয়ে আসব সঙ্গে। কি করি বল? কাঠমাণ্ডুর বেস্ট আলুর চাট যে এরাই বানায়! আমি সব দোকানে ঘুরে ঘুরে তুলনামূলক বিচার করে দেখেছি। তোমাকে নিয়ে বেরিয়েছি যখন, আই শুড অফার ইউ ওনলি দ্য ভেরি বেস্ট! এরা কী একসেলেন্ট টী বানায়, এখুনি দেখবে।' তা, অবশ্য কথাগুলো সত্যিই। দারুণ আলুর চাট আর চা দিল ওরা, আর টুলগুলো রাস্তায় বের করে নিয়ে আমরা রাস্তাতেই বসে বসে খেলুম, মাছির উপদ্রব সেখানে কম ছিল। বাইরে এসেই জনাথান বলল, 'তুমি কি গাঁজার গন্ধ সহ্য করতে পার? তাহলে অবশ্য ভেতরের ঘরটায় গিয়ে বসতে পারি। সেখানে মাছির উপদ্রব নেই, কিন্তু হিপি আছে।' —আমি তো সাহেবের জ্ঞানবুদ্ধির ঠেলায় হাঁ। তখন হাসপাতাল কোয়ার্টাসে ফেরবার জন্যে প্রাণ অস্থির হয়েছে। ফেরবার সময়ে আমি বললাম, 'আমাকে আর পৌঁছে দিতে হবে না— আমি একটা রিকশা ধরে চলে যাচ্ছি।' খুব রাগ হচ্ছে তখন। এতদিনে যদি বা একটা গোয়া সায়েব জুটল, যে নাকি হিপি নয়, সে কিনা হাড়কিপ্টে? ইরিনার সামনে ভর্তি গেলাসটি এগিয়ে দেন এবার হাড়কিপ্টে সাহেব, গোলগাল মুখে গদগদ হাস্য। আমার সামনে আমার গেলাসটি রাখেন।

—'তারপর?' বলে, আয়েশ করে নিজেরটি নিয়ে স্ত্রীর উল্টোদিকের চেয়ারে বসেন।

—'তারপর ঝামেলা বাধাল এক রবিবারে। সেদিন আমাকে প্রথমবার ডিনারে নেমন্তন্ন করল। আমি স্পষ্টই জিজ্ঞেস করলাম— ঝোপড়িতে নয় তো? হিপি পাড়ায় নয় তো? মাছি থাকবে না তো?' ও তো হেসেই উড়িয়ে দিল আমার ভয় ডর —'আরে না না এবার এক্কেবারে অন্য পাড়ায় নিয়ে যাব।' বেশ। আবার সেই তিরিশ টাকার ড্রেসটি পরে, চুলটুল শ্যাম্পু করে, নাইলন স্টকিংস আর নতুন স্টিলেটো হীলসের জুতোজোড়া পায় দিয়ে যথাসাধ্য ফিটফাট মেমবিবিটি সেজে তো বেরুলুম। গায়ে ভুর ভুর করছে বম্বেতে তৈরি ইভনিং ইন প্যারিস। সে সেন্ট এখন আর পাওয়া যায় না।

আবার হাঁটা। হাঁটছি তো হাঁটছি। ভুল করেছি সিটেলেটো হিলস পরে। ও জিনিস পায় দিয়ে পাহাড়ী পথে হাঁটার যে কী কষ্ট, আর কী ডেঞ্জারাস, সে না-হাঁটলে টের পাবে না। হাঁটতে হাঁটতে সাহেব বলল— 'আজ তোমাকে দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেব।' এবারে গিয়ে পৌঁছুলুম এক মধ্যবিত্ত নেপালী রেসিডেনশিয়াল পাড়ায়। এক বিরাট বাড়ির ভাঙা মতন দরজায় কড়া নাড়তেই নেপালী কত্তা গিন্নি এসে খুবই আদর করে ঘরে নিয়ে গেল আমাদের। গল্পগাছা করে ছাং-টাং খাইয়ে শেষ পর্যন্ত মহা যত্নে মাটিতে বসিয়েই পেতলের থালায় ভাত ডাল আর আলুর সব্জী খেতে দিলে। ওঃ, আমার কী মন খারাপ। আমরা একে কেরালার লোক, তাও ক্রীশ্চান, ওসব নিরিমিষ্যি আহারের ধার ধারি না। মাছ মাংস ছাড়া মুখে ভাত ওঠে না। কিন্তু সাহেব কী খুশি, কী পরিতৃপ্তি করে খেতে লাগল, যেন অমৃত। এ কী কিপ্টে রে বাবা, বন্ধুর ঘাড়ে ডিনারের খরচটা সেরে নিলে? খেতে খেতে সাহেব বললে—

—'জান ইরিনা, আমরা কার বাড়িতে খেতে বসেছি? ইনি একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত নেপালী সাহিত্যিক। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পরিবার, বংশানুক্রমে এঁরাই রাজবাড়ির গৃহশিক্ষক— ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেপালী ভাষা ও সাহিত্য পড়ান— কত বড় মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলুম দ্যাখ। খুব ভাল সারপ্রাইজ নয়?' 'হ্যাঁ, আমি তখন খুবই সারপ্রাইজ হচ্ছি, ঠিকই, কিন্তু তাই দিয়ে ঠেলে তো ভাত নামান যাচ্ছে না? এমন সময়ে সাহিত্যিকের মিষ্টি গিন্নি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ডিম খাও?' আমি তো তক্ষুনি ঘাড় নেড়ে দিয়েছি— 'হ্যাঁ!', অবিলম্বে অন্তত চারটে ডিম দিয়ে ভাজা বিশাল অমলেট এসে গেল, খাওয়াটিও দারুণ জমে গেল। তারপরে অনেকক্ষণ কড়া তামাক আর নেপালী মদ খেতে খেতে দিব্যি আড্ডা। লেখক লোকটি সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং। এতদিন নেপালে কাজ করছি অথচ কোনও নেপালী গৃহস্থ পরিবারে নেমন্তন্ন খাইনি, পাগলা সাহেবের কল্যাণে সেটা হয়ে গেল।'

—'ইনি তো হাফ সন্ন্যাসিনী ছিলেন, হয়তো ফুল সন্ন্যাসিনীই হয়ে যেতেন আমি যদি না সময়মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিতাম। এই একটা ব্যাপারে যীশুখৃষ্টকে হারিয়ে দিয়েছি বাপু! আরেকটু হলেই আমার বউ যীশুর বউ হয়ে যাচ্ছিল আর কি!'

—বলেই কালো বউকে জাপটে ধরে সশব্দে তার গালে একটি সাদা চুমু খায় সাহেব।

—'যাও! কী হচ্ছে?' ধমকে ওঠে কালো বউ— 'এটা কি ওয়াশিংটন?'

—'ওয়াশিংটন বুঝি চুমু খাবার দেশ? চল তবে আমরা ওয়াশিংটনে ফিরে যাই।'

—'বড্ড পাগলামি করছ সত্যি। ভালই হত যীশুর বউ হলে। সেইজন্যেই তো প্রস্তুত হচ্ছিলুম বাল্যকাল থেকে। মিশনারীদের খেয়েপরে মানুষ হলে লোকে মিশনারীই হয় প্রধানত।'

—'খুব ঠকান ঠকিয়েছি তাহলে তোমার মিশনারীদের কি বল? কিন্তু চটেছে বলে তো মনে হল না কেউ? দিব্যি আশীর্বাদ করল সব?'

—'চটবে কেন? যেভাবে বিয়ে হল, সে তো কল্পনার অতীত। সবাই কত খুশি হয়েছে আমার এই সৌভাগ্যে।'

—'সৌভাগ্য বলে মানছ তাহলে?'

—'নিশ্চয়ই। একশবার। হাজারবার। মহা সৌভাগ্য।'

—'বিয়েটা কোথায় হল? কাঠমাণ্ডুতেই?'

—'বল রিনা, বল নবনীতাকে, কিভাবে বিয়েটা করলুম? সে দারুণ ব্যাপার। জমজমাট কাণ্ড!'

—'দূর', ইরিনা তার স্বামীর উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে বলে— 'সে খুব লম্বা গল্প। কোর্টশিপের গল্পটা তো শুনতে পাচ্ছ, কম কী একসাইটিং। বিয়ে তো আরো ভয়ংকর। তবে মিশনারীরা তো মনে করেছিল আমি হয়ত চিরকুমারীই থাকব, তাই বিয়ে হচ্ছে বলে সবাই আহ্লাদে আটখানা। নইলে গল্প এমন কিছুই না।'

—'তার চেয়ে বরং জনাথান আমাকে কীভাবে প্রপোজ করল, সেই গল্পটা বলি, শোন। স্বভাবে এই মানুষটি এতই অধীর যে কোর্টশিপের মোটে সময়ই দিল না। প্রথমদিনে চা, দ্বিতীয়দিনে ডালভাত, তৃতীয়দিনেই প্রপোজাল। আগে কিছুদিন বেশ যে ঘোরাঘুরি হবে, মন জানাজানি হবে, রোমান্টিক আলোছায়ার খেলা চলবে— তা নয়। গোড়াতেই বিয়ের কথা পেড়ে বসল।'

—'তাহলে? নো রোমান্স অ্যাটঅল? হায় হায়'— 'না না রোমান্স টোমান্স হল সবই, তবে আঙুলে এইটে ওঠার পরে।' একটি গর্বিত অনামিকা তুলে দেখায় ইরিনা। তাতে একটি সিংগল কমলহীরে ঝকঝক করছে, তার পাশেই মোটাসোটা বেড় দেওয়া ওয়েডিং ব্যানড। দুটি দাম্ভিক অলংকার ঐ সতেজ বাদামী আঙুলে বড় সুন্দর মানিয়েছে। এতক্ষণে খেয়াল করি ইরিনার কানেও দুটি বড়-সড় হীরে ঝকমক করছে। আমার নজর লক্ষ্য করে, নিজের দুই কানে দুহাত ছুঁইয়ে ইরিনা হাসে—

—'ওয়েডিং প্রেজেন্টস। ফ্রম দি ব্রাইডগ্রুম অফকোর্স. —হু এলস?'

—'বাঃ। খুব সুন্দর, সত্যি। আচ্ছা, কী করে তোমার কাছে প্রপোজ করল জনাথান?' —সিগারেটে টান দিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল ইরিনা— 'সেইটেই তো বলছি। পরের সপ্তাহে বলল— সেবারে লোকের বাড়িতে নেমন্তন্নে তোমার মন ভরেনি। চল এবারে অন্নপূর্ণা হোটেলে।' এক-হপ্তা পরে ডিনার-ডান্সের নেমন্তন্ন রইল। অন্নপূর্ণাই সবচেয়ে বড় ফাইভস্টার হোটেল ওখানে। শুনেই তো আমি দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়লুম। তাহলে ঐ তিরিশ টাকার জামাতে আর চলবে না। এ বারে তো একটা ইভনিং গাউন চাই। আপনিই ইরিনার পরনের কর্ডুরয়ের প্যান্টের দিকে নজর পড়েছিল। এটাও তো একটা ডিনার পার্টি বড়-ঘরে নাচও চলছে। একটু আগেই তো নিজের স্বামীর সঙ্গে এক রাউণ্ড নেচে নিল ইরিনা, সবরকম লৌকিকতার নিয়ম ভেঙে। যে-যার আপন আপন স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে নর্তন-কুন্দন করবে— বিলিতি সমাজিক নৃত্যের এটা নিশ্চয়ই মূল উদ্দেশ্য নয়। আমার দৃষ্টি নজর করেই ভাবনাটা পড়ে ফেললে

ইরিনা—— 'এখন আমরা কত লিবারেটেড— এখনকার কথা ছেড়ে দাও, এমনি ট্রাউজার্সের ওপর তসরের পাঞ্জাবী ঝুলিয়ে তখন ডিপ্লোম্যাটিক কাজের কথা ভাবা যেত?' —স্বামীর দিকে কটাক্ষ করে ইরিনা বলে— 'সেদিন রীতিমতো ডিনার জ্যাকেট পরে হাজির হয়েছিলেন এই ভদ্রলোক— গলায় বো-টাই বেঁধে। দেখাচ্ছিল অবশ্যই খুবই সুন্দর। আমিও ইতিমধ্যে একটি আর্ট সিল্কের ইভনিং গাউন করিয়ে নিয়েছি, সেই রূপোলী স্টিলেটো হিলের জুতোর সঙ্গে যাবে, এমন একটা ম্যাচিং শালও কিনে ফেলেছি, আর ভাবছি কি নিদারুণ সেকসি দেখাচ্ছে আমাকে, কি অপরূপ রূপবতী। অর্ধ-শিশি ইভনিং ইন প্যারিস ঢেলেছি গায়ে, আর মুখে অনেক কিউটিক্যুরা পাউডার। হস্টেলের অন্য নার্সরা সবাই বলল দারুণ দেখাচ্ছে। সবাই তো মহা একসাইটেড— হোটেল অন্নপূর্ণায় বেড়াতে যাবার সাধ্য কারুরই নেই— কিন্তু সাধ প্রত্যেকেরই আছে।'

—'আবার হেঁটে তো?'

—'না না, এবারে হেঁটে নয়। এবারে রিকশাও নয়— ট্যাকসি। পোশাকের গুণে। ঐ-সব ধরাচুড়ো পরে না যায় রাস্তা দিয়ে হাঁটা, না যায় রিকশাগাড়িতে চড়া। অবশ্য ফ্রীক স্ট্রিট হলে আমার পোশাকটা তবু চলে যেত, হিপিরা তো হামেশাই দিনদুপুরে নাইট গাউন পরেই ঘুরে বেড়ায়— কিন্তু ওর ডি জে টা যেত না। ও জিনিস কোনও ফর্মাল ডাইনিং হলের বাইরে কোথাও মানায় না যে!

অন্নপূর্ণায় ঢুতে তো চক্ষু চড়কগাছ। এ কি স্বপ্নলোক— কোথাও দেখিনি এমন পালিশ করা মোম-চকচকে মেঝে, অথবা এতখানি কার্পেট ঢাকা ফ্লোর এরিয়াও। এতগুলো সাহেব-মেম, আসলি মেম, আসলি সাহেব— জনাথানের মতো, আমার মতো নয়— তাদের পরনের যেসব বিলিতি কাটের পোশাক পরিচ্ছদই আলাদা, তাদের হাঁটাচলাই আলাদা, প্রতিটি পদক্ষেপে গরম-গরম কনফিডেন্স ফুটে বেরুচ্ছে— তাদের চুলের কায়দা কত, তাদের প্রতিটি নড়াচড়া, সিগারেট ধরা, কি গেলাস ধরা, হাসি, কথা, কত কালচারড, কত মার্জিত— কত ফ্যাশনেবল। যেন অন্য জগৎ, অন্য পৃথিবী। যেন একগাছা ফরাশী ছাঁটের পুডল আর পেডিগ্রিওলা অ্যালসেশিয়ানের মধ্যে একটি মাংগ্রেল নেড়ির মতো করুণভাবে শোভা পাচ্ছি আমি। আমার সস্তা কাপড়ের সস্তা ছাঁটের উৎকট জামায় আমার সস্তা সেন্টের উগ্র গন্ধ, আমার অমার্জিত ভাবভঙ্গি, অনভিজাত হাঁটা-চলা সব দশগুণ বেড়ে উঠে আমাকেই দংশন করতে লাগল। আমি ঠিক সংয়ের মতো। এত সেলফ কনশাস জীবনে ফিল করিনি কখনও। ভাবলুম,— একটু ড্রিংক করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর বেশ কয়েক-পাত্র বিলিতি শেরি খেয়েও কিছুতেই রিল্যাক্স করতে পারছি না দেখে ভাবলুম— একটু নাচতে শুরু করলেই ঠিক হয়ে যাবে। তারপর বেশ কয়েক রাউন্ড নেচেও কিছুই ঠিক হল না। ক্রমশই মুষড়ে পড়তে লাগলুম। আমার কান্না পেতে লাগল। ডান্স-হল যেন জেলখানার মতন পিষে ফেলছে, পালাবার জন্যে প্রাণ আইঢাই—'

—'এ কিন্তু তোমার বড় অন্যায় বাপু', আমি মন্তব্য না করেই পারি না এবার— 'ধাবায় নিয়ে গেলেও দোষ, মাছি ভন-ভন, —বন্ধুর গেরস্তবাড়িতে নিয়ে গেলেও, দোষ, ডাল-ভাত-চচ্চরি, আবার ফাইভস্টার হোটেলে নিয়ে গেলেও দোষ? বড্ড বেশি বড়মানুষী? —তাহলে ও তোমাকে নিয়ে যাবেটা কোথায়?' একগাল হেসে হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দেয় ইরিনা—

—'সেটাই তো বলছি, জোনাথান আমাকে নিয়ে কোথায় গেল!' মোটা ঘোড়ার ল্যাজের গুচ্ছটা বুকের ওপর ফেলে নাড়াচাড়া করতে থাকে ইরিনা— চুলটা যেন আঁচলের মতো দেখাচ্ছে— ইরিনার কি একটু লজ্জা করছে এবার?

—'নাচছি বটে, কিন্তু মুখটা নিশ্চয় শুকিয়ে গিয়েছিল, আমার। কেননা নাচের মধ্যেই ফিসফিস করে জনাথান হঠাৎ বলল, চল, গিয়ে বাইরের খোলা ব্যালকনিতে দাঁড়াই। এই এখন যেমন, সেই আর কি? আমি তো বাঁচলুম। তক্ষুনি রাজি। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালুম। মাথার ওপর আকাশ, বাইরেটা খুব শান্ত, ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে, নাচঘরের বাজনার শব্দ এখানে মৃদু। সুদূর আলোরও জোর নেই, যে-জন্যে আকাশের চাঁদটা দেখতে কোনওই বাধা হচ্ছে না। জনাথান বললে— 'দ্যাখ চাঁদটা আজ কী আশ্চর্য—'

'সত্যিই চাঁদটা তখন খুব অদ্ভুত দেখতে ছিল! কীরকম অসমান গড়নের এবড়ো-খেবড়ো আঁকাবাঁকা। চারদিকে উড়ন্ত ধোঁয়ার মতো কালো মেঘের হিজিবিজি— আর তার ফাঁকে একফালি অপুষ্ট চাঁদ। তার রংও কীরকম ভুতুড়ে। গা ছমছম করা সিঁদুরে লাল টাইপের। —ভোঁতা ছুরিতে কেটে দেখা পাকা কুমড়োর ফালির মতো দেখাচ্ছে। চাঁদটা দেখিয়ে ও বলল— 'দেখেছ কী সুন্দর একটা অর্ধসমাপ্ত চাঁদ? মনে হচ্ছে না কি, যে এখনও সৃষ্টির সবকিছু গড়ন-পেটনের কাজকর্ম ফুরোয়নি? সৃষ্টিকর্তা একটু বিড়ি খেতে উঠে গেছেন?'

'শুনে গায়ে কাঁটা দিল আমার। সৃষ্টির প্রথম দিনগুলোর কথা তো এমনি করে ভাবিনি কখনও?'

এবার জনাথান বলল— 'দূর এমন অসামান্য একটা আধ-গড়া চাঁদ দেখে ফেলবার পরে, সৃষ্টিকর্তার খাস স্টুডিও থেকে কি আর ঐ বদ্ধঘরের আর্টিফিসিয়াল ঝিন্‌চাকে ফেরা যায়? তুমি কি ব্যাংকোয়েটের খানা খেতে না পেলে খুব দুঃখ পাবে? এবং এরপরে ক্যাবারে নৃত্যটি না দেখলে তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে?'

—'আমি বললুম— 'না না, মোটেই না।'

—'তবে চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি'— ও বলল, 'ওই দ্যাখ কী অদ্ভুত ঘন সমুদ্রের মতো গভীর কালো আকাশ, তারা নেই— কেমন সাদা-কালো দুরকমের মেঘ উড়ুক্কু মাছের মতো উড়ে যাচ্ছে— আর চাঁদটা' – একটা ভাঙাচোরা দ্বীপের চর যেন সদ্য জেগে উঠছে— চল ইরিনা চল, নাগরকোট চলে যাই, কাল ভোরে দুজনে একসঙ্গে সূর্যোদয় দেখে, তারপর ফিরে এসে ঘুমোব। যাবে?' —জনাথান আমার হাতদুটো চেপে ধরেছে। আমি তো অবাক। এত সুন্দর সুন্দর কথা আমি জীবনে কখনও কারুর মুখে

শুনিনি, সামান্য নার্স বলে কথা। সাহিত্য-টাহিত্যও পড়িনি তেমন কিছুই, মিলস অ্যাণ্ড মুন-এর রোমান্স ছাড়া— আমার জীবনটাই যে জলজ্যান্ত মিলস অ্যাণ্ড বুন হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত? আমি বলতে লাগলুম— 'বাইরে রাত্রিবাস? ও-বাবা সে পারব না। হস্টেলের সুপারের থেকে পারমিশন নিয়ে আসা হয়নি— মিশনারী হাসপাতাল বলে কথা।' তখন জনাথান বলল 'বেশ, নাগরকোট না হয় আরেক দিন হবে, চল আমরা বাগমতী নদীর ধারে যাই।'

হঠাৎ জনাথান এবার আপনমনেই যেন কথা শুরু করল— 'পিছনে পড়ে রইল ব্যাঙ্কোয়েট, তার চর্বচোষ্য লেহ্য পেয় নিয়ে, পড়ে রইল নাচঘর আর তার উদ্দাম বাজনা, দামী পারফিউমের গন্ধ মাখান ছবি-ছবি সব মেয়েরা, আমরা বেরিয়ে এসে হাঁটতে লাগলুম। হোটেল অন্নপূর্ণার দ্বারপালের অবাক চাউনি আমাদের গায়েই লাগল না— ইভনিং গাউনের আর ডিনার জ্যাকেটের সং-সাজা অবস্থাতেই আমরা হাঁটতে হাঁটতে শহর পেরিয়ে পাহাড়-নদী জঙ্গলের কাছে পৌঁছে গেলাম। খুব ডেলিকেট একটা নির্জনতা ছিল সেখানটাতে। যেন অল্প জোরে শব্দ হলেই খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে ঐসব ছায়া-ছায়া গাছপালা, রাঙা-ভাঙা চাঁদ, মেঘ ওড়া কালো আকাশ; —দূরে পশুপতিনাথ মন্দিরের চুড়োটা। বাগমতীর কুলকুল আর ঝোপের পতঙ্গদের ঝিনঝিন শব্দ ঝিম-ধরানো. একটা অলৌকিক পরিবেশ— মৃদু জ্যোৎস্না এখানে ওখানে মাটিতে আলো ছায়ার জাল বিছিয়ে ওঁৎ পেতে চুপচাপ পড়ে আছে, ডালপালার ফাঁক দিয়ে এসে, —ঠিক যেন নিষাদের ফাঁদ। বাগমতীর তীরে নেমে একটা মস্ত বড় পাথরে বসলুম আমরা।'

—'ঐরকম জায়গায় সবচেয়ে বেখাপ্পা ছিল আমাদের পোশাক, —কিন্তু সেসব কথা তখন মনেই ছিল না আমাদের,' —আবার ইরিনা খেই তুলে নেয়— 'আমার সত্যি সত্যিই মনে হচ্ছিল বুঝি বৃষ্টির প্রথম সপ্তাহ এখন সমাপ্ত হয়নি—।'

জনাথান আমাকে বলল— 'দ্যাখ তো ইরিনা, চাঁদটা এবারে অনেকটা যেন মোলায়েম হয়ে এসেছে না? অতটা তো এবড়ো-খেবড়ো দেখাচ্ছে না আর। কারিগর ফিরে এসে উকো দিয়ে খানিক ঘষাঘষি করেছেন মনে হয়।' ভাল করে চেয়ে দেখলুম সত্যি চাঁদটার অত রাগী লালচে রংও নেই, উড়ো-মেঘ কিছু সরে গিয়ে, ধারের খোঁচা খোঁচা ভাবটাও খানিকটা মিলিয়ে গেছে— এখন অনেকটা ভদ্রস্থ দেখাচ্ছে। কয়েকটা তারাও উঁকি দিচ্ছে। আবার আমার হাত ধরে জনাথান বলল— 'বুঝতেই পারছ, সৃষ্টিকর্তার সব কাজকর্ম এখনও শেষ হয়নি। সেই কারণেই এখানে আসা, —খুব জরুরি একটি কর্তব্য বাকি রয়ে গেছে তাঁর— কই, এবার আমার দিকে একটু তাকাও দেখি, বলছি জরুরি কথা আছে। ওই বিশ্রী হোটেলে এই জরুরি কথাটা মোটেই বলা যেত না। —শোন এবার মন দিয়ে— আমাকে বিয়ে করবে তুমি, ইরিনা?' ইরিনা থামল। জনাথানের দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাইল। জনাথানের মুখে মৃদু হাসি. পেটফুলো বৌকে আধখানা জড়িয়ে ধরে তার মাথায় নিজের মাথাটি ঠেকাল আদর করে। তারপর যে-

যার গেলাসে ঠোঁট ঠেকিয়ে চুমুক লাগাল। স্মৃতির সম্মানে?

—'আর পরের কথাটা? তারপরের কথাটা বুঝি বলবে না?' —জনাথান বলল। দেখি চশমার ফাঁকে সেইরকম মিটির মিটির হাসছে।

—'তুমি না বললে এ অংশটা তবে আমিই বলে দিই? ঐরকম একটা ডেলিকেট স্তব্ধতা, একটা ডেলিকেট আলো-আঁধার। ঐ ঝিম-ধরানো একঘেয়ে মৃদু কুলকুল ঝিনঝিন শব্দলহরী, প্রকৃতিতে একটা ঘোর ধরিয়ে দিয়েছে, গাছে নদীতে পাথরে মানুষে মিশে মিশে যাচ্ছে, ঠিক এমনি সময়ে বনের মধ্যে একটা রাতপাখি খুব জোরে ডেকে উঠল। কী তালকাটা, বেসুরো কর্কশ সেই চিৎকার, ঠিক বাচ্চার কান্নার মতো শোনাল— আর এই সাহসিকা ঘাবড়ে গিয়ে ওরে বাপরে বলে সবলে জাপটে ধরল সামনে যে লোকটা ছিল তাকেই। অর্থাৎ এই শর্মাকেই। আর আমি তো বাবা চালু ছেলে, অমন সুবর্ণসুযোগ ছাড়তে হয়? দিলাম সুন্দর করে একটা বিউটিফুল চুমু—'

—'আমার জীবনের সর্বপ্রথম চুম্বন।'

ইরিনা বলল এবং তারপরই রিপিট কোয়েশ্চন— 'কী আমাকে বিয়ে করবে তো?' আমি ঘাড় নাড়লুম, 'হ্যাঁ। এই বাগমতী সাক্ষী, এই চাঁদ সাক্ষী, হ্যাঁ। করব, করব।'

শুনে জনাথান বলল-'বাঃ, গ্র্যাণ্ড, ঐ যে দেখ, যা বলেছিলুম, চাঁদ-গড়া এবার পুরোপুরি শেষ।' 'তাকিয়ে দেখি সত্যিই তো? কুমড়োর ফালি কোথায়? এ যে টুসটুসে মধু ঝরানো পাকা খরমুজা? বৈদ্যুতিক যন্ত্রে স্লাইস করা ইমপোর্টেড হ্যানিডিউ মেলন?'

—'তারপর?'

—'তারও পর চাই তোমার? তারপর একটু অন্যরকম লিভিং ইন সিন ফর টু ইয়ার্স— আমাকে তো ফিরে যেতে হল দুমাস পরেই। ওই অ্যাসাইনমেনটে বিদেশে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বছর দুই আমাদের ঘোরতর প্রেম হল— রীতিমতো প্রিম্যারিটাল লাভ— কল ইট সিন অর কল ইট রোম্যা— অ্যাজ ইউ প্লীজ—'

—'কিন্তু আসল কথাটাই তো বলছ না। 'সিন বাই করেসপনডেন্স' হচ্ছিল আমাদের। কেননা 'লিভিং টুগেদার'টা অন্য লোকের তো বুঝতে পারছিল না? দৃশ্যত একজন ফিরে গেছে ওয়াশিংটনে, আরেকজন পড়ে আছে কাঠমাণ্ডুর মিশনারী হাসপাতালে। অথচ বাই করেসপনডেন্স দারুণ রকম প্রিম্যারিটাল লাভ চলছে—'

তিনজনেই প্রাণ খুলে হেসে উঠলুম এবারে—

—'তারপর?'

—'তারপর দুবছর বাদে একদম কোড ডিপ্লোম্যাটিক আটা এক দীর্ঘ সাদা বিদেশী গাড়ি এসে হাসপাতালের গাড়িবারান্দাটা জুড়ে দাঁড়াল। ব্যস, মাননীয় রাজপুত্তুর এসে আমাকে তাঁর ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে হাওয়া।'

—'সোজা দিল্লি হয়ে ওয়াশিংটন।' জনাথান মুখ গোমড়া করে বলে— 'সে তো না হয় হল, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আমার এত কষ্টে ফাঁদ পেতে ভারতীয় কনে ধরা, সেই গুড়েই তো বালি? ডাউরির আশায় যাও-বা ধরলুম শিকারটা— তা পাই-পয়সাও পণ জুটল

না! কেন? আমার কি বরপণের যোগ্যতা নেই? একটা মার্বেল প্যালেস, গোটা দুই গ্রাম, এটুকুও কি আমি পেতে পারতাম না? অন্তত একটা বাইসিক্ল আর একটা ট্রানজিস্টার? আমার ড্রাইভার তো এগুলো ছাড়া আরো পেয়েছে। সোনার আংটি, হাতঘড়ি, ইভন শুজ, অ্যাণ্ড বেডিং!'—

—'সে তো আমার চেয়ে উঁচু জাতের গো? বর্ণহিন্দু তো সে? আমি তো নেটিব খ্রিস্টান। হীনস্য হীন, দীনস্য দীন, —ভারতবর্ষে আমার কোনওই জাতপাত নেই। ভয়ানক গরীব আমরা। আমাকে মানুষ করবার মতোও সামর্থ ছিল না আমার বিধবা মায়ের।

—তাই না মিশনারীদের হাতে সমর্পণ করেছিলেন? তুমিও যেন বোকার মতো সিলেকশন করেছ? ঠকবেই তো! তো, চল না, আমরা মায়ের কাছে গ্রামে যাই? সম্পত্তি বলতে মায়ের আছে তো শুধু তিনটে মাদী শুয়োর, একটা ছাগল। একটা মোরগ, গোটা কয়েক মুরগী, আর তাদের পাহারাদার একটা কুকুর। যদি চাও মার কাছ থেকে ডজনখানেক শুয়োরছানা আর গোটা কয়েক মুরগী পণ নিয়ে নিতে পার এক্ষুনি—'

ঠিক এমন সময়ে রাস্তায় ভঁপ্পর ভঁপ্পর ভোঁ...করে তাশাপার্টির ব্যানড বেজে উঠল— 'জিসকি বিবি মোটি—'

—সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ, কান খাড়া। মুহূর্তের মধ্যে টেবিল ঠেলে সরিয়ে জনাথান উঠে পড়ে রেলিঙের ধারে ছুটল। ঝুঁকে দাঁড়িয়েই মুখ ঘুরিয়ে বৌকে ডাকল— 'এস, এস, রিনা, শিগগির দেখে যাও, কী সুন্দর।'

—'দেখলে তো? কেমন পাগল? দ্যাখ একবার—', বলে ইরিনা ঘাড় নেড়ে চোখের ইঙ্গিতে স্বামীর ছেলেমানুষী দেখিয়ে দিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হাসে। হাসতে হাসতে উঠেও পড়ে, এগিয়ে গিয়ে স্বামীর কোলটি ঘেঁষে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে পেছু পেছু যাই আমিও। একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়াই রেলিং-এ ভর দিয়ে।

মস্ত শোভাযাত্রা যাচ্ছে। প্রথমেই লাল জরিদার ঝলমলে পোশাক পরা ব্যান্ড পার্টি। রোগাবিবি-মোটাবিবির গান বাজাচ্ছে সদর্পে। তারপর বিপুল আলোক মালার জ্যামিতিক সব ত্রিকোণ ঘাড়ে করে দলে দলে গরীব লোক হেঁটে যাচ্ছে, তার পেছনে একদঙ্গল দিব্যালঙ্কারভূষিতা, মাল্যচন্দনচর্চিতা, রংচঙে হিজ্‌ড়ে যাচ্ছে নাচের নামে শ্রীহীন অঙ্গভঙ্গি করতে করতে, তাদের পিছনে কিছু গম্ভীর পুরুষ, আর হাসিখুশি নারীরা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে— মধ্যে ঘোড়ায় চেপে সুটপরিহিত বর। বরের মুখখানি দেখা যায় না, ফুলের ঝালরে ঢাকা, তার পিছনে আর কিছু লোকজন আর আলোর মালা. সবশেষে জনশূন্য ফাঁকা মোটরগাড়ির সারি।

—'বাঃ!' —শুনতে পেলুম জনাথান বলছে,— 'ওয়েডিং? শুধু তো ডাউরি নয়? এটাও তো তবে ফসকে গেছে? এই ঘোড়ায় চড়া, এই ফুল, এই আলো, গান-বাজনা, নাচটাচ?'

—'বললুম তো, ভুল ঘরে বিয়ে করেছ যে? ধরতে একটা মারবাড়ি বউ, পেতে

এইরকম দারুণ অভ্যর্থনা—'

—'যাক গে, আমাদের বিয়ের সিলভার জুবিলিতে, বুঝলে রিনা, আমরা ঠিক এইরকম উৎসবের ব্যবস্থা করব—'

—'ততদিনে নাতি হয়ে যাবে যে?'

—'নাতি সমেতই ঘোড়ায় চড়ে তোমার কাছে আসব— ডোন্ট ইউ ওয়ারি ডার্লিং। চাঁদ কি একবারই গড়েন ঈশ্বর? সারাজীবন ঐ একটাই পরিশ্রম করে যাচ্ছেন দৈনন্দিন। রোজ ভাঙছেন, রোজ গড়ছেন— চাঁদ গড়ার কাজটা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি তাঁর—'

আমি সরে এলুম রেলিং থেকে।
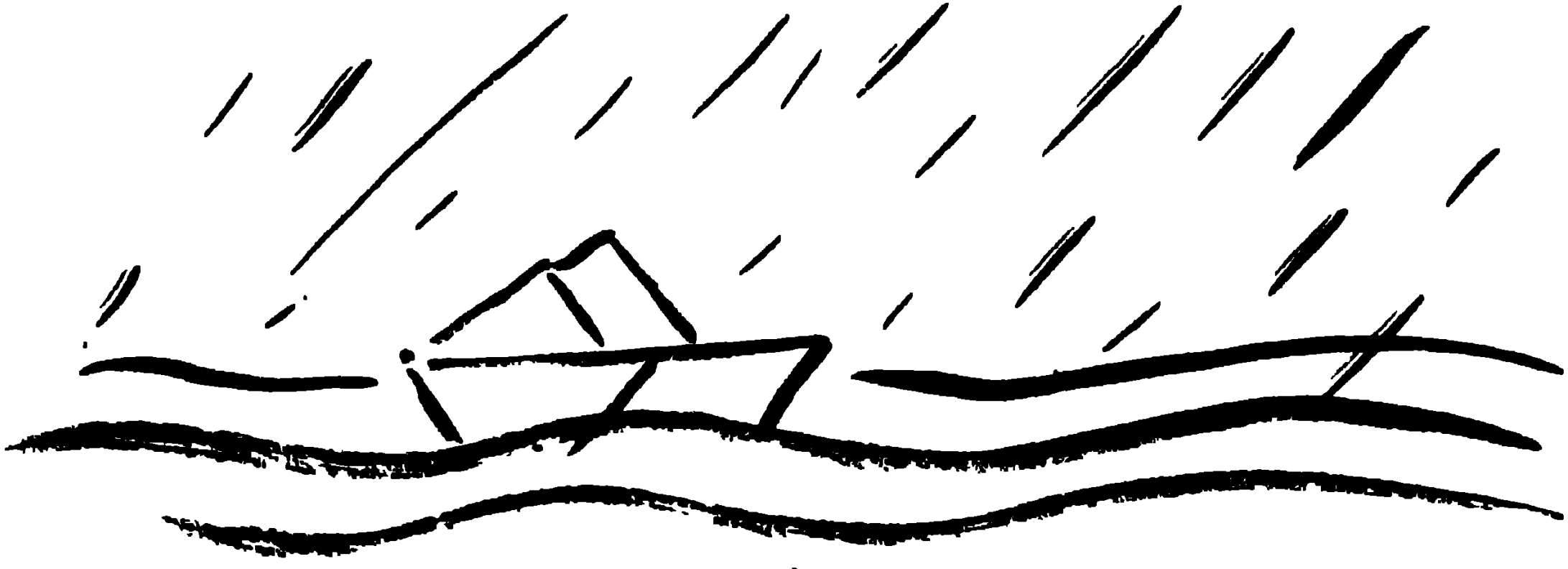
আবার এসেছে আষাঢ়

'একি কাণ্ড! এ যে একেবারে থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম বানিয়ে ফেলেছিস অমন দারুণ বৈঠকখানাটাকে?' — ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দাদামণি থমকে দাঁড়ান। এই দৃষ্টিটাকেই রবীন্দ্রনাথ বোধহয় বলেছেন 'নিমেষহত'। নিশ্বাস বন্ধ করে চোখ বুলোতে থাকেন ঘরময়। দৃষ্টিটা যেন পুলিস সার্জেন্টের হাতের টর্চলাইটের মত থেকে প্রত্যেকটা জিনিস চেঁচেপুছে স্পর্শ করে যায়— আর লজ্জায় আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত (সংস্কৃতে বলে পা থেকে মাথা) ভারি হয়ে উঠতে থাকে। দাদামণির নজর ফলো করে আমিও ঘরটা নতুন চোখে দেখছি। ঝকঝকে ইতালীয় মার্বেল পাথরের মেঝে, কাল মার্বেল আর মাদার অব পার্ল বসিয়ে বর্ডার দেওয়া। — সেই মেঝের ওপরে থাকার কথা সোফা-কৌচ-কার্পেটের— সাধারণত এ-ঘরে তারাই থাকে— কিন্তু এখন আছে? (১) একগাদা লেপ তোষক, বেডকভারে পুঁটলি বাঁধা— পুঁটলির ফাঁক দিয়ে ময়লা মশারি উপ্‌ছে পড়ছে বাইরে। (২) তিনটি বিশাল পুঁটলিতে বহু বাতিল হওয়া জামাকাপড়— মাদার টেরিজা, রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রমের জন্য রাখা। (৩) সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা খুলে ফেলে তার ন্যাড়া ড্রয়ারগুলো পাশাপাশি দাঁড় করান। তার ওপরে কিছু তাকিয়া, কুশন, আর ছ'সাতটা বক্সফাইল। টেবিলের মাথাটা বইয়ের তাকের গায়ে হেলান দেওয়া। তার ওপরে একটা শার্ট ঝুলছে। শার্টের ওপরে বেড়ালটা ঘুমচ্ছে। আরামে। (৪) মেঝেয় একটা বিরাট বারকোশের ওপরে কয়েকটা তেলরঙের টিন, তার্পিন তেলে ভেজান বুরুশ, বোতল, শিরিষ কাগজ, পুটিং-এর তাল। (৫) চতুর্দিকে সাত আটটা প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগে ভরা দরকারী কাগজপত্র, খেলনাপাতি, চিঠিপত্র, ফটো। (৬) একধামা শিশিবোতল (খালি)। (৭) একধামা সাদা গম। (৮) একটা বিশ লিটারের বৈয়ামে কেরোসিন। (৯) ঘরের মাঝখানে একখানা গদি— তাতে খাতা, বই, কলম, চাবি, চশমা। (১০) যে খাটের গদি, সেই খাটটির কাঠের অংশগুলি খুলে উল্টোদিকের দেয়ালে হেলান। তা থেকে ভিজে তোয়ালে ঝুলছে। (১১) মেঝের ওপরে হার্মোনিয়ামের বাক্স। তার ওপরে টিভি। তার ওপরে একটি কাচের বাটির মধ্যে দুটো

তাজা বেলফুলের গোড়ে মালা সুরভি ছড়াচ্ছে। (১২) একটি কার্পেটের ওপরে রানীর মত সগৌরবে অচল টেলিফোন এবং তার পদতলে, মোসাহেবের মত ভুটানী সারমেয়ী কুতুল বসে আছে। কার্পেটটা আবার উলট পাতা। (১৩) বইয়ের তাক কিছু খালি করা হয়েছে— মেঝেয় বইয়ের স্তূপ— তারই ওপরে ইতস্তত যামিনী রায়, গোপাল ঘোষ, সুনীলমাধব সেন, দেবীপ্রসাদেরা শুয়ে আছেন, অজস্র রেকর্ড দ্বারা পরিবৃত হয়ে। (১৪) দুটি বিরাট স্টিরিও স্পীকার মেঝের ওপরে পাশাপাশি রাখা। তার ওপরে কিছু শূন্য চায়ের কাপ ও জলের বোতল। একপাশে অযত্নে পড়ে আছে তার রেকর্ড চেঞ্জারটা— তার ওপরে দুটি আম। এক প্লেট ঝুরিভাজা।

—'ছি! ছি! ছি!'— দাদামণির ক্ষোভে দুঃখে বাকরোধ হয়ে যায়। 'করেছিস কি! এ যে বন্যার্তদের শিবির!' হাতের ছাতাটা দিয়ে মেঝের কোণটা দেখালেন, যেমন ডেমনস্ট্রেটররা দেখায় ছড়ি দিয়ে— 'এসব কি? ঘরদোর ঝাঁটপাট দেওয়ার পাট কি তুলে দিয়েছিস?'

ঘরভর্তি কুতুলের লোমের সাদা সাদা বল উড়ছে। যত্রতত্র চুনবালি। দেওয়াল ও ছাদ থেকে খসে-পড়া। ঝুলের টুকরো ইতিউতি উড়ে বেড়াচ্ছে প্রজাপতির মত, পাকার বাতাসে ডানা মেলে।

—'ঈসস— চোখে না দেখলে, বিশ্বাস হত না যে এ ঘরটায় এই মূর্তি করা যায়। করা সম্ভব!'

—লজ্জায় মাথা ঝুলিয়ে বসে আছি।

—'নাঃ, তুই আর ভদ্দরলোক হলি না, খুকু! সংসারী জীব আর হলি না! দেখেছিলি, খবরের কাগজে বেগম অব আউধের ছবি? কেমন গুছিয়ে রানীর মতই সংসার করছেন নিউ দিল্লির প্ল্যাটফর্মে? বেয়ারা, বাবুর্চি, ছেলে-মেয়ে, ৬টা শিকারী কুকুর, ফুলের টব, পার্সিয়ান কার্পেট, চাইনিজ ভাস, সব সমেত। যে রানী হয় সে প্ল্যাটফরমকেও প্রসাদতুল্য করে নিতে জানে। আর সে স্বভাব-ভিকিরি সে প্রাসাদকেও ্যাটফরম বানিয়ে ফ্যালে। ছোঃ।'

প্রথমে দাদামণির লেকচারটি হজম করি। তারপর ঝাঁঝিয়ে উঠি।

—'দেখতে পাচ্ছ না? বাড়িতে মিস্ত্রী লেগেছে? ঘরে সোফা কৌচ নেই, শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, স্টাডি, সব ঘরের জিনিস এই ঘরে জড়ো করা? সব কিছু মেঝেতে নামান? খাট টেবিল সবই খোলা? সবকিছু পুঁটলি বাঁধা? এমনিভাবে বুঝি আমি থাকি? এই একটি ঘরই নেয়নি— বাকি সবগুলো ঘরই যে মিস্ত্রিরা নিয়ে নিয়েছে। গুছিয়ে রাখবই বা কি করে, রেখেই বা কি হবে? আবার তো তুলতে হবে যথাস্থানে? এটা তো টেমপোরারি—'

—'নিয়ে নিয়েচে? নেবে কেন? কেন নেবে? তুমি দেবে তবে তো নেবে? তুমি দিলে কেন?'

—'ওরা সব ঘরে কাজ শুরু করে দিলে একসঙ্গে।'

—'বলি, একসঙ্গে সব ঘরে মিস্ত্রী লাগানর কথা কে কবে শুনেছে? তুই দিয়েছিস কেন ঢুকিয়ে? একখানা ঘর করবে, সব শেষ করে সাজিয়ে দেবে, তারপর আরেকখানা ঘর। এ আবার কেমন ধারা কাজের ছিরি?'

—'আমি কি করব? রহমানকে কন্ট্রাক্ট দিয়েছি। সে যেমনভাবে করবে তেমনি-ভাবে হচ্ছে তো। সে একসঙ্গে দু-তিনটে ঘর করছে। আমরা আর সাজিয়ে তুলতে সময় পাচ্ছি না। একে একে সবাই এই বড় ঘরে এসে জমছে। ভাঁড়ার ঘর, শোবার ঘরগুলো, স্টাডি, সবই বেএক্তার হয়ে আছে যে।'

—'শোবার ঘর সব ক'টায় কাজ হচ্ছে?'

—'কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু সব আলো পাখা নষ্ট হয়ে গেছে তো। ও ঘরগুলোতে শোয়া যাচ্ছে না। এ-ঘরে আলো পাখা ঠিক আছে।'

—'আলো পাখা নষ্ট হয়ে গেছে তো? কেন গেল?'

—'বলতে পারি না। হয়েছে এটুকু জানি। রহমান বলছে ব্রাশের টানে অমন হয়েই থাকে?'

—'মোটেই হয়েই থাকে না। তোমাকেও পেয়েছে গাধা। তোদের ইলেকট্রিক মিস্ত্রী নেই?'

—'এনেছিলাম। সে বলল ঘড়াঞ্চি ছাড়া পাখা সারবে না। ঘড়াঞ্চি ওর কাছে নেই— অন্যত্র কাজ হচ্ছে। সেখানে আছে।'

—'ঘড়াঞ্চিওয়ালা আর কোনও মিস্ত্রী নেই পাড়ায়?'

—'নাঃ, আর অন্যরা মইওয়ালা পার্টি। মইতে হবে না।'

—'তা শুচ্ছিস কোথায়? এ ঘরেই? খাট তো খোলা। এই মেঝের গদিতে তো একজন মাত্র— বড়জোর দু'জন—'

—'ঐ ফোলডিং খাটে আরেকজন। আর মাদুরের ওপর ডানলোপিলো পেতে আরেকজন, ঐ কর্নারে। ভাগ্যিস ঘরটা বড় ছিল।'

—'এই ঝুলকালি-চুনবালির মধ্যে মাটিতে শুস কি করে? ঝাঁটপাট বন্ধ কেন? ঝ্যাঁটা নেই তোদের?'

—'ঝ্যাঁটা থাকবে না কেন? ঝি নেই। কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

—'দেবে না? ঘরদোরের যা ছিরি? থাক? ও তো পাগল হয়ে যাবে।'

—'সে বলেছে মিস্তিরি না বেরুলে সে আর ঢুকবে না। তাই নিয়মিত সাফাই হচ্ছে না। ওই মজুরদেরই দুটো করে টাকা দিয়ে ঘরটর মুছিয়ে নিচ্ছি। কি রোজা করছে বলে সব দিন ওরা বেশি খাটতে চায় না। কাল মোছেনি। কাল আগে আগে চলে গেছে। আজকে ঈদ কিনা। আজ ওরা ছুটি করেছে।'

—'আজ ঈদ, প্লাস রথ! কোথাও না কোথাও কেলেঙ্কারি হবেই মনে হচ্ছে। দু'চারটে ভালরকম হাঙ্গামার স্টোরি আজ না হলেই নয়।' ঘরের সুদূর কোণে একমাত্র চেয়ারটি দখল করে বসে কাগজ পড়তে পড়তে দীপু এতক্ষণে পরিতৃপ্ত সুরে কথাটা

বলল, পায়ের কাছে মেঝেভর্তি সিগারেটের ছাই, দেশলাই কাঠি, পোড়া সিগারেটের টুকরো, শূন্য প্যাকেট। হাত-খানেক দুরেই শূন্য অ্যাশট্রে-টি ঝকঝকে হাসছে। দাদামণি দেখলেন। এবং হুঙ্কার ছাড়লেন।

—'ওঠ ব্যাটা হিপ্পি। তোল সিগারেটের টুকরো। কেন, ঐ অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলতে পার না? পাশেই রয়েচে?'

জগতে সবই নশ্বর, ছাইই বা কি, ছাইদানিই বা কি-এমনি একখানা মুখের ভাব করে দীপু পা দিয়ে টুকরোগুলো একত্র করতে থাক। দেখে দাদামণি খুশি হন। তারপরেই ভুরু কুঁচকে যায়। কান খাড়া করে শুনতে থাকেন। কোথায় একটা ঘস ঘস ঘস ঘস করে শব্দ হচ্ছে। অনন্ত।

—'ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকটাও তো মন্দ দিসনি? ও কিসের শব্দ?'

—'পালিশ মিস্ত্রী। বাথরুমের পাথর পালিশ করছে।'

—'পা-লিশ?' দাদামণি হেসে ফেলল। 'বাড়ির তো এই অবস্থা, এর মধ্যে পালিশ?'

—'না না, বাথরুম রিপেয়ারিং পেন্টিং কমপ্লিট। পালিশ হলেই এর ঘর শেষ। পঞ্চু এসেছে, ওর তো ঈদ নেই।'

এমনি সময়ে, ঠিক মাথার ওপরে অকস্মাৎ ঠঠাং ঠঠাং করে একটা বিকট শব্দ শুরু হয়। প্রচণ্ড শব্দ। বাড়ি কাঁপে।

—'ও বাবা!' দাদামণিও দৃশ্যত কেঁপে ওঠেন। 'ওটা আবার কি রে? কি পেটাচ্ছে ওটা? লোহার কিছু?'

—'ও কিছু না। ট্যাংকটা ভাঙছে বোধহয়।' কিসের ট্যাংক? কে ভাঙছে? কার হুকুমে ভাঙছে? দাদামণি ক্ষিপ্তপ্রায়।

—'মানে ঐ জলের বড় ট্যাংকটা খুব পুরনো হয়ে ফুটো ফুটো হয়ে গিয়েছিল তো? ওটা বদল করেছি। এক পুরনো লোহাওলা সেটা কিনেছে। সে-ই এসেছে ট্যাংকটা কেটে টুকরো করে নিয়ে যাবে বলে।'

—'ওহ্! তাই বল। যাই বলিস খুকু বাড়িটাকে সত্যি সাত্যি ইস্টিশানে পরিণত করেছিস। ভদ্দরলোকে থাকতে পারে এতরকম শব্দের মধ্যে? কাকিমাকে কি ভয়ঙ্কর কষ্ট দিচ্ছিস ভেবে দেখেছিস? ভাগ্যিস আর নিচে নামতে পারেন না— এ ঘরটা দেখলেই সিওর হার্টফেল, কিংবা সেরিব্রাল। ওই বীভৎস আওয়াজে আয়ুক্ষয় হচ্ছেই— সাউণ্ড পলিউশন একেই বলে—', বলতে বলতেই চোখ পড়ল ঘরের আরেক কোণে— 'অ্যাঁ? যামিনী রায়, সুনীলমাধব-সব মাটিতে ফেলে রেখেছিস? তোল তো, তুলে রাখ— কাকাবাবুর যত্নের এসব জিনিস তুই ধ্বংস না করেই ছাড়বি না দেখছি—', বলতে বলতে নিজেই তুলতে শুরু করেন ছবিগুলো 'জানিস, আমেরিকায় এ ছবির এখন কত দাম?' তার পাশেই একটা তেতলা রথ— কাগজের শেকলের মালায় অর্ধসজ্জিত। বাকি শেকল, কাঁচি, আঠা, রঙিন কাগজ সমেত ভূলুণ্ঠিত। কারিগরগণ বোধহয় অন্য কোনও দুষ্কর্মের টানে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন আপাতত। মোমবাতি, কাঁসর প্রস্তুত। — 'ওঃ,

আজ রথ। বিষ্টি হবেই। আকাশও সেজে আসছে। আমি ঘরেই আছি, বিষ্টি নেমে গেলে মুশকিল হবে। নে, ঘরদোর গুছিয়ে রাখ— আমি চারটে পাঁচটা নাগাদ ফিরে যেন সব টিপটপ দেখি। ভাল করে চা খাওয়াবি তখন—' যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন দাদামণি। আজকাল দুর্গাপুরে বদলি হয়েছেন— এবার বেশ মাস তিনেক বাদে এলেন।

দাদামণি বেরুতেই ঝাঁটা ঝাড়ন নিয়ে লেগে পড়ি চুনবালি কুকুরের লোম সাফাইয়ে। গোপাল ঘোষ, যামিনী রায়দের তুলে রাখি স্টিরিও স্পীকার দুটোর মাথায়। কাপ ডিশ বোতল-টোতল ট্রেতে করে সরিয়ে ফেলি। টুকরোগুলোকে যথাসাধ্য তুলে ট্রে ভরে ভরে গুছিয়ে রাখি। জুতোটুতো সরিয়ে দিই। গমের ঝুড়ি আর কেরোসিনের টিন রান্নাঘরেই পাঠাতে হবে— তার আগে জানলাগুলো বন্ধ করি। প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে। দাদামণি না ভিজে যান। বাচ্চারা রথই বা টানবে কেমন করে? আমার পক্ষে অবিশ্যি ভালই হল বৃষ্টিটা হয়ে— জলছাদটা এত খরচ করে যে ফের পেটান হল— পড়ার ঘরে জল পড়া বন্ধ হল কিনা সেটার একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে। পড়ার ঘরটা বৃষ্টির জলের চোটে অব্যবহার্য হয়ে গিয়েছিল। রহমান বলেছে তিরিশ বছরের মধ্যে আর জল পড়বে না, পড়ার ঘর এমনই রিপেয়ার করেছ।

জানলা-টানালা বন্ধ করে ফের নজর করে দেখলুম এত ঝাঁটপাট দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে গুছিয়েও ঘরটাকে থার্ডক্লাস ওয়েটিং রুম থেকে সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমেও উন্নীত করা যায়নি। অতগুলো ধ্যাবড়া বড় বেডকভার জড়ান পুঁটলি, মেঝেভর্তি বই, খোলা খাট, খোলা টেবিল, খোলা স্টিরিও সিস্টেম, দু'খানা ধামা, এসব যাবে কোথায়? হারমোনিয়ামের ওপর টিভি সেট? তার ওপরে গোড়ে মালা? যাকগে যাক। আর পাবি না।

পুজোর লেখা সব বাকি। আজ মিস্ত্রী নেই— এই ফাঁকে কাগজ কলম নিয়ে মেঝের গদিতে উপুড় হই। একটা বড় গল্প আধখানা লেখা হয়ে পড়ে আছে। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। কড়কড়াৎ বাজ পড়ল কোথায়। সীজনের প্রথম বড় বৃষ্টি। শব্দটা খুব ভাল লাগছে। ট্যাংক কাটা বন্ধ রেখে মিস্ত্রী নেমে গেছে নিচে। পঞ্চু অবিশ্যি ঘষে যাচ্ছে। — তার শব্দকে ছাপিয়ে উঠেছে বৃষ্টির ঝমঝম। এই সময়ে এককাপ চা হলে হত।

—'ঝর্না? এককাপ চা হবে নাকি? ঝর্না?'

এই বাক্যের সোনার কাঠিতে হেঁটমুণ্ড দীপু প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেই চেঁচাতে শুরু করে-'ঝর্না! ঝর্না! চা! চা!', সিঁড়িতে ঝর্ণার মাথা দেখা যায়। একগাল হেসে বলে—

—'চা হবে নে— আন্নাঘরে তুলকেলাম?' সদাহাস্যময়ী ঝর্না বুড়ো আঙুল দেখায়।

—'মানে? রান্নাঘরে তুলকালাম! কেন?'

—'জল পড়তেচে, গো জল! আন্নাঘর জলে থৈ থৈ কত্তেচে— চাল আটা তেল চিনি সোব ঘেঁটেঘুঁটে একাক্কার'— দুই হাত নেড়ে শূন্যে গ্লোবাকৃতি করে ঝর্ণা।

—'সেকি? কি করে হল?'

—'কে জানে, কি করে হল। আমরা তো জিনিস সরাতিই টাইম পাচ্চিনি— এই বাটি বসাই তো ঐখেনে জল পড়ে— ওখেনে থালা পাতি তো সেইখেনে ঝরঝর করে জল— আমরা খালি ছোটাছুটি করে থালাবাসন পাততিচি আর ঘর পুঁচতিচি— একেবারে বোকা বাইনে দেচে! এ্যাকোন চা-টা হবে নে, আগে এট্টু সামাল দিয়ে নি।'

—'তা সামাল আর দিচ্ছ কোথায়? দিচ্ছ লেকচার'— দীপু বলে।

—'মা তো বলেচে, আজ বিষ্টিতে খিজড়ি আন্না হবে। তাই ভগমানই আন্নাঘরে আবনা, আবনি খিজড়ি এঁধে একেচেন-দ্যাকো গে যাও।'—

দীপু এবার বলে, 'বাজে বোকো না— রান্নাঘরে আবার জল পড়বে কি করে? জল তো পড়ে পড়ার ঘরে।'

—'সে ঘর তো শুকনো খটখট কত্তেচে— এ লোতন ফুটো গো— আগে ছেলনি!'

—'জল পড়ছে তো চা করতে কি হয়েছে? আশ্চর্য!' দীপু আর একটা যুক্তি খাড়া করতে চেষ্টা করে ঝর্ণার কাছে বকুনি খায়।

—'উদিকে নংকাকাণ্ড হচ্চে— বলে কিনা, কি হয়েছে। তুমি নিজেই চা করে দ্যাকো না?'

—'যা যা দীপু, দ্যাখ না একবার ব্যাপারটা কি?'

—'যাচ্ছি, যাচ্ছি! বাব্বা। এককাপ চাও চাইবার উপায় নেই। অমনি সংসারের একটা কাজ ধরিয়ে দেবে।' বলে দীপু টিভির ওপর পা তুলে দিয়ে— জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে— 'ইস দিদি— বাইরেটা কি সুন্দর হয়েছে—', এবং উদাস গলায় গান ধরে—'মেঘছায়ে সজলবায়ে—' ওপরে যাবার লক্ষণ দেখায় না।

সত্যিই বাইরেটা ভারি মোহময় হয়েছে তো? সামনের কদম গাছটাতে বৃষ্টি যেন মণিমাণিক্যের মত ঝকঝক করছে— মেঘমেদুর আবছা ঝাপসা আলোর মধ্যেও কি উজ্জ্বল ওর সবুজ রংটা— কে বলে আমাদের আদরের কলকাতা মুমূর্ষু?

—'মা! মাগো। কি মজা। দেখবে এস দিম্মার বারান্দা নদী হয়েচে—', নাচতে নাচতে টুম্পা এল। হাতের স্প্যানের মলাটে বানান নৌকো।

—'নদীতে কত জল— ankledeep-এর চেয়েও বেশি, আমার প্রায় Kneedeep জল— দিদি নৌকো ভাসাচ্ছে। এটা দিয়ে সাতটা হবে, — দিম্মা বলেছেন সপ্তডিঙ্গা।'

—'ওগুলো সব গিয়ে নালীর মুখ বুজিয়ে দেবে— এত বৃষ্টির মধ্যে নৌকো তো ভাসবে না, বৃষ্টি থামলে।'

—এঁত বৃষ্টি কোঁথায়? কঁমে গেঁছে তোঁ? ভাঁসছে তোঁ' — বলতে বলতে টুম্পা নৌকা সমেত পালায় তেতলায়। পরমুহূর্তেই তার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ শোনা যায়—

—'মা! মা! দেখবে এস— কি মজা। দিম্মার ঘরের মধ্যেও কি সুন্দর জল ঢুকছে— flood— এর মতন—'

তার পরেই মায়ের সেবিকা পুতুলের আর্তনাদ।

—'ও দিদি! ও কানাই! কি হবে? ঘরে যে জল ঢুকছে! ঝাঁটা? ঝাঁটা কোথায়?'

—'সমস্তই তোমাদের নৌকো ভাসানর প্রতিফলন!'

মূর্তিমতী অরসিকা হয়ে ব্যাঘ্রগর্জনে এবং ব্যাঘ্রঝম্পনে তেতলায় ধাবিত হই। এবং ঝাঁটা হস্তে জলভরা বারান্দায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। কানাইই বা অমন কাব্যিক বাক্যবন্ধকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ ছাড়বে কেন? 'ঝাড়ুহাতে এল কানাই'— সেও হাঁটু অবধি লুঙ্গি উঠিয়ে ঝাড়ু নিয়ে নেমে পড়ে টুমপার নদীতে। দুজনে মিলে বুজে যাওয়া নর্দমার ঝাঁঝরিকে আক্রমণ করি। এই মিস্ত্রী খেটেছে তো? চুনবালি সব ঢুকছে বোধহয়— একগাদা ভিজে কাগজের নৌকোর শব তোলা হয়— ম্লানমুখে পিকো-টুমপা ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান— তাদের দিম্মা সান্ত্বনা দিচ্ছেন— 'সপ্তডিঙ্গা মাধুকরী ডুবেই থাকে দিদি— কিন্তু আবার ঠিক ভেসে উঠবে দেখো।' কিন্তু ওরা কিছুই শুনছে না। নর্দমার খনিগর্ভ থেকে কানাই একে একে শণের নুড়ো, দেশলাইকাঠি, ইঁটের কুচি, শুকনো ফুলের মালা— এই জাতীয় প্রচুর রত্নবাজি উদ্ধার করছে। আস্তে আস্তে জলটা দিব্যি নামতে শুরু করল। আমিও ঝাঁটা ফেলে, নিশ্চিন্ত হয়ে রান্নাঘরের 'তুলকালাম' পরিদর্শনে যাই।

ছাদের মাঝখান দিয়ে জল পড়ছে। মেঝেয় আমার একটা ধোয়া শাড়ি ব্লটিং পেপারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। চারিদিকে থরে থরে থালাবাটি কাপডিশ বিছানো। তার মধ্যে বৃষ্টির জল ধরা হচ্ছে। আমার সাধের জাপানি ছাতাটি কায়দা করে মিটসেফের সঙ্গে আটকে, তার নিচে বসে একা একাই বেধড়ক রাগারাগি করে মিস্ত্রীদের চতুর্দশপুরুষ উদ্ধার করতে করতে বাটনা বাটছে ঝর্না। রান্না করবার টেবিলের তলায় গ্যাসরিংটি নামিয়ে তার নিচে সঙ্গোপনে রান্না চড়ান হয়েছে। ভয়ে চায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে, নিঃশব্দে কেটে পড়াই মঙ্গল মনে করে পা টিপে টিপে সরে আসি— পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন। নিচে গিয়ে লেখাটা ধরতে হবে।

নিচে এসে ঘরে ঢুকতে গিয়ে পায়ে যেন জলের মতই কি ঠেকল। আরে, এ ঘরে আবার জল আসবে কি করে। বোতল ভাঙল নাকি? নজর করে দেখি বড় খাটের পালিশ করা খোলা অংশগুলি ভিজিয়ে দাপটে জলস্রোত আসছে। কোথা থেকে আসছে? দুটো জানলাই তো বন্ধ? জানলার ওপর বইগুলো তো শুকনো? তবে তো জানলা দিয়ে নয়। ভাঙা কাচ-টাচ দিয়ে আসা অসম্ভব ছিল না— তবে সদ্য কাচ সবই সারান হয়েছে — তবে? ঐ তো জলটা ধেয়ে আসছে বইয়ের র‍্যাকের তলা দিয়ে কুলকুলিয়ে। কাপড়ের পুঁটলির গা বেয়ে। কার্পেট ভিজিয়ে-কুতুল উঠে গদিতে চড়ে বসেছে— টেলিফোন উঠে সরে যেতে পারেনি, তাই ভিজে যাচ্ছে। সর্বনাশ! এত জল কোত্থেকে আসছে?

কুতুলটাও আশ্চর্য! সত্যি! উঠে গেছে, অথচ একটুও ঘেউ ঘেউ করেনি। করবেই বা কেন? জল তো চোর নয় ডাকাতও নয়, যে ঘরে ঢুকলে কুকুরকে চেঁচিয়ে তার জানান দিতে হবে? জল তো আউট অব সিলেবাস! কিন্তু একটু আগেও তো জলটল

ছিল না? এই তো ওপরে গেছি বারান্দা সাফ করতে— এর মধ্যেই এত জল এল কি করে। বৃষ্টি তো কমেই গেছে! দীপুটাই বা কেমন? চুপচাপ এর মধ্যে বসে আছে? দেখছে না?

—'দীপু!' হাঁকটি ছাড়ি, প্রায় কাপালিকদের মত। কিন্তু কোথায় দীপু? চেয়ার খালি। বাড়িতে চায়ের সুবিধা হবে না বুঝে তিনি নির্ঘাৎ পাড়ার দোকানে গেছেন। আশ্চর্য ছেলে। সংসারসুদ্ধু চুলোয় যাক, তার দৃষ্টিপাত নেই। চা-সিগারেট হলেই হল।

—'পিকোলো! টুমপা! কানাই! ঝর্না! পুতুল! শিগগির নেমে আয়। শিগগির। নিজের বৈঠকখানা ভেসে গেল জলে—', আমি আমার সংসারের টোটাল ম্যান পাওয়ার ব্যবহার করতে চেষ্টা করি— প্রত্যেকটি মানুষকে মোবিলাইজ না করলে ও সংকটের মোচন অসাধ্য।

—'জল? বৈঠকখানায়? ও-ম্মা! কি মজা!'

—'কই? কই? কই? সত্যি বলছ তো?'

মহোল্লাসে কলরোল করতে করতে দন্ত বিকশিত করে দুই কন্যা লাফাতে লাফাতে এসে পড়ে। ঠাস ঠাস করে দুই থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে করল আমার। এটা যে সমূহ বিপদ, ওরা তা বুঝতে পারছে না? মজা পাচ্ছে? মেঝে ভর্তি আমাদের যাবতীয় ভূসম্পত্তি— বই, রেকর্ড এবং অন্যান্য সবই যে মুহূর্তের মধ্যে জলমগ্ন ও বিনষ্ট হবে, এই ঘরে যে বান ডেকেছে— ওরা কিছুই টের পাচ্ছে না— নির্বোধ শিশু কাঁহাকা। জলের উৎস সন্ধানে তার গতিপথ অনুসরণ করে পাশের ঘরে উপস্থিত হই— কাপড় ঢাকা খাট, কাপড় ঢাকা গডরেজ আলমারির মাঝখানে দিয়ে বাঁশের ভারার তলা দিয়ে বিপুল ক্রমবর্ধমান জলরাশি খবরের কাগজ ঢাকা দেওয়া ট্রাংক সুটকেস ড্রেসিং টেবিলের তলা ভিজিয়ে ছুটে এসে আমার পদসেবা করে, সানন্দে আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। উৎস নর্দমা। কোণের নর্দমাটি দিয়ে বাইরের রেনওয়াটার পাইপের প্রবল জলকল্লোল অনায়াসে দোতলার শয়নকক্ষে অনুপ্রবেশ করছে। মাথার ওপর তিনতলার বারান্দায় কানাই তখনও সিংহবিক্রমে ঝাঁটা দিয়ে জলযুদ্ধ চালাচ্ছে, তার সম্মার্জনী-ঝংকার শুনতে পাচ্ছি।

মুহূর্তেই ঘটনাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। যত জল আমরা ওপর থেকে ঠেলে দিচ্চি, সব জল বেগে পালিয়ে এসে আমারই শোবার ঘরে শেলটার নিচ্ছে। কোনও বিশেষ কারণে জল একতলায় নামতে পারছে না। কি সর্বনাশ। প্রথমে ওপর থেকে জল নামা রুখতে হবে।

—'কানাই! ও কানাই! ঝাঁটা বন্ধ কর, ঝাঁটা বন্ধ কর'— বলতেই কানাইয়ের আরো জেদ চেপে গেল! সে তো নিচের সমস্যা জানে না? আমি যত চেঁচাই —'ঝাড়ু থামা'—ও তত বলে— 'আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না দিদি, এই তো আর একটুখানি— জল সব সাবাড়!' তার রোখ চেপেছে, বারান্দা সে নির্জলা করবেই!

—'অ পুতুল! অ ঝর্না! প্লিজ কানাইকে থামাও! বারান্দার জল বারান্দাতেই থাকা

ভাল, ও জল নাবিয়ে কাজ নেই— জলটা থাকুক, জলটা থাকুক, নর্দমা বুজিয়ে দাও— বরং নর্দমার মুখে ন্যাতা গুঁজে দাও—', শুনে কানাই ভাবলে দিদির মাথা খারাপ হয়েছে, সে আরো জোরে ঝাঁটা চালায়। নিজের কানকে অবিশ্বাস করে পুতুল ও ঝর্না নিচে আসে এবং ব্যাপার দেখেই রান্নাঘরে দৌড়োয়— নাঃ, এ ন্যাতা-বালতির কেস নয়— এ কেলোর কীর্তি, — ওয়ার ফুটিংয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে— যে যা পারে, থালা বাসন নিয়ে, বালতি ডেকচি নিয়ে হাজির। টুমপা পিকো সমেত কাঁসি নিয়ে কড়া নিয়ে মেঝের জল ছেঁচে বালতি ডেকচিতে তোলা হতে লাগল— কুতুল হঠাৎ জেগে উঠে ঘরে এত লোক এত হৈ চৈ, বেধড়ক চেঁচাতে শুরু করলে— হট্টগোল শুনে পালিশ মিস্ত্রী পঞ্চু ছুটে এল, এবং অবস্থা দেখে বললে জালিটা ভেঙে না ফেললে জল বের করে আনা যাবে না। বলেই কোথা থেকে একটা লোহার বড় রড এনে ঝাঁঝরিটা ভাঙতে শুরু করে দিল্। আমি চেষ্টা করছি একবার গদিটা টেনে সরাবার— রেকর্ডগুলো ভাগ্যিস জলের যাত্রাপথে নেই— ঘরের অন্যপাশে আছে— একবার লেপ তোষকের পুঁটলিটা নড়াতে চেষ্টা করছি— করতে কিছুই পারছি না— পুতুল দুই হাতে ঝাঁটাটা ক্রিকেট ব্যাগের মত বাগিয়ে ধরেছে— দু'হাতে জল পেটাচ্ছে, তার চেষ্টা জলটাকে বই আর গদির দিক থেকে সরিয়ে দরজার দিকে পাঠাবার— যে যার পজিশন নিয়ে নিয়েছি। ঝর্না দরজার কাছে, দীপুর একটি জীনস জিভছোলার মত করে দুটো পা দুহাতে ধরে ছেঁচে ছেঁচে ঘরের সব জল নিয়ে সিঁড়িতে ফেলছে।

এতক্ষণে কানাইও নিচে এসেছে। এসেই আধো ভিজে লেপ তোষকের গন্ধমাদনটা ও-ঘরের খাটে তুলেছে। স্টিরিও স্পীকারদুটো গদির ওপর তুলেছে। ও-ঘরে খাটের নিচে থেকে স্যুটকেসগুলো বের করে শুকনো জায়গায় রাখছে— আর বলছে— 'য্যাতো ঢাকন সবই উপ্রে আব য্যাতো জল সবই নিচে— এ্যার বেলাইতি ছুটকেশ সব ভিজ্যে গেল গাঃ।'

হঠাৎ জল ছেঁচা ফেলে টুমপা কেঁদে উঠলো— 'আমার রথ! আমার রথ একদম ভিজে গেল্— ওমা! আমার রথ!' আর পিকো চেঁচাচ্ছে— 'মা! মা! স্টিরিও! স্টিরিও!'

স্টিরিওর মা কি করবে? অতবড় জিনিসটাকে কানাই দুই হাতে তুলে, হঠাৎ লক্ষ্মণের ফলধরা অবস্থায় পড়ল— সেটাকে নামানর জায়গা নেই— বিন্ধ্যপর্বতের মত কুঁড়ো হয়ে অনন্ত অপেক্ষায় রয়ে যায় কানাই। প্রত্যেকেই আমরা চেঁচাচ্ছি, প্রত্যেকে প্রত্যেককে নির্দেশ এবং উপদেশ দিচ্ছি একই সঙ্গে, এবং মা ওপর থেকে অনবরত তাঁর ঘন্টিটা একনাগাড়ে বাড়িয়েই চলেছেন পাগলা ঘন্টার মত, আর বলছেন— 'ওরে— তোরা সবাই কে'থায় গেলি? ওপরে কেউ নেই কেন? বারান্দায় যে এখনও অনেক জল রয়ে গেল!'

এদিকে দোতলায় তো প্রত্যেকের কাসাবিয়াংকার অবস্থা। কারুরই স্টেশন ছেড়ে নড়বার উপায় নেই— মা বেচারী কিছুই টের পাচ্ছেন না।

ইতিমধ্যে একতলায় তিনটে অধৈর্য ডোরবেল বাজল। কেউই সাড়া দিতে পারছে না।

ওদিকে পঞ্চু ঝাঁঝরি ভেঙে ফেলে সর্বনাশ করেছে। 'ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল গরজিত উঠিছে বিপুল রোষে।' বিনা বাধায় দ্বিগুণ বেগে ঘরে জলপ্রবেশ ঘটছে। আবার বেল! আবার! এবার ঝাঁটা হাতে পুতুল ও সানকি হাতে পিকোলো উঁকি দিল। নিচে ধোপদুরস্ত দু'জন অধীর, অভিযোগনিরত ভদ্রলোক। আমাদেরই নিচের তলার বাসিন্দারা।

—'আমাদের ঘরে জল ঢুকছে। একটু যদি জলটা না সামলান, তবে—'

'স্বচক্ষে দেখে যান জল সামলান হচ্ছে কি হচ্ছে না—', ওপর থেকে উত্তর যায়।

তাঁরা স্বচক্ষে দেখতেই আসছিলেন, কিন্তু অত্যুৎসাহী ঝর্না অত না বুঝে আরেক ক্ষেপ জল ঝাড়ে— এবং নায়াগ্রার মত জলপ্রপাত হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে নেমে তাঁদের হাঁটু অবধি সিক্ত করে দেয়। দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে জল নেমে একতলার দরজার তলা দিয়ে ওঁদের ঘরে ঢুকছে। চোকাঠ না থাকার কুফল।

—'দরজার নিচে দুটো বস্তা লাগিয়ে নিন।' এবারে আমিই চেঁচাই— 'সিঁড়ির নিচে আছে।'

নিচের ভদ্রলোক যথার্থই ভদ্র, এবং বুদ্ধিমান। মুহূর্তেই বুঝে নেন, এটা সংকটজনক মুহূর্ত— এবং সঙ্গে সঙ্গে রেসকিউ পার্টিতে যোগ দেন। অর্থাৎ দৌড়ে নিচে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে বেরিয়ে রেনওয়াটার পাইপটি পরিদর্শনে লেগে যান। উপুড় হয়ে চিৎ হয়ে উঠোনে শুয়ে নানাভাবে নল খোঁচাখুঁচি করে তাঁদের ডায়াগোনসিস হল— 'নল তো জ্যাম। একেবারে অনেকদূর পর্যন্ত। একেবারে কংক্রিট হয়ে গেছে— মিস্ত্রীরা ভেতরে সিমেন্ট ফেলেছে নিশ্চয়ই— অতএব পাইপ ভর্তি হয়ে গিয়ে জলটা দোতলায় ঢুকছে।' এবার শুরু করলেন নলটি ভেঙে ফেলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। তাই দেখে আমার মনে পড়ে গেল— আরে! লোহাওয়ালা কোথায় গেল? সেই যে ট্যাংক ভাঙছিল? তার তো যন্ত্র আছে।

লোহাওয়ালা রকে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। বেণীর সঙ্গে মাথা না হোক, মাথার সঙ্গে বেণী— ট্যাংকের সঙ্গে রেনওয়াটার পাইপও পাবে শুনে মহা উৎসাহে সে ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে লেগে পড়ল, ঠঠাং, ঠঠাং, ঠঠাং...কিন্তু তার আগেই— যুবক পঞ্চুর রডের অবিরাম ধাক্কার কাছে পঞ্চাশ বছরের পুরনো বেনডটি আত্মসমর্পণ করল। আর কত সইবে? পঞ্চু সমানেই খুঁচিয়ে যাচ্ছে— তার দৃঢ় ধারণা এখানেই কিছু জমে আছে— তার খোঁচানর চোটে মর্চে ধরা লোহার নলটি গর্ত হয়ে গেল, এবং দোতলার ওপর থেকে দুটো নল নিয়ে নোংরা জল কিছু ইট-পাটকেল-শনের নুড়োসমেত প্রবল ধারায় নিচে কর্মরত পরোপকারী ভদ্রলোক এবং লোহাওয়ালার মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ল! আমি ভয়ে কাঁটা। ছি ছি— কি কাণ্ডটাই হয়ে গেল। কিন্তু মানুষের মন ভারি আশ্চর্য বস্তু— ভিজে যাওয়া মানুষগুলির কণ্ঠ দিয়ে যে উল্লাসধ্বনি নির্গত হল— সেটা রবি শাস্ত্রীর ছক্কা মারার সময়েই মানায়। পঞ্চুকে দেখাচ্ছিলও রবি শাস্ত্রীর মত।

জল ঢোকা বন্ধ। এবার রিল্যাক্স করে আমরা অর্থাৎ দোতলার জলকর্মীবৃন্দ ঘরের

জল, বারান্দার জল, সিঁড়ির জল, যাবতীয় জল সাফ-সুতরো করতে থাকি। আমার হাঁটুর কাছে কাপড় তোলা। হাতে নারকোল ঝাঁটা। একমনে ঘরের জল ঝাঁট দিচ্ছি। ওয়াটারফুটিং থেকে এবারে গার্হস্থ্য পর্যায়ে নেমে এসেছে কর্মের জাতীয় চরিত্র। এবার শুনতে পাই পাগলা ঘন্টির সঙ্গে সঙ্গে শয্যাবন্দী মা চেঁচাচ্ছেন—'ওরে। ভাত পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে যে? — ওপরে কি কেউ নেই?'

ঝর্না জিভ কেটে ছুটল ওপরে। হঠাৎ আমার কানের কাছে—

—'দিদি।'

—'কে রেঃ—'! চমকে উঠি! দুটি ছেলে।

—'আমরা এসেছিলাম মধুকৈটভ থেকে— এবারে আমাদের পুজোসংখ্যাটা—'

—'আজ থাক, বুঝলেন? এখন খুব ব্যস্ত—'

—'যদি একটা প্রেমের কবিতা— এটা শুধুই প্রেমের কবিতার সংকলন—'

—'আজ থাক ভাই, আরেক দিন, কেমন? এখন ভাবতে পারছি না— দেখতেই তো পাচ্ছেন—'

—'ও ঘরে জল ঢুকে গেছে বুঝি? কি করে ঢুকল?'

—'আরেক দিন সব বলব— রোববার সকালে আসবেন—।'

আপনমনে ঝাঁট দিতে থাকি। ছেলেদুটি চলে যায়। প্রেমের কবিতাই বটে।

—'দিদি।'

—'আবা-র?'

—'আমি শওকৎ। ঈদ মুবারক।'

—'ওঃ'—

শওকতের পরনে ধবধবে নতুন পোশাক— হাতে একটা কাগজের বাক্স। খাবারদাবার আছে বলে মনে হয়। মিষ্টি? কাবাব? যাই থাকুক— এই কি তার সুযোগ্য সময়?

—'ঈদ মুবারক শওকৎ। সরি আমি আজ একটু—'

—'এটা ধরুন দিদি— পিকো টুমপার জন্য একটু পেস্ট্রি।'

—'কেমন করে ধরব? হাতে তো ঝাঁটা। দেখছ না বাড়ির কি অবস্থা?'

দেখবে না কেন? কিন্তু শওকৎ বড় ভদ্র ছেলে। খানদানী পরিবার তাদের। সে এসব কেলেঙ্কারির মুহূর্তগুলি দেখেও দেখে না। যেন এটাই আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা— এই সিঁড়িতে জলপ্রপাত, এই হাতে ঝাঁড়ু নিয়ে, হাঁটু বের করে অতিথি আপ্যায়ন। যেন কিছুই হয়নি। সবই যথাযথ আছে। ইংরেজী এবং লখনউয়ী ভদ্রতায় এখানে একটা মিল আছে।

হঠাৎ যেন বাতাসে গন্ধ পেয়ে দুই মেয়ে হঠাৎ উদয় হল। হাঁটু অবধি গোটানো ভিজে জীনস একজন, আর যত্রতত্র ভিজে ন্যাকড়ার মত ফ্রকে আরেকজন। দু'জনেরই হাতে পুষ্পপাত্রের মত ধরা দুটি সানকি। তাতে নোংরা জল। শওকতের হাতে বাক্স দেখেই

লোভী টুমপা চকচকে চোখে প্রশ্ন করে, 'কি গো? শওকৎ-মামা? বাক্সে কি আছে?'

শওকৎ যেন বেঁচে যায়। বাক্স বাড়িয়ে ধরে সে বলে— 'কিছু না, সামান্য পেস্ট্রি! নে, তোরা খেয়ে ফ্যাল—'

অমনি ঘাড় কাৎ করে কোঁকড়া চুলভরা মাথাটা এগিয়ে আকাশ-পাতালব্যাপী একটি হাঁ করে টুমপা। 'দাও।'

তার মুখে ফেলে দিতে হবে। এটা সম্ভব নয়। পিকো ভদ্রভাবে বলে— 'ওই টেবিলে রাখ। ওটা শুকনো জায়গা। আমরা পরে নিচ্ছি। তুমি ওই চেয়ারটাতে বসতে পার। ওটা বোধহয় শুকনো চেয়ার। আজ বাড়িতে যা কাণ্ড! বাপরে—'

—'হামতুমম..এক কামরেমে বন্ধ হো'— নিচে উচ্চৈঃস্বরে গান গাইতে গাইতে চা-প্রীত চিত্তে দীপুর প্রবেশ। এবং আর্তনাদ। — 'একী! সিঁড়িতে এত জল কেন? কানাই! কানাই! ন্যাতা আর বালতি নিয়ে আয়! এত জল এলই বা কোত্থেকে—' বলতে বলতে ওপরে এসে দীপুর চক্ষুস্থির।

'সর্বনাশ। বই? রেকর্ড? সব ভিজে গেল নাকি? স্টিরিওটা? টিভি? সব তুলে রেখেছ তো?'

—'গেছে। সব গেছে। তুই যা ফুটপাতের দোকানে গিয়ে চা খা ততক্ষণ। ঘরে যে জল ঢুকেছে, খবরটাও তো দিবি? ছিলি তো এই ঘরেই।'

—'জা-জানলে তো দেব? আগে তো ঢুকছিল না। ঢুকল কখন? ইস! হেভি কেলো করে রেখেছ দেখছি?'

—'আমি? আমি কেলো করেছি?'

—'না, না, মানে কেলো হয়ে রয়েছে।'

—'কেলোর তুই আর দেখলি কি?'

এখন ঝর্না, পুতুল ঘর মুছছে, কানাই সিঁড়ি মুছছে, ঐ জলেই ফিনাইল গুলে নেওয়া হয়েছে, সবাই হাসি হাসি মুখে— তত বেশি ক্ষতি হয়নি যতটা হতে পারত। এটাই যদি রাত্রে হত? যখন সবাই ঘুমিয়ে? পর্দা, তোয়ালে, ফ্রক, ইজের যা কিছু হাতের কাছে পাওয়া গেছে সবই তখন ব্যবহার করা হয়েছে ঘরের জল শুষে নেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে। একমনে কানাই সিঁড়ি মুছছে যেটা দিয়ে, সেটা দীপুর পাজামা। দীপু দেখেও চিনতে পারল না।

—'ওকি! ওকি! সর্বনাশ করেছে—', বলে সে লাফিয়ে পড়ে তুলে নিল ভিজে চুপচুপে একটা চার্মসের প্যাকেট। 'ঈশশশ।' — বাসা থেকে খসে পড়া মৃত পক্ষিশাবকের মত ব্যর্থ প্যাকেটটিকে আদর করে আবার ফেলে দেয়।

বৃষ্টি ধরে গেছে। লাজুক লাজুক হলুদ রোদও উঠেছে। পুতুল বসে গেল ভিজে পুঁটলিগুলো নিয়ে। ঘরে ঘরে সর্বত্র মেলে দেওয়া হতে লাগল ছেঁড়া, ভিজে, বাতিল কাপড়-চোপড়ের রাশি। মা চেঁচাচ্ছেন, 'ওকি রে খাটের বাজুতে ভিজে কাপড় দিল কে? তুলে নে! তুলে নে। পালিশের আসবাবে জল ঠেকাতে নেই—' মা যদি জানতেন নিচের

খাটটা কেমনভাবে জলসিক্ত হয়েছে আজ। — মেঝেয় বিছানা দেওয়া হল ভিজে বইয়ের রাশি। 'পাখা খুলে দে!' পাখা ঘুরল না। লোডশেডিং। ঈদ প্লাস রথ। তবুও লোডশেডিং? ওঃহো! নিচে তো শওকৎ বসে আছে।

—'শওকৎকে চা মিষ্টি দে তো, পিকো।'

—'শওকৎমামাকে চা মিষ্টি দাও তো, ঝর্নাদি!'

অরণ্যদেবের ঢাকবাদকের মত নির্দেশটি রিলে হয়ে গেল। কিন্তু আমিও অরণ্যদেব নই,ঝ ঝর্নাও নয় অরণ্যের অধিবাসী। সে সাফ সাফ বলে দেয়—

'আমি কাউকে চা মিষ্টি দিতে পারবুনি বাপু। অগ্রে আমাকে কাপড় ছাড়তে হবেনি? সর্বো অঙ্গ ন্যাতাজোবড়া? ভিজে ঢোল? চা দাও বল্লেই হলো?'

—'থাক থাক দিদি! আমার আজ চা খেতে ইচ্ছে নেই— আমি বরং যাই পরে একদিন আসব—' শওকৎ উঠে দাঁড়ায়। এই বাড়িতে এই মুহূর্তে সভ্যভব্য শওকৎ বড্ড বেশি বেমানান।

—এতক্ষণে মনের মত ভূমিকা পেয়ে দীপু এগিয়ে আসে। 'চল, চল, শওকৎ, আমরা বরং ধীরেনের দোকানে গিয়ে ঈদ স্পেশাল চা খেয়ে আসি— এ বাড়ি থেকে এখন কাটিয়া পড়াই মঙ্গল— গুড লাক দিদি! ঈদ মুবারক!'

শওকৎও ভদ্রতা ভুলে হেসে ফেলে পা বাড়ায়।

বারান্দায় ভিজে কার্পেট ঝুলছে। চতুর্দিকে ভিজে কাপড়। ঘরবাড়ি ঝকঝক তকতক করছে। চুনবালি ঝুলকালি সব ধুয়েমুছে পরিষ্কার। আমরা সবাই পরিষ্কার শুকন কাপড় পরে চুলটুল বেঁধে আদা-চা খেতে খেতে গল্প করছি। বিদ্যুৎ এসে গেছে। পাখা ঘুরছে। বই শুকোচ্ছে। তবু বুকের সেই ধড়ফড়ানিটা কমছে না কিছুতেই। এখন বুকের মধ্যে হাতুড়ি, এমার্জেন্সি-কালোচিত উদ্বেগ। কিছুক্ষণ আগের ঘরের মধ্যে উচ্ছ্বসিত জলরাশিটার দৃশ্য ভুলতে পারছি না।

নিচে বেল বাজল। পাটভাঙা পায়জামা, ফর্সা গেঞ্জিতে, টেরি-কেটে চুল আঁচড়ে, শ্রীমান কানাই দরজা খুলে দিল। গুন গুন গুন গাইতে গাইতে।

—'উফ কি বৃষ্টি। কি বিষ্টি। কাজকম্ম আজ কিছু হল না!' বলতে বলতে ওপরে এসে পড়লেন দাদামণি। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দাদামণি বললেন — 'কি রে রথ সাজান কমপ্লিট?'

শুকনো মেঝেয় থেবড়ে বসে টুমপা তখন রথের গা থেকে ভিজে কাগজ খুলছে, আর নতুন কাগজ কাঁচি আঠা নিয়ে পিকো করতে বসে গেছে নতুন মালা-শেকল তৈরি করতে।

চারিদিকে তাকিয়ে দাদামণি উচ্ছ্বসিত—

—'বাঃ! এ যে ম্যাজিক রে! এই দেখে গেলুম ঝুলকালি চুনবালি, আর এর মধ্যেই যে দিব্যি ফেসলিফটিং হয়ে গেছে। পরিষ্কার ঝকঝকে মেঝে— সিঁড়ি থেকে ঘর পর্যন্ত যেন ধুয়ে মুছে রেখেছিস। এই তো চাই। কে বলে খুকু সংসারী হয়নি?' বলতে বলতে দাদামণি চেয়ারে মেলে রাখা দুটো ভিজে বাতিল ব্লাউজের ওপরে বসে পড়লেন।

১ মেহেবুব টেলার্স
(ক্যালকাটা নাইন)

রঞ্জন এসে বলল— 'বাব্বাঃ, যা বিশ্রী কেলেংকারি হতে চলেছিল আজ। উঃ! আরটু হলেই থানায় নিয়ে যেত।'

'কি রে, কি হয়েছে?'

'বসনমামার কাণ্ড! সেই যে গত সপ্তাহে যে কোটের কথা বলেছিলাম না, তারই জের মিটল আজ।'

গত সপ্তাহে রঞ্জন বলেছিল বটে একটা কোটের ঘটনা। তারপর থেকেই খুঁজছিল ক্যালকাটা নাইনটা কোথায়।

'পেলি না কি ক্যালকাটা নাইন?'

'পেলাম না? ওঃ, সে কি পাওয়া। মেহেবুব টেলার্সও পেয়েছি।'

আমি বরং রঞ্জনের গল্পটা গোড়া থেকেই বলি। ঠিক ও যেমন করে বলেছে, তেমনি।

'বসন্তমামার গায়ে সেদিন দেখি এক কালো কোট। গার্ডের ইউনিফর্মে রোজ যেমন কোট পরেন প্রায় তেমনিই, কেবল এটার বোতামঘরায়, পকেটে, আর হাতার মুখে জরির কাজ করা। অনেকটা রাজা-রাজড়ার মত, বা ব্যাণ্ডপার্টির লোকেদের মত। ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন।

'রঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু। কই সব? দেইখ্যা যা, কো-ট। সদা-পচা-মেন্তী। আয় এই দিকে, কো-ট।'

সদা-পচারা পাশের বাড়ির। ওরা ছিল না, রঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু দৌড়ে এল তিনজনে।

'কই কোট? কোট কই?'

বসনমামা ফ্যাশন মডেলের মত কোমরে দুই হাত রেখে ঘুরে নিলেন গোড়ালিতে ভর দিয়ে। ঘূর্ণি থামিয়েই ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন—

'দ্যাখছস? দারুণ না? পাক্কা ইংলিশ কোট। গোরা সাহেবের কোট বইল্যা কথা!'

তারপর কোটের তলার দিকটা দু আঙুলে তুলে বললেন।

—'কাপড়খানা দ্যাখ একবার। খাইস বিলাতী টুইড। এক্কেরে হীটার ফিট করা। কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে পরাইয়া দিলে কাঞ্চনজঙ্ঘা গইল্যা যায়। ছুইয়া দ্যাখ একবার। হাত লাগাইলেই লণ্ডন বেড়াইবার সুখ হয়।'

আমরা সবাই অমনি একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে একটু কোটটা ছুলাম। কম্বলের মত কুটকুটে। এই নাকি লণ্ডন?

তারপর ব্যায়ামবীরের মত দুই হাত নিজের দুই কাঁধে রেখে মাসল দেখানর ভঙ্গিতে বললেন।

'পুট দ্যাখ পুট। এক্কেরে পারফেক্ট!'

ঠিক যেন বলছেন— 'দ্যাখ কি বাইসেপস, দ্যাখ কি গুলি দ্যাখ হাতে আমার।'

'আর সস্ত?' বলে ডান হাতটা সামনে দিকে ঘুঁষি মারার ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিলেন স্যাৎ করে। —'দ্যাখ সেস্ত দ্যাখ।'

আমরা সবাই অমনি একটু পিছিয়ে গেলাম একসঙ্গে। মঞ্জুটা বলে ফেলল— 'ওখানে আবার সেস্ত কোথায়? সেস্ত তো ঘাড়ে না কাঁধে কোথায় যেন হয়!'

'ওই একই হৈল।' বসনমামা একটু লজ্জা পান বোধহয়।

'যাঁহা বায়ান্ন তাই হৈল গিয়া তেপ্পান্ন, যাকে কয় হাতা হোই তারেই কর সেস্ত! তুই আমারে টেইলারিং টার্মস শিখাস? দুই দিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন। ওঃ—'

বসনমামা রেগে যাচ্ছেন দেখে মঞ্জু বলে, 'সরি, আর বলব না।'

খুশি হয়ে বসনমামা আবার শুরু করেন 'কি কইতাসিলাম? ওঃ হ্যাঁ, সিলাই। সিলাই দ্যাখছস? সুইসুতার কামডা কী ফার্স্টক্লাস? আর পকেট দ্যাখছস? পকেট আর বুতামঘর? এক্কেরে জরিদার কাশ্মীরী শাল। ফাইন এমব্রয়ডারি, বোঝলা? এইয়া সহজ কাম না। পয়সা লাগে। আর দ্যাখায় কি? হাইক্লাশ! য্যান নিজামের সিপাই!'

কিছুক্ষণ ড্রামাটিক এফেক্টের জন্য চুপ করে থেকে বসনমামা বলেন—

'এইবার ঝুলটা দ্যাখ। পারফেক্ট ঝুল। জাস্ট আপটু থাই।' হাত দিয়ে টেনে টুনে কোটটা খানিকটা নামান বসন্তমামা। বলেন—

'ওঃ কি ফিটিং! য্যান বাঘের গলায় বাঘের চাম। অল পারফেক্ট।'

আমাদের কিন্তু কেমন কেমন লাগে। মনে হয় একটু ছোটই হয়েছে। হাতদুটোও কেমন খাটো খাটো। খুশিতে ভাসতে ভাসতে বসনমামা কিন্তু এবার বোতামে চলে যান।

'বুতাম দেখছস? বুতাম? ভাল কইর‍্যা দেইখ্যা ল।' জার্মানির বুতাম। চামড়ার। হিটলার যে ইহুদির চামড়া দিয়া বুতাম বানাইত? সেই স্টাইল। অবশাই ইহুদির চামড়ার না। বিন্ধ্যপর্বতের নীল গাইয়ের স্কিন।'

মঞ্জু বলল— 'চামড়ারই নয় বসনমামা, প্লাস্টিক!'

'চামড়াই না বসনমামা প্লাস্টিক!' বসনমামা মঞ্জুকে ভেংচে ওঠেন। 'তর কানটাও তাইলে প্লাস্টিক? দেখুম নাকি টাইন্যা?'

মঞ্জু দুইহাতে কান ঢেকে দূরে পালায়। তৃপ্তি বোধ করে বসনমামা বলেন—

'মাইয়াডার এট্টা ধ্যাও চ্যাও নাই। চামড়ারে কয় পেলাস্টিক।...

...এইবার ল্যাপেল দ্যাখ! কতটা চওড়া। এমুন চওড়া ল্যাপেল আইজকাইল কেউ দ্যাখতেই পায় না। হে-ই ফর্টিথ্রিতে যখন প্রিন্স অব ওয়েলস ইনডিয়া ভিজিটে আইসিল তখনই ফেশন হইসিল চওড়া ল্যাপেল কোট। অহন এতটা কাপড়ই বা খরচা করে কোন শালা? এই কাটই বা জানে কোন টেইলর? ...কলারটা দ্যাখ এইবার!'

একহাতে কলারটা উঁচু করে ধরে অন্যহাত পকেটে ঢুকিয়ে ঘরের এধার থেকে ওধার স্মার্টলি একবার মার্চ করে এলেন গুজস্টেপে।

'রয়্যাল কাট-এই কাটেরে কয় রয়্যাল কাট।'

সন্টু হঠাৎ বলে ফেলল— 'ফর্টিথ্রিতে তো দ্বিতীয় এলিজাবেথ রানী হলেন?' এবং মঞ্জু বলল— 'ফর্টিথ্রিতে যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন ইনডিয়াতে তো কোনও রাজা আসেইনি!'

'শাটাপ! ফুটানি মাইরলে এক থাবড়া দিয়া পিঠ ফ্যাইড়্যা ফ্যালাইমু। যা বাইরাইয়া যা সব। অপোগণ্ডের দল। মেজদি। ক্যাবল আপনেই শোনেন কোটের কাহিনী।

স্টার্চ দ্যাওয়া হোয়াইট পেন্টুলুনের উপর এই কোটখান চড়াইয়া, হ্যাট মাথায় দিয়া হাতে ফ্ল্যাগটা লইয়া যখন গোমো স্টেশনের এই মাথা থিক্যা ওই মাথা পর্যন্ত পায়চারি করুম না মেজদি, পেসেনজাররা কইবো ইওরোপীয়ান গার্ড যাইতাসে বুঝি! সেইসব টাইম তো অরা দ্যাখেই নাই। অরা আর এই কোটের মর্ম বুঝবে কি কইর‍্যা!'

বসনমামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পিছন ফিরে বসার জন্যে চেয়ার টেয়ার কিছু খুঁজলেন।

মা বলে ফেললেন--

'ও বসন্ত, তোমার কোটের পিছনে যে ফুটো?'

'ওঃ, ঐটা? গুলির ফুটা! গুলির! এইটা ফ্রিডম ফাইটের কালের কোট তো? ওঃ— মেজদি, কি দিনই গেসে গিয়া। পনপন কইর‍্যা ছুটত্যাসি পথে, পিছে পুলিস লইয়্যা— শনশন কইর‍্যা ছুটতাসে গুলির ঝাঁক— বনবন কইর‍্যা ঘুইর‍্যা পড়ত্যাসে মানুষগুলান সটাসট উনডেড হইয়্যা— আর তাগো বুকের রক্তে কাল' পিচের পথ রাঙ্গা হইয়া যাইত্যাসে—'

হঠাৎ মঞ্জু বলল 'লোকেদের পিঠে গুলি লাগলে 'বুকের রক্ত' কেন বলে বসনমামা?'

এই রে! আবার প্রশ্ন! মঞ্জুটাকে বাঁচাতে সন্টু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে— 'তুই থাম দিকি মঞ্জু। জানিসনা শুনিসনা সবতাতে কথা! আচ্ছা বসনমামা, তোমার পিঠে যে-গুলিটা লেগেছিল সেইটের—'

'আমার পিঠে গুলি লাগবো ক্যান? ষাইট! গুলি লাগুক গিয়া আমার শত্রুগো পৃষ্ঠে।' কিন্তু মঞ্জুকে রক্ষে করবে কোন দাদা আবার মঞ্জু বলল, 'কিন্তু তোমার কোটের ফুটোটা তো পিঠের দিকে?' ওর কথাটায় থাবা মেরে বলে উঠল সন্টু 'তোমার কি তবে বুকেই গুলি লেগেছিল বসনমামা?'

অদম্য মঞ্জুকে থামায় কে? মঞ্জু চটপট বলে দেয় উল্টো কথাটা 'তবে যে তুমি বললে

পেছনে পুলিস নিয়ে তুমি ছুটছিলে? পেছন থেকে বুকে কেমন করে গুলি লাগবে?' ভীষণ রেগে গিয়ে বসনমামা জিবে-টাগরায় চুক চুক করে শব্দ করে বলে উঠলেন— 'আঃ হা! আমার বক্ষে গুলি লাগাইয়া তোমাগো কামডা কি শুনি? আমার দেহে গুলিই বা লাগবো ক্যান? আমি কোথায় কইতাসি চিরস্মরণীয় শহীদ ফ্রিডম ফাইটারগো কাহিনী, আর তোমরা কও ক্যাবলই আমার কথা। আমি শহীদ?'

সন্টু চুপ করে যায়। কিন্তু মঞ্জু চুপ করে না। 'কিন্তু কোটের ওই ফুটোটা'—

'আঃ। কোটে ফুটা তো আমার কি? তার কথা আমারে জিগাও ক্যান? কোটের ফুটা কোটের ফুটা!' বসনমামা বিরক্তমুখে জানলা নিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকেন। এই উত্তরে কারও মুখে আর কোনও কথা জোগায় না। চমৎকার হয়ে চুপ করে যাই প্রত্যেকে। এমনকি মঞ্জুও। সকলেই মনে মনে একটা যুৎসই প্রশ্ন ভাবছি, এই বিচিত্র উত্তরের মানেটা কি আর জেনে নেওয়া যায়? এমন সময়ে কখন হারাণজ্যাঠা ঘরে ঢুকছেন।

জেঠিমা মারা গেছেন সেই ক-বে। তাঁর এই অতি আদুরে ছোট ভাইটি জ্যাঠারও অতি আদরের। সেই সূত্রেই আমাদের মামা বসনমামাকে দেখেই খুব খুশি হয়ে হারাণজ্যাঠা জিগেস করে বসলেন— 'বাঃ! বেড়ে জরিদার কোট ত? — কোথায় বানিয়েছ বসন্ত এমন কোটখানা?'

'এই তো জামাইবাবু ল্যাখাই আছে' — চট করে হেসে দিয়ে, পিছু ফিরে চেয়ারের মত হয়ে আধো-বসে পড়েন বসনমামা।

কলারটা উল্টে ফেলে তলা থেকে একটা লেবেল দেখান। সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ আউড়ে যায়— 'দ্যাখেন, লেবেল দ্যাখেন, মেহবুব টেইলার্স, ক্যালকাটা নাইন।

'ক্যালকাটা নাইনটা আবার কোনদিকে?'

'তা জানে কেডা? আমি তো রেলের গার্ডমানুষ। অ্যাড্রেস আপনে বরং পোস্ট অফ্সিসের পিওনরে জিগান গিয়া। আমি জানি স্টেশনের খবর। বাস।'

'সেকি? তোমার দর্জি, তুমি জান না কোন পাড়া?'

'আমাগো দরজি কেডায় কইল? আমাগো দরজি তো যতীন বাবু, বাহার টেইলার্স, ক্যালকাটা টুয়েন্টিনাইন।'

'তাহলে এই কোট?'—

অধৈর্য হয়ে বসনমামা বলেন— 'আহাঃ এতো কোট কোট করেন ক্যান? কোটের আমি জানি কি?'

—'মানে?'

—'মানে, কোট কি আমার?'

—'তবে কার কোট?'

—'হেইডাই বা আমি জানুম কি কইর‍্যা?' এবার হারাণজ্যাঠা স্পষ্টত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। —'তার মানে?' মা, সন্টু, মঞ্জু, সক্কলে মিলে কোরাসে হারাণজ্যাঠার সঙ্গে গলা মেলাই।

—'তার মানে?'

—'তার মানে?'

—'তার মানে?'

—'আঃ হা! আমি তো এইডা আইজই কুড়াইয়া পাইলাম। কে জানি ফেলাইয়া গেছিল! গার্ডের কামরায়। তা ফাটা ফুটা পুরানা কোট, ওইয়া আর ফিরাইয়া নিবে কেডা? তাই ভাবলাম আমিই কোটটা পড়ি। গরম আছে বেশ। দ্যাখেন, হাত দিয়া দ্যাখেন জামাইবাবু?'

বলে বসনমামা একটু লাজুক হাসেন।

'কই মেজদি, চা হইল?'

এত পর্যন্ত ঘটেছিল গত সপ্তাহে। রঞ্জন বলল 'তারপরে আজকে কি হল জান নবনীতাদি? বললে বিশ্বাস করবে না। এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিলাম আমরা, হঠাৎ চমকে দেখি গলির মুখে একটা ছোট্ট দোকান তাতে সত্যি সত্যি সাইনবোর্ডে লেখা— 'মেহবুব টেলার্স, ক্যালকাটা নাইন।' তিনজন দর্জি একটা গ্যারাজে বসে বসে পা-মেশিনে মশারি সেলাই করছে। নীল নীল নাইলন নেটের স্বপ্নের মত সব মশারিতে ঘরের মেঝে ভর্তি। আমি দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলেছি— 'আপনারা কি কোটও বানান?'

চিকনের সাদা টুপি মাথায়, মেহেদী লাগান দাড়ি নেড়ে বুড়ো দর্জি গোল গোল বাইফোকাল লেন্সের নিকেলের চশমা দিয়ে তাকালেন। তারপর বললেন— 'না তা। ক্যানো বলুন দিকি?'

—'মানে কোটের গায়ে আপনাদের লেবেল দেখেছি—'

বুড়ো দর্জি হাফপ্যান্টের ন্যাড়া মাথা সদ্য পৈতে-হওয়া সন্টুকে একবার ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর ফোকলা মুখে অপূর্ব এক হাসি হেসে বললেন—

—'কোট তৈরি করি না বটে, তবে লেবেল লাগিয়ে দি।'

—'তার মানে?'

—'মানে চোরা বাজার থেকে কোট নিয়ে এলে, আমরা তার লেবেলটা পালটে দি আরকি। আগে ছিল একটাকা পার লেবেল, এখন হয়েছে পাঁচ টাকা।' তার পরে বুড়ো দর্জি নাকি নতুন দাড়ি গোঁফ ওঠা রঞ্জনের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে, ওর হাতে ঝোলানো কলেজের ব্লেজারটার দিকে তাকিয়ে, হাত বাড়িয়ে একটা চোখ টিপে নিচুগলায় বলেছিল— 'কেন খোকা? আছে নাকি কোট? বেশতো, নিয়ে এস, তিনটাকায় করে দিচ্ছি। এ লাইনে পেরথম কাজ বলেই মনে হচ্ছে?'

—'বাপরে বাপ। চোরই ভেবে নিয়েছিল ওরা আমাদের, নবনীতাদি। আরটু হলেই হয়ত পুলিসে ধরত। বসনমামার যেমন কাণ্ড। কোত্থেকে প'রে এসেছেন এক চোরের ফেলে দেওয়া কোট।' রঞ্জন হাঁপাতে থাকে, আমি হাঁ করে থাকি। ধন্যি বসন্তমামা! ধন্য তাঁর কোট।
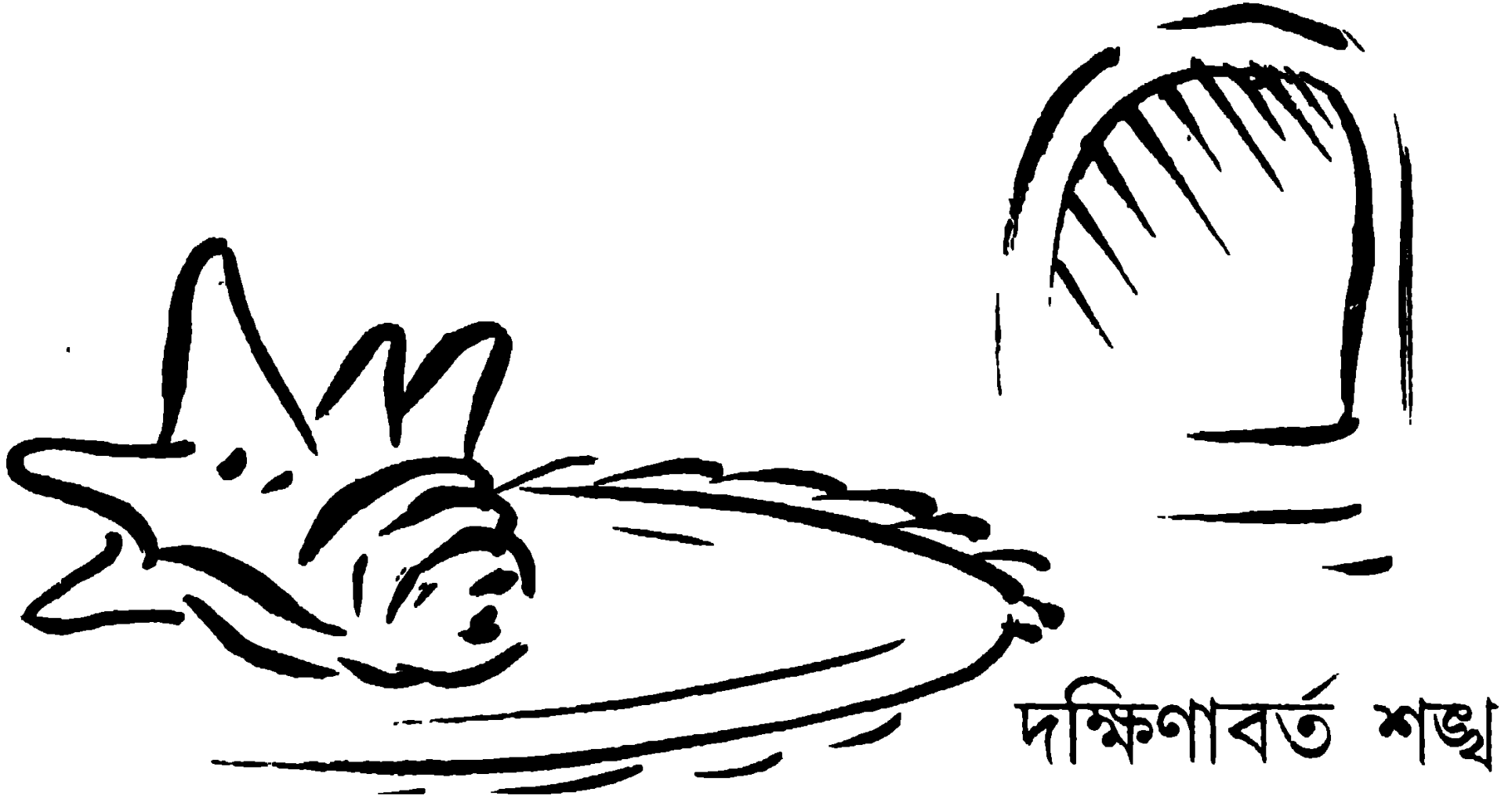
দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ

এবার পুজোর ছুটিতে আমাদের রঞ্জন অনেকদিন পরে এসেছিল। বেশ গোঁফদাড়ি গজিয়েছে দেখলুম। আরো কিছু খবর দিয়ে গেল বসন্তমামার। রঞ্জন বলল:

'সেদিন বিজয়া দশমী।

বসন্তমামা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন, ঢুকেই, এক হাঁক পাড়লেন—

'সন্টু-মন্টু-রঞ্জু। এই রাইখ্যা গ্যালাম মহাশঙ্খ। আমি যাইত্যাসি স্নানে। হাত দিবা না কেও। এই কইয়া দিলাম। শঙ্খে হাত দিলেই হাত কাইট্যা ফ্যালাইমু। হ। এই যেই-সেই শঙ্খ না। দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। ডাইনদিকে প্যাঁচ বোঝলা? অরডিনারি শঙ্খ গুলান কেমুন হয় খ্যাল আছে? লেফট সাইডেড, স-ব লেফট সাইডেড।'

তাকিয়ে দেখি বসনমামার হাতে এক বিরাট শঙ্খ। সত্যিই বেশ অসামান্য অসামান্য দেখতে। হাত উঁচু করে গোড়ালি তুলে শাঁখটা বসনমামা যত্ন করে জানলার মাথায় কুলুঙ্গীর তাকে উঠিয়ে রাখলেন। তারপর মাকে ডাকলেন চেঁচামেচি করে।

—'মেজদি। যত্ন কইর‍্যা তুইল্যা রাখেন, আপনের লেইগ্যাই আনসি। গেসিলাম গোপালপুর-অন-সী। আঃ সে কি ফাশ ক্লাস সী রিসর্ট। য্যান সাউথ অফ ফ্রানসে যাইয়া পড়সি পথ ভুইল্যা। সী সাইডে, মানে সমুদ্রের কূলে কূলে রঙ্গিন ছাতায় ছাতায় ছত্রাকার। প্লেন থিক্যা দেখায় য্যান শত শত মল্টি কলর ঝিনুক পইর‍্যা আছে। আর ছাতির নিচে? ছাতির নিচে ক্যাবল ম্যাম আর সাহেব। সাহেব আর ম্যাম। মেমগো আবার লাজলজ্জা নাই-বড়ই বেশরম। সাহেবগুলা তাও মন্দের ভাল। তাই বইল্যা আমিই বা কি কম? কি কন মেজদি? আমিই কি কম যাই? আমিও বইস্যা পড়লাম ছাতির তলায় গাও এলাইয়া— দিলাম দুই পাও টেবুলে তুইল্যা। আ-হ। নাকের ডগায় সবুজ গগলস ঝুলতাসে, মনে মনে একটা-অস্ট্রেলিয়ান টিউন হামিং করতাসি-এই টিউনটা সমুদ্রে স্কাইলাব ভাইঙ্গা পড়ার সময় দারুণ পপুলার হইসিলগা অস্ট্রেলিয়ান নেভিতে— আর কোলের উপর এট্টা রংচঙ্গা ইংরাজী নবেলের পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া যাইত্যাসি, কতকটা আউট অব মাইণ্ড— মানে কতকটা অন্যমনস্ক হইয়া আর কি— এমন সময়ে আইল এক ষণ্ডাগণ্ডা অস্ট্রেলিয়ান সাহেব। পরনে এইটুকু একখান

কালা মতন গেঞ্জীর জাঙ্গিয়া— মোরারজির গঙ্গাসাগর স্নানের জাঙ্গিয়াডার থিক্যাও ছোটই হবে তো বড় না— আর এই বড় একখান দেহ— শ্বেত হস্তীর লেইগ্যা সাদা মাংসের পাহাড়—'

এই সময়ে মা বললেন— 'স্নানে যাবে না, বসন্ত?'

বসনমামা বললেন— 'এই যাই মেজদি-'

কিন্তু আমরা তখন অদম্য হয়ে উঠেছি।

—'এখন না বসনমামা এখন না, আগে বলে যাও কি হল— তারপর সেই সাহেব—?' — বসনমামা এবার চৌকিতে পা তুলে বসলেন। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাতটা উল্টে আর ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন—

—'অইব আবার কি? কিসুই না। সাহেব আইয়া আমারে কইল— 'গুড মরনিং ছার।' আমিও মুখ থিক্যা পাইপটা নামাইয়া নড কইরা সিরিয়াসলি কইলাম— 'গুড মরনিং সার।' কিন্তু পাও নামাইলাম না। দেইখ্যা সাহেব কইল— 'আমি কি বসতে পারি? মে আই সিট ডাউন?' সাহেব তো আমার ইংলিশ শুইন্যা এককেরে হকচকাইয়া গেসে। কইল 'তুমি কি গানটা গাইসিলা? চিনা চিনা কইর‍্যা শুনা যায়?' আমি মৃদু হাইস্যা কইলাম 'সাহেব আপন দ্যাশের জাতীয় সঙ্গীত চিন না? এইটা তোমাগো সমুদ্রে স্কাইলাব পতনের সময়কার গান—' সাহেব তখন এত খুশি, নীল নীল চক্ষু দিয়া নীল নীল পানি গড়াইয়া পড়ে— কয় 'বাঃ ঠিক! এইয়া আমাগো দ্যাশেরই গান বটে। আমাগো দ্যাশের ভাটিয়ালী সঙ্গীত।' সাহেব কয়— 'আমি তো নাবিক, আমাগো রক্তে এই গান খেলা কইর‍্যা বেড়ায়। কিন্তু তুমি ইন্ডিয়ান হইয়া এই গান শিখলা কি কইর‍্যা?' আমি বলি— 'সাহেব, আমি নাবিক নই, কিন্তু বাঙ্গালদ্যাশের পোলা, আমরা হইলাম পানির পোকা— পানির বেপারে আমাগো লগে তুমি পারবা না—' যেইনা কইসি, সাহেবের খটাং কইর‍্যা বাজী ধইর‍্যা বসল— 'বেট? চল, ডুব সাঁতার দেই, দেখি কে কি তুইল্যা আনতে পারে সাগরের তল থিক্যা।' আমিই কি ছাড়ি? কইলাম— 'হোয়াই নট? ক্যান কাটুম না ডুবসাঁতার?' সাহেব কইল —'ও বে পার্টনার। কামান, সুইম! সুইম!' আমিও তৎক্ষণাৎ 'গড ইজ গুড, জয় মা কালী!' কইয়া পরনের তৌলিয়াখানাই দিলাম ছুঁইড়া সমুদ্রের তরঙ্গে, তারপর — 'চল সাহেব, ধরি গিয়া'— বইল্যা ঝাঁপ দিয়া পড়লাম জলে। মারলাম এক ডুব।

'ওঃ! সে কি গহীন গাঙ। ডুবত্যাসি, ডুবত্যাসি, ডুবত্যাসি— তলকূল আর মিলে না। শ্যাষে এক্কেরে অতলে যাইয়া দেখি, গুচ্ছ গুচ্ছ প্রবাল, আর মাদার অফ পার্লের শুক্তিগুলার লগে খেলা করতাসে আমার সাধের তৌলিয়া। সে কি বিউটি তোমরা বোঝবা না। হেলিয়া দুলিয়া যেন লুকোচুরি খেলতাসে। মস গ্রীন জলজ উদ্ভিদের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারতাসে আমার হলুদ তৌলিয়া! আর তৌলিয়ার লগে খেলা করে কে? কেডা খেলে? কইত্যা পার? এই সন্টু, তুই না ক্লাসে ফার্শট বয়, তুইই ক— কেডা খেলে?'

সন্টু ঘাবড়ে গেল। ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল। ভয়ে ভয়ে। ছোট হলেও মঞ্জুটা চিরকেলে সাহসী। সে বলল— 'কে খেলছিল বসনমামা? মৎস্যকন্যা?'

—'আরে ধুর। বসনমামা এক হাত নাড়াতেই মঞ্জু খতম। 'মৎস্যকইন্যা হইলে কি আর আমারে দেইখ্যাও ওয়েট করত? করত না। নিঘঘাত পলাইত। আরেঃ, মৎস্যকইন্যারা যে বড় লাজুক হয়। বোঝলা না? অগো লাজুক না হইয়াও উপায় নাই।'

এই সময়ে আবার মা ব্যস্ত হয়ে বললেন— 'বসন্ত, তুমি স্নান করতে যাবে না?' বসনমামা বললেন— 'আরে— যামু যামু, স্নানের ডিসকাশনই তো করতাসি। অবগাহন স্নান। এইয়া আপনের কল খুইল্যা টুপুর টাপুর গোছল না। হুঁ। তারপর সমুদ্র তলে যাইয়া দেখি, আমাগো তৌলিয়ার সগে খেলা করতাসে— এই, এই বিরাট শঙ্খগগ্যা। অঃ হো। সে কি ব্রাইটনেস মেজদি। রাশি রাশি মণি-মুক্তার জ্যোতিরে মলিন কইর‍্যা দিতাসে এইয়ার অমলিন শুভ্রতা। সপ্তসিন্ধুর রত্নবাজি যেন শরমে মুখ লুকাইতাসে বালুর শয্যায়। আর জলমধ্যে শতদল পদ্মফুলের মত সগৌরবে শোবা পাইতাসে— এই শঙ্খ। বাসস। লইয়া আইলাম তীরে। ভুস কইর‍্যা ভাইস্যা উইঠ্যাই দেখি সাহেব। লাল নীল ছাতির নিজে বইস্যা বইস্যা বড় বড় শ্বাস ছাড়তাসে। আমারে দেইখ্যা কইল— 'ওফ! তুমিই দ্যাখাইলা বটে। বিনা অক্সিজেনে জলের তলে পাক্কা বিশ মিনিট?' আমি কইলাম— 'এই দ্যাখ সাহেব-পদ্মাপারের প্র্যাকটিস। কই তুমি কি তুইল্যা আনসো দ্যাখাও দেহি? তৌলিয়া তো ধরতে পার নাই জানিই।'

সাহেব কয়— 'মাই গড! হোয়াট সী। হোয়াট ওয়েভ!' এই উত্তাল তরঙ্গিত বঙ্গোপসমুদ্রে তো উহারা নামে নাই। ব্যাটার পাঁচ মিনিটেই দম ফিনিস। সমুদ্রবক্ষ থিক্যা কিসুই তুলিতে পারে নাই। আমার হাতে শঙ্খ দেইখ্যা তো সাহেবের চক্ষু স্থির। কয়— 'এইয়া আবার কি-হোয়াট ইজ দিস?' ওইয়ারে বুঝাইবার লেইগ্যা তো শঙ্খে লাগাইলাম এক ফুঁ। উ-রি-ব্বাস। এই যে মেজদি শোনেন। এই কইয়্যা দিলাম হৌল ফ্যামিলিরেই জয়েন্ট ওয়ার্নিং দিয়া-দিলাম—এই শঙ্খে ফুঁ দিবেন না। নেভার। উফফ। শা-বাশ...সে কি ভোঁ। বাপ রে বাপ। সেই থিক্যাই আমি এই ডাইন কানটাতে স্লাইটলি কমতি শোনতাসি। রঞ্জু, মঞ্জু, সন্টু শুইন্যা দ্যাখ, সদা-পচা-মেন্তিরেও কইয়া দিবা— শঙ্খে কেন য়্যান কদাচ ফুঁ দিতে যাইও না। সর্বনাশ হইব। ভেরি ভেরি ডেনজারাস।

'যাইতাসিল এক মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ দূর দিয়া। পেন্সিংয়ের লাখান দেখা যায়। যেই না দিসি শঙ্খে ফুঁ, অমনি গেসে থামিয়া। হ, ঐ যুদ্ধ জাহাজ। গেসে থামিয়া। সে কি বিরাট শব্দ। সমুদ্রের জলে ব্রেইক টানসে ত? নিঃশব্দে নিচের পথেই দোতলা বাস ব্রেইক টাইনলে কত না শব্দ করে, আর সদা কলকল সমুদ্রে সাত তলা জাহাজ ব্রেইক দিসে— তার যা শব্দ— ওঃ! জাহাজ তো গেল মধ্য সমুদ্রে হইয়া, আমার শঙ্খনিনাদে ভয় পাইয়া। তখন আমারেই সিচুয়েশন সেইভ করতে হইল। চিৎকার কইর‍্যা কইয়া দিলাম— 'অল্ ক্লিয়ার! ভয় নাই। ফ্রেইণ্ডস হিয়ার!' হুড়াহুড়ি কইর‍্যা পকেট থিক্যা বাইর কইর‍্যা, দিলাম এই সাদা রুমালডা নাইড়্যা।' বসনমামা পকেট থেকে নস্যি-ঝাড়া নোংরা রুমালটা বের করলেন। মঞ্জু বলে উঠল: — 'বারে? তখন তোমার পকেট কোথায় বসনমামা? তুমি তো তখন তোয়ালে পরে—'

বসনমামা রেগে গিয়ে বললেন— 'মঞ্জুডার হইসে বড়ই চিপটিপানি স্বভাব—

বড়দের সব কথায় কথা কওন চাইই। তোরে আর কিসসু কমু না। যাঃ। তার পর, সাহেব তো আমার শঙ্খের রূপেগুণে এক্কেরে পাগল। ক্যাবলই কয়—

—'ওঃ! গ্র্যান্ড! গ্র্যান্ড! দি গ্রেইট ইন্ডিয়ান সী— সাইরেইন। হাউ মাচ?'

'আমি তো স্ট্রেইট কইয়া দিলাম— দিমু না সাহেব, এইয়া হৈল গিয়া দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, এ আমাগো বড় লক্ষ্মীমন্ত দ্রব্য— এ আমি তোমারে বেচুম না।' সাহেব খালি কয়— 'প্লীজ হাউ মাচ? ওয়ান থাউজ্যান্ট? টু থাউজ্যান্ট? ও কে, —থ্রি?'

আমার মুখে এক বাইক্য। মাথা নাড়তাসি আর ওনলি কইতাসি: 'নো সার। নট ফর সেইল। এইয়া আমাগো মেজদির লেইগ্যা লইয়া যামু— বড় পয়মন্ত শঙ্খ—'

একটু থেকে রঞ্জন বলল, 'আমরা তো ততক্ষণে আশ্চর্য হয়ে জানলার মাথায় কুলুঙ্গির খোপে সুরক্ষিত নট ফর সেল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি, বসনমামাও আমাদের তাকানটা তাকিয়ে দেখছেন স্নেহ মুগ্ধ হয়ে, এমন সময়ে ভীষণ গোলমাল করতে করতে একপাল ছেলে ঢুকল ঘরে।

'জানিস রঞ্জন, কি কাণ্ডই হয়েছে প্যানডেলে?'

'ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া যাচ্ছে না। পুরুতমশাই রেখে কাঁই— বড়দাদের যাচ্ছেতাই করছেন—'

'বিরাট কেলেঙ্কারি '

'তুলকালাম কাণ্ড! প্রতিমার অঙ্গহানি হয়েছে।'

'প্রতিমার হাত থেকে না—'

'কে যেন শাঁখটা—'

'চুরি করে নিয়েছে—'

'সেটা না পেলে বিসর্জনই আটকে থাকছে—'

মা অবাক হয়ে বললেন, 'কিন্তু ও গুলো মাটির শাঁখ হয়, ও শাঁখ চুরি করবেই বা কে, আর কেনই বা করবে?'

এমন সময়ে বসনমামার গলায় যেন কড়কড়াৎ করে বাজ ডাকলো:

—'আঃ— অই তো রইসে। লইয়া যা না তগো ছাদার মাথা শঙ্খ—' নিতান্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে মাথার পিছন দিকে বুড়ো আঙ্গুল উঁচিয়ে কুলুঙ্গীর দিকে দেখিয়ে দেন বসনমামা। বিরক্ত কণ্ঠে বলেন— 'যতত সব লেইট লতিফ— আমি মনে করি বিসর্জনটা হইয়াই গেছে বুঝি! এখন ক্যাবল লরির অপেক্ষা। পেনডেলে একটি জনপ্রাণীও নাই? ছিঃ!' তারপরে মাকে বললেন— 'কই মেজদি, গামছাটা দিয়েন, স্নানডা সাইরা আসি। ওঃ, ভারি তো একখান মাটির শঙ্খ, হেইয়া না পাইলে নাকি প্রতিমা বিসর্জনই হইতো না। যা— তা একখানা ব্লাফ ঝাইড়লেই হইল? আমি বুঝি না ওইয়াগো প্যাঁচ?'

আমি বললাম— 'রঞ্জন, এটা নিশ্চয় বসনমামার সত্যি ঘটনা নয়। এটা তুমি বানিয়েছ। এ কখন সত্যি হতে পারেই না।'

রঞ্জন বলল— 'বাঃ? আমি বানাতে পারি বলে বিশ্বাস হয়, আর বসনমামা বুঝি বানাতে পারেন না?' বলে রঞ্জন গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসল।

ডিভাইন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বা যোগবিভূতি

'বসন্তমামা এবারে সত্যি সত্যি দারুন একটা কোয়ার্টার পেয়েছেন দেখলাম, শালবনের মাঝখানে।' রঞ্জন জানালো।

'ব্যাঙ্গালোর থেকে গোমো গিয়েছিলি? ওটা কলকাতার পথে পড়ে?'

'অফিসের কাজেই গোমোর দিকে গিয়েছিলাম, ভাবলাম মামা-মামী-তুতুমিতুকে দেখে যাই। বাব্বাঃ যা জবর ঠাণ্ডাটা পড়েছে ওখানে! বাড়িটা কিন্তু দারুণ! ঘুরে এস একবার।'

'কেমন আছেন ওঁরা?'

'একটা নভেলটি দেখলাম এবারে। মামামামীতে প্রলয়ঙ্কর ঝগড়া হচ্ছে। বসনমামার গুলতাপ্পি বসনমামী আর সহ্য করছেন না। নারীমুক্তির বাতাস লেগে মামী এখন হককথা শোনাতে আরম্ভ করেছেন। যতই হককথা বলেন, ততই দেখি নাহক যুদ্ধ বাঁধে। একবারে লংকাকাণ্ড চলেছে বাড়িতে।'

'সে কি রে? মামী তো— মানে, মামী কি করেই বা'—

'কিরকম শুনবে? বলছি। এই ধর, আমি যাবামাত্র বসনমামা জানালেন আগের বাড়ির চেয়ে ঠাণ্ডাটা এবাড়িতে বেশি হবার কারণ এ বাড়িটা শালবনের মধ্যে। বনেজঙ্গলেই শীত বেশি পড়ে। আগের বাড়িটা ছিল ফাঁকা মাঠের মধ্যে। তাই ঠাণ্ডা কম পড়ত। একথা শুনেই বসনমামী বললেন— 'বাজে কথা রাখ। ফাঁকা মাঠে কনকনে বাতাস বয়ে যায় কোথাও বাধা পায় না, ঠাণ্ডা সেখানেই ঢের বেশি।' আর যাবে কোথায়? বসনমামা একেবারে খেপচুরিয়াস! শুরু করলেন— 'আছিলা তো কইলকাতা শহরে, শীত-গ্রীষ্মের তুমি জানটা কি? গাছ বাইয়া বাইয়া শীত লামে তো জান? আমি জানি। আমি নিজ চক্ষু দিয়াই দ্যাখসি, যখন সেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে সার্বিস করতাম, গাছ বাইয়া বাইয়া, গাছ বাইয়া বাইয়া গুড়ি গুড়ি শীত নামতে আছে, আউটারস্পেইস হইতে এই অর্থে! গাছই টাইন্যা শীত লামায়।' সঙ্গে সঙ্গেই মামী বললেন, 'তবে মরুভূমিতে রাত্তিরে অত শীত নামে কি করে? সেখানে কটা গাছ।' বসনমামা

বললেন— 'তয় না মাইয়ামানুষের বুদ্ধি! ডেজার্ট ক্লাইমেইট! ডেজার্ট ক্লাইমেইট, ডেজার্ট হইল গিয়া অন্য কথা। গাছ নাই বইল্যা শীতও হেইখানে লামে না, শীত ওঠে। বালুকণার থিক্যা বাষ্পাকারে শীত উইঠ্যা আসে, ইন্নার স্পেইস হইতে। ফরেস্টে শীতের ডাউনওয়ার্ড মুবমেইন্ট আর ডেজার্টে আপওয়ার্ড। বোঝলা? এট্টা লাকে আউটার স্পেইস থিক্যা, অন্যটা উঠে ইননার স্পেইস থিক্যা, তুমি আর কি বোঝবা সাইন্স? বগলছাতা?' মামী তাতে না দমে বললেন— 'কিন্তু সুমেরু কুমেরুতে? গাছও নেই, বালুকণাও নেই, তবে ঐ দোর্দণ্ড শীতটা আসে কোথা থেকে? ওখানে শীত নামে, না ওঠে? তোমার পাঁজিতে কি বলে?' বিরক্ত বসনমামা এবার বলেন, 'তুমি কি গাড়ল? এইটাও জাননা যে মেরু অঞ্চলে শীত উঠেও না, লামেও না, থাকে? ওই দ্যাশে শীত আসেও না যায়ও না। থাকে। হেইডাই হইল শীতের পারমানেন্ট রেসিডেন্স। হেইখানেই শীত গজায়। অ্যাবং দিকে দিকে সার্কিউলেট করে। — একদিন তুতুমিতুর ম্যাপটা লইয়া বইস্যা সব ফ্যাক্টস অ্যাণ্ড ফিগার্স এক্সপ্লেইন কইরা দিমু অনে। স্কুলে জিওগ্রাফি পড় নাই?' মামী— 'ধ্যুৎ যত্তবাজে কথা।' বলে চুল বাঁধতে বসেন।

নেক্সট কর্নাটকে হাতী আছে কি না এই প্রসঙ্গে বসনমামা বললেন 'হাতী এনিমেল হিসাবে মন্দ না। ক্যাবল লেজে অণুমাত্র হাত লাগলেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এই যা। ক্ষিপ্ত হইয়া চাট মারে, আর হাতির চাট যে খায়, তারে আর অন্নজল খাইতে হয় না!'

শুনেই মামী আপত্তি জানালেন, 'দূর দূর। হাতীতে আবার চাট মারে নাকি? হাতী কি দুধেল গাই? না ঘোড়া? হাতীতে কক্ষনো চাট মারে বলে কেউ শোনেনি!'

বসনমামা শান্তগলায় বললেন— 'তুতুর মা, হাতী হইল এক বিশাল প্রাণী। যেমন কিনা ভারতবর্ষ। তুমি আরে একপ্রকার জান, আমি আর এক প্রকার জানি। এইরকম তো হইতেই পারে। পারে না? সেই অন্ধ, কালা, আর খঞ্জের কাহিনী শুন নাই? অন্ধ, কালা আর খঞ্জ গেল জাদুঘরে হাতী দেখনের লগে। যাইয়া ইসে কি, শালা অন্ধ তো শুঁড়টা চ্যাইগ্যা ধরসে, ধইর্যা ভাবতাছে হস্তী হইল বুঝি রবারের নলের তুল্য, দীর্ঘ, নরম, সর্পবৎ— আর কালা? কালাডা, কালাডা ভাবে কি...' কালার প্রসঙ্গে এসে হোঁচট খেয়ে যান বসনমামা, তারপরেই সামলে নেন, 'কালা অন্য এক ডিফারেন্ট ভিউ দিল, আর খঞ্জের হইল গিয়ে আরও এক, থার্ড ওপিনিয়ন। অন্ধ, কালা আর খঞ্জের তো ফিলজফি অব লাইফ এক হইতে পারে না, সুতরাং অগো হস্তী-দর্শনও ভিন্ন ভিন্ন হইবেই। ঠিক কি না কও? আমাগো সিচুয়েশন অনুরূপ— তুমি হইলে গিয়া তুতুমিতুর মা, ফেমিনাইন, আমি অগো বাবা, মাসকুলাইন— দুই জনার ভিউ তো এক হইতেই পারে না। ঠিক কিনা তুমিই কও?'

'যত পাগলের কাণ্ড!' বলে মামী রেগে ঝনাৎ করে চাবিটা পিঠে ফেলে আপনমনে গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

তখন এমনিতেই মামীর দুশ্চিন্তা যাচ্ছিল, পোস্টাল স্ট্রাইকে অনেকদিন বাপের

বাড়ির চিঠি পাচ্ছিলেন না। তারই মধ্যে বসনমামা সিম্প্যাথি জানাতে গিয়ে বলে বসলেন—

'নাঃ, তুতুর মা, আগের দিনকালই ছিল ভাল, বানরের পায়ে পত্র বাইন্ধ্যা, ছাইড়্যা দিত যুদ্ধের টাইমে— আর বাতাসে উইড়্যা, সরি শূন্যে লম্ফ দিয়ে সেই বানর ঠিকই মেসেজ পৌঁছিয়া দিত। আমাগো পি-এণ্ড-টি-এর যা অবস্থা, অগোও উচিত বানরের মেসেঞ্জার সার্ভিস এভেইল করা।'

হেসে ফেলে মামী বললেন, 'এত শিগগির ভীমরতি ধরলে বাকি জীবন চাকরি করবে কেমন করে? একটু আগে বললে অন্ধ, খঞ্জ আর কালার হস্তী-দর্শন, আবার বলছ বাঁদরের পায়ে চিঠি বেঁধে উড়িয়ে দেবার গল্প। ওটা পায়রা হবে।'

এই হাসিটা বসনমামার একেবারেই সহ্য হল না। ক্ষেপে অস্থির হয়ে উনি অপিসে বেরিয়ে গেলেন পানটান না নিয়েই। যাবার সময়ে বললেন, 'উঃ গিন্নি তো না, উকিল! উকিল! তুমি বরং কোর্টে যাইয়া সওয়াল কর, ভালই পয়সা পাইবা বোঝলা তুতুমিতুর মা? মাইয়া মানুষের এত মুখরস্বভাব ভাল না। আমি ফিরুমই না আর এই পোড়াঘরে। লাইনেই গলা পাইত্যা দিমু আইজ— হ। তুমি ইনসুর্যান্সটা লইয়া বেনারসী কিনতে পারবা।'

'হ্যাঁ ওইটাই তো বাকি আছে! বেনারসীটা না কিনলেই চলছে না।' বলে মামী লুচিভাজা কন্টিনিউ করেন।

আমিই উদ্বিগ্ন হয়ে মামীকে ঠেলতে থাকি, 'অ মামী! মামা যে বললেন ফিরবেন না? অ মামী! মামা যে বললেন লাইনে গলা পেতে দেবেন?'

'বলুক গে,' মামী খুন্তি নেড়ে বলেন, 'অমন রোজই বলে। তুই খা। আর দুখানা লুচি নিবি?'

এদিকে সন্ধে হয়ে গেল। বসনমামা আপিস থেকে ফিরলেন না। মামী দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে রুটি বেলছেন, সেঁকছেন গল্প করছেন। আমি অস্থির।

'অ মামী, বসনমামা যে ফিরলেন না?'

'ফিরবে, ফিরবে, ক্ষিধে পেলেই ফিরবে। ধোঁকার ডালনা হচ্ছে জানে তো।'

রাত নটা নাগাদ শীতে কাঁপতে কাঁপতে বসনমামা হাজির। ঢুকেই ডানহাতে নিজের গলাটি চেপে ধরে বাঁহাত মামীর সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ধরাগলায় বললেন, 'মাফলার!'

মামী দৌড়ে ওঘর থেকে মাফলার এনে দেন। বসনমামা রুদ্ধকণ্ঠে বলেন 'ডেটল! গরমজল! গামছা!'

তুতুমিতু দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। কি ব্যাপার? কি ব্যাপার?

বসনমামা বললেন— 'নুন গরম জল। আদা-চা! দুই পিস বিস্কিট!'

আস্তে আস্তে সব পরিষ্কার হল। অফিস ফেরত বাজারে না গিয়ে আজ বসনমামা অন্ধকারের পর লাইনে মাথা দিতেই গিয়েছিলেন এবং দিয়েওছিলেন। ঘন্টাখানেক পরেও যখন কোনও ট্রেনের নামগন্ধ নেই, তখন উনি উঠে এসেছেন। কিন্তু এই শীতে

রাতে অতক্ষণ হিমশীতল লোহার রেলের ওপর গালগলা পেতে রেখে গলায় মোক্ষম ঠাণ্ডা লেগে গেছে। স্বরভঙ্গ গলায় ব্যথা ও কাশি শুরু হয়েছে। এছাড়া রেললাইন ব্যাপারটাই অত্যন্ত নোংরা। মাথাটা অতক্ষণ ঐ ডার্টি প্লেইসে রেখে দিয়ে বসনমামা খুব বিচলিত। ডেটল-গরমজলে স্নান না করলে অন্য যে কোনও অসুখ ওঁর হয়ে যাবেই।

মামী ছুটলেন আরও গরমজল চড়াতে। গলায় মাফলার জড়িয়ে, নুনজলে গার্গেল করে, ডেটলে হাতমুখ ধুয়ে দুটো বিস্কুট দিয়ে গরম গরম আদা-চায়ে চুমুক দিতে দিতে তৃপ্ত বসনমামা বললেন— 'দেখলা তো রনজন, ম্যারিড লাইফে কত জ্বালা! ডোন্ট গেট ম্যারিড। স্বাধীনতা হীনতায় কে মরিতে চায়রে কে মরিতে চায়!'

মামী আবার কারেক্ট করতে আসছিলেন— আমি ছুটে গিয়ে বাধা দিলাম। — রঞ্জন এতদূর বলে, নিজেই এককাপ চা চাইল। তারপরে দেয়ালের রামকৃষ্ণ ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে বলল, 'পরেরদিন সকালে দেখি বসনমামার ঘরে কুলুঙ্গিতে এক কালীঠাকুরের ছবি, তাতে বসনমামা ফুলচন্দন দিয়ে ধূপ জ্বেলে দিচ্ছেন। আমি তো ট্যারা। মামীমাই লক্ষ্মীপুজো করেন দেখেছি। বসনমামা তো এসবের ধার দিয়ে যেতেন না। কালীঠাকুর আবার কবে আমদানি হল? আমি বলেই ফেললাম, 'মামা, তুমি আবার পুজো ধরলে কবে থেকে?' 'তগো মামী আগে স্টার্ট করসিল বটে কিন্তু আমিই ফার্স্ট হইয়া গ্যালাম।' মামার মুখে বিশ্বজয়ীর হাসি— মামা বললেন, 'মনে আছে তো তর? সেই যে, বিশপের সেই প্যারাবোলাটা? কচ্ছপ আর খরগোশের সেই নিমন্ত্রণ, কে আগে লম্বা গলা বাড়াইয়া কলসী থিক্যা মাছের ঝোল খাইতে পারে? খাইল গিয়া খরগোশ, যদ্যপি কচ্ছপের গলা! — এও হইল গিয়া সেই কাহিনী। সাধনমার্গে হুত দূর এডভান্স কইরা গেছি কি না?' আমি আর ঈশপ প্রসঙ্গে না গিয়ে, শুধু বললাম, 'আরে তুমি সাধক নাকি?'

'অল্প!' লাজুকমুখে বসনমামা উত্তর দেন।

'তুমি সাধনা টাধনা কর, সত্যি, সত্যি?'

'গোপনে!'

'কদ্দিন করছ?'

'লং টাইম। লং প্র্যাকটিস। সাধনা তো প্র্যাকটিসের ব্যাপার।'

'সাধনার তো কিসব স্তর-টর আছে শুনেছি— তুমি এখন কোন স্টেজে আছ?'

'ফেইজ নাম্বার থ্রি। ফাইনাল স্টেইজটা সংসারে বইস্যা হয় না। শ্মশানে যাইতে হয়।'

'ও বাবা। সে কি শবসাধনা-টাধনা নাকি? ওসব করে কাজ নেই বাপু। তা এখন তুমি কি কি স্তর পার হয়েছ? মোট ক'টা স্তর আছে?'

'ফেইজ চাইরটা। আর স্তর হইল তোমার টোটাল টুয়েন্টি নাইন। ঊনত্রিশটা। আমি ক্রস করছি একটুশটা।'

'এ-কু-শ? বাপরে। তো, সেগুলো কি কি?

'শোনবা? শুইন্যা বোঝবা কিছু? তন্ত্রমন্ত্রের লাইনে পড়াশোনা করসো কিছু? কর নাই? শুইন্যা ফল নাই তাইলে? আমি অহন অবধি শিখছি— মারণ, উচাটন, বজ্রদংশন, বেচক, কুম্ভক, অর্ধকুম্ভক-জলের উপর দিয়া গমনাগমন, হিপ্নটিজিম, মেসমেরিজিম, নিহিলিজম—এইডা অদৃশ্য হইয়া যাওনের উপায়, —আসনসিদ্ধাই, ব্যাসনসিদ্ধাই— কয়ডা হইল? বদ্ধপ্রাণায়ম, মুক্তপ্রাণায়াম, ভুজঙ্গপ্রয়াত, অগ্নিভুক, বায়ুভুক, ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন এইয়ারই নাম সোউল কালচার, এইটা মার্কিন দ্যাশে খুব চলে, যোগবিভূতি আর ই-এস-পি। সোউলকালচার স্টেইজটা আমি বিগত আঠাশে জুন তারিখেই কমপ্লিট করছি— আর যোগবিভূতি? সেও হইয়া গেছে তোমার গিয়া উনিশে আগস্ট— অহন আছি ই-এস-পিতে। আর বাকি ক্যাবল লাস্ট এণ্ড ফাইনাল ফোর্থ ফেইজ তাইতে আটটি স্টেইজ আছে— একই গ্রুপের অষ্টক সাধনা, তারে কয় ডিভাইন পাওয়ার অব এটর্নি। হেইডা পাওয়া হইয়া গেল, তো বাস! তুমিই রামকৃষ্ণ, অরবিন্দের লহ নমস্কার হইয়া গ্যালে।'

'বাব্বাঃ। এত? আচ্ছা বসনমামা, যোগবিভূতি ব্যাপারটা কী— আমাকে দেখাবে?'

'হইবো, হইবো। দ্যাখবি অনে। তাড়াটা কীয়ের?'

'যোগবিভূতি তোমার রপ্ত হয়ে গেছে?'

'হয় নাই? জলবৎ! জলবৎ!

'প্লীজ বসনমামা। যোগবিভূতি দেখাতেই হবে। আচ্ছা, ব্যাপারটা ঠিক কি বল তো? ম্যাজিক ট্যাজিক?'

'সিম্পিল। এই, যেমুন ধর...তুমি এট্টা ধানী লংকা লইয়া কচাকচ কচাকচ চিবাইলে, তোমার কিছুই হইল না। কিন্তু যার যোগবিভূতি নাই, সে চিবাইলে জ্বলনে মুখ— প্যাট থিক্যা রক্ত বাইরাইবে। আর যোগবিভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি? অবিচল।'

'বসনমামা, যোগবিভূতি দেখাও, প্লীজ! আমি যোগবিভূতি কক্ষনো দেখিনি।'

'দেখামু অনে। লাঞ্চটাইমে রিমাইনডার দিয়া দিস। ও কিছুই না! সিম্পল।'

দুপুরে বসনমামা আর আমি পাশাপাশি দুটো পিঁড়িতে খেতে বসেছি। সামনে ভাতের থালা। আমি মনে করিয়ে দিলাম, 'বসনমামা, যোগবিভূতি?'

বসনমামা হাঁকলেন— 'তুতুমিতু! উঠান থিক্যা ধানীলংকা তুইল্যা আনো তো মনা? এক ডজন?'

তুতুমিতু অমনি ছুটল চুপড়ি হাতে। মুহূর্তের মধ্যে লালসবুজ একচুপড়ি ধানীলংকা নিয়ে হাজির। তারপরেই ছুটল হাত ধুয়ে ফেলতে। আমি তো দেখেই ভয়ে কাঁটা। এতগুলো চিবোবেন— কি সর্বনাশ।

বসনমামা বললেন, 'দ্যাখবা? যোগবিভূতি? দেইখ্যা লও মনোযোগ দিয়া। এই লইলাম দুইডা লংকা— এই দিলাম মুখে— আমি চিবাইলাম— কচাকচ! কচাকচ! যেন আইসক্রিম— ইহারেই কয় যোগবিভূতি। বোঝলা? খুব কঠিন!'

লংকা চিবুতে চিবুতে এই কথাকটি বলা হয়েছিল। তার পরেই যেন কেমন কেমন হয়ে গেল সব। বসনমামার জিভ জড়িয়ে উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়ে গেল, চোখ লাল হয়ে উঠল, দৃষ্টি অপ্রকৃতিস্থ মুখভঙ্গি অস্বাভাবিক হয়ে পড়ল। নেক্সট স্টেজে চোখ থেকে অবিরল জল ঝরতে লাগল। কোনও রকমে বসনমামা তখনও বলে চলেছেন, 'এইবার— এই লইলাম এক মুঠি অন্ন, এই ভইরা দিলাম মুখগহ্বরে— এই চিবাইলাম। ....তারপরে একঘটি জল— এ্যাঃ এ্যাইভাবে...ঢকঢক কইরা গিলিয়া ফ্যালাইলাম ...এইবার ফাইনাল স্টেইজ...চক্ষুমুদিয়া পদ্মাসনে স্থির হইয়া বসবা, বইস্যা ঠিক এইভাবে মুক্ত প্রাণায়াম করবা অর্থাৎ মুখ হাঁ কইরা বাতাস টানবা, ছাড়বা, টানবা...ছাড়বা, ...হুস-হাস-হাস...এই হইত্যাসে তোমার রিয়্যাল যোগবিভূতি'...

বলতে বলতে তাঁর কানদুটোও টকটকে লাল হয়েছে, তুতুমিতুও ততক্ষণে গলা ছেড়ে 'ওগো বাবাগো তোমার কি হল গো' বলে ডুকরে কেঁদে উঠেছে, আর মামী একবাটী দুধের সর এনে বলছেন, 'শিগগির এটা খেয়ে নাও তো, জিভে ননীর প্রলেপ দিলে জ্বালাটা বন্ধ হয়ে যায়—'

এক চোখ বন্ধ, তা থেকে অবিশ্রাম জল পড়ছে, অন্য চোখটা একটু খুলে বসনমামা মামীর হাত থেকে বাটি নিয়ে বললেন, 'বাকি ক্যাবল লাস্ট ফেইজ— ডিভাইন পাওয়ার অব অ্যাটান—'

মেজকাকিমার গল্প

মেজকাকিমার অনেক গল্প। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি! এই কালকেরটাই আগে বলা যাক। ছোটকাকু অফিস থেকে দুপুরে লাঞ্চ খেতে বাড়ি আসেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করছেন, 'মেজবৌদি, আমার কোনও চিঠি এসেছ?'

মেজকাকিমা বললেন, 'চিঠি? তা তুমি আসছ না, আসছ না, আমি তো রান্নাবান্না সেরে তোমার জন্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, দেখি পিয়ন আসে কি তুমি আস, এমন সময় পাশের বাড়ির সোমার মায়ের দেখা পেলুম। সোমার মায়ের খবর তো জান? তার ভায়ের চোখে অপারেশন হয়েছে, ম্যাড্রাসে গেছে। সেই সময়েই আবার তার মায়ের হল হার্ট অ্যাটাক। সেও হাসপাতালে। বেচারি একলা ভেবে ভেবে অস্থির। ম্যাড্রাসে ভায়ের খবর নেবে, না পি.জি-তে মাকে দেখতে যাবে, সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। তা সোমা অবিশ্যি খুব শক্ত মেয়ে, ছেলেবেলা থেকে পিতৃহীন হলে লোকে অমনি শক্ত হয়ে যায়। সে বললে, মা, তোমাকে ম্যাড্রাসের কথা ভাবতে হবে না, তুমি পি.জি-তেই যাও। কি সুবুদ্ধি, ভেবে দ্যাখ একবার ঠাকুরপো? অতটুকুনি মেয়ে, কলেজে পড়ছে মাত্তর। তারপর সোমার মা তো চলে গেল আমি ভাবলুম সোমার জন্য তো পাত্তর দেখা উচিত এবার! মেয়ে বেশ বড় হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে উমেশবাবু যাচ্ছিলেন। দেখেই মনে হল উমেশবাবুর চার ছেলের তো এখনও বিয়ে হয়নি। বিলেত, না আমেরিকায়, খড়্গাপুরে না দুর্গাপুরে, কোথায় না কোথায় যেন ছেলে চারটেই দূরে দূরে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোনওটা পড়ছে, কোনওটা বা চাকরি করছে। কে যে কেমন পাত্তর হয়েছে, ঠিক জানি না। উমেশবাবুকেই বরং ডেকে জিজ্ঞেস করি। তা উমেশবাবু তখন পোস্টাপিসে যাচ্ছিলেন বিলেতের না আমেরিকার চিঠি ডাকে দিতে। তাঁকে বলে দিলুম ঐ সঙ্গে আমার জন্যেও খান দুই পোস্টকার্ড এনে দিতে। বললুম, দাঁড়ান, তিরিশটা পয়সা নিয়ে যান, তা উনিও দাঁড়াবেন না, আমিও ছাড়ব না। ঐ কত্তেকত্তে ছেলেরা কে কি কচ্চে, কে কি পড়চে সেসব জিগ্যেস করতে করতে ভুলেই গেলুম। বয়েসের দোষ আর কি, তা উমেশবাবু—'

ছোটকাকু ডাল শেষ করে চচ্চড়ি মাখতে মাখতে বললেন, 'মেজবউদি, আমার কি কোনও চিঠি এসেছে?'

'সেই কথাই তো বলচি, তা পিয়নেরও দেখা নেই, তোমার দেখা নেই, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম মাথায় তেলটা মেখে নিই। তা তেলের যা অবস্থা হয়েছে! জবাকুসুম-ক্যাম্থারাইডিন তো মাখিইনি, একদম প্লেন নারকোল তেল। তাতেই কি খর্চা, কি খর্চা! মাঝে মাঝেই ভাবি, দূর ছাই তুলে তেল দেওয়া ছেড়েই দেব। তা পাকা-কাঁচা যাই হোক চাট্টিখানি চুল তো আছেই মাথায়, তেল না দিলে মাথা যেন ফেটে যায়, রাগ করে দু'দিন তেল না মাখলেই প্রেসার চড়ে যায়। সে আরেক কেলেঙ্কারি। তা আজকাল সিংঘী মার্কা বদল করে প্যারাসুট মার্কা কিনছিলুম, এখন আবার সেটাও বদল করতে হবে।'

এবার মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে কাকু বললেন 'মেজবৌদি, আমার কোনও চিঠি এসেছে?' চিরপ্রশান্ত চিরসুস্থির ছোটকাকু ধৈর্যভরেই প্রশ্ন করেন।

'আহা-হা, সেই কথাই তো হচ্চে। এতটুকুতে এত অধৈর্য হলে চলবে কেন? ওই চিঠির কথাই তো হচ্চে। তা আমি ভাবলুম পিয়নের তো দেখা নেই, বরং তেলটা একটু চাঁদিতে ঘসেই নিই, তারপর তেল মাখতে মাখতে দেখি, কি সব্বোনাশ। ও-বাড়ির চাঁদুর ছেলেটা ন্যাড়া ছাতে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। ওরে বাবা রে-এই ন্যাড়া ছাদের ঘুড়ি ওড়ানর মতন এতদূর ডেনজারাস খেলা আর নেই। আমি তো অমনি চেঁচাতে শুরু করেছি! অ চাঁদু! তোর ছেলে যে পড়ে মোলো রে! কি কচ্চিস? আগে ছেলেকে নামা! তা চাঁদু বাড়ি ছিল না, সকালবেলায় এই সময়ে অবিশ্যি সে থাকে না কোনওদিনই, তার তো রোজই আপিস— সেই সুযোগেই ছেলেটা ছাদে উঠেছে, তাদের ইস্কুল সব বন্ধ কিনা? গরমের ছুটি দিয়েচে এর মধ্যেই— ইস্কুলগুলো যে কটা দিনই বা খোলা থাকে, আর কটা দিন বন্ধ—'

'মেজবউদি?' ছোটকাকু কাঁচা আমের ফটিক ঝোলে চুমুক দিয়ে গোঁফ ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'আমার কি কোনও চিঠিপত্তর এসেছে?'

'আহা, চিঠির কথা বলছি না তো কি কথা বলছি আর? ভাবলুম তেলটা যখন মাখা হয়ে গেল, একেবারে গামছাটা নিয়ে, কাপড়-চোপড় নিয়েই নিচে কলতলায় নাবি, তোমার ডাকবাক্সটাও দেখা হবে, চানটাও সারা হবে— এমন সময়ে সাবির টেলিফোন এল। সাবির শাশুড়ি যায়-যায় জানই তো? সাবিদের বাড়ি টেলিফোন নেই, খবর যা কিছু আমার এখানেই দেয়। আমি তখন কি করি? কেমন করে সাবিকে ডেকে পাঠাই? ঘরে তো কেউই নেই, তখন বললুম— তা খবরটা বরং আমাকেই দিয়ে দাও, দুপুরবেলা যখন ছোট ঠাকুরপো ভাত খেতে আসবে তার হাতে সাবিকে খবর দিয়ে দেব। তা, হাতে তেল নিয়ে ফোন ধরা যদি বা যায়, কলম ধরা বড়ই শক্ত। তখন সাবির দেওরকে বললুম, ধর, তেল হাতটা ধুয়ে আসি।'

দইয়ের বাটিটা নামিয়ে রেখে ছোটকাকু বললেন, 'মেজবৌদি, আমার কি কোন

চিঠি—'

'আহা, শোনই না সবটা, এত অধীর হলে কি সংসারে চলে? আপিসের কাজকর্ম করই বা কেমন করে তোমরা? তাড়াতাড়ি তেলহাত ধুয়ে সাবির দেওর যা যা বললে সব একখানা কাগজে লিখে নিলুম। সেই চিঠি লিখে ওকে বললুম, ছোটঠাকুরপোকে দেব— সে ঠিক ভাত খেয়ে আপিসে যাবার পথে সাবিকে দিয়ে যাবে তার শাশুড়ির খবরটা। চিঠি চিঠি করে যে পাগল করে দিচ্ছ, তা সেই চিঠির কথাই তো বলছি। শুনলে তো?'

ছোটকাকু হাত ধুয়ে মেজকাকিমার হাত থেকে মশলা নিয়ে খেতে খেতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, 'তাহলে, মেজবৌদি, সাবির চিঠিটাই দিয়ে দাও। যাবার পথে দিয়ে যাচ্ছি।'

'সে কি আর আছে? রাস্তা দিয়ে তক্ষুনি মনমোহন ছুতোর মিস্তিরি যাচ্ছিল, সে তো সাবিদের পাশের বাড়িতেই কাজ করেছে। তার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তখন তখনই পেয়ে গেছে। ওসব খবর ফেলে রাখতে হয়?'

ছিটকিনি খুলতে খুলতে ছোটকাকু বললেন, 'তাহলে আজকে সকালের ডাকে আমার কোনও চিঠি আসেনি?

মেজকাকিমা পিছু পিছু গেছেন দেওরকে এগিয়ে দিতে। ফস করে জ্বলে উঠলেন, 'কে বললে আসেনি? আমি কি বলেছি একবারও যে তোমার কোনও চিঠি আসেনি? কেন আসবে না চিঠি? আমি পিয়নকে দেখতে পাইনি বলেই যে চিঠি আসবে না তেমন কি কোনও নিয়ম আছে? এই তো তোমার দুখানা পত্তর এসেছে। এই দরজার কাছেই টেবিলের ওপর খবরের কাগজ চাপা দিয়ে তুলে রেখেছি, পাছে উড়ে যায়।'

খবরের কাগজের গোছা তুলে বীরদর্পে মেজকাকিমা দুটি খাম এগিয়ে দিলেন ছোটকাকুর হাতে।

(২) অতিথিসৎকার

কেউ যদি কড়া নেড়েছে তবে তার আর রক্ষে নেই। অমনি মেজকাকিমা চেঁচাবেন, 'বউমা, বউমা, মিষ্টি আন, শরবৎ কর, অতিথিনারায়ণকে অমনি ফেরাতে নেই।' তারপর তো দরজা খোলা হল। মেজকাকিমা ছুটে এসে মোড়া পেতে দিয়ে পাখা খুলে বলবেন, 'কাকে চাই আপনার?' যদি অচেনা হয়, তবু— 'বউমা, শরবৎ করে, মিষ্টি আনাও।' তিনি হয়ত কোনও সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ। ভাব দেখে লজ্জা পাচ্ছেন। এখন অতিথি বলতে সব বাড়িতেই এঁরাই প্রধান। এরোপ্লেনের সুটকেস, ইলেকট্রিকের ঝাঁটাবালতি, গ্যাসের উনুন, বাসনকোসন, তেল, সাবান, খাবার-দাবার, কি না আনেন এঁরা। এমনকি অন্তর্বাস পর্যন্ত। মেজকাকিমার সব কিছুই দেখা চাই। শোনা চাই। তারপর অতিথিকে মিষ্টির থালা দিয়ে শরবৎ খাইয়ে জিনিসপত্র কিনে, বিদায় করা চাই। জিনিস লাগুক না লাগুক মেজকাকিমা কিনবেনই। যদি না বড্ড বেশি দামী হয়। শ'খানেকের মধ্যে হলে তাকে খালি হাতে ফিরতে হবে না এই বাড়ি থেকে।

মেজকাকিমার কল্যাণে বাড়ি খেলো সাবানে, জোলো ফিনাইলে, বেফিট অন্তর্বাসে, স্যানিটারি ন্যাপকিনে, শ্যাম্পুতে, পাউডারে, ম্যাগিতে, বোর্নভিটাতে ভর্তি। অতিথিকে ফেরাতে কষ্ট হয় মেজকাকিমার। এত রোদ্দুরে আহারে লোকের দোরে দোরে ঘুরছে, ওদের বুঝি কষ্ট হয় না? কিছু না কিনলে চলবে কেন? আজ দরকার নেই? কাল হবে। যাকে রাখ সেই রাখে। মেজকাকিমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। বড়বউদির মত এমন পুত্রবধূ জগতে হয় না। বড়বউদির সহ্যের সীমা নেই। ভালবাসার অন্ত নেই। আমরা অধৈর্য হয়ে যাই, বউদি শুধু হাসেন। দাদার মৃত্যুর পর থেকে বড়বউদি একদম একা। দিনের বেলাতে ইস্কুলে পড়ান, বাকি সময়টা মেজকাকিমাকে নিয়ে। মেজকাকিমা তাঁর অতিথিদের গলা নিচু করে বলেন —'বড়বউমা আবার একটু কৃপণ আছে, ছোট্ট ছোট্ট গেলাসে শরবৎ দেয়, আটআনা দামের রসগোল্লা আনায়, তবু দেয় তো। আমার মেয়ে হলে? ও বাবা, এ যদি সন্ধ্যারানী হত, কিছু দিতই না। এই দিচ্ছি মা দিচ্ছি করেই সন্ধে উৎরে দিত। তোমরা চলে যেতে। চিরকাল কি কেউ জলখাবারের লোভে লোভে বসে থাকতে পারে?' তখনও জলখাবারের আশায় বসে থাকা, অথবা জলখাবার খেতে খেতে ব্যস্ত অতিথিরা এই অতি স্পষ্ট কথোপকথনে যারপরনাই অস্বস্তি বোধ করেন, কিন্তু অনপায়। না খাইয়ে ছাড়বেনও না মেজকাকিমা। লৌহভীমচূর্ণ করার মত যত্ন তাঁর। হ্যাঁ, সন্ধ্যা হলে বলত, 'মা, তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। এসেছে জিনিস বেচতে। তোমার আত্মীয় নয় কুটুম নয়, জ্ঞাতপুত কেউ নয়, তাকে মিষ্টির থালা ধরে দেবার কি দরকার।' আমি বলি, 'কি দরকার সেটা তুই কি বুঝবি রে সন্ধ্যা? বুঝি আমি আর বোঝে তারা। আমার এতেই পুণ্যি। অতিথি অতিথি। কি জন্যে এসেছে, চাঁদা চাইতে না সাবান বেচতে, সে আমার জেনে কাজ নেই, যেই এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবে, সেই নারায়ণ, তাকে সেবা করা অবশ্যকর্তব্য।' বক্তৃতার পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু শরবৎ খেয়ে চলে যান, মিষ্টির থালায় হাত দেন না অতিথিরা। এতো গেল অচেনা অতিথিদের বেলায়। যখন সত্যি চেনা লোক, মেজকাকিমা উ‌‌ সিত। 'এস, এস বউমা, খাবার সাজাও, বুলু-বাচ্চু এসেছে, বউমা খাবার থালাগুলো তুলে নাও, বুলু, বাচ্চুকে হাত ধোবার জল দাও, ওরা এবার চলে যাক, ভীষণ ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে আর বসে কাজ নেই।' অথবা বাচ্চু রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে রেখেছে, কেউ না চুরি করে নিয়ে যায়! ওদের ছেড়ে দাও ট্রামবাসে ভীষণ ভিড় হয়ে যাবে এবার, ওদের এক্ষুনি না গেলে নয়। অথবা কার্ত্তিক মাসের কাঁচা হিম লেগে যাবে মাথায় আরও দেরি করে গেলে। অথবা বুলুর মায়ের শরীর ভা‌ নয়, বেশিক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকা উচিত নয় ওর অথবা এই বেলা না গেলে রোদটা আরও চড়ে যাবে, ওরা বরং বেলাবেলি চলে যাক— মেজকাকিমার ঝুড়িতে ওজরের সংখ্যা অগু‌ ঋতুমাফিক রোদ আসা, হিম লাগা, ঠাণ্ডা লাগা, ঝড়, বিষ্টি, চোর-ডাকাত, নয় তো বাড়িতে মা, শ্বশুর, ছেলেপুলে, নয় তো চাকরি-বাকরি, নয় তো, গাড়িতে ভিড়, শেষ অবধি গাড়ি চুড়ির ভয় পর্যন্ত দেখান মেজকাকিমা। আত্মীয় বন্ধুদের খাওয়া হলেই আর একমিনিটও নয়, তক্ষুনি বিদায় করা চাই। বসতে

দেন যতক্ষণ খুশি কেবল সেলসগার্ল-সেলসম্যানদের। ওরা তো 'বেড়াতে' আসেনি, 'কাজে' এসেছে। ওদের কথাই আলাদা। সত্যি কথাই তো!

(৩) পয়া-অপয়া

'এই যে, এই কাপড়টা আর পরবো না বউমা তুলে রাখ'— মেজকাকিমার হাতে ফর্সা কালাপেড়ে শান্তিপুরী ধুতি একটি। মেজকাকিমা বললেন, 'বড় বিশ্রী কাপড় এখানা বউমা, এটা পরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, ওপাশে একখানা রিকশা উল্টে বিয়েবাড়ির বাসনকোসন সব রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। কি কাণ্ড বল দেখি? ওই বাঁড়ুয্যেদের বাড়ির বিয়ের ভিয়েন বসছে, তার জন্যেই যাচ্ছিল মনে হয়। আসলে হয়েছে কি, একটা গাড়ি একটা কুকুরকে প্রায় চাপা দিচ্ছিল, যেই গাড়িটা এদিকে হঠাৎ সরে এসেছে, অমনি এই বাসনভর্তি রিকশাটা উলটে পড়ল। কেউ কাউকে ধাক্কা মারেনি। সব আপনি-আপনি, সব এই কাপড়খানার জন্যে। সেদিনই এটা তুলে রাখা উচিত ছিল। মনে আছে, সেদিন এইটে পরে ভাত খাচ্ছিলুম, আর বিন্দুর মা পা হড়কে পড়ে গেল কলতলাতে?' বড়বউদি কিছু বললেন না। তবে আর ওই আলমারিটাতে জায়গা কুলোচ্ছে না। ঠাসা হয়ে আছে অপয়া শাড়িতে। তা দিয়ে বাসনও কেনা চলবে না। অপয়া বাসন হয়ে যাবে সেসব। পরাও চলবে না। মেজকাকিমা চেনেন যে। প্রত্যেকটা কাপড় তাঁর মনে থাকে। এত অপয়া শাড়ি কি আর একদিনে জমেছে? তা নয়, পঁচিশ বছর ধরে জমেছে। মেজকাকা মারা যাবার দিন থেকেই। সেই প্রথম অপয়া শাড়ি বাছা শুরু হল। যেটা পরা অবস্থায় মেজকাকার মৃত্যু ঘটল। তারপর থেকেই অপয়া ঘটনা বড্ড বেড়েছে। 'পাশের বাড়ির মেয়েটা যে গলায় দড়ি দিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গিয়ে, সেই খবরটা এই কাপড় পরে শুনতে পেলুম। এটা বড্ড অপয়া।' —'এই কাপড়টাই পরেছিলুম যেদিন পদ্মপুকুরে সেই ভীষণ মারামারিটা হল।' —'এই কাপড়টা আমি পরেছিলুম যেদিন মিত্তিরদের কত্তা-গিন্নিতে বেদম ঝগড়া হয়েছিল— গিন্নি বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন চিরদিনের জন্যে। শেষে মিত্তিরমশাই নিজে গিয়ে বহু সাধ্য-সাধনা করে দশ দিনে ফেরৎ আনলেন।' — এরকম কত! কত!

'এই কাপড়টা পরা অবস্থায় ছোটখোকার বউয়ের প্রথম বাচ্চাটা নষ্ট হবার খবর পেয়েছিলুম।'

'এই কাপড়টা পরা অবস্থায় বুলুর ছেলের ডিভোর্সের খবর শুনলুম', 'এটা পরেছিলুম যেদিন রামু ধোপা ট্রাম চাপা পড়েছিল', 'এই কাপড়টা পরা অবস্থাতেই সেজ ঠাকুরপোর চাকরি যাবার খবর এল।'

'এই কাপড়টা পরেছিলুম যখন রেডিওতে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুসংবাদ দিলে।'

এমনি, নেহরুর মৃত্যুসংবাদের শাড়ি, উত্তমকুমারের মৃত্যুদিনের শাড়ি, ভোলাদ্বীপ প্লেন বিপর্যয়ের শাড়ি, বিশুর ঠাকুরমার পা পিছলে পড়ে কোমর ভাঙবার দিনের শাড়ি, পাড়ার ভুতো কুকুর চাপা পড়বার দিনের শাড়ি, বিজুর বাবাকে পুলিসে ধরবার দিনের শাড়ি, শুভেন্দুর বাড়িওয়ালার হুজ্জুতি করার দিনের কাপড়, প্রতিমার ফেল করার

'কিন্তু এত ঝড়-বাদলে বাইরে থাকলে তোমার শাশুড়ি ভাববেন। তুমি বাড়ি যাও!'

'কোথায় ঝড়-বাদল? শুকনো তো!'

'আসছে। ভয়ঙ্কর ঝড় আসছে।'

'মোটেই আসছে না। বাইরে পরিষ্কার আকাশ, খটখটে। আমি তো এই এলুম বাইরে থেকে।'

'রেডিওতে বলেছে। সতর্কবাণী দিয়েছে, তুমি জানবে কোত্থেকে? তোমরা তো রেডিও শুনবে না। প্রবল বান ডেকেছে। এখানেও এল বলে!'

'কোথায় বান? অন্ধ্রে? না বাংলাদেশে?'

এই দু'টো দেশকে প্রতিবছর সমুদ্র একবার করে মার দিয়ে যায়। শয়ে শয়ে পশুপাখি, ঘরবাড়ি সমেত মানুষ মরে।

'অন্ধ্র আর চাটগাঁ ছাড়া কি আর দেশ নেই? প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে চীনে। চীন তো আমাদের গায়ের ওপর। চীনে ঝড়-ঝঞ্ঝা মানেই সেটা কলকাতাতে এসে পড়ল বলে!'

মেজকাকিমা দ্রুত হাতে জানলা বন্ধ করতে থাকেন, চীনের ঝড় সাবধান হওয়া দরকার।

বড়বউদি চুপিচুপি বলেন, 'চীনে তো ভাল। হনলুলুতে ঝড় হয়েছিল রেডিওতে শুনেই তো মা ছাদ থেকে সমস্ত ভিজে কাপড় তুলে ফেললেন, আর ফ্লোরিডাতে সেই যে একটা সাইক্লোন এসেছিল তার নাম ওরা দিয়েছিল 'সোনিয়া'। তাই থেকে মার ধারণা হয়েছে কে জানে? রেডিওতে 'সোনিয়া' নাম উচ্চারণ হলেই দৌড়ে গিয়ে জানলা দরজা বন্ধ করেন।'

টেলিভিসনটাকে মেজকাকিমা এখনও মেনে নিতে পারেননি। টেলিভিসনের ঘরে উনি ঢোকেনই না। কেবল 'রামায়ণ' হলে শুধু ওটা দেখতেই ইদানীং যাচ্ছেন। টি. ভি কে রেডিওর সতীন বলে মনে করেন মেজকাকিমা। টি. ভির ওপরে মনে মনে তাই তার রাগ। টি. ভি এসে রেডিওর যেন মান-মর্যাদা নষ্ট করেছে। ছোটকাকুর মতো বড়বউদিও মেজকাকিমাকে স্নেহের প্রশ্রয় দেন। তার সব অযৌক্তিক কাণ্ড-কারখানাই মেনে নেন। আর হাসেন। আশ্চর্য মানুষ বউদি।

(৫) ত্রিফলা

মেজকাকিমা খুব ভক্তিমতী। মেজকাকিমার ইচ্ছে আমরাও সকলে ভক্তিমতী হই। কিন্তু কাউকেই মানাতে পারেননি। এমনকি ওঁর ওই অদ্বিতীয় স্বেচ্ছাসেবিকা 'ওয়ান উওম্যান ভলান্টিয়ার ফোর্স' বড় বৌদিকেও না।

রাত্রে সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে খেয়েদেয়ে খোলা রেডিওর পাশে শুয়ে মেজকাকিমা ঘুমিয়ে পড়েন। আর এগারটায় রেডিও বন্ধ হলেই উঠে পড়েন। বড়বউদি ততক্ষণে স্কুলের খাতা-টাতা দেখে সবে এসে শুয়েছেন। মেজকাকিমাকে রাত্রে দেখতে হয়, পাশে একজনের না শুলেই নয়। ওঁর বয়স যদিও সত্তর হয়নি, কিন্তু হার্টটা ভাল নয়। দুবার অ্যাটাক হয়ে গেছে। পেসমেকার বসান আছে। সে আরেক গল্প। ঘুম থেকে

উঠেই মেজকাকিমা ঘড়ি দেখেন। তারপর ডাকেন, 'ও বউমা? বউমা? ঘুমলে? বলি ঘুমলে নাকি? ঘুমলে?'

বড়বউদি বলেন, 'কি মা? কিছু বলেছেন?'

'না মা, না। কিচ্ছু বলিনি। বলছি ঘুমোও। ঘুম তোমার দরকার। সারাদিন খেটেখুটে আস। বাড়িতেও তো বুড়ি শাশুড়িটাকে নিয়ে তোমার বিশ্রাম নেই। ঘুমোও মা, ঘুমোও। ঘুম না হলে তোমার শরীর দেবে কেন? এত কাজ মানুষে পারে? ঘরে খাটনি, আবার বাইরে খাটনি। বিশ্রামের সময় বলতে তো এই রাতটুকুনি। তা না ঘুমোলে কি চলে মা? তাই বলছি ঘুমোও। ঘুমিয়ে পড়। ঘুম মানুষের দেহে খাদ্য, পথ্য, ওষুধের মতই জরুরি। ওটা তোমার দরকার।'

বড়বউদি চুপ করে শুয়ে থাকেন। উত্তর দেন না।

'অ বউমা! বউমা। বলি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? অ্যাঁ? এ যে দেখি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। তেষ্টা পেয়েছে, অ বউমা, জল খাব।'

অকস্মাৎ মেজকাকিমা মরিয়া হয়ে ওঠেন।

বউমা যে ঘুমোননি, তাও প্রমাণ হয়ে যায়। বউদি উঠে পাশের টেবিল থেকে পাথরের গেলাসটি শাশুড়ির হাত তুলে দেন। মেজকাকিমা বলেন, 'নাও, শুয়ে পড়। ঘুম তোমার দরকার।'

বউদি হাসতে হাসতে শুয়ে পড়েন। একসময় ঘুমিয়েও পড়েন, মেজকাকিমার মুখে নানান গল্প শুনতে শুনতেই। মেজকাকিমা ঘুমোন না— দাদার ছেলেবেলার গল্প করেন বউদির কাছে। মেজকাকিমার ওই একই ছেলে ছিল। আর একটি মেয়ে আছে। বম্বেতে থাকে। তার ছেলেবেলার গল্পও শুনতে হয় বউদিকে। তারপর ভোর তিনটে বাজতেই ঘড়ি ধরে, 'অ বউমা! বউমা! উঠে পড়, ওঠ, ওঠ, শীগগির বাথরুমে যাও। হিসি করে এস, নইলে শরীর খারাপ হবে যে। এতক্ষণ বাথরুমে না গিয়ে থাকতে হয়? শরীরের বিষ শরীরে বসে যাবে যে? ওঠ? বাথরুমে যাও। কিডনি শেষ হয়ে যাবে। যাও বাথরুমে যাও।'

'আপনি যাবেন মা? চলুন, আমি আলো জ্বেলে দিচ্ছি।'

'আমি তো যাবই। সে কথা হচ্ছে না। আমি বলছি তুমি যাও। এই যে তোমার একটানা ঘুমুনো, বাথরুমে না গিয়ে, এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয় একটুও। খুব খারাপ অভ্যেস।'

মেজকাকিমার অনুরোধমাফিক বড়বউদির স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম পর্ব শেষ হয়। বউদি ফের ঘুমোতে যান।

চারটে বাজে দেয়াল ঘড়িতে। মেজকাকিমা ডাকেন, 'অ বড়বউমা, বড়বউমা। ওঠ মামণি ওঠ, চাট্টে বেজে গেল যে— বড়বাইরে ফিরে আসবে না? এর পর যে অনিয়ম হয়ে যাবে। শরীর শুদ্ধি না করলে কি চলে মা? যাও, বড়বাইরে যাও। চারটে বেজে গেছে।'

মেজকাকিমার একেবারে কড়া নিয়ম। বড়বউদির ইচ্ছে-অনিচ্ছে, বা শারীরিক প্রয়োজন, তাঁর বাথরুম যাবার কোনও ভিত্তিই হতে পারে না। এ ব্যাপারে মেজকাকিমার ঘড়ি দেখাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এতেও বউদির হাসি মোছে না।

বাথরুম থেকে এসে বউদি আবার শুতে চেষ্টা করেন। মেজকাকিমার নাম হওয়া উচিত ছিল 'কমলি'। উনি 'নেহি ছোড়েগী'। ঠিক পাঁচটার সময়ে মেজকাকিমা উঠে কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ বস্ত্র পরে ধূপ জ্বেলে ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে ধূপ নেড়ে নেড়ে, ঘরময় দেয়াল ভর্তি টাঙান ক্যালেণ্ডার থেকে বাঁধান অপূর্ব সব দেবদেবীর ছবিতে এবারে আরতি করতে শুরু করেন। হেঁটে হেঁটে ঘরময় ঘুরে ফিরে মন্ত্র পড়তে পড়তে।

'অ বউমা, বউমা। ওঠ। ওঠ। শাঁখটা ধর। বাজাতে হবে না, কেবল ধরে ধরে এনি নাড়লেই হবে। যাও, বাসি কাপড়টা আগে ছেড়ে এস। তারপর শাঁখটা নাড়াও। এই ব্রাহ্মমুহূর্ত বড় জাগ্রত মুহূর্ত। এই সকালে দেবতাদের আরতির সময়ে সবাইকে উপস্থিত থাকতে হয়। ওঁরা সব সশরীরে এসে পুজো নেন। এই সময়টাই স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের, দেবতার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের প্রকৃষ্ট সময়। এই মুহূর্তটা ঘুমিয়ে নষ্ট করতে নেই মা, উঠে পড়। দ্যাখ কি সুন্দর সুয্যি উঠবে এবার। ছাদে যাও। ছাদে গিয়ে পুবমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বল 'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং'— ওঠ বউমা? কি কি? পাশ ফিরছ কেন? অ বউমা? ওঠ?'

পিঠে জোরসে ঠেলা খেয়ে বড় বউদি ঘুমচোখে এইবারে বলেন, 'এই যে উঠছি। উঠছি মা। আপনার ত্রিফলাটা ভেজান আছে, এই আমি উঠেই দিচ্ছি।'

হঠাৎ আশ্চর্য পটপরিবর্তন হয়। নরম সুরে মেজকাকিমা বলেন, 'ত্রিফলা? আবার তুমি ত্রিফলা ভিজিয়েছ? কোবরেজ মশাই বুড়ো হয়েছেন, কি বলতে কি বলেছেন, আমি বলেছি না, আমি ত্রিফলা খাই না, ত্রিফলা খাব না আমি।'

'না মা, তা হয় না। কবিরাজ মশাই রাগ করবেন।'

'তুমি শোও তো ততক্ষণ। চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই মেয়ের। ভোর হতে না উঠে পড়ে আমার পেছনে লেগে গেছ? 'মা, ত্রিফলা খাও!' শুধু শুধু এক্ষুনি ওঠবার কোনও দরকার নেই। তোমার তো মরনিং ইস্কুল নয় বউমা? তুমি বরং আর একটু রেস্ট নাও। বিশ্রাম কর। আরেকটু ঘুমোও দিকিনি, বউমা? ঘুমটা খুবই জরুরি। তোমার শরীরের পক্ষে ঘুমটা খুবই দরকার।' বলতে বলতে মেজকাকিমা একা একাই ছাদে পালান।

বড় বউদি মৃদু হেসে পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। এখন দু'ঘন্টা নিশ্চিন্ত। সেই সাতটায় সুরবালা আসে। এসে চা তৈরি করে। চান করে, পুজো করে, চা খেয়ে, কাগজ পড়ে একেবারে তারপরে মেজকাকিমা এসে চায়ের কাপ হাতে আদর করে বউদিকে তুলবেন, 'বউমা! অ বউমা? ওঠ, ওঠ, চা খাও। আর কতক্ষণ ঘুমোবে? তোমার ইস্কুলের বেলা হয়ে গেল যে?' মেজকাকিমার রেডিওতে তখন লোকসঙ্গীত চলবে। ত্রিফলার টাইম ওভার।

মেজদির কেচ্ছা

আমাদের ভবানীপুরের পাড়াতে এবাড়ি-ওবাড়িতে খুব যাতায়াত। তোমাদের বালিগঞ্জ নিউ-আলিপুরের মতন নয় বাপু। বিয়েবাড়িতে যাচ্ছি, ধর আমার তেমন ভাল শাড়ি নেই, তাতে কি? সামনের বাড়িতে নতুন বউ এসেছে, অনেক ভাল ভাল শাড়ি, একটা চেয়ে নিয়ে পড়ে যেতে কোনওই বাধা নেই। শাড়ি তো আমি খেয়ে ফেলব না? ছিঁড়ে খুঁড়ে কিংবা দই-কালিয়া মাখিয়ে নষ্টও করব না— বয়েস হয়েছে যথেষ্ট। আমাদের পাড়ায় এসবের চল আছে। তোমার বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এসে পড়েছে— ঘরে কিছু নেই, আমার ঘরে যা আছে, চটপট সেই নারকেল নাড়ু নিমকি দিয়ে তুমি চা দিয়ে দিলে তোমার অতিথিকে। ধর কত্তাগিন্নি সিনেমায় যাচ্ছি— শাশুড়িমা বাড়িতে নেই— দেওরের কাছে গেছেন। আমার বাচ্চারা তোমার বাড়িতে ঘুমিয়ে রইল। দিব্যি ফেরার পথে আমরা ওদের তুলে সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ি এলুম। না, ফ্ল্যাট বাড়ি না হলে কী হবে— এ বাড়ি-ও বাড়ি ভাব আছে। তোমরা ফ্ল্যাটবাড়িতে একসঙ্গে থাক। অথচ এ ওর মুখ দেখো না, নাম জান না। আমাদের ভবানীপুর, কালীঘাট ঢের ভাল পাড়া। মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখাশুনো হয়, কথাবার্তা হয়, সুখে দুঃখে খোঁজখবর নেয় সব্বাই। পাড়ার লোকেরা দূর-পর নয়। সুবিধে যেমন আছে, অসুবিধেও যে নেই একেবারে তা বলব না। শাশুড়ি যদি দেওরের বাড়িতেও থাকেন, তবু, সামনের বাড়ির জ্যাঠাইমা তো আছেন? গুরুজনের নজরের বাইরে থাকা চলে না। 'বৌমা!' বলে হাঁক পাড়বার কেউ না কেউ আছেনই। আমার যখন নতুন বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে আগমন হল, সে অনেককাল আগের কথা, তখন ঠিক সামনের বাড়িতে আমার শাশুড়ির এক 'প্রাণের বন্ধু' ছিলেন। শাশুড়িমা তাঁকে 'মেজদি' বলে ডাকতেন। কেন 'মেজদি' তা জানি না। মেজদির বয়েস নাকি শাশুড়িমার চেয়ে বেশি ছিল, কিন্তু মেজদিই অনেক বেশি চটপটে ছিলেন। (তাঁর উকিল স্বামী বেঁচে, এবং জমজমাট পসার ছিল তখনও যদিও তিনি মেজদির চেয়েও বয়সে অনেক বড়।) আমার বিয়ের কিছু আগেই আমার শ্বশুর পরলোকগমন করেছেন। তাঁকে কখনও চোখে দেখিনি। শাশুড়িমার থান-পরা বিষণ্ণ

মূর্তিই আমি প্রথম থেকে দেখছি। এদিকে মেজদির কপালে মস্ত বড় গোল সিঁদুর-টিপ, চওড়াপাড় শাড়ি, বেস্পতিবারে আলতা-পরা পা, একগাল পান, একগাল হাসি, আর সিঁথেভর্তি লম্বা-চওড়া সিঁদুর। মেজদিকে আমরাও মেজদি ডাকতুম। আমার স্বামী তাঁকে ছোটবেলা থেকে 'মেজদি' বলেই ডেকে এসেছেন, আমরাও আর মাসিমা-টাসিমা বলা হয়নি। মেজদির নাম আহ্লাদী হলেই বেশি মানত। —এক গা সোনার গয়না, দিনরাত্তির পাড়াসুদ্ধ ঝমঝমিয়ে বেড়াচ্ছেন, ভয়ডর নেই। মেজদির স্বামী, জামাইবাবুর (তাঁকে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই 'জামাইবাবু' ডাকতাম) অনেক টাকা রোজগার, তিনি দুঁদে উকিল ছিলেন।

অত বয়স হয়েছে, তবু মক্কেলের কমতি নেই। বারান্দাতে পর্যন্ত বেঞ্চি পাতা ছিল, মক্কেলদের ঘরের মধ্যে আঁটত না। মেজদির তিন মেয়ে, দুই ছেলে। ছোট ছেলে বিলেতে ডাক্তার। বড় ছেলে-বউ এক নাতনি, দুই নাতি সমেত তাঁদের কাছেই থাকত। মেজদির সঙ্গে বউয়ের বিন্দুমাত্র অশান্তি ছিল না। বউই সংসার দেখত, বউই গিন্নি, মেজদি শুধু হাসিমুখে পাড়া বেড়াতেন আর নাতি-নাতনিদের সঙ্গে মেজদির বয়েসের খুব একটা তফাত আছে বলে মনে হত না। যেমন গলায় গলায় ভাব, তেমনি ঝগড়া বেঁধে যেত মাঝে মাঝে। বউমাকে গিয়ে মেটাতে হত। এমনিতে অবিশ্যি মেজদির পাড়ার ছোটদের সঙ্গে খুব ভাব। মেজদি তো গপ্পো বলতে ওস্তাদ কিনা। বুড়ো-বুড়ির গপ্পো, কানা-কানির গপ্পো, বোবা-বুবির গপ্পো, ন্যাড়া-নেড়ির গপ্পো, চড়াইকত্তা-চড়াইগিন্নির গপ্পো, তোতা-তুতির গপ্পো, পিঠেগাছার গপ্পো। 'আশিমন ময়দার দো-রোটি খায়া'—! পাড়ার বাচ্চারা মেজদিকে একবার পেলে আর ছাড়তে চায় না। আমারও খুব ভাল লাগত মেজদিকে। মেজদি যা-তা কাণ্ডকারখানা করতেন, এবং একেবারেই অনায়াসে। মেজদির বরটি মেজদিকে ভীষণ আহ্লাদ দেন—পাড়ায় এমন একটা কথা চালু ছিল। ছেলে-বউয়ের কাছেও তিনি প্রবল প্রশ্রয় পেতেন, সেটা চোখেই দেখতুম। আহ্লাদী দুলালী বলতে যা বোঝায় মেজদি ছিলেন ঠিক তাই। মেজদির স্বামীর বয়েস তখন নব্বই বছর। কিন্তু মেজদির মোটে চুয়াত্তর। হাসিখুশি মেজদি মোটেই বুড়ি হননি। কপালের দু'পাশে কিছু কোঁকড়া কোঁকড়া সাদা চুল ছাড়া, মেজদির মধ্যে বার্ধক্যের কোনও লক্ষণই ছিল না। ওই নামেই যা চুয়াত্তর। একপিঠ কালো চুল, ঝলমলে হাসি, চমকিলি চোখ, যুবতীর সমান মেজদি জামাইবাবুকে 'আপনি-আজ্ঞে' করতেন। আমাদের বাবা-মাদের মধ্যে কাউকেই এটা করতে দেখিনি, তাই খুব অবাক লাগত। তখন নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে আমার। বয়েস নিতান্তই অল্প। কৌতূহলের চোটে একদিন মেজদিকে তো জিজ্ঞেসই করে ফেললুম— 'মেজদি, আপনি জামাইবাবুকে আপনি-আজ্ঞে করেন কেন? অসুবিধে হয় না?' শুনে মেজদি, প্রথমে খানিকটা হেসে নিলেন। তারপর হাতের রুপোর বাটিটা খুলে একটা জর্দা-পান মুখে গুঁজে, সুগন্ধ ছড়িয়ে ধীরে সুস্থে বললেন— 'সে দুঃখের কথা তোকে কী বলব। শুনবি? তবে শোন। বিয়ে তো হল! চাঁদের আলোর মতনি ফুটফুটে মেয়ে ছিলুম, তোদের চেয়েও ঢের ছেলেমানুষ— চোদ্দ বছরের মেয়ে তিরিশ বছরের

বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে হল। না, না বুড়োর সেই প্রথম বিয়ে। দোজবরে নই। উকিল হয়ে গুছিয়ে বসে নিয়ে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করতে শুরু করে দেবার পরে, তবে না কত্তার খেয়াল হল, এত টাকা দিয়ে কবরটা কী, যদি সংসারই না রইল! তখন দ্যাখ-দ্যাখ শিগগির পাত্রী দ্যাখ। তিরিশ বছরের বরকে কে আর মেয়ে দেবে? বিধবা মায়ের শেষ মেয়েটা ছাড়া, আর কাকেই বা পাবে সে? তবে হ্যাঁ, বুড়োর কপাল ভাল ছিল বল? বউটা মন্দ পায়নি। অবিশ্যি আমিও বলব বাপু, বুড়ো শিবঠাকুর বরটি আমারও কপালে জুটেছেন ভালই। ওই নন্দীভৃঙ্গী, অর্থাৎ মক্কেল, আর বউ। বউ আর মক্কেল। এই দুটি নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন। মোটেই বারমুখো নন। বরঞ্চ একটু বেশি ঘরকুনো। কোর্টে বেরুন ভেন্ন আর কোথাও বেরুবেন না। এক আমার মা যতদিন ছিলেন, শ্বশুরবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যেতে খুব ভালবাসতেন। আমার মার মতন রান্নার হাত খুব কম লোকের হয় কিনা! ব্যস। মাও চলে গেলেন, উনিও আর কোথায় যাবেন না। আমার বড় বড় দিদি সব কত ডাকত, আদর করে— তার বেলা গা করতেন না। কেবল কাজ। কেবল কাজ। এখন তো আমার এক ছোড়দি ছাড়া কেউ বেঁচে নেই। ছোড়দা নেমন্তন্ন করেও না, তার শরীর মন ভাল না।'

'মেজাদ! আপনারও ছোড়দি আছে? আপনি তাহলে মেজবোন নন?'

—'দূর, আমি কেন মেজবোন হব? আমি তো সবার ছোট!'

—'তবে সবাই আমরা আপনাকে মেজদি বলি কেন?'

—'তোরা কেন বলিস আমি তা কেমন করে জানব বল? বরং তোর শাশুড়িকে জিজ্ঞেস কর। তোদের জামাইবাবুটি মেজভাই— আমাকে তো উনি 'মেজবৌ' বলেই ডাকেন, শুনিসনি? তোর শাশুড়ি হঠাৎ নতুন বউ হয়ে এসে আমাকে 'মেজদি' বলে ডাকতে শুরু করে দিলে। সেই ডাক শুনে শুনেই বাকিরা সব্বাই। এমনকি তুই সুদ্দু। তের ছেলেও তাই ডাকবে।' ভবিষ্যৎ ছেলের প্রসঙ্গে নতুন বউয়ের যতটুকু লজ্জা পাওয়া উচিত, তা পেয়ে, আমি আবার বলি— 'কিন্তু আপনি কেন? আপনার বরকে 'আপনি' বলেন কেন সেটা কিন্তু এখনও বললেন না।'

—'ও, বলিনি বুঝি? তা, যেটুকু বলেছি, তাই থেকেই তুই বুঝে নিতে পারলি না? তবে কেমন বি-এ পাশ তুই? ইশকুলের চোদ্দ বছরের মেয়ে, হঠাৎ একটা তিরিশ বছরের কত্তাবেক্তি উকিল মানুষকে তুমি-তুমি করে কথা কইতে পারে? পারে কি? তুই-ই বল। তুই পারতিস। বরই হোক আর যেই হোক। আমি তো তাঁকে চিনতুম না। বাড়ির ছোট মেয়ে, হঠাৎ অন্য বাড়িতে গিয়ে অতবড় দামড়া অচেনা লোকটাকে গায়ে পড়ে 'ওগো-হাঁগো তুমি কি কচ্চো গো' বলতে পারে?' ফলে এ জীবনে আমার আর ওগো-হ্যাঁগো বলাই হল না। 'এই যে', 'শুনুন', 'শুনচেন', বড় জোর 'ও মশাই' পর্যন্ত! ছেলেপুলে বড় হবার পর এখন 'কত্তামশাই' বলেও ডাকি। তা, তুইই বল। কাজটা কি আমার ঠিক হয়নি? বলি, দায়টা কার ছিল? বয়েসে যে বড় তার, না আমার? যার বাড়িতে আমি নতুন এসেছি, তার, না আমার? দায়টা কার ছিল?

—'মানে?'

—'মানে? তবে খুলেই বলি শোন। আমারও কি দুঃখ নেই? উনিই তো আমাকে আদর করে, চিরকুটি ধরে, কোলে বসিয়ে একদিন কানে কানে বলবেন—'হ্যাঁগো, তোমার-আমার যে-সম্পর্ক, তাতে কি অমন দূর-পরের মতন আপনি বলা মানায়? তুমি আর আমাকে অমনি আপনি-আজ্ঞে কোর না তো? এবার থেকে তুমি বলবে। কেমন?' বল তুই, এটা কি ওঁরই বলা কর্তব্য ছিল না? আমিও ঘাড় নেড়ে 'তুমি-তুমি' কত্তুম। উনিই নিজে থেকে যদি আমাকে 'তুমি' বলতে কোনও দিনও না বলেন, তবে আমি কেমন করে সেধে 'তুমি' বলব ওঁকে? ষোল বছরের বড়ো গুরুজন মানুষটাকে? ওঁরও তো রসকষ কিছু কিছু থাকতে হয়? বউয়ের মুখে 'ওগো, হ্যাঁগো, আর দুটি ভাত নেবে গো?' শুনতেও তো সাধ হয়? তা নয়, ওর প্রাণে কোনই শখ সাধ হল না 'হ্যাঁ কত্তামশাই, আপনি কি আর দুটো ভাত নেবেন' এই শুনেই তার আনন্দ। বউয়ের মুখ থেকে মন শুকনো শুকনো কাঠ-কাঠ কথা শুনে কত্তার নিজের প্রাণে কোনওই দুঃখ নেই। বউ তো নয়, যেন রাঁধুনীবামুন কথা কইছে। আমার তো নিজের কানেই কেমন কেমন ঠেকত। কিন্তু জীবন কেটে গেল, 'তুমি' বলতে আর উনি বললেনই না। তাই যেই বড়বউমা এল ঘরে, আমি ওকে বলে দিলুম— দ্যাখ বউমা— আমার শুনে শুনে তুমিও যেন আমার ছেলেকে আপনি-আজ্ঞে কোর না বাপু! স্বামী-স্ত্রীকে ওরকম ডাক শুনতে বড়ড বিচ্ছিরি শুকনো-শুকনো লাগে। অবিশ্যি মেজবউমার বেলা অন্য কথা। তার শিক্ষাদীক্ষা তার দেশের মতন, আমাদের সঙ্গে ঠিকমতন খাপ খায় না। যদিও সে-মেয়ের চেষ্টার অন্ত নেই। তাকে কিছুই শেখাতে পড়তে হয়নি। মেম বলে কথা? মেমসাহেবদের আপনি তুমি নেই— সব সময়ে 'হানি' আর 'ডার্লিং' মুখে লেগেই আছে— মেজদি হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

—'বউয়ের আদিখ্যেতায় বরং ছেলের গোড়ায় খুব লজ্জা করত, আমিই বললুম— লজ্জা কিসের? ওটা হচ্ছে তোদের ইংরিজিতে 'ওগো-হ্যাঁগো-তাই নয়? ছেলেরও এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। দেশে যখন আসে, সেও দেখি ডার্লিং বলছে। ছোটবেলায় সত্যি আমার দুঃখ ছিল রে, বরের সঙ্গে দুটো মিঠে বুলি কানে কানে কে না বলতে চায়? তা কপালে থাকলে তো?' মেজদির চোখ উদাস হয়ে গেল। এটা বড় দেখা যায় না। তাই তাড়াতাড়ি বললুম—

'আচ্ছা— যদি জামাইবাবু এখন আপনাকে 'তুমি' বলতে পারমিশান দেন? আপনি পারবেন?' মেজদির ফর্সা নাক আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠল। মেজদি আস্তে আস্তে মাথাটি ডাইনে-বাঁয়ে হেলিয়ে তেমনি বাইরের দিকে চেয়ে থেকেই বললেন—

'এখন? এখন...নাঃ— পারলেও, বলব না।'

সেদিন মেজদির বাড়িতে গেছি, হঠাৎ দেখি হুড়মুড়িয়ে মেজদি জামাইবাবুর টেবিলে এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে হাজির— আমাকে ফিসফিস করে বললেন 'যা তো বুলু, চট করে

এক গেলাস জল গড়িয়ে নিয়ে আয় তোর জামাইবাবুর জন্যে' —বলেই আমার হাতে জামাইবাবুর বড় রুপোর গেলাসটা ধরিয়ে দিলেন। তারপর জামাইবাবুর মুখের কাছে দুটি বড় বড় হলদে-গোলাপী সন্দেশ ধরে, তেমনিই ফিসফিস করে বললেন— 'এই যে নিন? নিন? দু'চারখানা এইবেলা মেরে দিন দিকিনি, টপাটপ মুখে ফেলে? খুব ভাল সন্দেশ দিয়েছে বাপু আপনার মক্কেল' —মেজদির এমন আকস্মিক ফিসফাস ষড়যন্ত্রী টাইপের হাবভাবটি দেখে দুঁদে উকিলও ঘাবড়ে গেলেন। জামাইবাবুর মুখের চেহারা দেখে কষ্ট হল। ভীষণ অবাক হয়ে গিয়ে উনিও ফিসফিসিয়ে মেজদিকে বললেন— 'বউমাকে বাক্সটা দাও গে, জলখাবারের সঙ্গে তো দেবেই—এত তাড়ার কী আছে?' একটি হাত ঘুড়িয়ে, মেজদি ব্যাজার মুখ করে বললেন —'আররেঃ? সে তো ভা-গে-র? তখন গুনে গুনে দুটিমাত্র দেবে কিন্তু, বলে দিচ্চি আর চাইলেই বলবে, 'বাবা, আপনাদের বয়েস হয়েছে এখন বেশি মিষ্টি খেতে নেই'— তার চেয়ে এইবেলা দুটো এক্সট্রা পাচ্ছেন, খেয়ে তো নেবেন? কী রকম বে-আক্কেলে মানুষ রে বাবা? এমনি করে আপনি মামলা চালান? দেখি দেখি হাঁ-? হাঁ দেখি?' ...জামাইবাবু হাঁ করলেন। আমি জল আনতে চলে গেলুম।

আরেকদিন। লোডশেডিং হয়েছে। ঘোর অন্ধকারে মেজদি চাবি-গয়না ঝুমঝুমিয়ে এসে হাজির। হাত টর্চ! —'দ্যাখ না? তোদের জামাইবাবুটার রসকষ কিছুটি নেই। এত মন খারাপ লাগছে। একটা শখও যদি মেটাতেন!'

—'কেন, কী হল আবার?'

—'হবে আর কী? অন্ধকারে বসে আছেন, আজ কী ভাগ্যি— মক্কেল নেই। রাস্তায় কোনও আলো নেই। বললুম— 'এই যে শুনছেন? বলি শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আপনারও একানব্বুই, আমারও পঁচাত্তর হয়ে গেল, এ জীবনে একটা দিনও তো হাত ধরাধরি করে পার্কে বেড়ান হল না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো সাঁঝবেলাতে হরদম হাত ধরে ঘুরছে দেখতে পাই। এইবেলা বরং রাস্তা সুদ্ধু ঘুটঘুটে অন্ধকার, কেউ কিচ্ছুটি দেখতে পাবে না, চলুন না মশাই, আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে একটু ওই পার্কে বেড়িয়ে আসি? আপনার মক্কেলরাও দেখতে পাবে না— খোকার ছাত্রছাত্রীরাও দেখতে পাবে না, নাতি-নাতনিদের বন্ধুরাও দেখতে পাবে না— চলুন না বাবা একটু রাস্তায় হাত ধরাধরি করে দুজনে মিলে হেঁটে বেড়িয়ে আসি? আপনার কি প্রাণে একটুও শখসাধ হয় না?' প্রথমে উনি তো হেসেই গড়ালেন— যেন কতই একটা ছেলেমানুষি কথা বলেছি। তারপর বললেন— 'মেজবউ, অন্ধকারে বেরুলে আমরাও যে পথে কিছু দেখতে পাব না! এই বয়সে হোঁচট খেয়ে যদি পড়ে যাই, কোমরটি মট করে ভেঙে যাবে, আর এ জীবনে জোড়া লাগবে না। রাস্তাঘাটে কত খানাখন্দ, গর্ত, ইঁটপাটকেল, ঠেলাগাড়ি, রিকশা, কুকুর, অন্ধকারে হাঁটা সোজা নয়। শুধু যে আমাদের কেউ দেখবে না তাইই তো নয়? আমরাও হাতিঘোড়া কিচ্ছুটি দেখতে পাব না গো? টর্চ নিলে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না, আর টর্চ না নিলে দুজনে মিলে পথে হোঁচট খাব। তার চেয়ে

এস, বরং ঘরেই হাত ধরাধরি করে বসে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখতে থাকি দুজনে। থাকগে, লণ্ঠনটা জ্বেলে কাজ নেই।' সে কি সম্ভব? বউমা লণ্ঠন নিয়ে এল বলে। 'জ্বালতে হবে না?' বলা যায়? ওঁর যত অসম্ভব কথা! হোঁচট! টর্চ নিয়েও হাত ধরাধরি করা যায়। যায় না? রাগ হয়ে গেল। আমি বললুম 'বয়েই গেছে আমার আপনার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে মক্কেলদের পথ চেয়ে হা-পিত্যেস করে অন্ধকারে ওঁত পেতে বসে থাকতে। আমি চললুম বুলুদের বাড়িতে।'

মেজদির জন্যে আমার সত্যি খুব কষ্ট হল। মেজদি ভুল করে সত্তর বছর আগে জন্মেছেন। যেদিন ওঁদের নিমগাছের ডালে মেজদির নাতনির জন্যে দড়িতে পিঁড়ি বেঁধে দোলনা টাঙিয়ে দেওয়া হল, নাতনিকে কোলে নিয়ে সবার আগে মেজদিই বসে গেলেন দোলনায় দুলতে আর বউমা শাশুড়িতে দোল দিতে লাগল। সে দৃশ্য আমরা সবাই দেখেছি, মেজদিকে চিনি বলে কেউই অবাক হইনি। অথচ বয়েসে অনেক কম আমার শাশুড়িকে ওই দোলনায় বসে দোল খাচ্ছেন এটা কল্পনা করতেও অসুবিধে হয়। মেজদি মেজদিই। তাঁর নিজস্ব একটা ব্যাপার আছে। বছর দুয়েক আগের কথা-চৈত্রমাসের সেল হচ্ছে, মেজদি সেলে সম্বচ্ছরের জনয ৬ খানা চওড়াপাড় নতুন শাড়ি কিনছেন— প্রত্যেকটা খুব সুন্দর। পয়লা বৈশাখের আগেই এদিকে বিপর্যয় ঘটল বাড়িতে— জামাইবাবু হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। করোনারি থ্রম্বোসিস। বউমাকে ডেকে মেজদি বললেন— 'বউমা! তোমার শ্বশুর তো চললেন এখন। এই যে ৬ খানা নতুন শাড়ি কেনা হল? আর কবে পরা হবে? এ গিন্নিবান্নি বুড়ো বয়সের শাড়ি তোমাকেও মানাবে না। বরং এবেলা ওবেলা করে পরেই ফেলি সবগুলো?' বউমা আর কী বলবে 'তাই পরুন'— ছাড়া? বাড়িভর্তি লোকজন, ডাক্তার, হাসপাতালের আয়া, মেয়ে জামাইরা সবাই এসে পড়েছে, বিলেত থেকে ডাক্তার ছেলেও এসে পড়ল, পাড়াপড়শীরা সারাদিন ছুটোছুটি করছি, জামাইবাবু অজ্ঞান অচৈতন্য— তাঁকে অক্সিজেনে রাখা হয়েছে, মেজদির নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই-প্রচণ্ড টেনশন— কিন্তু তারই মধ্যে ঠিক মেজদি এবেলা-ওবেলা/ওবেলা-এবেলা করে তিনদিনে ছ'খানা নতুন কোরা শাড়ি ঝটাপট পরে ফেলেছেন। বলাবাহুল্য খুবই অদ্ভুত দেখাল কাজটা। ইতিমধ্যে ঈশ্বরের দয়ার জামাইবাবুও আস্তে আস্তে সামলে উঠলেন। মেজদি বললেন— 'বউমা? সব নতুন শাড়ি তো ভেঙে ফেলেছি। ১লা বৈশাখে কী পরব? যাও দিকি, আর একখানা কাপড় কিনে আনো। লালপেড়ে। সম্বচ্ছরের দিনে সধবা মেয়েমানুষকে নতুন কাপড় পরতে হয়। নইলে সংসারে অমঙ্গল।' বউমা ছুটল নতুন কাপড় কিনতে। সেরে ওঠার মাস খানেক মাস দেড়েক পরেই আবার জামাইবাবু চেম্বারে বসলেন।

যেমনি মেজদি, তেমনি জামাইবাবু। অতবড় অসুখের পরও যথেষ্ট বিশ্রাম না নিয়েই কাজে লেগে গেলেন বলে ছ'মাস যেতে না যেতে জামাইবাবু আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ছেলেবউ, মেয়েজামাই, এমনকি মেজদি পর্যন্ত তাঁকে কিছুতেই বিশ্রামে রাখতে পারেননি। এবার দ্বিতীয় অ্যাটাক— বাড়িতে রাখা চলল না, জামাইবাবুকে এবার

নার্সিংহামে দিতে হলো। ঘর-নার্সিংহোম মেজদি সারাদিন ছোটছুটি করছেন। বলতে নেই মেজদিরও তো বয়েস খুব কম নয়। স্ট্রেন হচ্ছে বাড়িসুদ্ধু সকলেরই। মেজদির হাবভাবে কিন্তু হতাশার চিহ্ন নেই। শুধু চুলটা একটু রুক্ষুসুক্ষু, চোখটা একটু চঞ্চল এই পর্যন্ত। নয় নয় করেও তাঁর বয়েস এখন ঊনআশি হয়েছে, জামাইবাবুর পঁচানব্বই। দু'জনেই দেহে-মনে সচল আছেন এই যা! মেজদির চুলের শুভ্রতা খানিক বেড়েছে, কয়েকটা কুঞ্চন দেখা দিয়েছে গালে গলায়, এই পর্যন্ত।

'তোদের জামাইবাবু তো আরাম করে শুয়ে আছেন হাসপাতালে, আর আমারই হয়েছে জ্বালা'— বললেন মেজদি। 'নাওয়া খাওয়া না হয় চুলোয় যাক, তাতে ক্ষতি নেই। পুজো-আচ্চা পর্যন্ত চুলোয় গেছে। অথচ ঠাকুরকেই তো ডাকতে হয় এখন। এই পঁচানব্বই বছরের বুড়ো যদিবা হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে আসে, সে তো ডাক্তারের গুণে নয়, ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে। তাই না? তা ঠাকুরঘরে ঢুকতেই রাত ন'টা দশটা বেজে যাচ্ছে। তখন ঠাকুরের ঘুম পেয়ে যায়। কী যে বলি, ঘুমোতে ঘুমোতে গোপাল কিছুই শোনে কি না কে জানে?' —মেজদির অতি আদূরে এক গোপাল ঠাকুর আছেন, তিনি রুপোর খাটে সোনার ছাতা মাথায় দিয়ে সোনার নাড়ু খান। অর্থাৎ মেজদিদিরও ওপরে আর-এককাঠি। আহ্লাদে নন্দদুলাল। মেজদি তাঁকে ডেকে কী যে বলেন, জানি না। তবে আমাকে ডেকে একদিন বললেন —'শোন বুলু। তোকে একটা জরুরি কথা বলে রাখি। তোদের জামাইবাবু গত হলে আমি কিন্তু আর আমার চওড়াপাড় কাপড়গুলো পরব না। তোর জামাইবাবুর পুরনোর ধুতিগুলোও পরব না। আমার ছটা ফাইন থান চাই। খোকাকে আমি সোজাসুজি বলতে চাই না— ওকে মনে করে তুই বলবি যে, আমি তোকে বলে রেখেছি, চওড়াপেড়ে শাড়ি-পড়া বুড়ি বিধবা দেখতে আমার ভাল লাগে না। নরুন পেড়ে ধুতি পরা বিধবাও বিতিকিচ্ছিরি লাগে। বেশি বয়সে বিধবা হলে বাঙালি মেয়েদের থান-কাপড়েই মানায়। যে বয়েসের যেটা ফ্যাশান। বুঝলি না? মনে করে কিন্তু বলবি খোকাকে ে া কিনে রাখে— তোর জামাইবাবুর এটা তো সেকেণ্ড অ্যাটাক। ছিয়ানব্বই হতে চলল। যদিও বা এবার সেরে ওঠেন, থার্ড অ্যাটাকেই নির্ঘাত যাবেন। তখন যদি শোকে তাপে আর গোলমালের মধ্যে কাপড়চোপড়ের মতো তুচ্ছ কথাটা আমার বলতে মনে না থাকে? তাই তোকে আগেভাগেই বলে রাখলুম। আর শোন বউমাকে বলবি আমাকে যেন মাছফাছ ধরায় না অশৌচের পরে। আশি বছর বয়সে বিধবা হলে মাছ-মাংস খাওয়া কেবল লুভিষ্টিপানা ছাড়া কিছু নয়। সারাজীবন ঢের মাছমাংস খেয়েছি। যেসব বুড়ি বিধবার দাঁত নেই অথচ মাংস খায় আমার মনে হয় তারা সারা জীবন খেতে পায়নি। হ্যাঁ অল্পবয়সে বিধবা হতুম যদি, সে এক কথা ছিল। কিন্তু বয়েস তো এখন আশি? সাধ আহ্লাদ বাকি থাকার দিন নেই।'

'আশি তো আপনার হয়নি, মেজদি আর বিধবাও তো আপনি হননি। দুটোরই দেরি আছে। দেখুন— জামাইবাবু সেরে উঠবেন নিশ্চয়। খুবই ভাল ডাক্তারের হাতে

রয়েছেন। আচ্ছা মানুষ তো! আপনাকে আশি বছরে বিধবা হতে হবেই— এটা কে বলেছে?' আমি প্রায় ধমকেই ফেলি মেজদিকে। তারপর যোগ করি— 'আর সাধ আহ্লাদ? আপনার না থাক, আমাদের আছ, দাঁড়ান না আপনার আশি বছরের বার্থডে করব আমরা, ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে, রাস্তায় প্রসেসন করে; ঘাড়ে করে বওয়া আলোর স্ট্যান্ড জ্বালিয়ে, আপনাকে আর জামাইবাবুকে হাত-ধরাধরি করিয়ে হাঁটিয়ে পার্কে ঘুরিয়ে নিয়ে আসব— আসুক অঘ্রান মাস— তবে তো আশি হবে? আর বৈধব্য অনেক দূরে, মেজদি, শুধু শুধু অত অলুক্ষণে কথা বলবেন না তো!'

'অলুক্ষণে কথা? বটে?' বলেই মেজদি দুষ্টু হেসে আমার কানেকানে গোপন কিছু বলবার জন্যে মাথা নিচু করে এগিয়ে এলেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন— 'কেন এত অলুক্ষণে কথা বলছি বল তো? তবে শোন। ছাতা নিয়ে বেরুলে যেমন বিষ্টি পড়ে না, তেমনি আমার কেমন মনে হয়, গোপালের কানের কাছে অত থান-কাপড়ের গপ্পো করলে, কি জানি, হয়ত আর বিধবা হতে হবে না। বুঝলি বোকা? ঠকাচ্ছি, ঠাকুরকে এমনি মিছিমিছি করে ঠকাচ্ছি রে—' মেজদি হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গোপালঠাকুর মেজদির কথা ঠিকই শুনতে পান। এ যাত্রাতেও জামাইবাবু সেরে উঠে নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরে এলেন— মেজদি আহ্লাদে হালকা হয়ে যেন ঠিক চাঁদের জমিতে নীল আর্মস্ট্রং— ওজনহীন হয়ে উড়ে বেড়াতে লাগলেন। উড়তে উড়তে একদিন সেই নববর্ষের লাল কস্তাপেড়ে ধনেখালিটা পরেই ভর সন্ধেবেলায় মেজদি স্নানের ঘরে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন।

অতএব ছখানা ফাইন থান কেনবার জরুরি কথাটা তাঁর ছেলেকে মনে করিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার ঘাড় থেকে নেমে গেল।

মেজদি চলে গেলেন কার্তিক মাসে, আর অঘ্রান মাসের এক রাত্তিরে হিমের মধ্যে জামাইবাবু একা একা লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে টর্চ ছাড়াই হঠাৎ রাস্তায় কী করতে যে বেরুলেন, কে জানে? মাঝখান থেকে খানাখন্দে পড়ে গিয়ে ডান পা খানা ভেঙে ফেললেন। বেচারি! সেই যে জামাইবাবু নার্সিংহোমে গেলেন, এবারে আর তাঁকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা গেল না।

—বলি, আনবেটা কে? মিছিমিছি থান-কাপড়ের গুলগপ্পো শুনিয়ে গোপাল ঠাকুরকে ঠকানর কেউ ছিল না যে।

———